সংখ্যা-১-১২

৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রতিষ্ঠিত—

Regd. No. B 5274 - 89 - P 80643

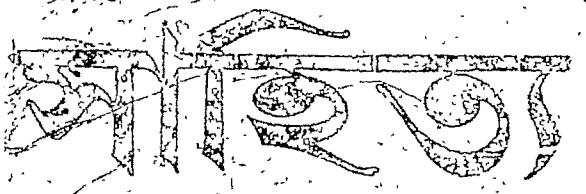

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

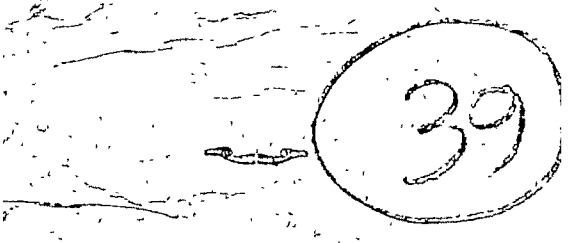

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত

তারা প্রেস।

৫৬ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশশধর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩২৯ সাল।

সাহিত্য।

৩২শ বর্ষ।

(বৈশাখ ১৩২৯—চৈত্র ১৩২৯)

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অ

অনুভূতির ব্যথা	...	ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	৩৮১
অভিন্ন	...	নৃপেন্দ্রকুমার বসু	৪৯৪

আ

আমার ডেপুটীগিরি		শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ	২৭
আমরা	...	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ	১৮৯
আর্টে দুর্গামূর্ত্তি	...	ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২০৫
আমার আত্মীয় তুমি		চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১১
আত্মপরিচয়	...	শ্রীবরদা দত্ত এম্-এ	২৯৩
আকাশ	...	চণ্ডীচরণ মিত্র	৩৮৪
আমির খস্রু	...	আ. ল	৪০২
আগামী কল্য	...	—	৪৯৮
আশার বাণী	...	অনুশীলা ঘোষ	৫১১
আগমনী	...	মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী	৫৪৬
আয়ুর্ব্বেদ-প্রসঙ্গ	...	কবিরাজ	৬০১
আলেয়া (কবিতা)	...	নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল	৭৪০
আলোচনা	...	সম্পাদক	৯১১

ই

ইরাক	...	ব্রজদাস গোস্বামী	৪০৩, ৫৫৭, ৬৩৮, ৭৮৩

ঈ

ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ...	অন্নপূর্ণা হাজরা	৬৮১

উ

উদ্বাধন ...	হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী	৪৩৩
উজান তরীর মাঝি —	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১০৮৪

ঋ

ঋতু পতি —	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০২৩

এ

একাগ্রতা ...	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ	২০৪
একখানি চিঠি ...	রবীন্দ্রনাথ সেন	৬১৮

ক

কোন্‌টী অধিক মিষ্ট	শ্রীরাজকুমার সেনগুপ্ত	১২৪
কালিদাসের জাতিনির্ণয়	(ঐ)	১৫৮
কবির আঁখি ...	বরদাচরণ দত্ত এম-এ	২৭৬
কালা জ্বর ...	গণপতি পাঁজা	৩১৮
কান্ত কবি রজনীকান্ত	সরলাবালা দাসী	৩৮৬
কবি সত্যেন্দ্রনাথ ...	বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৪০৮
কবির ব্যথা ...	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৬৩৬
কর্ম্মবীর টাটার জীবন-কথা	যতীন্দ্রমোহন রায়	৭০০, ৭৮৫
কো জাগর্ত্তিবা ...	সুকুমার ভাদুড়ী	৭৮৮
কবীর ...	মন্মথনাথ গুপ্ত	৮৭৪
কবিতা সুন্দরী ...	শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	৮৮০
কবি হাফেজ —	নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ	১০৩২

খ

খোন্দকার সাহেব ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম-এ	৭৯৮

গ

গয়ার কথা	শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি-এল ৩২, ১৪৯, ৩১০, ৭৪৩, ৮২১	
গান এবং বক্তৃতা ...	রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর	৪৪
গচ্ছিত ধন ...	সুকুমার ভাদুড়ী	১৪৪
গৃহশিল্প ও কারখানা	জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত	৫৫৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
গুণগান ..	গোপাল মোক্তার	২৩১
গল্প নয় (প্রবন্ধ) ...	নিম চাঁদ	১০০৫
	ঘ	
ঘরের ডাকাত ..	শারদাচরণ দত্ত	৮৫৩
	চ	
চুড়ি বিবি গো ...	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৩
চাটনি . .	মণিমৃণালিনী সেন	১৩১
চিরত্বঃখ ...	বিবেকানন্দ পাল, বি-এ	২৫৮
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫৮
চা ...	নৃপেন্দ্রকুমার বসু	১৩৩
	ছ	
ছায়া ...	সুকুমার ভাদুড়ী	২৩৭
ছোটলোকের অত্যাচার (প্রবন্ধ)	কস্যচিৎ উকীলস্য	৬০৮
	জ	
জেব উন্নিসা ...	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	১৫
জাল নাটোর ...	মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ	৮১৬
জাতীয় শিক্ষার ভূমিকা	দিগেন্দ্রনাথ পালিত	১০২৬
	ট	
টলষ্টয় —	হেমরঞ্জন রায়	৩৭০
টলষ্টয়ের কথা —	জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত	১০৫৭
	ত	
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	সুরেশচন্দ্র নন্দী ৬৩, ১০৩, ২৯৩, ৩১১, ৫৯৩, ৭০৫, ৮৩৪, ৯১৫, ৯৮৫,	
তুলসীদাসন —	মন্মথনাথ গুপ্ত	৩৫১
তৃষা —	ব্রহ্মদাস গোস্বামী	৭৬৪
তুলসীদাসের স্ত্রী-বিদ্বেষ	মন্মথনাথ গুপ্ত	১০৯১
	দ	
দরিদ্রা —	মণীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ	৪১৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
দেবতার আবির্ভাব —	যতীন্দ্রমোহন সিংহ	৬২৬
দ্বারকা তীর্থ —	রাজেন্দ্রকুমার যজুমদার শাস্ত্রী	৮১১
ধ		
ধর্ম্মসাধনে সুশাস্ত্র —	বিপিনচন্দ্র পাল	৫৬২
ধনী ও বড়লোক —	নৃপেন্দ্রকুমার বসু	৬৫০
ন		
নারীত্ব বিকাশে সতীত্ব	শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম	৩৪
নবীনের গান —	শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী	৫০
নববর্ষের অভিভাষণ —	—	৭১
নিবেদন —	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৩
নিশীথে —	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৩৪৬
নাম গান —	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	৫৬১
নারীর বন্ধন —	সুকুমার ভাদুড়ী	৮৪৬
নিদাঘে —	শ্রীঃ—	৮৭৩
প		
পিয়াসী —	শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী	৫২
পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী —	পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম-এ	১০৯
প্রতিমা ...	বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ	২৫৪
পুণ্যতীর্থে গুরু পূজা ...	...	২৭৮
প্রয়াণে ...	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৩৫০
পল্লী চিত্র ...	ভূপেন্দ্রকুমার রায়	৩৫৫
পরমহংসদেব ও অবতারবাদ	শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	৩৭০
প্রিন্স ক্রোপট্‌কীন ...	দীনাথবন্ধু দত্ত	৩৯৮
প্রবন্ধে বঙ্কিম-প্রতিভা	মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়	৪২০
পুষ্পবাসিনী ...	ব্রজদাস গোস্বামী	৪৩৫
প্রিয়প্রবাস মহাকাব্য	মন্মথনাথ গুপ্ত	৪৯৫
পদ্মিনী সমস্যা ...	নিখিলনাথ রায়, বি-এল	৫১২
পুরুষ ...	মন্মথ দত্ত, এম-এ	৫২৭

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রেমের স্বরূপ	...	রমলা	৩০১
প্রহরা	...	হৃষীকেশ মল্লিক	৬২৫
পানওয়ালি	...	মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়	৬৬৫
প্রত্যাখ্যাতা	...	ভীমচন্দ্র ধর	৬৯৬
পুরাণ-প্রসঙ্গ	...	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৯
প্রতীক্ষায় (কবিতা)	...	রবীন্দ্রনাথ সেন	৮০৮
প্রাবনে	...	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৮৪৭
পথের সন্ধান	...	সুকুমার ভাদুড়ী	৯১৭
		ব	
বিধিলিপি	...	শ্রীমতী সুবর্ণলতা দে	১৭
বৈশাখী পূর্ণিমা	...	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫
বৈশাখের রৌদ্র	...	আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ	৭০
বৈঠকী	...	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭, ১৫৯, ২৩৭, ৩৩৩, ৪৩১	
বাঙ্গালী টলষ্টয়	...	বিপিনচন্দ্র পাল	৯৩, ২৫৫
বুঝে পাওয়া	...	বিমলরাজ ঘোষ	১৩৬, ১৮২
ব্রাহ্মণ	...	শ্রীবরদা দত্ত, এম-এ	২০৩
বন্ধু	..	সতীশচন্দ্র চৌধুরী	২৫৯
বাঙ্গালীর কীর্ত্তি	...	মীর্জ্জা মহম্মদ মুফিবল হক খাঁ	২৬৬
বন্দীবরণ	...	বরদা দত্ত, এম-এ	৩৩৭
বঙ্গভূমি	...	ক্ষণপ্রভা দত্ত	৩৪৭
বর্ত্তমান ভারত	—	বিশাখা বসু	৩৬৩
ব্যবসায় ও চাকুরী	—	অনাথবন্ধু দত্ত	৪৪১
বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব	—	বিপিনচন্দ্র পাল	৪৫৫
বিরহী	—	রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৮৭, ৫৭২
বনের মায়া (কবিতা)	—	রবীন্দ্রনাথ সেন	৫২১
বৈদিক ভারতে সমুদ্র যাত্রা		শৈলেন্দ্রভূষণ সেনগুপ্ত	৫৫২
বল গল্প (কবিতা)	—	বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৬১৩
বৈজ্ঞানিকের আসন এবং নকল		নরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস সি	৬৬১

বিষয়			পৃ-া
বাঙ্গালায় জাতি	—	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮২
বর্ষা	—	যতীন্দ্রনাথ সেন	৭১২
বাঙ্গালা সাহিত্যে দেশাত্মবোধ		হরিপদ ঘোষাল এম-এ	৬৯২, ৯৯১
(বা ইংরেজ আমলে-বাঙ্গালী কবির স্বদেশপ্রেম)			
বনবালা	—	সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৮৪০
বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস		পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৯৪
বাঙ্গালার ইতিহাসে কর্ম্মকারশিল্পীর স্থান		প্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল	৯৩১
বীরকবিভূষণ	—	মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত	৯৬৪
বঙ্গভূমি	—	সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৭
বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী	—	গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	১০০৯
বারোয়ারী	—	পঞ্চানন দত্ত।	১০

ভ

ভালবাসি	—	আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ	১৮১
ভারত-শিল্পতত্ত্ব	—	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি-এল	৪২, ৩৩৯
ভাবনার ঘর	—	সুধা দেবী	৩১৭
ভারতে দেবোপাসনা ও রাখী বন্ধন		দিগেন্দ্রনাথ পালিত	৫৮৩

ম

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়		পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, এম এ	১২৫
মাসিক পত্র সমালোচনা		—	১৩৩, ৬৫১, ৯২৬
মূঢ়	—	বিবেকানন্দ পাল, বি-এ	২৩৬
মনের কথা	—	সুকুমার ভাদুড়ী	২৬৯
মধুর ছিটা	—	ভূপেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী	৩৪৮
মিলন (কবিতা)	—	মীরজা	৩৬৫
মা সিকী	—	—	৪২৪
মানুষ ও পশুর মোকদ্দমা		গোলাম মুস্তাফা বি-এ	৪৬৭
মদনমোহন	—	শরচ্চন্দ্র দত্ত	৪৭২
মার্জ্জনা	—	জগদীশচন্দ্র ঘোষ	৪৮৫
মানসী	—	সুকুমার ভাদুড়ী	৪৯৯

বিষয়			পৃষ্ঠা
মুক্তিলাভ	—	চৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এল	৫২৯
মিলন ও বিরহ	....	নৃপেন্দ্রকুমার বসু	৫৭১
মীরা বাঈ	—	মন্মথনাথ গুপ্ত	৭৫০
মায়ের ডাক	—	বাঙ্গালী	৭৫৩
মহাকবি সুরদাস	—	মন্মথনাথ গুপ্ত	৮৫২
		য	
যীশুখৃষ্ট	—	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	
		র	
রাধা-ভাব	—	বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	
রোদ নর সুখ	—	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৬৮
রাধা (কবিতা)	—	হেমরঞ্জন রায়	৬৪৫
রূপের তুলালী	—	রবীন্দ্রনাথ সেন	৭৩৬ ৭৯০
রবীন্দ্র সাধনার পরিণতি		শিবরক্ষ দত্ত, বি এ	৫৪৮
		ল	
লুৎ ফুল	—	মহম্মদ গোলাম জিলানী	৫৯২
		শ	
শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার মতবাদ		শ্রী :—	২২
শিখজাতি গঠনের কথা			১০৬১
শুভক্ষণ	—	জগদীশচন্দ্র দাস	৬৮১
শরতের আহ্বান	—	নীরদারঞ্জন বিশ্বাস	৪৬০
শারদা	—	বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৬২৬
শকুন্তলা	—	শরচ্চন্দ্র পাল	৭৭৪
শ্রীমৎস্বামী প্রকাশানন্দ		শ্রী :—	৭৯৫
শৈলতট সুন্দরী	—	সুরেশচন্দ্র ঘটক এম এ	৮৮৭
শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা	—	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৯২৯
		ষ	
ষ্টেশন মাষ্টার	—	মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ	২০৭
ষট্‌চক্র বিবরণ	—	গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	৯০৫

বিষয়			পৃষ্ঠা
		স	
সন্ধান	—	বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী	৭২১
সাম্যবাদ ও সাম্যসাধন		শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	১
সাধু গণ্ডল	—	শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ	২৯
সভার বোধন	—	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ	৬২
সেখ সাদী	—	আলি রখ তেয়ার	২১০
স্নেহের জয়	—	ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	২১৩
সন্ধান	—	হেমরঞ্জন রায়	৩০৮
সাময়িকী	—	বরদাদত্ত, এম-এ	৩২৩
সমালোচনা	—	বেতাল	৩২৭
সন্ধ্যা মালতী	—	মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়	৩৫৯
স্মৃতি ও প্রেম	—	নৃপেন্দ্রকুমার বসু	৫৮২
সোয়াস্তি	—	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	৬৫৭
সাহিত্য ও শিল্প সাধনা		শিবকৃষ্ণ দত্ত, বি-এ	৬৫৮
স্তুতি	—	বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৮৩৩
সাহিত্যের পুষ্টি	—	কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ	৮৪৯
স্বায়ত্ত শাসন	—	পঞ্চানন দত্ত	৮৮১
সাহিত্যে আবর্জ্জনা	—	শ্রী :	৯০৫, ৯৪৪
সম্বোধন	—	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৯৬৮, ১০৩১
সংস্কৃত-বাঙ্গালা	—	ভৈরবচন্দ্র চতুর্ধুরীণ	০৩৮
		হ	
হারানো কথা	—	যাবদাচরণ দত্ত	২২৯
হিন্দুর ঈশ্বরোপাসনা ও স্বরাজবাদ		শ্রীদিগেন্দ্রনাথ পালিত	৮৬২
হিন্দু কে	—	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৫১

সাম্যবাদ ও সাম্য সাধন।

১

প্রথম যৌবনে ইংরাজী শিখিয়া য়ুরোপের সাম্যবাদের প্রেরণায় সমাজটাকে ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিতে চাহিয়াছিলাম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী নবীশ বাঙ্গালী মাত্রেই কাজে তাহাকে ফলাইয়া তুলিতে পারুন আর নাই পারুন, চিন্তায় এবং ভাবে সাম্যবাদী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত এই সাম্যবাদের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁর সাম্যবিষয়ক প্রবন্ধটী ইহার প্রমাণ। করাসী লেখকেরাও এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিবন্ধ রচনা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইতে রাজী হন নাই। যে কারণেই হউক, বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে এই সাম্যবাদকে যেন হয় বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সাম্যের ডাকেই প্রথম বয়সে জাত ভাঙিয়াছিলাম। আমাদের এই জাতিবিচার মানুষের মধ্যে একটা কৃত্রিম উচ্চনীচ ভেদের প্রতিষ্ঠা করে। এই অবিচারের প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই জাত ভাঙিয়াছিলাম। সে আজ ছেচল্লিশ বৎসরের কথা। জাত ভাঙিয়া বাবার সঙ্গে বিরোধ করিলাম; জাত ভাঙিতে যাইয়া পিতার ত্যাজ্যপুত্র হইলাম; শোধের শেওলা হইয়া ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরেও কি প্রাণের মধ্যে, কি পরিবারে, কিম্বা সমাজের কোথাও প্রকৃত সাম্যের প্রতিষ্ঠা ত করিতে পারিলাম না! এই দুঃখ রহিয়া গেল।

দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাতে বুঝিয়াছি যে, জাত ভাঙা সহজ; কিন্তু সত্য সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা সহজ নহে। য়ুরোপ আমাদের আধুনিক সাম্যবাদের শিক্ষাগুরু। কিন্তু য়ুরোপের এই সাম্য আজিও কেবল একটা মতবাদই হইয়া আছে; সাধনের দ্বারা সাধকের অন্তর-বাহিরে ফুটিয়া উঠে নাই। যে সাধনের দ্বারা সত্য সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সে সাধনের সন্ধানও আজি পর্য্যন্ত য়ুরোপ পাইয়াছে কি না সন্দেহ।

য়ুরোপের সাম্যবাদের প্রথম সূত্রে কহে—মানুষ মাত্রেই সমান। একদিন য়ুরোপ না বুঝিয়াই কথাটা মানিয়া লইয়াছিল। মানুষ মাত্রেই সমান, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য নহে। প্রকৃতির বৈষম্য, শক্তির বৈষম্য, শিক্ষা ও সাধনার বৈষম্য, গুণের ও কৃতিত্বের বৈষম্য সংসারটাকে ছাইয়া আছে। এই প্রত্যক্ষ বৈষম্যকে অস্বীকার করিয়া মানুষ মাত্রেই সমান, এ কথাটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যদি বল যে প্রকৃতিতে, শক্তিতে, শিক্ষা ও সাধনাতে মানুষে মানুষে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, এই প্রভেদ তাহাদের মধ্যে কোনও অধিকারি-ভেদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, প্রকৃতিগত বা গুণগত সাম্য না থাকিলেও সামাজিক অধিকারগত সাম্যের প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। মানুষ মাত্রেই সমান, এ কথার অর্থ সকলেরই সমান অধিকার আছে।

কিন্তু তাই কি সত্য? যে যাহা করিতে পারে না, তাহা করিবার অধিকার কি তাহার আছে বা থাকা উচিত? অধিকার নির্ণয় হয়, অধিকারীর শক্তি-সাধ্যের দ্বারা। আর মানুষের শক্তিসাধ্য যখন সমান নয়, তখন সকলের সমান অধিকার হইবে, এই বা কেমন কথা? অন্ধ বা খঞ্জের সিপাই হইবার অধিকার আছে কি? নিরক্ষর মূর্খের অধ্যাপকের আসনে বসিবার অধিকার থাকিতে পারে কি? গুণ ও শক্তিই অধিকারের সৃষ্টি করে। এই অধিকারি-ভেদ মানিতেই হয়। আর এই অধিকারিভেদ যারা মানিবে, তারা সকল মানুষের অধিকার সমান, এ কথাটা স্বীকার করিতে পারিবে না।

অথচ কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার সম্বন্ধে সকল মানুষেরই সমান অধি-কার থাকা সঙ্গত। সকল মানুষেরই একটা দেহ আছে; এবং এই দেহের মধ্যে একটা প্রাণ আছে। সকল মানুষেরই কতকগুলি ইন্দ্রিয় আছে এবং এ সকল ইন্দ্রিয়ের স্ফূর্তির উপরে সকল মানুষেরই জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে। এ সকল ইন্দ্রিয় কতকগুলি বাহিরের; বাহিরের বিষয়ের সঙ্গে যার সম্পর্ক। আর একটী ইন্দ্রিয়কে আমাদের প্রাচীনেরা অন্তরিন্দ্রিয় কহিয়াছেন। তাহার নাম মন। এই মনের দ্বারা অন্তর-রাজ্যের, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির এবং মনীষিণীবৃত্তির বিকাশ ও সার্থকতা সম্পাদিত হয়। এ সকল ইন্দ্রিয় এবং বৃত্তি মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। এখানে একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, সকল মানুষই সমান। এই সকল বৃত্তির যথাযোগ্য অনুশীলনের উপরে মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে। এ বিষয়েও সকল মানুষই সমান। সকল মানুষই বাঁচিতে চাহে। এই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারটা সকলেরই আছে।

বাঁচিয়া থাকিতে গেলেই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানাদির প্রয়োজন হয়। জীবনের এই সকল মুখ্য উপাদানের উপরেও সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। সকল মানুষই সুখ চায় এবং দুঃখ চায় না। প্রত্যেক মানুষের নিজের সুখ অন্বেষণ এবং দুঃখ পরিহার করিবার অধিকার আছে। বাঁচিবার অধিকার, বাড়িবার অধিকার, সুখী হইবার অধিকার এবং দুঃখ এড়াইবার অধিকার—এ সকল অধিকার সকল মানুষেরই আছে। দুর্ব্বলেরও আছে, সবলেরও আছে। অজ্ঞেরও আছে, জ্ঞানীরও আছে। অকৃতীরও আছে, কৃতীরও আছে। অন্ততঃ সভ্যসমাজ মাত্রেই ইহা মানিয়া লইয়াছে। এই জন্যই কোনও সভ্য সমাজে বিকলাঙ্গকে বা দুর্ব্বলকে বা মূর্খকে বা অকৃতীকে মারিয়া ফেলে না। বরঞ্চ ইহাদের জীবনের যথাসম্ভব সার্থকতা-সম্পাদনের সাহায্য করিবার জন্য নানা-দিকে নানা আয়োজন করিয়াছে। এখানে এক প্রকারের সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। য়ুরোপের সাম্যবাদ এই পর্য্যন্তই উঠিয়াছে। এখনও ইহার উপরে উঠিতে পারে নাই। এই সাম্যবাদের ভিত্তি অনুকম্পা—জীবে দয়া।

কিন্তু এই অনুকম্পার উপরে যে সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে হাসপাতাল, আতুর-আশ্রম, অনাথ-আশ্রম প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে পারে; প্রকৃত মনুষ্যত্ব গড়িতে পারে না। দানের দ্বারা মানুষকে মানুষ করা যায় না। এরূপ দানে বরঞ্চ দাতা এবং গৃহীতা উভয়েরই সত্য মনুষ্যত্বকে খাটো করিয়া তুলে। একজন নিজের ঐশ্বর্য্যমদে ফাঁপিয়া উঠে, আর একজন নিজের দারিদ্র্য ও অক্ষমতার বোঝায় মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। কেহই নিজের সত্য মনুষ্যত্ব-বস্তুকে ধরিতে পারে না।

য়ুরোপের সাম্যবাদ অনেকটা এই অনুকম্পার উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া সেখানে এই সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। য়ুরোপের সাম্যবাদে সমাজের বিষম বৈষম্য ও বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রাচীন কালে সমাজে কেবল বৈষম্যই ছিল, এতটা বিরোধ ছিল না। ধনী এবং নির্ধন, প্রভু এবং ভৃত্য, এ সকলের মধ্যে একটা সহজ এবং সবল আত্মীয়-তার সম্বন্ধ ছিল না। শ্রেষ্ঠদিগের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান প্রকট ছিল না। এইজন্য শ্রেষ্ঠদিগের আনুগত্যে ইতরদিগের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিত না। সুতরাং শ্রেষ্ঠরাও ইতরদিগকে হেয়জ্ঞান করিতেন না। ইতরেরাও শ্রেষ্ঠদিগের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অসূয়াপরাশ হইয়া উঠিত না। এ সকল ভেদ সত্ত্বেও সমাজে কোনও বিষম বিরোধ জাগিয়া উঠে নাই। কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদের প্রচারে

এই বিরোধটাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। যাহারা এতদিন ছোট বলিয়া নিজেদের ভাবিত না, তারা এখন ইহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই ভাবনার ব্যথায় অধীর হইয়া হয় নিজে বড় হইবার জন্য কিম্বা যারা বড় আছে, তাহাদিগকে টানিয়া নামাইয়া ছোট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। যারা ধনের জোরে সমাজের বড় হইবার সুযোগ পাইতেছে, তারা দল ছাড়িয়া লাফাইয়া উপরে উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। ইহারা যে শ্রেণীতে ছিল, সে শ্রেণীর লোকদিগকে কিছুতেই নিজের সমান বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। যারা ধনী হইবার সুযোগ পায় নাই, তারা নিজের দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে দিবানিশি ধনীদিগের প্রতি একটা সাংঘাতিক হিংসার ভাব পোষণ করিতেছে। য়ুরোপের সর্ব্বত্র আজ সমাজের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। সেখানে কার্য্যতঃ সাম্যবাদের এই অর্থ দাঁড়াইয়াছে যে, আমা অপেক্ষা যে বড় আছে, আমি তাহার সমান হইব; আর আমা অপেক্ষা যে ছোট আছে, তাহাকে চিরদিন খাটো করিয়া রাখিব। য়ুরোপের সাম্যবাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, য়ুরোপের এই সাম্যনীতি একটা মানসিক মতবাদকে আশ্রয় করিয়াই এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু সমাজে সাধু মহাজনগণের সাধনের দ্বারা প্রকট হইয়া উঠে নাই।

২

প্রথম যৌবনে সাম্যের সন্ধানে ছুটিয়াছিলাম, তাহা যে কত দুর্লভ বস্তু, অল্পদিনের মধ্যে ইহা বুঝিতে পারিলাম। আমরা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নামে প্রাচীন সমাজের জাতিভেদ ভাঙিলাম বটে। কিন্তু নিজেদের জীবনে, চরিত্রে, পরিবারে, সমাজে, এমন কি অন্তরের ভাবে এবং চিন্তাতেও এই সাম্যের আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। জাত ভাঙিলাম,—সত্য কথা বলিতে গেলে—লোভে। জাত মানিলে পানাহারের বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলিতে হয়; খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতে হয়। না মানিলে এ সকল বালাই ঘুচিয়া যায়। প্রথমে এই জন্যই জাত ভাঙিলাম। যারতার হাতে খাইতে আরম্ভ করিলাম। হিন্দুর খাদ্যাখাদ্য বিচার বর্জ্জন করিলাম। কিন্তু যাদের হাতে খাইতে যাইয়া জাত ভাঙিলাম, তাহাদিগকে যে জীবনের কোনও সম্বন্ধে নিজের সমান করিয়া লইলাম, ইহা নহে। তাহারা সমাজের যে মর্য্যাদাবিহীন ধাপে পড়িয়াছিল, সেখানেই পড়িয়া রহিল। তাদের হাতে অন্নজল গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম বলিয়া তাহাদিগকে যে নিজের সমান করিয়া তুলিয়া লইলাম,

এমন নহে। পূর্ব্বে যেমন তাহারা নিজেদের অমর্য্যাদায় বোঝায় নীচু হইয়া আসিয়া দাঁড়াইত, এখনও সেইরূপই করিতে লাগিল। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ঘুচিল না। তারা যদি তখন আমাদের একাসনে বসিবার চেষ্টা করিত; সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার খাতিরে সে অতি বড় বেয়াদবীটা যে প্রসন্ন-চিত্তে অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম, তাহাও নহে। কোনও দিন তাহাদের একসঙ্গে লইয়া বসিয়া খাই নাই; বরঞ্চ প্রাচীন সমাজে জাতিভেদ মানিয়াও বৃহৎ বৃহৎ সামাজিক ব্যাপারে ভৃত্য-শ্রেণীর নিমন্ত্রিতদিগকে লইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রভুরা স্বচ্ছন্দে পংক্তিভোজন করিয়াছেন। ইহাতে প্রভুদিগেরও মর্য্যাদা হানি হয় নাই, ভৃত্যেরাও কোনও প্রকারের সঙ্কোচবোধ করে নাই। কিন্তু আমাদের সংস্কৃত বা reformed সমাজে ইহা কল্পনার অতীত ছিল বলিলেও হয়। আমরা হাত ভাঙিলাম বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান কেশাগ্র পরিমাণেও পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

মনে পড়ে একদিনের কথা। গৃহিণী একখানি নূতন শাড়ী কিনিয়াছেন; পাড়টা নূতন ধরনের এবং অত্যন্ত সুন্দর; খোলও ভাল ছিল। একদিন একজন শ্রদ্ধেয়া মহিলা বেড়াইতে আসিয়া গৃহিণীর পরিধানে ঐ শাড়ীখানি দেখিয়া কহিলেন যে, তাঁহারও ঐ নমুনার শাড়ী দেখিয়া বড় পছন্দ হইয়াছিল এবং একজোড়া কিনিয়া আনিবার জন্য হুকুম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিবস তাঁর বাড়ীর চাকরাণীকে ঐরূপ শাড়ী পরিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁর আর তাহা কেনা হইল না। কথাটা শুনিয়া অন্তস্তল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। এই ভাবেই কি আমরা তবে জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিব? আর এই জন্যই কি পিতা-মাতাকে কাঁদাইয়া আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া আসিয়া একটা নূতন আদর্শ সমাজ গড়িতে গিয়াছিলাম!—সে দিন হইতে বারবারই মনে হইয়াছে, আমরা য়ুরোপের নিকট হইতে যে সাম্যবাদ ধার করিয়া আনিয়াছি, তাহার দ্বারা প্রকৃত সাম্যের সন্ধান কখনই পাইব না।

৩

সে সন্ধান পাইলাম এদেশের সাধুভক্তদিগের চরণতলে। আমাদের সমাজে যতই কেন ভেদবৈষম্যের প্রতিষ্ঠা হউক না, শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক—সাধনে সর্ব্বত্রই একটা বিরাট সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অদ্বৈত-বেদান্তের আশ্রয়েও হইয়াছে, বৈষ্ণব-বেদান্তের আশ্রয়েও হইয়াছে। উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের সনাতন সাধনায় এই আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের সূত্রপাত

হইয়াছে। সাধক যে দিন নিজের ভিতরে ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব করিলেন, বিশ্বের সর্ব্বত্র সেই একই ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতে এক অধ্যাত্ম সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যে আত্মা আমার মধ্যে দ্রষ্টা, ভোক্তারূপে বিদ্যমান, সেই আত্মাই যখন সকল মনুষ্যের মধ্যে দ্রষ্টা এবং ভোক্তা হইয়া রহিয়াছেন, তখন কে কাহাকে ছোট বলিবে, কে কাহার অবমাননা করিবে? দেহের ভেদ, অন্তরের বিদ্যাবুদ্ধির বিভিন্নতা, সমাজের পদমর্য্যাদার বৈষম্য—এ সকল বাহিরের কথা। এ সকল আগন্তুক ব্যবস্থা; মানব জীবনের নিত্যবস্তু নহে। সেই নিত্যবস্তু জীবের আত্মা। এই আত্মার ভূমিতে এবং এই আত্মার অধিকারে বাহিরের শত ভেদ ও বৈষম্য সত্ত্বেও সকল মানুষ সমান। এই আত্মার ভূমিতে জীব-শিব এক, চৈতন্যমাত্রেই ব্রহ্ম-চৈতন্য; মানুষ মাত্রেই চিদ্‌ঘননিরঞ্জনের প্রকাশ। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই এই সত্যেতে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার চেষ্টায় সাধক উপাসনাকালে কহেন:—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি নচ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি, নিত্যমুক্তস্বভাববান্।"

আমি দেবতা, কোনও ইতর সৃষ্টি নহি; আমি ব্রহ্ম, শোকভুক্ নহি; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং নিত্যমুক্ত স্বভাবসম্পন্ন। এই দেবত্বের দাবী, কেবল ব্রাহ্মণের নহে, চণ্ডালেরও আছে। এখানে জাত বিচার নাই। ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান এই ভাবে "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" এই সত্যের সাধনা করিয়া একটা অপূর্ব্ব সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ভেদবুদ্ধিমাত্রেই সত্যকে এবং ব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখে। এইজন্য ভারতের জ্ঞানিগণ প্রাণপণ করিয়া এই ভেদবুদ্ধিটাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দোহাই দিয়া আজ বর্ণভেদ বা জাতিভেদকে সমর্থন করিবার চেষ্টা হইতেছে, একটু তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মই এই ভেদবুদ্ধিকে নষ্ট করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম একটা অখণ্ড ধর্ম্ম। বর্ণ ও আশ্রমসমন্বিত যে ধর্ম্ম, তাহাই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে বর্ণের বা জাতির কোনও ধর্ম্মত্ব থাকে না। আর আশ্রমের শাসন এবং সাধনের দ্বারাই বর্ণগত ভেদ ও বৈষম্যের দোষ নষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার শাস্ত্র সাহিত্য দিয়া বিচার করিলে হিন্দু প্রকৃত পক্ষে যে জন্মগত ভেদ-বৈষম্য স্বীকার করে, ইহা বলা যায় না। প্রাচীন কালে

ভারতের হিন্দু-সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগ দ্বিজেদের, অপর ভাগ শূদ্রদিগের। শূদ্রেরা প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার কাফ্রীদিগের মতন ভারতের সমাজের গণ্ডীর বাহিরে ছিলেন। শূদ্রদিগকে বাদ দিলে ভারতের প্রাচীন আর্য্যসমাজে প্রকৃতপক্ষে একটা অপূর্ব্ব সাম্যসাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। সে চেষ্টা হইয়াছিল ব্রহ্মজ্ঞানের প্রেরণায়। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের দ্বারা সামাজিক বৈষম্য নষ্ট করা যায় না। সমাজ-রক্ষার জন্যই এ সকল বৈষম্যের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। সমাজের মুখ্য বৃত্তি তিনটী। প্রথম, কৃষি গো-রক্ষা, বাণিজ্যাদি দ্বারা লোকের জীবিকা উপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়, সমাজের ভিতরে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন, এবং বাহির হইতে আততায়ী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়, লোকশিক্ষার এবং লোকচরিত্র উন্নত করিবার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ করা। প্রত্যেক সমাজকে বাঁচিয়া থাকিবার এবং নিজের সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতিবিধানের জন্য এই বিবিধ ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ব্যবস্থা করিতে যাইয়াই সমাজে ভিন্ন লোকে ভিন্ন কর্ম্মে ও পদে নিযুক্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ভেদ ও বৈষম্যের সৃষ্টি করে। লোকশিক্ষা এবং সমাজের সাধনার পরিপুষ্টি কর্ম্মে যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের জ্ঞান এবং চরিত্র উন্নত না হইলে চলে না এবং এই জ্ঞান ও চরিত্রবলে তাঁহারা সকলের বন্দনীয় হইয়াও রহিবেন, ইহাও কেহ আটকাইতে পারিবে না। ইঁহারাই ভারতের ব্রাহ্মণ ছিলেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ছিল। আর এই গুণকর্ম্মের বলেই ব্রাহ্মণেরা সমাজে শ্রেষ্ঠতম আসন পাইয়াছিলেন। যে সকল দেশে জাতিভেদ ছিল না, এখনও নাই, সেখানের আজি পর্য্যন্ত এই কাঞ্চনকৌলীন্যের যুগেও ধর্ম্মযাজক এবং অধ্যাপকেরা সমাজের শ্রেষ্ঠতম অভিজাতবর্গের সঙ্গে আসন পাইয়া থাকেন। তারপর সমাজের শাসন-সংরক্ষণের ভার যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাঁহারাও নিজেদের গুণকর্ম্ম প্রভাবে বিশেষ পদমর্য্যাদা লাভ করেন। ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্য জ্ঞানে ও চরিত্রে, ক্ষত্রিয়দিগের কৌলীন্য—পদে ও শাসনাধিকারে। আর যাঁহারা কৃষি গোরক্ষা, বাণিজ্যাদি দ্বারা সমাজকে খাওয়াইয়া পরাইয়া রাখেন, তাঁহাদের কৌলীন্য ধনে। এইরূপে সমাজরক্ষার জন্য সমাজজীবনে নানাবিধ ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এ সকল ভেদ ও বৈষম্য যে কখনও লোপ পাইবে, এরূপ কল্পনা করাও কঠিন। শক্তির বিভিন্নতা ও গুণের বিভিন্নতা

কর্ম্মের বিভিন্নতানিবন্ধন সকল সমাজেই কেহ ছোট, কেহ বড় হইয়া থাকিবেই থাকিবে; সাম্যবাদী য়ুরোপীয় সমাজেও আছে; আমাদের সমাজেও ছিল।

কিন্তু ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম একদিন এই অপরিহার্য্য ভেদ ও বৈষম্যের দোষ কাটাইবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, সেরূপ চেষ্টা আর কোথাও হইয়াছিল কি না জানি না। ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজবিজ্ঞান আশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া এই অপরিহার্য্য ভেদ ও বৈষম্যের বিষ নষ্ট করিয়া দিতে চাহিয়াছিল।

এই ধর্ম্মের প্রথম সূত্র এই যে, মানুষ মাত্রেই শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। লোক ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ হয়, জন্মের দ্বারা নহে, কিন্তু সংস্কারের দ্বারা। এই সংস্কারের উপরেই প্রাচীন আশ্রমসকলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রথম সংস্কার উপনয়ন; উপনীত হইয়া গুরুগৃহে যাইয়া বেদাদি অধ্যয়ন করিতে হইত ইহাই প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছিল। এই আশ্রমে ছয় বৎসর হইতে চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীকে বাস করিতে হইত। ব্রহ্মচারী সকলে সমান ছিল। এখানে রাজপুত্র বা ব্রহ্মণপুত্র বা বৈশ্যপুত্র মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। সকলকেই মধু, মাংস, ছাতা, জুতা বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশধারণ করিতে হইত। সকলকেই যথাবিধি প্রতিবেশী গৃহস্থদিগের দ্বারে যাইয়া ভিক্ষা করিতে হইত। এই ভিক্ষা দ্বারাই সকলের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, রাজপুত্রেরও হইত, কৃষকপুত্রেরও হইত। এই আশ্রমে মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়াই দেখিত। সামাজিক পদ-মর্য্যাদার সন্ধান লইত না এবং সকলের মধ্যেই এই সাধারণ মনুষ্যত্ববস্তুকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে, গুরুগৃহে, ভারতের প্রাচীন সাধনাতে একটা অপূর্ব্ব সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই শিক্ষা লইয়া ব্রহ্মচারী যখন স্নাতক হইয়া সমাজে নিজের পরিবারে ফিরিয়া যাইতেন, এবং সমাজ জীবনে নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন, তখন তাঁহাদের পরস্পরের কর্ম্ম ও পদের বৈষম্য নিবন্ধন যে অপরিহার্য্য ভেদের প্রতিষ্ঠা হইত, তাহা পোষাকী কাপড়ের মতন প্রাণের বাহিরেই পড়িয়া থাকিত, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। আর প্রথম জীবনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা ও সাধনানিবন্ধন সমাজজীবনের এ সকল অপরিহার্য্য ভেদ ও বৈষম্য উচ্চপদস্থদিগের অন্তরে অভিমানের এবং নিম্নপদস্থদিগের অন্তরে অসূয়া সৃষ্টি করিত না। অন্ততঃ ইহাই এই আশ্রমধর্ম্মের লক্ষ্য ছিল। আদিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাম্য-সাধনা, মধ্যে গার্হস্থাশ্রমের ভেদ ও বৈষম্যের স্বীকার, শেষে বানপ্রস্থাশ্রমের ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা গার্হস্থাশ্রমে যে ভেদ ও

বৈষম্যের সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা, এবং পরিণামে সন্ন্যাস আশ্রমে পুনরায় বিশ্বময় সাম্য ও মৈত্রীসাধনা করিয়া সর্ব্বজীবে ব্রহ্মোপলব্ধি করা—ইহাই আশ্রমচতুষ্টয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ কতটা পরিমাণে যে সফল হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু এইভাবে ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিচার ও আলোচনা করিলে ইহাদ্বারা প্রাচীন ভারত-সমাজের একটা শ্রেষ্ঠতর সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। ভারতে আধুনিক য়ুরোপের মতন একটা সাম্য-বাদের প্রচার হইয়াছিল কি না, জানি না। কেহ কেহ বলেন, ভগবান্ বুদ্ধদেব এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ আলোচনায় এখানে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু প্রকৃত সাম্যসাধনের যে খুবই একটা চেষ্টা হইয়াছিল, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। দুই দিকে এই চেষ্টা হয়, এক ব্রহ্মজ্ঞানের পথে, অপর ভগবদ্ভক্তির পথে।

৪

ব্রহ্মজ্ঞানী উপাধি-বর্জ্জিত আত্মার ভূমিতেই সকল মানুষকে সমান করিয়া-ছিলেন। যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সাধকের নিজের মধ্যে আছেন, সেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে সকল মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি কোনও মানুষকে অবজ্ঞা করেন না। ইহাই জ্ঞানপথের সাম্যবাদের মূল কথা। পারমার্থিক দৃষ্টিতে মানুষ মাত্রেই সমান, ইহা জানিয়া এবং মানিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যবহারিক জগতে প্রত্যক্ষ ভেদ ও বৈষম্যকে স্বচ্ছন্দে মানিয়া লইতে পারেন, অনেকেই মানিয়া লয়েন। এক ব্রহ্মই সত্য, আর সকলেই মিথ্যা। অতএব জাত মানাও মিথ্যা, জাত গড়াও মিথ্যা; এই লইয়া বাদ-বিতণ্ডা করাও মিথ্যা। সাধক এই সকল মিথ্যার জালে জড়িত হইলে যে চিত্তের সমতা ব্যতীত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না, তাহাই হারাইয়া বসেন। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গুরু এবং হাতী ও কুকুরকে সমভাবে দর্শন করিবে; অর্থাৎ নিজের অন্তরে ইহাদের সম্বন্ধে কোনও রকম ভেদবুদ্ধি পোষণ করিবে না, ইহা সত্য বটে। কিন্তু তাই বলিয়া পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে কুকুরকে ব্রাহ্মণের আসনে বসাইলে চলিবে না, চণ্ডালকে বসাইলেও চলিবে না। শ্রাদ্ধপিণ্ড-পূরকাদিদান সকলই 'অবিদ্যাবদ-বিষয়াণি'; পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা। এই মিথ্যা কার্য্যে যখন ব্যাপৃত হইবে, তখন ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের মধ্যে যে মিথ্যা ভেদ, তাহা আসিয়া চলিতেই বা আপত্তি করিবে কেন? এই যুক্তি-বা যুক্ত্যাভাস অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞানের পথে যে সাম্যের সাধনা হইয়াছিল, তাহা প্রায়ই হয় শাস্ত্রবাক্যে না হয় ক্বচিৎ শ্রেষ্ঠতর সাধকের

ধ্যানে মাত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; জীবনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ও কর্ম্মে স্থান পায় নাই।

কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পথে যে সাম্যের সাধন হইয়াছিল, তাহা কেবল শাস্ত্রের উপদেশে কিম্বা সাধকের মানসকল্পনাতে কিম্বা অন্তরের অনুভবেতেই আবদ্ধ রহে নাই, বহির্বাচরণে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমাজসংস্কারে সমষ্টি গতভাবে এই শ্রেষ্ঠতম সাম্য সাধনার চেষ্টা হইয়াছিল। ভাগবতমাত্রেই সমাজের জাতিবর্ণগত বৈষম্যটাকে ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছেন। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, পশ্চিমাঞ্চলে কবীর, পঞ্জাবে গুরু নানক, মহারাষ্ট্রে তুকারাম, ইহাঁরা সকলেই এই সাম্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। আজিও এই বাংলা দেশে বিশেষ বিশেষ সাধকেরা জাতিবর্ণের গণ্ডী ভাঙিয়া সাধন-মণ্ডলী গড়িতেছেন। সমাজ নীরবে ইহাঁদের এ আদর্শকে স্বীকার করিয়া লইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞানের পথে যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ভগবদ্ভক্তির পথে তাহা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহার মূল কারণ এই মনে হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানেতে পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে যে একটা বিশাল প্রভেদের সৃষ্টি করিয়াছে, ভগবদ্ভক্তির পথে তাহা হয় নাই। ভক্তিসিদ্ধান্তে জগৎকে মিথ্যা কহে না। জীবের মধ্যে শিব আছেন, ইহাই স্বীকার করে। কিন্তু জীবই যে শিব ইহা মানে না। জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, যেমন দুধ হইতে দই হয়। কিন্তু এই দই যেমন আবার কখনই দুধ হয় না, সেইরূপ জীবও কখনও আবার ব্রহ্ম হয় না। জীব ভগবানের নিত্য দাস। অনন্ত কোটিযুগেও এই নিত্য সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আবার এই জীবের মধ্যে ভগবান্‌ই সর্ব্বদা লীলা করিতেছেন। এই ভাগবতী লীলানিবন্ধন জীবের জীবনের কোনও ব্যাপারই মিথ্যা নহে, সত্য। সে যাহা করে বা না করে, তাহা দ্বারা তাহার পরমার্থলাভের হয় সহায় না হয় অন্তরায় হইয়া থাকে। জীবের আত্মা যেমন সত্য, তাহার দেহটাও মিথ্যা নহে। এই দেহের অন্তরালে জীবের একটা নিত্যসিদ্ধ দেহ আছে। সেই দেহের ছাঁচেই এই দেহ গড়িয়া উঠিয়াছে। এ দেহ জড়দেহ, সেই দেহ সাত্ত্বিক, চিন্ময় দেহ। এই নিত্যসিদ্ধ দেহেতেই জীব ভগবানের নিত্যধামে তাঁহার লীলাপরিকর হইয়া আছে। এই সত্যটাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত কহিয়াছেন :—

"ব্রজে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া স্মরণ
নিশিদিন করে রাধা কৃষ্ণের পূজন।"

জীবের এই জড়দেহ তার এই সিদ্ধদেহের প্রতিবিম্ব বলিয়া অতিশয় পবিত্র। এ তনুর আশ্রয়েই সে ভাগবতী তনুলাভ করিয়া থাকে। জীবের এই দেহে যে আঘাত পড়ে, তাহা ভগবানের বুকে লাগে; এবং এই আঘাতের চিহ্ন অনন্ত অনুকম্পাপরবশ হইয়া ভগবান্ নিত্যকাল নিজের অঙ্গে ধারণ করিয়া রহেন। ইহাই ভক্তের অনুভূতি। ভগবদ্ভক্ত এই জন্য মানুষের গায়ে হাত তুলিতে পারেন না। এই কারণেই প্রত্যেক নরের মধ্যে নারায়ণ তাঁর নিত্য মন্দির রচনা করিয়া বাস করিতেছেন জানিয়া, ভগবদ্ভক্ত সকলকেই ইতর তত্ত্বনির্ব্বিশেষে আপনার ইষ্টমূর্ত্তিজ্ঞান করেন। মানুষকে হেয় জ্ঞান করিলে তাঁহার ভক্তিতে আঘাত লাগে। বাবা অর্জ্জুনদাস এই ভক্তির প্রেরণায় ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে যাহাকে দেখিতেন, "আ মেরা রাম" বলিয়া প্রেমে গদগদ হইয়া তাহারই আরতি করিতেন। বাবা দয়ালদাস এই ভক্তির প্রেরণাতেই যেখানে যখন যাইতেন, সেখানকার ক্ষুধিত দরিদ্র-নারায়ণদিগকে ডাকিয়া ভক্তিভরে ষোড়শোপচারে তাহাদের ভোজন করাইতেন। একজন সাধু একবার কহিয়াছিলেন, বাবা তুমি সাধুভোজন না করাইয়া যাকে তাকে ডাকিয়া ভোজন করাও কেন? দয়ালদাস উত্তর করিলেন, "সাধুকে লিয়ে প্রণাম; ভোখেকে লিয়ে রোটী" ভগবদ্ভক্তিতে আমাদের দেশে এই ভাবের সাম্যই সাধিত হইয়াছিল। এ সাম্য মতবাদের সাম্য ছিল না। এই সাম্যের সাধনায় সমাজে বিরোধ বা বিপ্লব আনে নাই; কিন্তু কেবল বিশ্বজনীন মৈত্রীরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। য়ুরোপ যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার নিন্দা করি না। সে চেষ্টারও প্রয়োজন আছে। জনসমাজকে সাম্যের আদর্শের অনুকূল করাই য়ুরোপের সাম্যসাধনার লক্ষ্য। য়ুরোপ সাম্যের বহিরঙ্গটা গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে; অন্তরঙ্গের দিকে তেমন দৃষ্টি করিতেছে না। আমরা আবার কেবল সাম্যের অন্তরঙ্গসাধনের জন্যই ব্যস্ত ছিলাম। এই সাধনের সিদ্ধির জন্যই যে সমাজে সাম্যের বহিরঙ্গ গড়িয়া তোলা প্রয়োজন, সে দিকে আমাদের দৃষ্টি এখনও ভাল করিয়া পড়ে নাই। সুতরাং য়ুরোপের মতন আমাদিগেরও সাম্যসাধনা অপূর্ণ ও একদেশদর্শী হইয়া রহিয়াছে। সাধনার সিদ্ধির জন্য য়ুরোপকে সাম্যের অন্তরঙ্গসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আর এই সাধনে ভারতবর্ষকেই তাহার দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিতে হইবে। আমাদিগকেও সেইরূপ আমাদের সাম্যসাধনকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য য়ুরোপের অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাম্যের বহিরঙ্গ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

গুরুর সহিত শঙ্করের মিলন হইল। তৎপর মহাপণ্ডিত মণ্ডনমিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। অসীম অধ্যবসায় ও অমানুষিক শক্তিপ্রভাবে শঙ্কর দক্ষিণ-ভারতের প্রান্তভাগ হইতে তুষারকিরীটী হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া অনুকূল তর্কযুক্তি প্রভাবে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগকে পরাস্ত করিয়া ও শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সংস্কার বিধানপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম ও অদ্বৈত মত স্থাপন করিয়াছিলেন। সুবিশাল ভারতের চতুঃসীমানায় যে চারিটী মঠ দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় আজও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা আচার্য্য শঙ্কর স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে শৃঙ্গেরীমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধনমঠ ও হিমালয়ে জ্যোতিমঠ এখনও বেদান্তের মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সেই সুদূর অতীতে যখন বাষ্পীয়যান প্রভৃতি উদ্ভাবিত হয় নাই—যখন পদব্রজ ব্যতীত ভ্রমণের অন্য কোনও সহজ উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই—তখন এই অত্যল্পকালের মধ্যে এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সমস্ত ভারতকে পুনরায় অদ্বৈতভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করা কি এক বিরাট ব্যাপার—তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না। সমগ্র দেশকে হিন্দুধর্ম্মের পুণ্যমহিমায় সমুদ্ভাসিত করিয়া মাত্র দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ বয়সে বৈশাখী শুক্লাপঞ্চমীর মঙ্গলময় দিবসে এই জগদ্বিশ্রুত মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

এই অত্যল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভারত ভ্রমণ—মঠস্থাপন—এবং অতগুলি গ্রন্থের ভাষ্যপ্রণয়ন করা সামান্য শক্তির পরিচায়ক নহে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-পদানুরক্তা পুণ্যশীলা বিদুষী সিষ্টার নিবেদিতা আচার্য্য শঙ্কর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য, তিনি বলিয়াছেন :—

We contemplate with wonder and delight the devotion of Francis of Assisi, the intellect of Abelard, the virile force and freedom of Martin Luker, and the political efficiency of Ignatius Layala ; but who could imagine all these united in one person i.e. Shankar ?

আসিসির ফ্রান্সিসের ধর্ম্মানুরাগ, আবিলার্ডের বুদ্ধিমত্তা, মার্টিন লুকারের ওজস্বিতা ও স্বাধীনতাস্পৃহা এবং ইগ্নেসিয়স লয়লার রাজনৈতিক কর্ম্মকুশলতা ভাবিলে আমরা আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হই—হর্ষে পুলকিত হই ; কিন্তু এই সমস্ত বিভিন্ন গুণ যে শঙ্করের মধ্যে একত্র সমন্বয় হইয়াছে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

এক অখণ্ড অদ্বৈত একরস ব্রহ্মেই এই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে—এই মত স্থাপনকল্পে শঙ্কর প্রধান একাদশ উপনিষদের ভাষ্য, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতগুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

আচার্য্য শঙ্কর নিরঙ্কুশ জ্ঞানবাদী।

তাঁহার মতে আত্মবোধ সকল জ্ঞানের মূল—আত্মাই সকল জ্ঞানের আশ্রয়। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। "আত্মত্বাদেবাত্মনো নিরাকরণাশঙ্কাম্নুপপত্তিঃ। ন হ্যাত্মাগন্তুকঃ কস্যচিৎ স্বয়ংসিদ্ধত্বাৎ।" যে হেতু আত্মা, সেই হেতু আত্মা ছিল কি না ও আছে কিনা এ আশঙ্কা হয় না। কারণ আত্মা আগন্তুক নহে, কাহার কার্য্য নহে, আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, (ব্রহ্মসূত্র ২, ৩, ৭,) এই আত্মা সৎস্বরূপ—চিৎস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ। "পুরুষো হি বিনাশহেত্বাভাবাদবিনাশী বিক্রিয়াহেত্বভাবাৎ কূটস্থনিত্যঃ। অতএব নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবঃ।" (ব্রহ্মসূত্র ১, ১, ৪ ভাষ্য) বিনাশের কারণ না থাকায় আত্মা অবিনাশী, বিনাশহেতু না থাকায় তিনি কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও নিত্য। তৎকারণে তিনি নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, নিত্য মুক্ত। জীব কেবল অবিদ্যার বশেই আপনাকে দেহবান্ বলিয়া মনে করে, মন প্রভৃতিতে আত্মাকে আরোপিত করিয়া কর্ত্তা ভোক্তারূপে ব্যবহার করে। মিথ্যাজ্ঞানই ইহার মূলে। 'মিথ্যাভিমানস্তু প্রত্যক্ষঃ সম্বন্ধহেতুঃ' (ব্রঃ সূঃ ১, ১, ৪ ভাষ্য।

শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন, বাহ্যবস্তুর ব্যবহারিক সত্তা আছে। তাঁহার মতে মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। মন অ-মন হইলেই দ্বৈতনিবৃত্তি হয়। গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"মনোমাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।
মনসোঽমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥"

এই স্থানেই শঙ্করের মতের বিশিষ্টতা। এই স্থানেই পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সহিত তাঁহার মতের বিভিন্নতা। Plato র মতে মনোময় জগৎ সত্য; বস্তু সত্য নহে, বস্তু সম্বন্ধে যে Idea তাহাই সত্য। Kantও সেই মতাবলম্বী। তিনি বলেন, যে বস্তু সৎ নহে—Not the thing but the thingishness of things or the thing-in-itself. অর্থাৎ বস্তুসম্বন্ধে যে মনোভাব, তাহাই বস্তুর বাস্তবসত্তা। কিন্তু শঙ্কর বলেন যে, মনোময় জগৎ মিথ্যা। মন ও জড় পরি

বর্ত্তনশীল। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় মন এক ভাবে অবস্থিত নয়। যাহা সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় স্থির অবিচলিত নহে তাহা সত্য নহে। মন ত্রি-অবস্থায় শাশ্বত ও সনাতন নহে। অতএব মন অসৎ। মনই মায়া—মায়ার নিবৃত্তিতে দ্বৈতনিবৃত্ত হয়। এই জগতের অধিষ্ঠান চৈতন্য। পর্য্যালোচনা ব্যতীত এরূপ শৃঙ্খলা বিরচিত হইতে পারে না। প্রধান জড়। পর্য্যালোচনা জড়ের ধর্ম্ম নহে। অতএব সাংখ্যের প্রকৃতি জগতের কারণ নহে। ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ঈশ্বর সমষ্টি উপাধি ও জীব ব্যষ্টি উপাধি। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমষ্টি ও ব্যষ্টির পরে এক অখণ্ড ভূমা ব্রহ্মই প্রতিভাত হন। জীবগত অবিদ্যার জন্যই জীব আপন ব্রহ্মাত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত নহে। অবিদ্যার বিনাশেই জীব ব্রহ্মাত্মরূপে অবস্থিত হয়। জীব সর্ব্বাবস্থায় মুক্ত, কিন্তু বোধ নাই।—'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।'

আচার্য্য গৌড়পাদ কারিকায় বলিয়াছিলেন—

"অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিনাম্।
যোগিনা বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ॥"

শঙ্করের মতে ভক্তি জ্ঞানের সহকারী। "মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" (বিবেকচূড়ামণি) ইহাই Spinoza' র Amor Intellectual's or intellectual love of God,

শঙ্করের মতে কেবল ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় শঙ্করের মতে হইতে পারে না। সকলের পক্ষে সন্ন্যাস সঙ্গত নহে। শঙ্কর সন্ন্যাসের প্রাধান্য দিয়াছেন এবং তিনি বলেন যে, কর্ম্মত্যাগীই বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী। শমদমাদিসাধনসম্পন্ন সন্ন্যাসী বেদান্ত শ্রবণের অধিকারী হওয়ায় নিম্নাধিকারীর সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে ক্রিয়াবিশেষবহুল বহুশাখাসমন্বিত কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আজও বিলুপ্ত হয় নাই। যখন তান্ত্রিক বামাচার ও বৌদ্ধগণের ভূত-প্রেত-প্রস্তর-বৃক্ষ-পূজার প্রবল তমোময় ঝটিকায় অপ্রতিহত বেগে দার্শনিক জ্ঞানের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল—যখন প্রকৃত দর্শন শাস্ত্র কুসংস্কার ও দুর্নীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল—তখন এই জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষ হিমসেকশূন্য নির্ম্মল পবিত্র বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বিপ্লবগরোগিতল হইতে পবিত্র নিষ্কামধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতমত

স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই আসুন, আজ ভারতের জাতীয় জাগরণের উজ্জ্বল দিবসে—এই সেবাধর্ম্মের পবিত্র মন্দিরে ভারতের সেই মহামনীষীর আরাধনা করি। এই মহাপুরুষের আদর্শে—আমারা যেন নবভাবে অনুপ্রাণিত হই—মনুষ্যত্বে প্রভাবিত হই—নিষ্কাম কর্ম্মের পুণ্যমহিমায়—সত্য ও সুন্দরের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মহীন, ধর্ম্মহীন, ও সত্যহীন ভারতবাসী যেন জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও সত্যের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া আবার বিশ্বের বিরাট্ সভায় তাহার প্রকৃত স্থান অধিকার করে—আবার যেন সেই "মহাযানবের সাগর-তীরে" ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মহাভাবে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত ও উচ্ছলিত হইয়া উঠে।

জেব্ উন্নিসা। *

(J. D. Westbrook)

তোমার নিকুঞ্জ আজি জনশূন্য, হে রাজনন্দিনি ;
নাচিয়া ছুটিত যেথা 'সাইপ্রেস'-তরুবীথি দিয়া
উজল নিঝরবারি লীলাভরে পথ চিনি' চিনি,'
ধূ ধূ মরু আজি সেথা ভগ্ন কুঞ্জ-তোরণ বেড়িয়া ;
বিশুষ্ক গোলাপবাগ, বুল্‌বুল উড়ে গেছে আজ
জেব্‌উন্নিসার শুধু স্মৃতিমাত্র করিছে বিরাজ।

তবু ভক্ত ফকিরেরা কহে যেথা ভগবৎকথা,
ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থকামী বেদীমূলে মেলে যেথা আসি'—
বহু পুণ্যরসনায় কাঁপে তব ছন্দের বারতা,
সম্মানিত তব নাম, স্মৃতি তব সেথা অবিনাশী ;
বুঝিবা তোমার বাণী সহায়তা করে লভিবার
প্রেমের ঠাকুরটীরে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণার।

বিদেশী, বিভিন্নভাষী,—তবু আজ আমরাও তাই
খুঁজিয়া রহস্য-ঘন কবিতা-কাননখানি তব,
যেথা বসি' মনোগুণে পুড়ে তুমি হয়েছিলে ছাই,
তোমার প্রাণের গানে দিতেছি গো ধ্বনি অভিনব ;
ধরিতেছি বাক্যজালে স্বপ্ন তব নিগূঢ় আত্মার,
অমর-বিহঙ্গশিশু—অগ্নিপক্ষ—দীপ্ত কামনার।

শ্রীবিমল কৃষ্ণ ঘোষ।

---

* দিওয়ান-মগরিত্রী ঔরংজেব-তনয়া।

বিধিলিপি।

বনিয়াদী বংশে জন্ম হইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন রমেশচন্দ্র সংসারে প্রবেশ করিল, তখন সে বংশের আর কিছুই ছিল না। তাহার পিতার আমল পর্য্যন্তও বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত এবং ক্রিয়া-কলাপের সময় বন্ধুদের বাটীতে পাত পাড়ে নাই এমন লোক কুশপুরগ্রামে কেহই ছিল না। কিন্তু কালের চক্রে সে সমস্তই গিয়াছিল। জ্ঞাতিবিরোধ ও মোকদ্দমায় সে সকলই নষ্ট হইয়াছিল। রমেশের সম্বল ছিল শুধু নামটা; আর পিতৃপিতামহের অন্য সম্পত্তি কিছু না পাইলেও, পাইয়াছিল সে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও স্বাধীন চিত্ত। রমেশ লেখাপড়া মন্দ শিখে নাই। পিতার মৃত্যুর পর যখন দেখিল যে, পৈত্রিক একটা জীর্ণ অসংস্কৃত অংশ, তৎসংলগ্ন কিঞ্চিৎ জমী ও খানকয়েক তৈজসপত্র ব্যতীত আর কিছুই তাহার নাই, তখন সে জননীর সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতায় চাকুরী করিতে আসিল। রমেশের মামা এক সওদাগরী আফিসের বড় বাবু ছিলেন, তিনিই যোগাড় করিয়া রমেশের ৪০ টাকা বেতনের একটী চাকুরি করিয়া দিলেন। রমেশের সংসার বড় ছিল না। মাতা, স্বয়ং, পত্নী ও একটী ৪ বৎসরের কন্যা ব্যতীত অন্য পোষ্য আর তাহার ছিল না। কাজেই সংসার এক প্রকার চলিয়া যাইতে লাগিল। স্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী সুন্দরী ভার্য্যা আর স্নেহের পুতলী সুকুমারী কন্যা—এই লইয়া তাহার জীবনটা বেশ সুখেই কাটিতেছিল।

রমেশ চন্দ্র কর্ম্মঠ ও অত্যন্ত বিনয়ী ছিল; সেজন্য আফিসের সাহেব তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বৎসর পাঁচ ছয় পরে রমেশের বেতন ক্রমে ১০০ এক শত টাকা হইল। এতদিন পর্য্যন্ত রমেশের কোনও ভাবনা চিন্তা ছিল না। এইবার কিন্তু নির্ম্মলা বড় হইতেছে, তাহার বিবাহের সংস্থান করিতে হইবে, এই চিন্তাটা তাহাকে একটু ব্যাকুল করিতে আরম্ভ করিল। তবে তাহার একটা ভরসা ছিল যে, এই একটীমাত্র কন্যা বলিয়া সে তাহাকে বেশ সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিতেছিল। লেখাপড়ায় ও গৃহকর্ম্মে উভয়েতেই নির্ম্মলা বেশ পারদর্শিতা লাভ করিতেছিল। আর তাহার উপর বিধাতা তাহাকে সুন্দরী করিয়াই গড়িয়াছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়, বাঙ্গালী জাতি, বিশেষতঃ বিবাহযোগ্য

পুত্রের পিতা ত রূপ, গুণ বুঝেন না, তিনি বুঝেন কেবল অর্থ। তোমার মেয়ে কুরূপা হইলেও কিছুই আসিয়া যায় না, যদি থাকে তোমার টাকা। আর তোমার মেয়ে স্বর্গের অপ্সরী হইলেও তোমার নিস্তার নাই, যদি না থাকে তোমার টাকা।

রমেশ চন্দ্র শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ যুবক; তাই সে আভিজাত্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আর অপেক্ষা ব্যয় অধিক না করিয়া একটু মিতব্যয়ী হইয়া চলিত এবং জমাইয়াছিলও কিছু। কিন্তু হায়, সে যে বড় অল্প, পাত্রের পিতার চিরক্ষুধার্ত্ত উদর ত তাহাতে পূর্ণ হইবার নহে! তাই সে মধ্যে মধ্যে বিমনা হইয়া পড়িত। নির্ম্মলা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আজ কাল তুমি অত কি ভাব?"

রমেশ বলিল,—"ভাবছি মা, তোমার বিয়ের কথা।"

নির্ম্মলা বলিল,—"না বাবা, তুমি অত ভেবো না, আমি কখ্খন বিয়ে ক'র্ব না।"

"—দূর পাগলী, তা কি হয়?"

সরলা বালিকা উত্তর করিল,—"কেন হবে না বাবা? এই ত আমি পড়েছি বিলাতে কত মেয়ে বিয়ে করে না?"

রমেশ বলিল,—"সে যে বিলাত মা, আর এ যে বাংলা দেশ, এখানে তোমার বিয়ে দিতে না পার্লে লোকে আমায় একঘরে করে রাখবে মা?"

"—তা হ'রে করুক্‌গে, আমি কিন্তু বিয়ে কর্ব না।"

রমেশ হাসিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া কহিল,—"আচ্ছা, তাই হবে, তুমি আমার মিশিবাবা হ'য়ে থেক।"

২

রমেশ বাবুর বাটীর নিকটেই রামলাল মিত্র মহাশয়ের বাটী। রামলাল বাবু মস্ত ধনী, তাঁহার প্রকাণ্ড জমীদারী। তিনি নিজেও বেশ সুশিক্ষিত এবং অত্যন্ত অমায়িক। তিনি রমেশ বাবুকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং রমেশ বাবুও তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। রামলাল বাবু বিপত্নীক। তাঁহার পত্নী যখন একমাত্র অষ্টম বর্ষীয় পুত্র সুশীলকে রাখিয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেলেন, তখন রামলাল বাবুর বয়স অধিক না হইলেও পাছে পুনরায় বিবাহ করিলে সুশীলের উপর তাঁহার স্নেহ কমিয়া যায়, সেই জন্য আত্মীয়জনের যথেষ্ট অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর দার পরিগ্রহ করেন নাই। সুশীলকে মানুষ করিয়া তোলাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুশীলও পিতার

সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া সুশিক্ষা লাভ করিতেছিল। এখন সুশীল বি, এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এম্, এ, পড়িতেছিল। ধনী সন্তান হইয়াও তাহার মনে একটুকুও অহঙ্কার ছিল না। তাহার নম্র প্রকৃতির জন্য সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

রমেশ বাবুর পত্নীকে সুশীল মাসীমা বলিত, এবং বাল্যকালে মাতৃহীন হওয়ায় এই মাসীমার উপর দিয়াই মায়ের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া লইত। রমেশ বাবুর স্ত্রী উমাশশীও সুশীলকে নিজ পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। সুশীল ও নির্ম্মলাতে তাঁহার ভেদজ্ঞান ছিল না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, রমেশ বাবু ম্যালেরিয়ার তাড়নায় ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দেশের সমস্ত বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় একটী ছোট বাটী কিনিয়া বাস করিতেছিলেন। রামলাল বাবুর ও তাঁহার বাটী একই রাস্তায় এবং প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত বলিলেই হয়। রমেশ বাবুর বাটীতে সুশীলের অবাধ গতি ছিল। নির্ম্মলা সুশীলের নিকট হইতে পাঠ অভ্যাস করিয়া লইত এবং সুশীলদের বাটীতেও সে যাইত, তবে ইদানীং বড় হইয়াছে বলিয়া আর বড় একটা বাটীর বাহির হইত না। সুশীল তাহাদের বাটীতে আসিলে তাহার নিকট হইতে পাঠ শিক্ষা করিয়া লইত।

রমেশ বাবুর ও উমাশশীর সর্ব্বদাই মনে হইত, "আহা যদি সুশীলের সহিত নির্ম্মলার বিবাহ হইত, তাহা হইলে বড়ই সুখের কথা হইত।" কিন্তু হায় তাঁহারা যে গরীব। বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার এ দুরাশা তাঁহাদের মনে স্থান দেওয়া আদৌ শোভন নহে। নির্ম্মলার বয়স এখন বার বৎসর—রূপ যেন দেহে আর ধরে না। ভাদ্র মাসের নদীর উভয়কূল ছাপাইয়া পড়িতেছিল। তাহার উপর সে সুশীলের নিকট হইতে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতেছিল। সুশীলেরও মনে হইত "আহা যদি নির্ম্মলার সহিত আমার বিবাহ হইত।" সে বুঝিতেছিল যে, তাহার মন নির্ম্মলার উপর অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু পাছে পিতা অমত করেন, সেই ভয়ে সে কোন কথা প্রকাশ করে নাই। তাহার প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় হৃদয়ের ভিতর দিয়াই বহিয়া যাইতেছিল। একদিন রমেশ বাবু আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার জননী বলিলেন,—

"বাবা রমেশ, আরত নির্ম্মলাকে রেখে দেওয়া চলে না, এইবার তুমি পাত্র দেখ।" রমেশ বাবু বলিলেন,—

"মা, এরই মধ্যে কেন? আর দিনকতক থাক না?" "আর যে বার বছরে পড়ল বাবা, আর কদিন যাবে বল, এখন থেকেই দেখতে আরম্ভ কর,

তবে যদি তের বছরে দিতে পার, আর একটু খুঁজতেও ত হবে; বার তার হাতে ত অমনি ধরে দিতে পারবে না?"

রমেশ বাবু বলিলেন,—"মা ইচ্ছে ত। তাই আমার ঐ একটা মেয়ে আর ছেলে পুলেত নেই, ওকে যাতে একটু সৎপাত্রে দিতে পারি তাই আমার একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু যে দিন-কাল পড়েছে, জানি না বরাতে কি আছে।"

মা বলিলেন,—"ভালই হবে বাবা, তুমিত কখনও কোন মন্দ কাজ কর নি, ভগবান্ তোমার ভালই কর্ব্বেন।"

রমেশ বাবু বলিলেন,—"সেই আশীর্ব্বাদ কর মা, তোমার আশীর্ব্বাদ যে আমার একমাত্র ভরসা।"

সেই দিন রমেশ বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুশীলকে বলিলেন,—"বাবা সুশীল, নির্ম্মলা ত বড় হয়ে উঠেছে, আর ত ঘরে রাখা চলে না, তা তুমি একবার তোমার কলেজের অঞ্চলে দেখ—যদি একটী ভাল পাত্র পাওয়া যায়। তুমি ত আমাদের অবস্থা সবই জান, অল্প স্বল্পের মধ্যে যাতে হয়, এমন একটু সন্ধান রেখ।"

সুশীল বলিল,—"মেশোমশায়, আপনার যা আছে, তাই যথেষ্ট। আপনার অভাব কিসের, আর নির্ম্মলার মত মেয়ের বিয়ের জন্য আপনি অত ভাবছেন কেন, অমন মেয়ে কটা মেলে?" আপনি দেখবেন নির্ম্মলার বিয়েতে আপনার এক পয়সাও খরচ হবে না।"

রমেশ বাবু বলিলেন,—"বাবা সুশীল, আর কি সে দিনকাল আছে, এখন রূপগুণ কি কেহ দেখে! শুধু টাকা, টাকা না থাকিলে মেয়ের বাপের আর নিস্তার নাই।"

সুশীল,—"আচ্ছা, মেশোমশায়, আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিব"—বলিয়া নির্ম্মলারবর অনুসন্ধানে ছুটিল। সরলপ্রকৃতি যুবক, সংসারের কুটিলতা ত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; কাজেই কলেজের দুই চারিজন বন্ধুর পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিনাপণে বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে নির্ম্মলার বিবাহের জন্যে নির্ব্বাচন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না, এই ভরসায় সে রমেশবাবুকে ওই কথা বলিয়াছিল।

পড়িবার ঘরে গিয়া সুশীল দেখিল, নির্ম্মলা পুস্তক লইয়া তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। সুশীল হাসিয়া বলিল,—"ওরে নির্ম্মলা, তোর যে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে রে আবার মেশোমশায় ঘটক পাকড়েচেন আমায়।" নির্ম্মলা যেন

P30643

শুনিতে পায় নাই, এই ভাণ করিয়া বলিল,—"কি বল্‌লে সুশীলদা, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে? তা হো'ক ভাই আমার একটী বৌদিদির বড়ই দরকার হয়েচে, কবে তোমার বিয়ে সুশীলদা?"

সুশীল বলিল, "আহা, ন্যাকা সাজা হচ্ছে, যেন কিছুই শুন্‌তে পান্ নি? ওরে আমার বিয়ে হ'লে কি আর আমি তোকে খবর দিতে আস্‌তুম? তুইই আমাকে খবর দিতে এতক্ষণ দৌড়তিস্।"

নির্ম্মলা,—"তবে কার বিয়ের কথা বল্‌ছিলে?"

সুশীল,—"ওরে তোর রে তোর, আবার ঘটক আমিই।"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, "ও", তাই বল, তা ঘটকঠাকুর, তোমায় আর বিশেষ কষ্ট কর্‌তে হবে না, কেননা বিয়েও আর আমি কর্‌ব না!"

৩।

তারপর প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলার বিবাহের কিন্তু কিছুই ঠিক হয় নাই। সুশীল বন্ধুমহলে সন্ধান লইয়া একেবারেই বিফলমনোরথ হইয়াছিল। কারণ, যে সব বন্ধু পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিত, তাহাদের কেহ বলিল, এখন বিবাহের আদৌ ইচ্ছা নাই। কেহ সুপুত্রের মত বলিল,—"আমাকে বলিলে ত হইবে না ভাই, বাবা মা যাহা করিবেন তাহাই হইবে।' সুশীল তাহাদিগের অভিভাবকবর্গকে পত্র লিখিলে সবাই পাঁচ ছয় হাজার টাকা হাঁকিয়া বসিলেন। আর রমেশ বাবু? তাঁহার কন্যা; তিনিত ব্যাকুলভাবে কত স্থানেই ছুটাছুটী করিয়াছেন, কিন্তু কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।' এদিকে নির্ম্মলাও ক্রমে বড় হইয়া উঠিয়াছে। রমেশ বাবু কি যে করিবেন, কিছুই ঠিক পাইতেছিলেন না। এখন একমাত্র পরমেশ্বরের উপরই নির্ভর করিয়া চলিতেছিলেন। এক একবার বিরক্ত হইয়া মনে করিতেন "দেবো না নির্ম্মলার বিয়ে, থাক্ সে অবিবাহিতা, বিবাহ ব্যতীত কি রমণীর আর কোনও পন্থা নাই?" কিন্তু হায় তাহা ত হইবার নহে, তিনি যে হিন্দু, তায় আবার বাঙ্গালী। এরূপ চিন্তা তাঁহার মনের মধ্যে থাকাই ভাল; তদনুযায়ী কার্য্য করা যে অসম্ভব! আর নির্ম্মলা? সে ভাবিত, হায় কেন সে জন্মিয়াছিল, কেন সে পুত্র না হইয়া কন্যা হইয়াছিল? সে যদি পুত্র হইত, তাহা হইলে পিতার ত এত ভাবনা হইত না? তাহার উপর সে সুশিক্ষা পাইয়াছিল। যে তাহাকে বিবাহ করিবে, তাহার দৃষ্টি যে তাহার অপেক্ষা তাহার পিতার অর্থের উপরই অধিক থাকিবে, এই চিন্তায় তাহার মন ঘৃণায়পরিপূর্ণ হইত। ইচ্ছা হইত

পিতাকে বলে, "বাবা, আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না।" কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিত না। তাহাতে সে বাঙ্গালীর মেয়ে। তাহাকে মুখ বুজিয়াই থাকিতে হইবে—মতামত প্রকাশের কোন অধিকারই ত তাহার নাই।

যাহাই হউক, দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছিল। সুশীল ইহার মধ্যে এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুরে একটী কলেজে প্রফেসার নিযুক্ত হইয়াছে, শীঘ্রই সেখানে চলিয়া যাইবে। নির্ম্মলা সুশীলের পাশের সংবাদ পাইয়াছিল; কিন্তু সে বিদেশে যাইতেছে তাহা জানিত না। সুশীল যাইবার দিন পূর্ব্বে নির্ম্মলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল,—

"নির্ম্মলা, আমি ত চল্‌লুম, কিন্তু তোর বিয়ের সময় দেখিস্ যেন খবর পাই।" নির্ম্মলা একেবারে আশ্চার্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাবে সুশীলদা?"

"কেন, তুই জানিস্ না? আমার যে, বহরমপুরে চাকরী হয়েছে, আমি পরশু দিনই চলে যাব।"

"কেন, সুশীলদা! তোমার কিসের অভাব যে, তুমি বিদেশে যাচ্ছ চাকরী কর্ত্তে?

"হ্যাঁরে অভাব না থাক্‌লে বুঝি আর কাজ কর্ম্ম করতে নেই? ছাখ্, এটা আমাদের একটা মস্ত ভুল, আমাদের দেশের যাদের একটু পয়সা আছে, তারা অমনি জমীদার সেজে বসে, আর ক্ষমতা থাক্‌লেও উপার্জ্জনের চেষ্টা করে না। এই পয়সার অহঙ্কার আর আরামের চেষ্টাই ত আমাদের খেয়েছে। আমি কিন্তু ওসব ভালবাসি না। পয়সা আছে আছে, তা ব'লে উপার্জ্জন কর্ব্ব না কেন?"

নির্ম্মলা,—"আমিও তা বল্‌ছি না। আমি বল্‌ছি যে, বিদেশে গিয়ে চাকরী না কর্‌লে কি আর হবে না? কেন, এখানে কি আর চাকরী মেলে না?"

সুশীল,—"কাজই যখন করব, তখন আর এখান সেখান কি বল্?"

নির্ম্মলা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—"সুশীলদা, সেখানে গিয়ে আমার.....আমাদের কথা ভুলে যাবে ত?"

"হ্যাঁ ছ'মাসের পথ যাচ্ছি, তোদের কথা আর ভুল্‌ব না? আর, অন্য কারুর কথা ভুলি না ভুলি তোর কথা কিন্তু আগে ভুলে যাব", বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুশীল চলিয়া গেল।

আজ সুশীলের যাইবার দিন। নির্ম্মলার যেন সকাল হইতে কিছুই ভাল

লাগিতেছিল না। সুশীল পূর্ব্বদিন আসিতে পারে নাই। যাইবার গোছগাছ করিতে ব্যস্ত ছিল। নির্ম্মলা কাজ কর্ম্ম সারিয়া তাহার পড়িবার ঘরটীতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। চক্ষের জল আর কিছুতেই বাধা মানিতে চাইতেছিল না। উদাসনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছিল। সুশীল যে ইতিমধ্যে কখন মাসীমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়াছিল, তাহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই। যখন সুশীল ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে আসিয়া তাহার মস্তকস্পর্শ করিয়া ডাকিল, "নির্ম্মলা ?" তখন তাহার জ্ঞান হইল। মুখ ফিরিয়াই সুশীলকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হায় সে প্রবল বন্যা রোধ করিবার ক্ষমতা তাহার কোথায় ? সুশীল জিজ্ঞাসা করিল,—

"নির্ম্মলা কাঁদছিস্ কেন ?" তাহারও গলাটা যেন ধরিয়া গিয়াছিল। নির্ম্মলা কিছুই উত্তর করিল না। কিছুক্ষণ পরে সুশীল বলিল,—

"নির্ম্মল,—আমি তাহলে আসি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, এখনই যেতে হবে।" নির্ম্মলা শুধু বলিল,—

"মাঝে মাঝে চিঠি পত্র দেবেত ?"

"দিব বই কি ? তাও কি আমায় বলে দিতে হবে ?" তখন নির্ম্মলা সুশীলের পদধূলি গ্রহণ করিল। সুশীল তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া "আসি তাহলে" বলিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার অজ্ঞাতসারে মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। নির্ম্মলা ছাদের উপরের ঘর হইতে সুশীলের গাড়ী যতক্ষণ দেখা যায় দেখিল, তারপর গাড়ী দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

৪।

এদিকে রমেশ বাবু কন্যার বিবাহের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাত্র আর জুটে না। সুযোগ্য পুত্রের পিতারা একেবারে ৫।৭হাজার টাকার কমে কথাই কহেন না। আবার যাহার তাহার হস্তে নির্ম্মলাকে অর্পণ করিতে রমেশবাবুর মন সরে না। অবশেষে বহু কষ্টে সুশীলের চলিয়া যাইবার প্রায় তিন মাস পরে একটী পাত্রের সন্ধান মিলিল। পাত্রটী সবে মাত্র বি. এ পরীক্ষা দিয়াছে। তখনও পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই। পাত্রের পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও নিতান্ত মন্দও নহে। যাহা হউক বাজারে মৎস্যবিক্রয়ের ন্যায় অনেক দর কষাকষি করিয়া পাত্রের পিতা অবশেষে তিন

হাজার টাকার বিনিময়ে পুত্রটীকে বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। রমেশবাবুও ওই পাত্রেই নির্ম্মলাকে অর্পণ করা মনস্থ করিলেন। শ্রাবণমাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। একটী মাত্র কন্যার বিবাহ, কাজেই রমেশবাবু একটু অধিক আড়ম্বরের সহিত আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিবাহের দিন ক্রমেই নিকট হইতে লাগিল। রমেশ বাবুর বাটী আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্ববর্গে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত বাটী আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত; কেবল একজনের প্রাণে শান্তি ছিল না, সে নির্ম্মলা। সুশীলের নিকট নির্ম্মলার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র গিয়াছে। সুশীল একবার ভাবিল "যাইব না" তার পরেই ভাবিল, না - নির্ম্মলার বিবাহে না যাইলে তাহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, আর হয়ত নির্ম্মলাও একটু আঘাত পাইবে। সে যাওয়াই স্থির করিল। ইতিমধ্যে নির্ম্মলার গাত্রে হরিদ্রা প্রভৃতি সমস্তই হইয়া গিয়াছে। অদ্য বিবাহ, প্রভাত হইতেই রমেশ বাবুর বাটীর বাহিরে নহবৎ বসিয়াছে। সকলেই ব্যস্ত ভাবে বিবাহের আয়োজনের জন্য ছুটাছুটী করিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় যথাসময়ে একে একে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিতে লাগিলেন। কিছুপরেই বরযাত্রিগণসহ বর আসিল। বাটীর মধ্যে হইতে শঙ্খ ও উলুধ্বনি বরের আগমনবৃত্তান্ত সকলকে জানাইয়া দিল। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী বর্গের আহারের আয়োজন হইতে লাগিল। ওদিকে বাটীর মধ্যে সম্প্রদানের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইল। কেবল সুশীল তখনও আইসে নাই। রামলালবাবু ও রমেশবাবু উভয়েই তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন; কারণ তাহার সেইদিন বৈকালেই আসিয়া পঁহুছিবার কথা। সমস্ত আয়োজন স্থির হইলে রমেশবাবু কৃতাঞ্জলি হইয়া পাত্রকে সভাস্থ করিবার অনুমতি চাহিলেন। পাত্রের পিতা অনুমতি প্রদান করিলে পাত্রকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। এমনি সময়ে একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়া সমস্ত গোলমাল হইয়া যাইল। বিধাতা পুরুষের কখন কি ইচ্ছা, তাহা মানুষে কি করিয়া বুঝিবে? সম্প্রদানের পূর্ব্বে পাত্রের পিতা বরাভরণের সামান্য ত্রুটী দেখিয়া একেবারে মহা ক্ষাপ্পা হইয়া উঠিলেন। তিনি একেবারে সে ত্রুটী তখনই সংশোধিত না হইলে কিছুতেই পুত্রের বিবাহ দিতে দিবেন না বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। রমেশবাবু কত অনুনয় করিলেন, বিবাহটা হইয়া যাইলে সমস্তই ঠিক করিয়া দিবেন বলিলেন। কিন্তু বরের পিতা একেবারে অটল। "এখনই সব ঠিক করিয়া দাও ত দাও নতুবা আমি বর লইয়া চলিয়া যাইব।" রমেশবাবু ত একেবারে মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। সে রাত্রে যে কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে,

কিছুতেই তাঁ'র কল্পনায় আসিল না। এদিকে বরের পিতাও বরযাত্রিরা মহাগোল করিতে লাগিলেন। রমেশ এই ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। পাত্রের পিতার ব্যবহারে তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে পাত্রের পিতা বলিলেন যে, যদি দুই শত টাকা আরও বেশী দেওয়া হয়, তবেই তিনি বিবাহ হইতে দিবেন; নতুবা নয়। রমেশবাবু যথাসর্ব্বস্ব খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহ দিতে ছিলেন, তাঁহার ঘরে তখন ৫০পটী টাকাও নাই ত দুইশত টাকা দিবেন কোথা হইতে ? তিনি স্বরূপ অবস্থা পাত্রের পিতার নিকট বর্ণনা করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তির মনে একটুও দয়া হইল না। তখন রমেশবাবু অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন "বেশ তবে তা'ই হউক, আমি কিন্তু যা দিবার কথা ছিল, সমস্তই দিয়েছি। এর উপর আর এক কপর্দ্দকও দিব না।" এমন সময় সুশীল আসিয়া পড়িল। লাইনের গোলমাল হওয়ায় তাহার ট্রেণ কিছু বিলম্বে আসিয়াছিল। সুশীল সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে তখনই পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া দুই শত টাকা আনিয়া রমেশবাবুর হস্তে দিয়া বলিল, "আপনি ওদের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলুন, এ টাকা নিতে আপনি একটুও সঙ্কুচিত হবেন না, এ আমি নির্ম্মলাকে 'যতুক' দিচ্ছি।" রমেশবাবু কাঁদিয়া ফেলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু টাকা লইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার মেয়ে লেখাপড়া হয় হোক, সমাজ আমাকে না নিক্, কিন্তু তবুও ও চামারের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিব না।" আত্মীয়গণ তাহাকে অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু কোনই ফল হইল না। বর চলিয়া গেল। সকলেই তখন রমেশবাবুর এই 'বুদ্ধিভ্রংশতা'র সমালোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু এক ব্যক্তির তাঁহার উপর শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া গেল। তিনি শ্যামলালবাবু। তিনি নিজে একজন মহাতেজস্বী ব্যক্তি। রমেশবাবুর এই আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, মনুষ্যোচিত তেজস্বিতা তাঁহার চক্ষে বড়ই উচ্চ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কিন্তু যাহাই হউক, এখনত একটা কিছু করিতে হইবে। রমেশবাবু এই আকস্মিক বিপদে ও উত্তেজনায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। অন্দরে তাঁহার জননী ও পত্নী শোকে মুহ্যমানা। সকলেরই মুখে একটা বিষাদচ্ছায়া। কি করা যাইবে, কেহই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। হিনুর কন্যা, বিবাহ আজ না হইলে আর হইবে না। কিন্তু পাত্রই বা এসময়ে কোথায় পাওয়া যায় ? তখন শ্যামলালবাবু এমন একটা কর্ম্ম করিয়া বসিলেন যে, সকলেই

তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইল। তিনি সুশীলকে অন্তরালে ডাকিয়া তাহার সহিত কি কথা বার্ত্তা কহিলেন এবং কিছু পরেই যেখানে রমেশবাবু বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে সুশীলকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—

"রমেশবাবু! আপনি যদি কিছু মনে না করেন, ত একটা কথা বলি।"

রমেশ বাবু তিনি কি বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রামলাল বাবু,—"রমেশ বাবু, মেয়ের বিয়ে ত আজ দিতেই হ'বে, কিন্তু পাত্রই বা কোথায় পাওয়া যায়, তবে এক আমার সুশীল আছে, আপনার যদি অমত না হ'য় তা হ'লে আমি নির্ম্মলাকে পুত্রবধূ করতে রাজি আছি, আপনি একটু ভেবে দেখুন।"

রমেশবাবু রামলাল বাবুর কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলিলেন, "রামলাল বাবু! একি বল্‌ছেন? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌ছেন?"

রামলাল বাবু বলিলেন, "রমেশ বাবু, আমি এমন পশু নই যে, মানুষের এ অবস্থায় তার সঙ্গে তামাসা কর্‌ব! আমি যা বল্‌ছি সত্যই বল্‌ছি। আমি সত্যসত্যই সুশীলের সঙ্গে নির্ম্মলার বিয়ে দিতে রাজি আছি, আর সুশীলেরও এতে মত আছে, এখন আপনার ইচ্ছার উপর সব নির্ভর কচ্ছে।"

রমেশ বাবু বলিলেন,—"রামলাল বাবু, আমার ইচ্ছার কথা বলছেন? সুশীলের সহিত নির্ম্মলার বিয়ে দিবার আমার আবার ইচ্ছা? এ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া রামলাল বাবু! আমার এত সৌভাগ্য যে, আমি সুশীলকে জামাই কর্ব্বো! আর আপনি রামলাল বাবু, আপনি কি মানুষ না দেবতা? আপনার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে আমি আমার জন্ম সার্থক করি।" এই বলিয়া রমেশ বাবু রামলাল বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন।

রামলাল বাবু শশব্যস্তে তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "কি করেন রমেশ বাবু, আমি আপনার কি করেছি, এ অবস্থায় মানুষের যা কর্ত্তব্য, তাই করেছি, তার চেয়ে অধিক ত কিছু করিনি।"

রমেশ বাবু বলিলেন,—"না, রামলাল বাবু, আপনি যা করলেন, একালে মানুষ তা করে না। মানুষের হৃদয় এখন আর অতটা উদার নেই।"

তারপর সুশীলের দিকে ফিরিয়া তিনি তাহাকে দুই হাতে বক্ষে লইয়া বলিলেন, "বাবা সুশীল, তা তুমি কি দয়া করে আমার নির্ম্মলাকে গ্রহণ করতে পারবে?" সুশীল বলিল, "আপনি কি বলছেন? আমি যে নির্ম্মলাকে লাভকরা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি, আর তার উপর আমার বাবার ইচ্ছা, সে যে আমি দেবতার আদেশ বলে মনে করি।" রমেশ বাবু তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া বাটীর মধ্যে এই সুসংবাদ দিতে ছুটিলেন। তাঁহার জননী ও পত্নী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন; তাঁহাদের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল; বিষাদমুগ্ধ ভবন আবার আনন্দকোলাহলে মুখরিত হইল। আর নির্ম্মলা? এ সংবাদে তাহার মনের ভাব কি হইল, কি আনন্দতরঙ্গে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তারপর? তারপর আর কি? শুভ মুহূর্ত্তে সুশীলের হস্তে রমেশবাবু নির্ম্মলাকে সঁপিয়া দিলেন। যখন চারিচক্ষের মিলন হয়, তখন যাহারা ছিল, তাহারা বলে যে, উভয়ের চক্ষুতে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী সুবর্ণলতা দে।

"আমার ডেপুটিগিরি"।

(ছোট গল্প।)

(১)

সেবার কলিকাতায় আসিয়াই ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরিয়াছিল। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, দেহখানা একেবারে সাদা হইয়া গেল। বাবা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, সংসারের একমাত্র অবলম্বন আমি, ছোট ভাই ভগিনীগুলি আমার মুখের দিকেই চাহিয়া আছে। আর দুখিনী মা আমার কত আশায় কত নিরাশায় জীবনের শেষ দিন কয়টা কাটাইতেছিলেন। সেদিন জ্বরের বেগটা একটু কমিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু শরীরটা বড়ই অস্থির বোধ হইল। রাত্র প্রায় নয়টা বাজে, পাশের ঘরে ছিলেন রায় বাহাদুর ত্রৈলোক্যচরণ। তিনি

দিন দুই যাবৎ আমাদের অতিথি। পঞ্চকোট হইতে রাজার কি একটা কাজ লইয়া আসিয়াছিলেন। হঠাৎ রাস্তায় ফেরিওয়ালা, "বরফ্" "বরফ্" বলিয়া হাঁকিয়া গেল, তখন বুঝিলাম বড়ই গরম পড়িয়াছে। দক্ষিণের জানালাটা একটু খুলিয়া দিলাম। বেয়ারা আসিয়া মাথায় ওয়াডিকলনের পটি লাগাইয়া দিল। দ্বাদশীর চন্দ্র তখন শ্রাবণের আকাশে একটু ম্লান হাসি হাসিতেছিল, যেন তখনই নিভিয়া যাইবে। ক্রমে বাসার সকলেরই খাওয়া হইল, পার্শের বাটীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিয়া গেল। এদিকে পার্শ্বের ঘরগুলি হইতেও নাসিকাধ্বনি গুরু গম্ভীর রবে উত্থিত হইতেছিল। আমার চোখে কিন্তু একটুও ঘুম ছিল না। এই প্রকাণ্ড জনকোলাহলময়ী কলিকাতানগরী একেবারে নিঝুম হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে দুইটা বাজিয়া গেল, তখন একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আমারও একটু তন্দ্রার আবেশ হইল।

(২)

আমি তন্দ্রার আবেশে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম,—যেন আমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছি, একটা পাহাড়ের উপরে আমাদের বাসা, অনতিদূরে একটা ঝরনা। আমাদের "লিলি" সেই ঝরনার পারে "জোছন্‌কে" লইয়া খেলিতে যায়, আর ছোট ছোট পাহাড়ীয়া পাখী আসিয়া তাহাদের সঙ্গে খেলা করে—সেই খাসিয়া বালক-বালিকাগুলি "জোছন্‌কে" কতই আদর করে, লিলিকে ভুটিয়া খাইতে দেয়। সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন। আমি রোজই কাছারী হইতে বাসায় আসিয়া বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসি. "স্ত্রী" আসিয়া মাথায় হাওয়া করে, "মনুয়া" জলখাবার দিয়া যায়, ক্রমে সূর্য্যদেব শ্রান্তদেহে নীল পর্ব্বতের পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়ে। পাহাড়ীয়া বালকেরা গরু ঠেঙ্গাইয়া সান্ধ্য সঙ্গীতে স্নিগ্ধ পাহাড় মুখরিত করিয়া তাহাদের কুটীরে ফিরিয়া যায়। হঠাৎ আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি রোদ উঠিয়াছে, জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতেছে। আমার শরীরটা তখন বড়ই দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল, মাথাটা ঘুরিতেছিল। ঠাকুর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কি খাবেন?" আমি এক গ্লাস জল চাহিলাম। কোন রকমে হাত মুখ ধুইয়া একটু ঠাণ্ডা জল পান করিলাম। শ্রান্ত দেহে একটু সজীবতা আসিল।

প্রভাত তখন লাল চেলী পরিয়া নববধূর বেশে সুসজ্জিতা। আমি প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলাম, আর শেষ রাত্রের স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম। ইতিমধ্যেই বাসার দুই একজন বন্ধু বান্ধবকে স্বপ্নের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি।

তাহারা সকলেই বলিল "শেষ রাত্রের স্বপ্ন সফল হয়" পিয়ন একখানা টেলীগ্রাম দিয়া গেল। খুলিয়া দেখি, লেখা আছে—"Your father siriously ill, Come sherp" অর্থাৎ "তোমার পিতা ভয়ানক কাতর সত্বর চলিয়া আইস।" আমার শেষ রাত্রের স্বপ্ন সফল হইল। তখন আমি প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছি। আমার ডেপুটীগিরির আর বাকি কি?

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি,এ।

সাধু মণ্ডল।

(ছোটগল্প)

(১)

সাধুমণ্ডল জাতিতে মুসলমান, গ্রামের মধ্যে মাতব্বর লোক। লগ্নি পত্রও বেশ আছে। গ্রামের গরীব লোককে দশ পাঁচ টাকা ধার দিয়াও থাকে, কিন্তু মণ্ডল কখনও সুদ নেয় না। পাঠক মনে করিবেন না যে, সাধু মণ্ডল প্রকৃতই সাধু ছিল। যখন শ্রাবণ মাসের প্রথমে অথবা আষাঢ়ের শেষে পাট কাটা আরম্ভ হয়, তখনই মণ্ডলের লগ্নির টাকা আদায় করিবার সময়। মণ্ডলের কড়ার আছে—"নছিমুদ্দিন পাঁচ টাকা ধার নিয়াছে, সে যেন মণ্ডলকে, মন দুই পাট দেয়, মণ্ডল গরীবের নিকট টাকা চায় না" গ্রামের জীর্ণ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোক টাকা অন্য কোথাও পায় না, কাজেই তাহাদিগকে মণ্ডলের চুক্তি অনুযায়ীই কার্য্য করিতে হয়।

কিন্তু পাটের মন যখন দশ বার টাকা হিসাবে বিক্রি হয়, তখন মণ্ডলকে যদি পাঁচ টাকায় দুই মন পাট দিতে হয়, তবে লোকের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যে বেচারীরা আষাঢ়ের শেষে উপরে বৃষ্টি ও নীচে জল সহ্য করিয়া গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া পদ্মার পার হইতে পাট কাটে, তাহাদের শরীরের রক্ত মণ্ডল চুষিয়া লয়। ক্রমে গ্রামের লোক চড়িয়া উঠিল,—

মণ্ডলকে খুন করিবে। মণ্ডলও সর্ব্বদা সতর্ক—লাঠি, সড়্‌কি ও দশ বার জন লাঠিয়াল সর্ব্বদাই ঘরে মজুত আছে। মণ্ডল দিন দু'প্রহরেও চার জন "পাইক" না লইয়া ঘরের বাহির হয় না। ক্রমে গ্রামের লোক মণ্ডলের সঙ্গে সদ্ভাব করিল,—সে কিন্তু মুখের। মণ্ডল কতক বুঝিল, কতক বুঝিলও না; কিন্তু সেও পূর্ব্বের ন্যায়ই সতর্ক। ঘরের মধ্যে দুই পাল্লা টিনের বেড়া দিয়া তবে মণ্ডল থাকে। গ্রামবাসীরাও মণ্ডলের নিকট হইতে টাকা নেওয়া প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু গরীবের উপায় নাই; কর্জ্জ করিতেই হয়। সাধু মণ্ডলও পাঁচ টাকায় দুই মন পাট, তিন মন তিল ইত্যাদি কড়ারে টাকা দেয়। অবশেষে গ্রামের লোক তিন বৎসর চেষ্টা করিয়া ১০০০৲ টাকা মজুত করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল—এবার মণ্ডলকে শেষ করা চাই। কিন্তু মুখে খুব সদ্ভাব।

(২)

ঐ গ্রামের নিকট-গ্রামেই মণ্ডলের এক "খালাত" ভাই থাকিত। লোকে প্রচার করিল যে, মণ্ডলের ভাই হাফেজালী বড়ই গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে। এদিকে এক দিবস হাফেজের শ্বশুর আসিয়া মণ্ডলকে খুব বিশেষ করিয়া গোলমাল মিটাইবার কথা বলিয়া গেল। মণ্ডলও কিছুতেই স্বীকার নয়। অবশেষে হাফেজালীর শ্বশুর "কাদের মিয়া" সতের দিন অনুরোধ করিলে মণ্ডল রাজি হইল। আজ গ্রামের "নসির সেখের" বাটীতে এক মস্ত বৈঠক বসিবে। মণ্ডলেরও নিমন্ত্রণ আছে, বৈকাল বেলাই বৈঠক। গ্রামের লোকের সঙ্গে মণ্ডলের যে বিবাদ ছিল, তাহাও বাহিরে নাই।

দণ্ড দুই চার বেলা থাকিতে মণ্ডল ভাহার বিবিকে বলিল "হাফিজা মোরে ভাত আনিয়া দে"

হাফিজা—"যাবা কনে"!

মণ্ডল—"সতের দিন অইল কাদের মিঞা একটা গোলমাল মিটাইতে কইতেছে, হেইডা আইজ নসির সেখের বাড়ীর বৈঠকে মিটামু"।

হাফেজা—বৈঠক ত মোর বাড়ীতেই বরাবর বইত।

মণ্ডল আহারে বসিল। একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "দে দে, শীগ্‌গীর," আইজি বুঝি শ্যাষ খাওয়াটা খাই। অমনি হাফিজা বলিল,—

"মুই যাইতে দিমু না।"

মণ্ডল খাইয়া উঠিয়া অনেক কষ্টে হাফিজার নিকট হইতে বিদায় নিল। মণ্ডল যাত্রা করিল, আকাশ বেশ পরিষ্কার, বেলা তখনও দণ্ড দুই আছে। বাটী হইতে

বাহির হইবার সময় হাফিজা বলিল, প্যাদা কাসেমকে লইয়া যাও, কিন্তু মণ্ডল বলিল—"ব্যালা বেল্‌ই ফিরুম কি কাম্।" মণ্ডল বারান্দা হইতে নামিলেই তাহার লাঠিটী মাটিতে পড়িয়া গেল। কুকুরে একটা হাঁচি দিল। অমনি কুলক্ষণ দেখিয়া হাফিজা বাইয়া মণ্ডলের কাপড় ধরিল। অনেক কষ্টে মণ্ডল হাফিজাকে বুঝাইয়া চলিল।

নসিরের বাড়ীতে আজ হাসন পরামানিক, কাজিমুদ্দিন বৈরাগী, ইদসোলী দফাদার প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। ইহারা সকলেই গোপনে মণ্ডলের শত্রু। কিন্তু মণ্ডল জানে, তিন বৎসর যাবৎ তাহারা তাহার বন্ধু। ক্রমে বৈঠকে হাফেজের কথা উঠিল, কিন্তু দেখা গেল যে খেজোর পরামাণিক, হবিবুল্লা, জালাল সেখ এবং কালু ফকির বৈঠকে আসে নাই। কাজেই মণ্ডল অন্য এক তারিখ ফেলিল। এদিকে একথায় সে কথায় রাত্র দণ্ড দুই হইল। তখন হাফেজের শ্বশুর কাদের মিঞা বলিল "মণ্ডল ভাই চল তোমারে বাড়ীতে থুইয়া আই।"—প্রকাণ্ড মাঠ, মধ্যস্থানে শূন্য ভিটা এবং চতুর্দ্দিকে পাট খেত। আর আট রসির মধ্যেই মণ্ডলের বাড়ী, এমন সময় কাদের মিঞা বলিল "মণ্ডল ভাই! মুই একটু দৌর দিয়া কইয়া আইমু যে, মুই আইজ বাড়ীতে থাইমু না, তোমার বাড়ী ম্যাজমান্ থামু, তুমি এট্টু দারাও। বলিতে বলিতেই "কাদের" দৌড় দিল, অমনই আট দশ জন ভীষণকায় লোক আসিয়া মণ্ডলের গলা টিপিয়া ধরিল। তাহার আর শব্দ করিবার জো রহিল না। তাহার পর প্রতিশোধ-কারিগণ সাধু মণ্ডলের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া বিলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। পর দিবস লাস পাওয়া গেল, দারোগা আসিল। গ্রামের লোক সাধু মণ্ডলের নিকা পক্ষের পুত্র জমির মণ্ডলের উপরেই সমস্ত দোষ চাপাইল, এক দারোগাকে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিল। কাজেই মোকর্দ্দমা চালাইবার পরিবর্ত্তে "জমিরকেও" দারোগা সাহেবের পূজার জন্য কিছু দিতে হইল। দারোগা সাহেবও সেই বার কতকগুলি নূতন গহনার তিন হস্ত দীর্ঘ ফর্দ্দ করিলেন।

শ্রীমুরলী ধর গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

গয়ার কথা।

ব্রহ্মগয়া।

(১)

সূচনা।

যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে মহাতীর্থে হিন্দুজনসাধারণ পিতৃলোকের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য গমন করিয়া থাকে, যেখানে বহুতীর্থের সমবায়, এবং যেখানে ভগবান্ নানা রূপে বিরাজিত, সেই পুণ্য তীর্থ গয়াক্ষেত্রের কথা শুনিতে কাহার না আগ্রহ হইয়া থাকে? আবার যেখানে সেই করুণাবতার বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিতে কাহার মন না ধাবিত হয়? তাই আমরা ক্রমে ক্রমে সেই সকল বিচিত্র কথার অবতারণা করিতেছি।

প্রথমে গয়াক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিয়া লই। গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে ইহার প্রধান তীর্থ গয়াশির একক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। গয়াশির একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ইহাতেই বিষ্ণুপদ অবস্থিত। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মযোনি, রামশিলা, প্রেতশিলা প্রভৃতি পর্ব্বত এই ক্ষেত্রমধ্যে বিরাজিত। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী ইহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। ফল্গুর পরপারে সীতাকুণ্ড পর্ব্বত, এইখানে দাঁড়াইয়া গয়াধামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, নানামন্দির ও অট্টালিকা-শোভিত নগরীর অপূর্ব্ব শোভা নয়নের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে। আবার ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের উপর হইতে যদি চারিদিকে নিরীক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে এক বিচিত্র শ্যামশোভায় চক্ষু শীতল হইয়া উঠে। সেই শ্যাম শোভার মধ্যে মধ্যে ধূসর বর্ণ পর্ব্বত সকল কেমন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এবং শুভ্র সৌধরাজি কেমন হাসিয়া উঠিতেছে। বুদ্ধগয়ার কথা মনে হইলে, সেই ধরণীগর্ভ হইতে উত্থিত বিরাট মন্দির কত পুরাতন কথা মনে জাগাইয়া তুলে। নৈরঞ্জনা বুদ্ধগয়ার প্রান্তভাগ বিধৌত করিয়া উত্তরদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার পর মহানদীর সহিত মিলিত হইয়া ফল্গুনাম ধারণ করিয়া গয়ানগরীর পার্শ্বদিয়া বহিয়া যাইতেছে। নৈরঞ্জনা এক্ষণে নীলাজল, এবং মহানদী মোহনা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পুরাণাদিতে ফল্গু মহানদী নামেও পরিচিত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া গয়াক্ষেত্র বিরাজিত। কিন্তু যেখানে বোধিদ্রুম অবস্থিত, তাহাকে এক্ষণে বোধগয়া কহিয়া থাকে; এই বোধগয়া বুদ্ধগয়া নামেই কথিত হয়। একখানি শিলালিপিতে 'বুদ্ধগয়া' নাম ছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সে শিলালিপির এক্ষণে সন্ধান পাওয়া যায় না, এবং তাহা তত প্রাচীনও নহে। বোধগয়া বা বুদ্ধগয়া ব্যতীত সমস্ত ক্ষেত্রই গয়ানামেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু বুদ্ধগয়া হইতে ইহাকে বিভিন্ন নামে বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মগয়া নামকরণও দেখা যায়। এই ব্রহ্মগয়া নাম আমরা প্রথমে আইন-আকবরীতে দেখিতে পাই। এইক্ষেত্র ব্রহ্মাকে উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মগয়া নাম হয়। * কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের নামানুসারে ইহার ব্রহ্মগয়া নাম হইয়াছিল, আবার কাহারও কাহারও মতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্থান বলিয়া ইহা ব্রহ্মগয়া নামে অভিহিত হয়। সে যাহা হউক, একসময়ে বুদ্ধগয়া হইতে ইহাকে পৃথক ভাবে বুঝাইবার জন্য ইহার যে ব্রহ্মগয়া নাম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে একমাত্র গয়া নাম ব্যতীত ব্রহ্মগয়া বা বুদ্ধগয়া নামের উল্লেখ দেখা যায় না। আমরা কিন্তু দুইটি স্থানের কথা পৃথক ভাবে বলিবার জন্য তাহাদিগকে ব্রহ্মগয়া ও বুদ্ধগয়া নামেই অভিহিত করিতেছি। বুদ্ধগয়ার প্রকৃত নাম বোধগয়া হইলেও তাহা সাধারণের নিকট বুদ্ধগয়া নামেই পরিচিত।

গয়া নামের উৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ গয়াসুরের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া গয়াসুর হইতেই গয়া নামের উৎপত্তি স্থির করেন। * কিন্তু আমাদের শাস্ত্রাদিতে গয় রাজার নাম হইতে গয়া

* "Gaya, the place of Hiudoo worship, is in this Sircar (Behar); they cal it Birhm Gaya, being consecrated to Brahma."

(Gladwin's Ayeen Akbery)

* "The town of Gaya is one of the most famous places of Brahmnical warship in Northern India. It is said to have received its man from an *Asur* named *Gaya-Mahatma*."

(Cunningham, Archeological Survey of India Vol. III.)

'According te the *Bhagabat Puran*, *Gaya* was the name of a king who dwelt in the town in the *Treta-yuga* or silver age; But the more geberally accepted legend is that contained in the *Vayu Purana*, according *to which Gaya* was the name of *Asur* or demon of giant size."

(Gazetter of the Gaya District,)

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে গয়রাজার গয়ায় বাসকরার কথা দেখিতে পাই নাই। অন্যান্য পুরাণে তাহার উল্লেখ আছে বটে।

নামের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। আবার একাধিক গয়রাজারও উল্লেখ দেখা গিয়া থাকে। যেরূপে গয়া নামের উৎপত্তি হউক না কেন, গয়া যে একটি প্রাচীন তীর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং এখানে পিতৃকার্য্য করিলে যে অক্ষয় ফল লাভ হয়, তাহাও শাস্ত্রাদিতে লিখিত আছে। আমরা যে যে শাস্ত্রে গয়ার কথা আছে, প্রথমে তাহারই উল্লেখ করিতেছি, সেই সঙ্গে গয়রাজা গয়াসুর প্রভৃতির বিবরণ ও গয়া-মাহাত্ম্যের কথাও বলিতেছি।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

নারীত্ব বিকাশে সতীত্ব।

ভারতবাসীদের আজ এই দুর্দ্দশার দিনে আমরা যে দিকে লক্ষ্য করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবের তুলনায় তাঁহারা আজ কতদূর অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে কি ছিল, এখন কি-হইয়াছে, এই পার্থক্যালোচনাই আমাদের দুঃখের প্রধান কারণ। যদি অতীতটা আমাদের গরিমময় না থাকিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের কষ্ট দিতে পারিত না। এখনও পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে, যাহারা অনেক বিষয়ে ভারতবাসী অপেক্ষা হীন, কিন্তু তাহাদের দিকে তাকাইয়া ভারতবাসী আনন্দানুভব করেন না। কারণ ভারতবাসীর কষ্ট,—নূতন না পাইয়া নহে; তাঁহার দুঃখ, প্রাপ্ত বস্তু হারাইয়া। উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে না পারা কষ্টের কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু উচ্চ সোপানে একবার আরোহণ করিয়া ভাগ্যদোষে নিম্নে পতিত হওয়া যে কি কষ্ট, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। ভারতবাসীর আজ এই ভুক্তভোগীর অবস্থা,—এই পতনের দুঃখ অনবরত তাঁহার ভিতর জাগিয়া উঠিতেছে।

একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, অতীত গৌরব স্মরণে দুঃখ হইলেও তাহা একেবারে সুখশূন্য নহে। পতনের দিকটা মনে করিলে দুঃখ হইলেও গৌরবের কথায় আমাদের বুকটা ভরিয়া উঠে। যার বর্ত্তমান অন্ধকারময়, তাহার স্বতঃই অতীত ও ভবিষ্যৎকে ধরিয়া বাঁচিতে হয়। তাই

আমাদের গৌরব অতীতের বস্তু হইলেও আমরা তাহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিতে চাই না। আমরা সেই গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া আনন্দ পাইতে চাই, সেই গৌরবস্মৃতিকেই আমরা উন্নতিপথের সহায় করিতে চাই, সেই অতীত সুখস্মৃতির আনন্দে আমরা বর্ত্তমানের কষ্ট কিয়ৎপরিমাণে ভুলিবার চেষ্টা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাই। তাই এই দুর্দ্দিনেও ভারতবাসী তাঁহার পূর্ব্ব গৌরবের কথা একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বুঝি বা সেই স্মৃতিই তাঁহাকে এখনও জীবিত রাখিয়াছে!

কিন্তু আজ 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'—এই দুর্দ্দিনেও যে সুখস্মৃতিটুকু আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, আজ তাহাকে লইয়াও টানাটানি হইতেছে। বহু দিন হইতে দশ জন বিদেশী মিলিয়া আমাদিগকে বুঝাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে যে, আমাদের অতীতেও গৌরবের কিছু ছিল না। আমরা এখনও যেমন অসভ্য, পূর্ব্বেও তেমন, কিম্বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে অসভ্য ছিলাম। পরে পরের কষ্ট বুঝে না, পরে পরের ভাল দেখিতে পারে না বা শুনতে চায় না, এই ভাবিয়া বিদেশীর কথাতেও আমরা আমাদের অতীত গৌরব স্মৃতি মুছিয়া ফেলি নাই। আজ কিন্তু ঘরভাঙ্গা বিভীষণ উপস্থিত। ঘরের লোক শত্রু হইলে বাঁচা কষ্ট, তাই প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছে,—তাই আজ কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। আজ ভারতবাসীর সত্য সত্যই বড় বিপদের দিন, আজ সত্যই 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। এতদিন বিদেশী লোকে আমাদের আদর্শগুলিকে ছোট করিয়া দেখিলেও আমরা আমাদের আদর্শে দোষারোপ করিতাম না। আমরা শুধু আমাদের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি বা আমাদের অবনতি লক্ষ্য করিয়াই দুঃখ করিতাম। আজ কিন্তু আমরা আদর্শেই' দোষারোপ করিতেছি। তাই বলিতেছিলাম, আজ উদ্ধার পাওয়া বড় কষ্ট। এতদিন শুধু শুনিতেছিলাম, ভারতবাসী হারিয়েছে সত্যনিষ্ঠা, ধৃতি, উৎসাহ, মনের জোর ইত্যাদি। আজ তাহার উপর শুনিতে হইতেছে যে, এই সব গুণ-সম্পদ-হারাইবার মুখ্য এবং সর্ব্ব প্রধান কারণ হইতেছে—অন্য একটী গুণলাভে চেষ্টা। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও সেদিন একটী অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, আমরা সতীত্বকে অনেক বড় ক'রে দেখেছি, আমাদের নারীগণের উন্নতির পথে ঐ সতীত্বের আদর্শ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথাটী তিনি এবা বলেন নাই। এই রকমের একটা চিন্তাস্রোত যে আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; তাই এই কথাটা লইয়া একটু আলোচনা প্রয়োজন। সমালোচনাকে ত্যাগ

করিলে চলিবে না লোকের কথা উপেক্ষা করিলে চলে না। আমাদের আদর্শ যদি খাঁটি জিনিষ হয়, তাহা হইলে এই সব সমালোচনার মধ্যেও তাহা বাঁচিয়া থাকিবে।

হিন্দুসমাজের অনেক দোষ থাকিতে পারে, হিন্দুসমাজের নরনারীর মধ্যে অনেক গুণের অভাব পরিলক্ষিত হয় বটে—কিন্তু তাহা বলিয়া কোনও একটী গুণের দিকে লক্ষ্য দেওয়াতেই যে অন্যান্য গুণসমূহ বিকশিত হইতে পারিতেছে না, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। যে সমস্ত দোষ আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, কিসে সেই সব দূরীভূত হয়, সেই চিন্তা করিবার প্রয়োজন।

কপটাচার, মিথ্যা কথন, ইত্যাদি কেমন করিয়া আমরা ত্যাগ করিতে পারি, সেই বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। হিন্দুনারী সতীত্বকে ছোট করিয়া দেখিলে তাহার অন্যান্য গুণগুলি ফুটিয়া উঠিবে, এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যে গুণ নাই, তাহাই অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, যেটুকু আছে, তাহা বাদ দিলে অন্য কিছু লাভ না হইতেও পারে; অধিকন্তু সেটুকুও যাইবে। সুতরাং মোটের উপর ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক, কাহারও কাহারও মনে এরূপ ধারণাও আসিতে পারে যে, সংযমমাত্রই মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অন্তরায়। মানবের সমস্ত শক্তিকে বিকশিত করিতে হইলে, ইহাদের মতে তাহার প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার আবশ্যক নাই,—কারণ, সংযত করা ও বাধা দেওয়া একই কথা—সুতরাং সংযমমাত্রই বিকাশের এবং উন্নতির অন্তরায়। এই ধারণাটী নিতান্ত অমূলক। জলস্রোত যখন শতমুখে ধাবিত হইবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই স্রোতকে শতমুখে যাইতে না দিয়া যদি একদিকে তাহার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করা যায়,—তাহা হইলে ঐ স্রোতের বেগ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। পাঁচ দিকে ইন্দ্রিয়গণকে ছাড়িয়া দিলে প্রবৃত্তির অবাধ গতি তাহাদিগকে শক্তিহীন করিয়া তুলে; সুতরাং কোনওরূপ উন্নতির পক্ষে ইন্দ্রিয়গণের অবাধ গতি অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। জলস্রোত যেমন অনেক দিকে চলিলে শক্তিহীন হওয়ায় নদীর সব মুখই শুকাইয়া যায়— তেমন মানবীয় শক্তিকে সংযত করিতে না পারিলে তাহাও বহুদিকে ধাবিত হইয়া মানুষকে একেবারে শক্তিহীন করিয়া তাহার মৃত্যুর পথ দেখাইয়া দেয়।

সতী কে? সতীর আদর্শ দক্ষকন্যা সতী, সাবিত্রী, সীতা, প্রভৃতি। কায়মনোবাক্যে যে হিন্দুনারী তাঁহার পতি ভিন্ন অন্য পুরুষাসক্ত হইবেন না, তিনিই প্রকৃত

সতীপদবাচ্য। যে হিন্দুনারী তাঁহার স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের চিন্তা পর্য্যন্ত করেন না, তিনিই যথার্থ সতী,—একে নিষ্ঠা, একস্বামীতেই তন্ময়ত্ব, কেবল পতিই ধ্যান, ইহাই সতীত্বের—মূলকথা,—একে নিষ্ঠাই সতীত্ব, দুইএ প্রীতিই ব্যভিচার, এদিক দিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, সত্যে নিষ্ঠা এবং সতীত্ব একই কথা। আমরা অবশ্য এখানে সতীত্বের আদর্শের কথাই বলিতেছি,—সতী তাঁহার স্বামীর মধ্য দিয়াই সত্য এবং ভগবানের পূজা করেন, সতী স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে সত্য হইতে পৃথক্ ভাবে দেখেন না। এখানে যদি কেহ বলেন যে, একনিষ্ঠ হইলেই যদি সতী হওয়া যায়, তাহা হইলে শৈবলিনী অসতী নহেন, কারণ তিনি প্রতাপেই একনিষ্ঠ ছিলেন, তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, শৈবলিনী যখন চন্দ্রশেখরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, তখনই—তিনি ব্যভিচারিণী হইয়াছিলেন। যদি তিনি প্রতাপকে এতই ভাল বাসিয়াছেন যে, তিনি প্রতাপকে কখনও ভুলিতে পারিবেন না, তাহা হইলে তিনি চন্দ্রশেখরকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন না কেন? সাবিত্রী ত সত্যবান্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিপদে বরণ করিতে স্বীকৃতা হয়েন নাই। তিনিও সাবিত্রীর মত দৃঢ়সঙ্কল্পা হইলেন না কেন?

ভারতবাসী আজ হারিয়েছে সত্য; সত্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই ভারতবাসীর উদ্ধার সম্ভব হইতে পারে, নতুবা নহে। হিন্দুরমণী সত্যকে বড় করিয়া দেখিলে, সতীত্বকেও বড় করিয়া দেখিবেন, এবং এই সত্যে নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুনারী ভারতবাসীকে জানাইতে সক্ষম হইবেন, মনুষ্যত্বের বিকাশ সত্যের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে,—সত্য ভিন্ন অন্য পথে চলিলে কদাচ মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য সতীত্বকে একটু ছোট ক'রে দেখ্‌লে বা back groundএ রাখিয়া দিলে চলিবে না; বরং সতীত্বের মহান্ আদর্শ হইতে হিন্দুনারী আজকাল কতটা পিছে পড়িয়া আছেন,তাহা আলোচনা করিয়া আদর্শের দিকে ছুটিতে হইবে। সতীত্বের আদর্শকে আমরা উচ্চস্থান দিয়াছি বলিয়া ভারতের আজ এ দুর্দ্দশা হয় নাই,—হিন্দুনারী আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছেন বা হইতেছেন বলিয়া আজ এই দৈন্য ভারতকে আলিঙ্গন করিয়াছে। হিন্দুস্থানে রমণীর স্থান কোন দিনই খুব নিম্নে ছিল না, রাজপুতরমণীদের শৌর্য্য, বীর্য্য, নির্ভীকতার কথা আজও ইতিহাস মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, কই, এই ভারতের সে গৌরবের দিনেও সতীত্ব হিন্দুরমণীকে নারীত্ববিকাশে সহায়তা ভিন্ন বাধা প্রদান ত করে নাই। আজ আমাদের এ শঙ্কা উঠিতেছে কেন? লক্ষ্মী

ছাড়িয়া গেলে লোকের হিতাহিতজ্ঞান থাকে না, তাই আমরা নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছি, সতীনারীর আদর্শ আমরা আজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি না। যেদিন ভারত গৌরবমণ্ডিত ছিল, এই আদর্শ সেই কালের আজ ভারতকে পুনরায় গৌরবান্বিত দেখিতে হইলে তাহার সেই আদর্শকে উপেক্ষা করিলে বড় ভুল হইবে। বিদেশীদের সহিত সুর মিলাইয়া ভারতের পূর্ব্ব গৌরবকে উপেক্ষা করিলে বড়ই অকল্যাণ হইবে, আজ ভারতের কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বে যে ছিল, তাহাও কি অস্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হইবে? ভারতবর্ষের পূর্ব্ব গৌরবস্মৃতিতে যাঁহার বুক ফাটে না, তিনি কেমন দেশহিতৈষী জানি না। আজ এই দিনে ভারতের প্রত্যেক নরনারীকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অতীত গৌরব কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া উৎসাহিত করিতে হইবে, তাহা না করিয়া যদি আমরা বিপরীত পথে অগ্রসর হইয়া হিন্দুর আদর্শটাকেই ছোট করিয়া দিই, তাহা হইলে ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী হইলেও আমরা তাহার অমঙ্গলই করিব।

আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, শাস্ত্রকারেরা সকলই পুরুষ মানুষ, তাই স্বার্থান্ধ হইয়া তাঁহারা নারীকে চাপিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কথাটা আপাতত শুনিতে মন্দ লাগে না, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই যুক্তির অসারতা উপলব্ধি করা যায়। যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী, কোনওরূপ বিষয় বাসনা যাঁহাদের নাই, সেই ঋষিগণ শাস্ত্রপ্রণেতা। যাঁহাদের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা স্বার্থের প্রেরণার লেশমাত্র দেখিতে পাই না, তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া আমরা স্বার্থপর বলিব? যাঁহাদের পরার্থই স্বার্থ, পরহিত যাঁহাদের ব্রত, পরার্থ হইতে পৃথক্ যে স্বার্থ, তাহাকে যাঁহারা জানেন না,—সেই আদর্শত্যাগীদিগকে আমরা কেমন করিয়া স্বার্থান্ধ ভাবিব? আমরা সর্ব্বদা স্বার্থান্বেষণ করিয়াও যদি পরহিতচিন্তা করিতে পারি, তাহা হইলে সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ কি পরের মঙ্গল কামনা করিতে অসমর্থ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়?

আদর্শের কথা বলিতে গেলে অনেকে চমকাইয়া উঠেন, তাঁহারা বলেন—আদর্শ দেখিয়া আমরা কি করিব? বাস্তবজগতে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাই লইয়া আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে একটা বড় রকমের ভুল লুকাইয়া আছে, আদর্শদ্বারাই আমাদের বাস্তব গঠিত হইতেছে—ideal ই actual কে গড়িয়া তুলিতেছে, আদর্শকে ছোট করিলে, আমাদের বাস্তব জীবন খুব উন্নত হইবার সম্ভাবনা নাই,—তবে একথাও সত্য যে, বাস্তবজীবনে আমরা

খুব নিম্নে থাকিলে, উচ্চ আদর্শ ভাবনা অসম্ভব, লক্ষ্যস্থির না থাকিলে, ideal টীকে সর্ব্বদা সাম্‌নে ধরিয়া না রাখিলে উন্নতি অসম্ভব, একদিক দিয়া দেখিলে আদর্শই মানবজীবনের সর্ব্বস্ব, ইহাই Idealism, Ideal কে বাদ দিয়া actual থাকিতে পারে না ; সুতরাং আদর্শের বিষয় আমরা আলোচনা করিব না, এইরূপ তর্ক ভুল। সীতা চরিত্র বা সাবিত্রী চরিত্র আঁকিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কারণ উহার সহিত আমাদের—বাস্তব জীবনের কোনও সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না,—এইরূপ ধারণা নিতান্ত অযৌক্তিক : কারণ, আদর্শকে সাম্‌নে রাখিয়াই জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, নতুবা নহে, গন্তব্য স্থান নির্দ্ধারিত না থাকিলে গতি অসম্ভব।

আবার—কেহ কেহ বলেন, যে সাহিত্যে শুধু আদর্শ সৃষ্টিরই প্রয়োজন—বাস্তব জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিবার কোনও আবশ্যক নাই,—ইহারাও বিপরীত দিকে ঠিক ঐ রকম ভুলই করেন। বাস্তব বা actual এর মধ্যে আমরা বাস করিলেও উহার চিত্র যতক্ষণ না আমাদের সাম্‌নে কেহ ধরেন, ততক্ষণ আমরা বাস্তবের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্ধারণে সমর্থ হই না, আমরা অনেক সময়েই Self conscious থাকি না, এই Self conscious করানই বাস্তব চরিত্রের উদ্দেশ্য, আমারই জীবনের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আমি অনেক সময়ে চমকাইয়া উঠি।

তাই বলিতেছিলাম, সাহিত্যে আদর্শসৃষ্টি ও বাস্তব সৃষ্টি—উভয়ই পাশাপাশি থাকা দরকার। উহার একটীকে বাদ দিয়া আর একটী থাকিতে পারে না। আদর্শ এবং বাস্তবের ভেদ আমরা ইচ্ছা করিলেই মুছিয়া ফেলিতে পারি না। দুইটী পরস্পর বিভিন্ন, অথচ সংশ্লিষ্ট, একটীকে বাদ দিয়া আর একটী থাকে না সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া দুইটীই এক নহে, আদর্শ বা Ideal কখনও actual বা বাস্তবের সমান হইতে পারে না। আদর্শ চিরকালই উচ্চে থাকে। বাস্তব হইতে আদর্শ দূরে বলিয়া আদর্শের দোষ ধরা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য।

সতী স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। স্বামীর সুখেই তাঁহার সুখ, স্বামীর দুঃখেই তাঁহার দুঃখ, সতী স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে অস্থিমাংসবিশিষ্ট নরদেহ বলিয়া বিবেচনা করেন না, স্বামীর সহিত তাঁহার শুধু দেহের সম্বন্ধ নহে। স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্র লাল তাঁহার "পরপারে"র সরযূর মুখ দিয়া এই কথাগুলি বেশ সুন্দরভাবে বলাইয়াছেন। সরযূ তাঁহার স্বামী মহিমকে বলিতেছেন:—"সতীত্ব আমার ধর্ম্ম...সেই দেবতার

পূজার তুমি ত বিল্বদলমাত্র। তবে তোমার পবিত্রতা কামনা করি এই কারণে—যাহাতে সেই বিল্বদল আমার দেবতার চরণে দিবার উপযুক্ত হয়, যাতে সে আবর্জ্জনায় প'ড়ে কলুষিত না হয়। (আর যদি কলুষিত হয়) তা হ'লে আমার অশ্রুজলে তাকে পবিত্র ক'রে নেবো, সতীর অশ্রুজলের চেয়ে গঙ্গার বারি অধিক পবিত্র নয়।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাবে সরযূচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, সতীস্ত্রীর মহিমা ও গৌরব তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিলাতে বাস করিয়া, বিলাতী সভ্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপলব্ধি করিয়াও তিনি বিদেশীর বাহিরের চাকচিক্যে ভুলিয়া ভিতরের জ্যোতিঃ ও সৌন্দর্য্যকে ত্যাগ করেন নাই। সরযূর মধ্য দিয়া তিনি সতীনারীর যে আদর্শ বর্ত্তমানযুগে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। স্বামী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা একরূপ পরিত্যক্তা হইয়াও তিনি দরিদ্র স্বামীর কুটীর ত্যাগ করিয়া ধনী দাদামহাশয়ের প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, স্বামী বেশ্যাসক্ত জানিয়াও তিনি স্বামীর প্রীতির জন্য মাসে মাসে তাঁহার মাসহারার সমস্ত টাকাই স্বামীকে দিয়াছেন, অনাহারে বিনা চিকিৎসায় প্রাণের অধিক সন্তানকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়াও সতী পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয়েন নাই, এই পাষণ্ড স্বামীর জন্য তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতেও দ্বিধা করেন নাই। আজ বিলাতী সভ্যতার যুগে বিলাতী সমাজকে বিশেষভাবে জানিয়াও বিলাত-প্রত্যাগত দ্বিজেন্দ্র লাল যে এই আদর্শ আমাদিগকে দিয়াছেন, ইহা সৌভাগ্যের ও আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। সীতা সাবিত্রীর দোহাই দিবার দিনও চলিয়া গিয়াছে, এখন সরযূর দোহাই দিয়াও কি রক্ষা পাইব না?

শরৎ বাবুও তাঁহার "শ্রীকান্তের" অন্নদা দিদি এবং "বিরাজবৌ"র মধ্য দিয়া যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখিয়াছেন, তাহাতেও সতীত্বকে তিনি বড় করিয়া দেখেন নাই বা তাঁহার পাঠকবর্গকে দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই, ইহা আমরা মনে করি না। অভয় তাঁহার পাষণ্ড স্বামীকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে আশ্রয় দিয়া যে নারীত্ব বেশী বিকাশিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় গ্রন্থমধ্যে বিশেষ পাওয়া যায় না, অভয়া স্বামিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেও যেমন, স্বামিত্যাগ করিবার পরেও তেমন, আর অন্নদা দিদি তাঁহার পাষণ্ড স্বামীকে অনুসরণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া স্বামীর সুখদুঃখ বরণ করিয়া লইয়া যে তাঁহার নারীত্ব বিকাশের অন্তরায়কে বরণ করিয়াছিলেন, সেভাবও শরৎবাবু দেখাইবার

চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বিরাজবৌ তাঁহার স্বামীর সত্তার সত্তা মিশাইয়া দিয়াছেন। স্বামী ভিন্ন অন্য চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। কিসে স্বামী সুখী হইবেন? কিসে স্বামীর কল্যাণ হইবে? ইহাই তাঁহার ধ্যান, ইহাই তাঁহার সাধনা, সংসারের কোনরূপ দুঃখ কষ্টে সতীনারী এক দিনের জন্যও কষ্ট অনুভব করেন নাই; কিন্তু যখন তাঁহার স্বামী তাঁহার সতীত্বে সন্দেহ করিলেন, তখন বিরাজবৌ পাগল হইয়া উঠিলেন,—তাঁহার আর হিতাহিতজ্ঞান রহিল না, পরপারের সরযূও সতীত্ব সম্বন্ধে শ্লেষ সহ্য করিতে না পারিয়াই স্বামীর প্রতি একটু কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

শরৎবাবু তাঁহার অনেক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, "বুকের সত্য" "মুখের সত্য" হইতে উচ্চে, এবং বুকের সত্যই আসল জিনিস। যে গড়িয়া বিবাহ (যেখানে হৃদয়ের ভালবাসা নাই) মুখের সত্যমাত্র, যেখানে হৃদয়ে প্রকৃত ভালবাসা, সেখানেই বুকের সত্য। মুখের সত্য বুকের সত্যের বিরোধী হইলে বুকের সত্যকেই বাঁচাইতে হইবে, কথাটা ভাল বটে, কিন্তু আমাদের দেখিতে হবে হিন্দুর আদর্শ কি? হিন্দু সত্যকে দুইভাবে ভাবিতে পারে নাই, দুইভাবে ভাবিতে শেখেও নাই। হিন্দুর নিকটে বুকের সত্য মুখের সত্য হইতে পৃথক্ নহে। মুখের সত্য যাহাতে বুকের সত্য হইতে পৃথক্ না হয়, সেই চেষ্টাই কর্ত্তব্য, বুকের সত্য যদি মুখের সত্য হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা সত্য রহিল কোথায়? তাহা ত মিথ্যাচার, তাহা ত কপটতা "দেবদাস" কিম্বা "স্বামী"তে শরৎবাবু বুকের সত্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলেও, উহাকে আমরা সত্য বলিতে পারি না। আমরা বলিব, উহা সত্য হইত—যদি তাঁহারা দুই গ্রন্থের নায়িকা অন্য পুরুষকে পতি বলিয়া গ্রহণ না করিতেন। বাহিরে সাধারণে জানিতেছে একরূপ, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমি অন্যরূপ, সাধারণের নিকট একজনের গৃহিণী, অন্তরে অন্তরে আর একজনের পত্নী বা প্রণয়িনী—ইহাকে মিথ্যাচার কেন বলিব না বুঝিতে পারি না।

আর একটী দিক হইতে বিষয়টী আলোচনা করিতে হইবে, "নারীত্বের বিকাশ" বলিতে কি বুঝায়, সে বিষয়ে একটী সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। যেখানে অবাধ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সম্ভাবনা থাকে, সেই স্থলেই কি নারীত্ব বিকসিত হইবার উপায় বিদ্যমান? আর যেখানে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুবিধা নাই, সেখানেই কি নারীত্ব বিকাশের অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে? নারীত্ব বিকাশের পথে নারীর দুঃখকষ্টই কি প্রধান অন্তরায়? মানুষের মধ্যে আমরা

দুইটী ভাবের সংমিশ্রণ দেখিতে পাই,—একটী পশুত্ব বা Sensual self যে বিষয়ে অন্যাদি হইতে মানব বিভিন্ন নহে, আর একটী তাহার দেবত্ব বা Higher self এইটীই মানবের বিশেষত্ব। যাঁহাদের মতে সতীত্ব নারীত্ব বিকাশের অন্তরায় হইতে পারে, তাঁহারা যেন নারীত্ব Lower self এর বিকাশের দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন, নারীত্বের বিকাশ বলিতে আমরা বুঝি Higher self এর বিকাশ, সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে Lower self কে সংযত (Regulated) করিতে না পারিলে Higher self এর বিকাশ সম্ভবে না, Lower self এর অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের খুব আহার জোগাইলে নারীর দেবী হইবার সম্ভাবনা অল্প, নারকী হইবার সম্ভাবনাই অধিক, নারীর পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখ্‌তে পাই Lower self এর বিসর্জ্জন—এবং সঙ্গে সঙ্গে Higher self এর প্রকাশ; তাই মাতৃত্বের আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত। ত্যাগের মধ্য দিয়া, সংযমের মধ্য দিয়াই মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিত হয়, যথেচ্ছ ভোগের মধ্য দিয়া হইবার সম্ভাবনা নাই, আমরা যেখানে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখি, সেইখানেই আমাদের মাথা—নোয়াইয়া আসে; ভোগ আমাদের মস্তক অবনত করাইতে পারে না।

একটী বিষয়ে সংযম অভ্যাস করিলে অন্য বিষয়েও সংযত হইবার সম্ভাবনা অধিক। সতীত্বের মধ্য দিয়াই সত্য প্রভৃতি গুণ ফুটিয়া উঠে। সতীত্বকে ছোট করিয়া দেখিলে বা বিসর্জ্জন দিলে নারীত্ব বিকশিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। স্বামী যদি পাষণ্ডই হন, তাহা হইলে সেই স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষাসক্ত হইলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুবিধা হইতে পারে বটে; কিন্তু অন্য পুরুষাসক্ত না হইয়া পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়া সেবাব্রত অবলম্বন করিয়া পরহিতে রত হইতে পারিলে, নারীত্ব বিকশিত হয় না বলিয়া ত আমাদের ধারণা হয় না,—কেবল ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির অভাব হইতে পারে এই মাত্র।

হিন্দুনারীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া দেশহিতৈষিগণ তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু হিন্দুনারীকে ত্যাগের মহান্ আদর্শ হইতে বিচ্যুত করাইলে তাঁহারা হিন্দুনারীকে প্রকৃত সুখ দিতে পারিবেন না, হিন্দুনারী ভোগাসক্ত হইলে হিন্দুনারীর সম্মানও বাড়িবে না, হিন্দুনারীর মহিমা ত্যাগেই ফুটিয়াছে, ত্যাগেই হিন্দুনারীর জীবনের আদর্শ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করা হিন্দুনারী কখনও পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন নাই। পুরুষের মধ্যে ত্যাগ এরূপ ভাবে ফুটিতে পারে নাই। আমরা পুরুষের সহিত তাঁহাদের সমান করিতে

চাহিতেছি, অর্থাৎ ত্যাগের আদর্শ ছাড়িয়া ভোগের মধ্যে গা ঢালিয়া দিতে বলিতেছি, আমরা যে সুখ ভোগ করিতেছি, আমরা তাঁহাদিগকে তাহাই দিতে চাহিতেছি, যে মহাপুরুষ ভোগসুখকে অল্প ও বিনাশশীল জানিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন এবং ভগবদানন্দে বিভোর হইয়া দিনযাপন করিতেছেন, তাঁহাকে যদি আমরা বলি—"প্রভো! আপনি বড় কষ্ট পাইতেছেন, আপনি বন পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হউন, আপনি অনেক সুখ পাইবেন, ইহা যেমন বাতুলতা মাত্র, সেইরূপ যাঁহারা ভোগ-বিলাসকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ত্যাগের আনন্দকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, সেই হিন্দুনারীগণকে—আমরা বলিতেছি—আপনারা ত্যাগের আদর্শ ভুলিয়া যান, আপনারা আমাদের মত ভোগাসক্ত হউন, তবেই আপনাদের মঙ্গল হইবে, ভোগের ঊর্দ্ধে যে সুখ বা আনন্দ থাকিতে পারে, এরূপ ধারণা করিতে আমরা অক্ষম বলিয়া আমাদের দৃষ্টিতে হিন্দুনারীগণ বিশেষ ক্লেশ অনুভব করেন বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সতী হিন্দুনারী কখনও তাঁহার ত্যাগকে দুঃখময় বলিয়া বোধ করেন না। জোর করিয়া আমরা হিন্দুনারীকে সতী করিতে চাহিলেই তাঁহারা সতী হইতে পারিতেন না, আমরা নরকে রহিয়াছি, তাই নরকের সুখকেই বড় বলিয়া মনে করিতেছি। তাই হিন্দুনারীকে সেই সুখ দিতে যত্নবান্ হইতেছি, আমরা দিব্য সুখের সন্ধান রাখি না, তাই ত্যাগের আনন্দ কল্পনা করিতে না পারিয়া ত্যাগকে দুঃখময় ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছি।

হিন্দুনারীগণ, তোমাদের সম্মুখে আজ ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত, নরকের সুখের প্রলোভনে তোমরা স্বর্গসুখ ত্যাগ করিও না, Satonকে Eve বন্ধু বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, অনেক শত্রু বন্ধুর রূপ ধরিয়া আসে, কোনওরূপ প্রলোভনে হৃদয়ের ধনকে ত্যাগ করিওনা, বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ, কোন্‌টী তোমাদের প্রাণের জিনিস, যেটুকু এখনও তোমাদের আছে, সেটুকু আর হারাইও না, তোমাদের ঐটুকু গেলেই আমাদের সব যায়, বড় স্বার্থান্ধের মত কথা বলিতেছি সত্য, কিন্তু অল্পলোকেই ত্যাগ করে—সকলে ত তাহা পারে না। আমরা নিজেরা ত গিয়াছিই—শুধু যাই নাই, তোমাদেরও ধরিয়া টানিতেছি। তোমরা কি অটল থাকিতে পারিবে না? হিন্দু-ঋষিরা ত্যাগের আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই জগতের সাররত্ন তোমাদিগকেও সেই আনন্দ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বনবাসী হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন; কিন্তু তোমাদিগকে গৃহে থাকিয়াই ত্যাগী হইবার পথ দেখাইয়া

দিয়াছেন। তাঁহারা দেবতা ছিলেন, তাই তোমাদিগকে দেবী করিতে চাহিয়াছিলেন। আমরা অসুর, তাই তোমাদিগকে নায়কী করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাই বলিতেছিলাম, আজ তোমাদের সাম্‌নে ভীষণ পরীক্ষা, উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না কি?

শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম।

গান এবং বক্তৃতা।

গান এবং বক্তৃতা, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টা ভাল, তাহার কোনো উত্তর নাই। বক্তৃতা মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাষা তাহার প্রধান অঙ্গ। গান আরও কিছু ব্যক্ত করে। সুর এবং তাল তাহার প্রধান অঙ্গ। বক্তৃতার লক্ষণ পুরুষের মত। গানের লক্ষণের সঙ্গে স্ত্রীচরিত্রের সাদৃশ্য আছে।

গান ও বক্তৃতা একত্র হইলে যাহা হয়, তাহাকে আমরা পূর্ব্বকালে 'অভিনয়' বলিতাম। যাত্রার দলের বক্তৃতা থামিয়া গেলেই বুঝিতে হইবে যে, এইবার 'গান' আরম্ভ। যেমন ঝড়ের পর বৃষ্টি। ইহার নাম 'একতাল করিয়া বলা।' থিয়েটরের রঙ্গমঞ্চেও দেখিয়াছি যে, ঝড়ের পর এক পস্‌লা ছোট বৃষ্টি মাঝে মাঝে হয়। তাহা হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতির সহযোগে যাত্রার দলের গান হইতে বেশী মিষ্ট বোধ হয়। যাত্রার দলে গান জমাইবার জন্য জুড়ি থাকিত, জুড়ির মধ্যে কেহ তান জুড়িয়া দিতেন। ইহা রাগ লয়ের কসরৎ। থিয়েটারে এরূপ কসরৎ নিষিদ্ধ।

বক্তৃতায় জুড়ি চলে না। কোনো অধিবেশনের অধিকারী (প্রেসিডেণ্ট) আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার অনুমতিক্রমে একজন বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তিনি হাত পা নাড়িলে একটু Dramatic Effect হয় বটে, কিন্তু বক্তৃতার ভিত্তি Reasoning power (ন্যায়বিচার)। গানের ক্ষেত্র feelings (ভাব)। যাত্রাও থিয়েটার প্রভৃতির অভিনয়স্থলে ভাবরাজ্যকে আলোড়িত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

কালক্রমে অভিনয়ের মধ্যেও ন্যায়বিচারের ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বক্তৃতার মধ্যে এখনও সুর ও লয় প্রভৃতির বিকাশ হয় নাই। কিন্তু তাহা যে সম্যক্‌-ভাবে হইতে পারে, ইহার প্রমাণে 'কথকতার' উদাহরণ লইলে হয়। কথকতা ঠিক অভিনয়ও নয়, বক্তৃতাও নয়। উভয়ই। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি, কিন্তু একাধারে কথকমহাশয়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন মীটিংএ যদি বক্তা সেই প্রণালী অবলম্বন করেন, তবে বোধ হয় বক্তৃতার মূল্য বাড়িয়া যাইবে।

যখন সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তখন এ বিষয়ও সকলের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আমরা প্রতীচ্য জগৎ হইতে বক্তৃতা প্রণালী দেখিতেছি। হয় ত ভারতবর্ষের প্রণালী তাহাতে যুক্ত হইলে একটা মৌলিক প্রথার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু কোন্ উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা ইঙ্গিতস্বরূপ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা গেল।

প্রথমে উপাদানগুলির দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। আমাদের দেশে গানের প্রধান তিনটি বিভাগ—ধ্রুপদ, খেয়াল, এবং টপ্পা। ধ্রুপদ তাল-সর্ব্বস্ব। বক্তৃতায় তাহা খাটিবে না। টপ্পায় গিট্‌কিরি বেশী এবং কল্পনার বিকাশ কম। খেয়ালে কল্পনার ভাগই প্রধান এবং তালের গোলমাল নাই। দম আটকাইয়া গেলে সমে ফেলিয়া খালাস্! বক্তৃতার প্রণালী অনেকটা সেই রকম। বক্তৃতার সময় বাধা। একজন বক্তার হয়ত ফুড়ি মিনিট সময়, তাহার মধ্যে হয়ত পাঁচটা point of argument। এক point বিস্তার করিতে চারি মিনিটের অধিক সময় নাই। প্রত্যেক বিষয়ের কাজেই পরে 'সম'। সুতরাং খেয়ালের এক একটা। তালের সঙ্গে বক্তার এক একটা argument বিকাশ করিয়া সমে ফেলিলে খেয়ালের মত শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হওয়ার খুব সম্ভাবনা।

আর এক রকম গান আমাদের দেশে প্রচলিত। তাহার নাম 'কীর্ত্তন'। যাঁহাদের ভাবের পুঁজিপাটা বেশী, তাঁহারা কীর্ত্তন পছন্দ করেন। সভাস্থলেও এরূপ লোকের সমাগম হয়, এবং তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনার্থ বক্তৃতার সঙ্গে কীর্ত্তনের দুইএকটা লহরী ছাড়িয়া দিলে বক্তৃতা ফুটিয়া উঠিতে পারে। প্রতীচ্য জগৎ এবিষয়ে এখনও Experiment করেন নাই। আমরা তাঁহাদিগের চরনোন্নতির জন্য তাহা শিখাইতে পারি!

আমাদের দেশে অনেকের মত যে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সঙ্গীতের মিশ্রণে একটা অভিনব পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে। ইহাতে আমার বিশ্বাস কম।

'পশ্চিমে হাওয়া'র সঙ্গে 'পুবে হাওয়া' মিশাইয়া দিলে কোনটারই বিশেষত্ব থাকে না। উভয়ের গতি বিপরীত দিকে। কিন্তু বক্তৃতার সঙ্গে গান মিশানো সম্ভব, কারণ উভয় উভয়েরই পক্ষপাতী। এখন দেখা যাউক, তাহা কিপ্রকারে সম্ভব।

বক্তৃতা

ডারউইন বলেন যে, বক্তৃতার প্রথম সূত্রপাত দ্বন্দ্ব কলহ, এবং তাহা লইয়া ভাষার উৎপত্তি। রিকটার প্রভৃতির মত অন্যরকম। তাঁহারা বলেন, প্রেম হইতে ভাষার উৎপত্তি। এটা কান্টের Apriori মত। ইহার বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে ইতর প্রাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। যখন একদল পশু অন্যদলের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়, তখন বেশ বুঝা যায় যে, তাহারা পরস্পরকে কোন্‌টা ন্যায় এবং কোন্‌টা অন্যায়, তাহা আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করে। মানবসমাজেও যখন আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব কলহের সূত্রপাত হইয়া অজস্রধারায় গালি বর্ষিত হয়, তখনও আমরা সেই তথ্য দেখিতে পাই। অর্থাৎ একজনের দোষ অন্যজন প্রথমে দেখায়, এবং তাহা "প্রকাশ করিয়া" বলিলে, এবং বিপক্ষদল "শ্রবণ করিলে" সওয়াল জবাব সুরু হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামায় গিয়া থামে। সভ্যতার উন্নতস্তরেও তাহাই প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান। তবে ভাষার সংস্কৃতভাবের মধ্যে তাহা অনেকটা চাপা পড়িয়া কৌন্সিলির বক্তৃতার আকার ধারণ করে। ভাবজগতে (যেমন প্রেমের ক্ষেত্রে) Reasouing বড় একটা খাটে না। বৈষ্ণবের ভাষা, কিংবা ধর্ম্মপ্রচারকগণের ভাষাকে আমরা 'বক্তৃতা' বলিয়া অভিহিত করিতে প্রস্তুত নহি। সেগুলি অনেকটা গানের মতো, কেবল সুর বসাইলেই হয়। কিন্তু যেখানে বক্তৃতার বিষয় কিম্বা দাবী দাওয়া, এবং যাহার মীমাংসা ন্যায়বিচার সাপেক্ষ, সেস্থলে সুর এবং লয় বসানো সুকঠিন। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি, এবং অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সুকঠিন হইলেও তাহা সম্ভব।

গান

গানের মূলই প্রেম। কথা কম, সুর বেশী। ন্যায় বিচার নাই। সুর সাতটা স—রি—গ—ম—প—ধ—নি। সেগুলির মধ্যে কড়ি, কোমল, এবং অতিকোমল আছে। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন যে, গান গুলিলেই বক্তার চটিয়া উঠা খুব সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ ভাবিয়া দেখুন, যদি একজন বক্তার

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে যদি আর একজন বক্তা পরজের খেয়াল সুরু করিয়া দেয়, কিংবা পদীপিসির গালি থামিয়া গেলে যদি কেনারামের দা—

'হরি বলনা ওরে রসনা'

এই প্রকারের একটা কীর্ত্তন জুড়িয়া দেয়, তবে খুনখারাপি হইবার সম্ভাবনা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বক্তার প্রথমতঃ একটু Musical traniing এর দরকার। অনেক বক্তার এরূপ আছে। কিন্তু general culture না হইলে আমাদের প্রস্তাবিত প্রণালীর সাধনা দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

কি প্রকারে সাধিত হইবে ?

গায়ক ও বক্তার তফাৎ কি ? দেখিতে উভয়ই তানপুরার মত। পঞ্চম ও খরজ বাম ও দক্ষিণ বাহু। জুড়ির তার, মুখের বাণী। কান মোচড়াইয়া সুরে বাঁধিলে তানপুরার সুর সুশ্রাব্য হয়। প্রত্যেক শ্রোতার কর্ণকুহরে সেই সুর প্রথমে বসিয়া গেলে, পরে বিস্তারিত স্বরগ্রাম খেয়ালের মতো তাহাতে আঘাত করে। বেসুরা (irrelevant) হইলে, কিংবা সুমিষ্ট না হইলে শ্রোতা বিরক্ত হয়। গায়ক অন্য একটা তানপুরা কিংবা হার্ম্মোনিয়মের সাহায্যে নিজের দেহরূপ তানপুরা বাঁধিয়া লয়। বক্তার সে অভ্যাস নাই। সুতরাং কথায় শ্রোতৃগণকে মোহিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বক্তার গলা সাধা উচিত এবং সভার প্রেসিডেন্টের নিকটে একটা Table হার্ম্মোনিয়ম কিংবা Cottage Piano থাকা কর্ত্তব্য।

তানপুরার সৃষ্টিকর্ত্তা মহাদেব, গৌরীকে সুর বিজ্ঞান বুঝাইবার সময় বলিয়াছিলেন 'এই যে তানপুরার জুড়ির তার, ইহারা একটা 'জ্ঞান' (Reason) এবং অন্যটা 'ভক্তি' (feelings)। দুটো একসুরে না বাঁধিলে গান হয় না।'

সেই রকম, বক্তার মেজাজ যদি কিঞ্চিৎ সুরে গিয়া বসে, তবে বহু বাগবিতণ্ডার কষ্টকর ভাব হইতে শ্রোতাগণ অব্যাহতি পায় না। মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যও এই মত অবলম্বন করিয়া সঙ্গে একজন ভজনদক্ষ গায়কশিষ্যকে লইয়া দিগ্বিজয়ে যাইতেন। রামানুজের ধর্ম্ম প্রচার কীর্ত্তন ও ভজনের উপর দিয়াই চলিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবেরও তাই।

একটা হার্ম্মোনিয়ম সঙ্গে থাকিলে 'Oder, Oder' প্রভৃতির দরকার হয় না। সুর চিপিয়া একটা গৎ বাজাইয়া দিলেই বক্তার অগ্নিভাব চট্ করিয়া

প্রশমিত হইবে। কিন্তু ইহা হইতেও আর একটা সহজ উপায় আছে, তাহা "Subject music"এর অবতারণা।

"SUBJECT MUSIC" কি ?

বহুকাল পূর্ব্বে (বোধ হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে) রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর Bethune Soecety র একটা অধিবেশনে রাগরাগিণীসম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সুব বিন্যাসপূর্ব্বক বুঝাইয়াছিলেন যে, কতকগুলি রাগিণীর মধ্যে স্বতঃই এক একটা ভাব আবিষ্ট। যেমন পবজের মধ্যে কলহ, জয়জয়ন্তীর মধ্যে করুণা, ভৈরবীর মধ্যে নবজীবনের উন্মেষ ইত্যাদি। আমরাও তাহাই মধ্যে মধ্যে অনুভব করিযাছি।

মনে করুন, বক্তৃতার Subject বিবাহ। এস্থলে President প্রথমেই সাহানা রাগিণী বাজাইবেন এবং বক্তার কর্ণে সেই সুর লাগিয়া থাকিবে। যদি প্রচলিত বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধেও বক্তা বক্তৃতা করেন, তাহা সত্ত্বেও সাহানা রাগিণীর গুণে তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতার বুদ্ধিগম্য এবং প্রীতিজনক হইতে পারে। অপিচ সাহানা রাগিণীর সঙ্গে যদি বক্তার প্রস্তাবিত প্রথা সুরে না মিশিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি নিজেও বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার প্রস্তাবনা ভারত-বাসীর হৃদয়গ্রাহী হওয়া অসম্ভব!

এই প্রকরণে—

জাতিভেদের বক্তৃতায় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করা বিধেয়! কারণ, জাতিভেদে কোনো বিশেষ সুর খাটে না। সভাস্থলে এত গোলমাল হইয়া পড়ে যে, খোলকরতাল এবং কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। 'স্ত্রীস্বাধীনতা' যদি বক্তৃতার বিষয় হয়, তবে প্রথমে ভৈরবী রাগিণী জুড়িয়া দেওয়া উচিত। মহাদেবের সঙ্গে যখন উমার কৈলাসে কোন্দল বাধিয়াছিল (স্বাধীনতা হইয়া) তখন ভৈরবীমণ্ডলী এই সুরে উভয় পক্ষকে মোহিত করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন। 'দুর্ভিক্ষের' বক্তৃতায় জয়জয়ন্তী রাগিণী শ্রেয়ঃ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, কৌন্সিলিতে কিংবা জাতীয় মহাসভায় এই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করা সম্ভব কিনা, তাহার উত্তরে আমরা বলিব 'চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন'। প্রথতমঃ অনেকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, কারণ Rationalisin মধ্যে Hedonism একত্র করিয়া Politice এর অবতারণা এখনও নীতিবিরুদ্ধ। বরং লড়াইয়ের সময় ভগবানের নাম চলে, কিন্তু এপর্য্যন্ত

কৌন্সীলি প্রভৃতি স্থানে, কিংবা বিচারালয়ে ঈশ্বরের কিংবা ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া নিতান্ত লজ্জাকর ব্যাপার, তাহা অনেকে মনে করেন।

তবে যদি হাতাহাতি হইয়া পড়ে, তবে অনেকে হয়ত "For God's Sake, don't" বলিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইহাও নীতিবিরুদ্ধ। গোলমাল হইলে পুলিশ আছে, পাঁড়ন মত দস্তদ্বারা দংশন না করিয়া শান্তিরক্ষার জন্য নানাবিধ সভ্য উপায় আছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা বুঝেন, কিন্তু অশিক্ষিত Mass তাহা বুঝিতে পারে না; সুতরাং ক্রমে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। যতদিন বক্তৃতার সঙ্গে গান বাজনা এবং কীর্ত্তন থাকে, ততদিন সকল দেশেরই অশিক্ষিত প্রজা খুসী থাকে। সকলেই গান বাজনা অভিনয়ের জন্য দু'পয়সা খরচ করিতে প্রস্তুত। এক বিঘার স্থলে দশবিঘা জমি চাষ করিয়া তাহারা আনন্দলাভের নিমিত্ত ব্যাকুল, এবং তাহাতে দশজন গায়ক প্রতিপালিত হয়। এই প্রথার গুণে এবং তাহার সহিত দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকায় ভারতবর্ষের প্রজা বিগড়াইয়া যায় নাই। কেবল নীরস বক্তৃতা শ্রবণ করিলে তাহারা বিরক্ত হয়। যে শতাব্দী ভবিষ্যৎ-জলকল্লোল আমরা দূর হইতে শুনিতে পাইতেছি, তাহার মধ্যে কোন বক্তৃতাই টিঁকিবে না। সঙ্কীর্ত্তনের গীতিমত দরকার।

বোধ হয় আপনার এখনও সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই। বক্তৃতা শিখিলে সকলেই বক্তৃতা করিতে প্রস্তুত হয়। একজনের বক্তৃতা অন্য লোকের ভালসাগে না। যদি সকলকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া যায়, সময়াভাব। সকলে একত্রে বক্তৃতা করিলে মহাগোলযোগের ব্যাপার। সুতরাং সকলের মনরক্ষা করিতে হইলে বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন (এবং হবিলুটের বাতসা যদি থাকে তবে আরও ভাল) প্রশস্ত পথ।

অতএব যে বিষয়ের তর্কবিতর্কে মাথা ঠিক রাখা অসম্ভব, এমত স্থলে খোল করতাল লওয়া ভাল।

যেমন, মনে করুন 'বজেট স্পীচ'।

আমাদের সংসারে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সংসারের খরচ (তাহার আয় ব্যয়ের এষ্টিমেট্ প্রভৃতি) লইয়া অগ্নিকাণ্ড বাধিয়া উঠে, রাষ্ট্রীয় মহাসভাতেও তাই। এস্থলে মেঘমল্লারের সঙ্কীর্ত্তন প্রযুজ্য। স্বায়ত্তশাসনস্থলে মালকোষ রাগিণীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শিক্ষাবিভাগের বচসা উঠিলে গুজরাটি ভজন (কানাড়া রাগিণী):

রাজ অভ্যর্থনার সময় দরবারি কানাড়া (মোগলশাসন কালে ইহা প্রচলিত ছিল)।

বৌদ্ধযুগ হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন পর্য্যন্ত এই প্রথা অক্ষুণ্ণভাবে সুরক্ষিত হইয়াছিল। যদি দিব্যচক্ষু খুলিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, Communism তন্ত্র পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতেছে। সেটা চাপিয়া দিলে হয়ত কর্ম্মসন্ন্যাস কিংবা ঘোর রক্তপাতের সূত্রপাত হইবে। বড়র সহিত ছোটর মিশামিশির উপায় গান ভিন্ন আর কিছুই নাই।

গৃহস্থ পরিবারক্ষেত্রে একটা উদাহরণ লউন। ঘরে ঘরে গানের সূত্রপাত হইয়াছে। বক্তৃতা ও গালাগালির মাত্রা কমিয়া যাইতেছে। এই জন্য কেহই গানে বাধা দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু ঠিক পথ এখনও নিরূপিত হয় নাই। এখনও রামের স্ত্রী শ্যামের স্ত্রীর সঙ্গে কথায় কথায় কলহ করিতে প্রস্তুত। রামের কন্যা কিংবা শ্যামের পুত্রবধূ তাহা গান গাইয়া প্রশমিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফল এখন ধরে নাই। বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে মাত্র।

সুরেন্দ্রনাথ।

নবীনের গান।

(কবিতা)

(১)

আজ এসেছে নবীন বৈশাখ্!
অশ্রু সজল ছল ছল চোখে বারি ঝরা, আজ রাখ্ রাখ্!
আজি তোর দ্বারে নবীন বর্ষ
আসিয়াছে ল'য়ে প্রীতি ও হর্ষ
বন্ধন ভারে নির্জ্জীব হৃদে দীর্ঘশ্বাস ফেলা থাক্।
দীপ্ত কয়ারে চির-বিমর্ষ আননে-সকল বেদন কাঁদন টুটে যাক্!
আজ এসেছে নবীন বৈশাখ্!

(২)

আজ এসেছে বিশ্ব-মাঝারে—
চির-অন্ধকারের যবনিকা ঠেলি আলোকমালাবে ;
আজ টুটে যাক্ সব অবসাদ ব্যথা,
উঠুক্ বাজিয়া মধু প্রেম গাথা,—
অন্তর মাঝে তোদের ;—জাগাক্ ভারত মানবে সবারে !
আজ—লুপ্ত করুক্ বিশ্বমাঝের নিঃস্বজাতির অধীনতা ঘোর আঁধারে
এই নবীন আলোক-মালারে !

(৩)

আজি এই মহা নবীনতা মাঝ—
ছেড়ে ফেল্ ওরে জীর্ণ ভূষণ, নবসাজে ত্বরা সাজ্ সাজ্ !
নবীনোদ্যমে পূর্ণ ক'রেনে
উদ্যমহীন নিঃসাড় মনে ;
নিস্তেজ দুটি চক্ষু ভরিয়া দীপ্ত আলোক ফোটা আজ !
জীর্ণ শীর্ণ অঙ্গে জাগুক্ নবীন শক্তি,— নবীন ভক্তি, ঘুচি লাজ !
আজি—এই মহানবীনতা মাঝ !

(৪)

আজি গাব নবীনের মহা গান—
প্রকৃতির প্রতি অণু পরমাণু বিশ্বের বুকে তার প্রাণ।
নভ রঞ্জিত নবীন বর্ণে,
নবীনের গান বাজে এ কর্ণে ;
কেন তবে তুই ওরে নির্জ্জীব রবি হ'য়ে রহিস ম্রিয়মাণ ?
শক্তিতে জাগি শুক্তি ভাঙ্গিয়া কর তোর মহা-বন্ধন আজ অবসান !
আজ—ভারতবক্ষে ঝঙ্কার তুলি গারে মহা নবীনের গান !

ইতি—

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

পিয়াশী।

—:০:—

(ছোট গল্প)

ষ্টিমার থেকে বড়বাজার ঘাটে নেমে রোজই আমি তাকে ঠিক একভাবেই ব'সে থাকতে দেখতুম্ ; একখানি শতগ্রন্থি ছিন্ন মলিন কাপড় প'রে সে ঘাটের উপর ব'সে নানারূপ ধর্ম্মের গান গাইত ; তাই শুনে একফোঁটা দয়া ক'রে কেউ বা তার সাম্‌নে দু'একটী পয়সা ফেলে দিত, এবং তাহাতেই অতিকষ্টে তার দিন পাত হ'ত।

তার সেই বাল্যের বিপদভরা ইতিহাসটী শুন্‌লে পাষাণও কেঁপে ওঠে। ছেলে বেলায় বাপ-মা—হারা হ'য়ে সে যখন পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছিল, তখন এক বুড়ো ফেরীওয়ালা ফেরী ক'রে পথে ঘুরতে ঘুরতে তাকে কুড়িয়ে পায়। তারই, সেই নিঃসন্তান বিপত্নীক বৃদ্ধেরই নিবিড় স্নেহ যত্নের শীতল ধারায় সে যখন বারো বছরেরটি হ'ল' তখন তার দুর্ভাগ্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সেই বৃদ্ধের জীবন-কুসুমটীও ধীরে ধীরে শুকিয়ে ঝ'রে প'ড়ল। একদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ অজ্ঞাত সুদূরের পার থেকে যখন তার তলব প'ড়লো, তখন সেও সেই তলব শুনে সেই বারবছরের বালককে এ বিশ্বসংসারে 'জনস্রোত' পূর্ণ কলিকাতা মহানগরীর এক কোলাহলমুখরিত পথ মধ্যে ফেলে রেখে নির্ব্বিকার চিত্তে প্রস্থান ক'র্লে—তার তলবকারীর আদেশ পালন ক'র্ত্তে।

সেই থেকে সে গান গেয়েই তা'র জীবিকা উপার্জ্জন ক'র্ত্তো ; বড় সুন্দর গাইতে পার্ত্তো সে ; তা'র প্রাণের মাঝের সমস্ত নিবিড় গোপন ব্যথা তার সেই গানের সুরে ঝ'রে প'ড়তো। তাই মাঝে মাঝে তার সেই অশ্রুঝরা গানের করুণ ঝঙ্কার শুন্‌তে শুন্‌তে কতদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতো', তবু আমার সেই গঙ্গাতীরে ব'সে সেই গান শুন্‌তে ইচ্ছে হ'ত। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব আর সাংসারিক জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যের খাতিরে তা আর হ'য়ে উঠ্‌তো না ; অগত্যা তাকে যৎকিঞ্চিৎ দান ক'রেই আমাকে তেম্‌নি তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণে বাড়ী ফির্‌তে হ'ত, কোনও দিনবা চোখদুটোও অশ্রুসজল হ'য়ে উঠ্‌তো, অলক্ষ্যে একটী দীর্ঘশ্বাসও বুকটাকে তোলপাড় ক'রে দিয়ে বেরিয়ে আস্‌তো।

একদিন আমাদের সঙ্গেই এক বৃদ্ধ তাঁর তের বছরের একমাত্র কন্যা সবিতাকে নিয়ে ষ্টিমার থেকে নাম্‌লেন। তাঁর বাড়ী ছিল হ্যারিসন রোডের ওপরেই। ঘাটের উপর সেই বালকটি তখন গান গাইছিল; হঠাৎ বৃদ্ধদের দেখে তা'র গান থেমে গেল; আর সে একদৃষ্টে তাঁদের দিকে চেয়ে রইল মুখে সুর নেই—চোখের দৃষ্টি স্থির, কৌতুকপূর্ণ! যেন বহু পূর্ব্বে এদের সঙ্গে তার বড় নিবিড় পরিচয় ছিল। আফিসের বেলা হ'য়ে যাওয়ায় আমি তাড়াতাড়ি পথে নেমে আফিসের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চল্‌লুম।

সন্ধ্যার সময় ঘাটে ফিরে বড়, আশ্চার্য্য হ'য়ে গেলুম; একি! আমার সেই

* * * * *

প্রিয় গায়ক কৈ? মন যেন কেমন একটী অজানা দুঃখে ভারি হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু নিরুপায়—অগত্যা আমাকে সেদিন তা'র গান না শুনে এমনই হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরতে হ'ল। তার ৮।১০ দিনপরে একদিন একটু ঘুরে অফিস থেকে ফিরছি, দেখ্‌লুম, একটি বড় বাড়ীর গেটের কাছে আমার সেই গায়ক ব'সে তেমনি ক'রে আকুল উচ্ছ্বসিত স্বরে গান গাইছে; কিন্তু কৈ—আজ ত তেমন কেউ শ্রোতা নেই—সে আপন মনে গেয়ে চলেছে কেউ শুনছে কিনা সেদিকে তার লক্ষ্যই নেই। সে আপনার গানে আপনিই বিভোর!

কয়েকটী গান শুনে দুটি পয়সা দিয়ে বাড়ী ফিরলুম।

* * * * *

তিন দিনপরে সেইখান দিয়ে আবার চলেছি; দেখ্‌লুম সেই বাড়ীটী বেশ সাজান—দ্বারে দুটি পূর্ণ কুম্ভ, আর তার পাশে দুটি কলাগাছ। সান্ধ্য বাতাসের স্নিগ্ধ হিল্লোলে, ভিতর থেকে বহুনহবতের মধুর পূরবীঝঙ্কার আমার কাণে এসে বাজল! বুঝ্‌লুম—বাড়ীতে একটা কিছু উৎসব আছে।

সেই গায়ক আমার ঠিক সেই খানটিতেই ব'সে আছে; কিন্তু তা'র সেদিনকার সেই ম্লান চেহারা আর নিস্তেজ দীপ্তিহীন চোখের দৃষ্টি দেখে বোধ হ'ল যেন সে কত কালের দুঃখপীড়িত, রুগ্ন, শোকগ্রস্ত। আর গানেও তা'র তেমন উৎসাহ নেই। খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম—তার পর সে একটা গান ধ'রলে; কিন্তু একি? গলা যে তার একেবারে ভাঙ্গা;—আর গানের প্রতি মূর্চ্ছনায় কিসের এ গভীর বিপদ, প্রাণভরা আকুলতা উথ্‌লে উঠ্‌ছে? গানের প্রতি পর্দ্দা যেন পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ মানুষের কানে ঢেলে দিচ্ছে, গার

শুনে মনটা ভারি হ'য়ে উঠ্‌লো। ধীরে ধীরে সেই ব্যথিত ভারাক্রান্ত অন্তর নিয়েই বাড়ী ফিরলুম।

* * * * *

তারপর দিন সন্ধ্যার সময় আফিস থেকে ফিরছি; বিয়ে বাড়ীর সাম্‌নে দিয়েই চলেছি—বিয়ে বাড়ীর অবস্থা দেখে বুঝলুম বরক'নে বিদায় হ'য়েছে। লোকের ভিড় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে গেট্‌টী পেরিয়ে এসেই সহসা থম্‌কে দাঁড়ালুম। একি!—সাম্‌নেই-একটি কে উবু হ'য়ে প'ড়ে—দূরে গেটের ভেতর থেকে বাড়ীর কর্ত্তা অত্যন্ত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'লছেন—"বেটা মর্ব্বার আর জায়গা পেলেনা,—এখন গেটের সাম্‌নে মরা পড়ে থাক্‌বে; যা হ'রে, থানায় একটা খবর দিয়ে আয়।"

ভাল ক'রে চেয়ে দেখি—এরে সেই আমার সাধের গায়ক—আমার দুঃখহারী ব্যথাহারী দিনের শ্রান্তিনাশী শান্তিদারী সেই বালক গায়ক—যা'র গান শুনবার জন্যে কতদিন কত রাত ক'রে বাড়ী ফিরেছি—বাড়ীর অসুখ বিসুখ তুচ্ছ ক'রেও নিশ্চিন্ত মনে স্থির হ'য়ে ব'সে যা'র গান শুনে বিভোর হ'য়ে গিয়েছি। সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা মাখা—মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে ফুটপাথের উপর প'ড়ে আছে সে, মুখদিয়া তা'র অজস্র ফেনা গড়াচ্ছে—বুঝলুম এতা'র মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত! বুকের মধ্যে প্রাণটী যেন মুহূর্ত্তের জন্য একবার ধড় ফড় ক'রে উঠ্‌লো। সমস্ত দেহের মধ্যে দিয়ে একটী সঘন কম্পন তড়িদ্‌বেগে ছুটে গেল।

মনে মনে শুধু একবার ভাব্‌লুম—"এইত' জগতের গতি!"

বুকের অতৃপ্ত পিপাসা বুকে নিয়েই সে কলিকাতার ফুটপাথে শুয়ে এই সীমাহীন বিশ্বসংসার থেকে চিরবিদায় নিলে—শুধু পার্থিব জ্বালার অবসানে এক ফোঁটা স্নিগ্ধ শীতল শান্তিবারি সিঞ্চনে ব্যথিত তপ্ত হৃদয় জুড়োবার জন্য! তার সে দারুণ নিবিড় দুর্দ্দশার প্রতি—বুভুক্ষিত তা'র সে হৃদয়ের প্রতি—এ বিরাট বিশ্বের একটি প্রাণীও একবার ফিরেও চাইলোনা—একটিবার এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুও ফেল্‌লে না, একটি দীর্ঘশ্বাসও না;—তার অপরাধ—শুধু সে দীন, হীন, নিরাশ্রয় পথের ভিখারী! মাত্র এইটুকু!—

ইতি—

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

বৈশাখী পূর্ণিমা।

—:০:—

"আজ বৈশাখী পূর্ণিমা,—আজ ফুলদোল,—আজ ওলাই চণ্ডীর পূজা, উনার বারোইয়ারী"—এ সকল উক্তির মহিমা ও প্রভাব পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। সে ফুলদোলের মাধুর্য্য এখনকার যুবজনের কল্পনাতীত। তাই বৈশাখের নির্ম্মেঘনীল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের রজত পাশা বিকাশ দেখিয়া.

"মনে পড়িল রে আমার সেই ব্রজভূম"।

আমার সেই উল্লাস-উৎসবময়ী, পুষ্পাভরণভূষিতা বঙ্গভূমিকে,—পুরাতন বাঙ্গালা দেশকে ও জাতিকে মনে পড়িল। এখন ছেলেদের গলা ধরিয়া বলিতে হয়,—জান না, বাঙ্গালা যে এককালে ফুলের দেশ ছিল। এমন বারোমাস পুষ্পাভরণে ভূষিত ভূমি উত্তর ভারতে কুত্রাপি ছিল না। এই ফুলদোলের বাহার কলিকাতা হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাহা ফুটিত, তাহার শত অংশের এক অংশও নাই। রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের হ্যারিংটন ষ্ট্রীটের ভবনে আমাদিগকে একবার ফুলদোলের উৎসবে হাজির থাকিতে হইয়াছিল। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে খানসামা আসিয়া বলিল—"হুতার কাপড় পরিয়া ভিতরে যাইতে পারিবেন না, আমি কাপড় চাদর দিতেছি।" এই বলিয়া সে যুথিকার টানা-পড়েনে তৈয়ারী একখানা ফুলের কাপড় দিল এবং বেলার চাদর দিল। কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, সকলেরই এক সাজ—ফুলের ধুতী, ফুলের চাদর, ফুলের উত্তরীয়, ফুলের আভরণ অলঙ্কার, আর দুই ইঞ্চি মোটা নানা রঙের ফুলের কার্পেট বিছাইয়া তাহারই উপর কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তনের মহাজন পদ গান করিতেছে। এ ব্যবস্থা কেবল ইন্দ্রচন্দ্রেরই ছিল না, যাহার গৃহে নারায়ণ শিলা থাকিত, নিত্যসেবা হইত, তাহারই গৃহে ফুলদোল হইত। সেকালে প্রায় সকল গৃহস্থই শালগ্রাম-সেবা করিতেন, সুতরাং ফুলদোলের উৎসব ঘরে-ঘরে চলিত। তেমন, যুঁই ও বেলার গোড়ে এখন ত আর দেখিতে পাই না।—"চাই বেলা ফুল" এ ডাক কলিকাতায় যেন বন্ধ হইয়াছে। প্রত্যহ বৈশাখ মাসে বেলা ও যুঁই ফুলের টাটকা মালা প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে খরিদ হইত। এখন তেমন

ফুলের প্রাচুর্য্য নাই, কুসুমশোভায় শোভিত থাকিবার প্রবৃত্তিও যেন বাঙ্গালী হারাইয়াছে।

ফুল দোল।

ফুলদোলের বাহার ও ধুম ছিল—খড়দহে, শান্তিপুরে, নবদ্বীপে, গুপ্তিপাড়ায় ও কটোয়ায়। খড়দহে শ্যামসুন্দরের ফুলদোল একটা দর্শনীয়, ও উপভোগ্য ব্যাপার ছিল। বাঙ্গালার প্রতি গ্রাম এই সময়ে পুষ্পপূর্ণ থাকিত। এখনকার কয়টা ছোকরা মালতী এবং মাধবীর ব্রততী বিতান দেখিয়াছে? একটা মালতীর ঝাড়ে ও লতায় এক একটা কুঞ্জ তৈয়ার হইত, একটা মাধবীতে একটা বড় মাধবীকুঞ্জ তৈয়ার হইত। এখন মালতী ও মাধবী ফুলই অনেকে চিনিতে পারে না। অথচ আমাদের বেশ মনে আছে, কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর দুই ধারের প্রায় প্রতিগ্রামেই মালতী এবং মাধবীকুঞ্জ ছিল। সে পলাশের শোভায় আর গ্রাম পল্লীতে অনুরাগ রক্তিম বিভা ফুটিয়া থাকে না, আর সে কাঞ্চনফুল দেখিতে পাই না, নানাবিধ চম্পক বাজারে আসে না! ফুলময়ী বঙ্গভূমি অধুনা কুসুমশূন্যা। অতএব ফুলদোলের সে বাহার নাই, সে উল্লাসমদিরা-প্রমত্ত নর নারীর হাস্য কোলাহল নাই।

স্ত্রী-স্বাধীনতার

কথা ত খুব বল, এই বাঙ্গালায় বৈশাখ-মাসে পূর্ব্বে যেরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল, তাহার এক কণাও এখন থাকিলে বিদেশী অবাক্ হইয়া তাকাইয়া দেখিত। এই বৈশাখে মালদহ জেলায়

গম্ভীরার নাচ

হইত, এখনও হইয়া থাকে। যে গম্ভীরার নাচ দেখে নাই, গান শুনে নাই, সে বাঙ্গালী জীবনের অতি সুখের একটা ছবি দেখে নাই। এই বৈশাখের "চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনীতে" দক্ষিণ বাঙ্গালার ও বাঢ়ের

ছাঁও-ছুঁই

খেলার উন্মাদনা যে দেখে নাই, সে তালে-তালে নাচ ও অপর পক্ষের নরনারীর ছায়া স্পর্শের চেষ্টার উল্লাস যে উপভোগ করে নাই, সে আসল বাঙ্গালীকে চিনে না। এই বৈশাখে পুষ্পমাল্যভূষিত হইয়া, রজত-নূপুর চরণে চড়াইয়া, মণিপুর ও পূর্ব্ববঙ্গে

চৌ-গেণ

খেলা হইত। পলাশকাটের কন্দুকে অগ্নি ধরাইয়া লাল লোহার রঙে রঞ্জিত ম্যালেট ধরিয়া, তালে তালে বাঙ্গালী নরনারী ঘোর নিশাকালে এক-প্রকারে "পোলো" খেলিতেন, ঘোড়ায় চড়িয়া খেলিলে তাহাকে পোলো বলিত, আর শুধু চরণের উপর ভর করিয়া খেলিলে সে খেলাকে চৌগেণ খেলা বলিত। এখনও মণিপুরে এই খেলার প্রচলন আছে, বাঙ্গালা ছাড়িয়াছে। এই সকল বৈশাখী খেলার—কুসুম উল্লাসের একটা বর্ণনা রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর তাঁহার একখানা নাটকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া উত্তর বাঢ়ের

ভাদোর নাচ

এক অপূর্ব্ব নৃত্য ছিল। উহা বর্ষাকালে, শ্রাবণী পূর্ণিমা বা ঝুলনযাত্রার সময় হইতে আরম্ভ হইত এবং পিতৃপক্ষের পূর্ব্বেকার পূর্ণিমায় শেষ হইত। কথাটা বলিলে হয় ত অনেকে চমৎকাইবেন যে, আশী বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার গৃহস্থঘরের কিশোর কিশোরী বেশ নাচিতে ও গান করিতে পারিত, এবং এই সকল উৎসবে অবাধে যোগ দিত। ইদানীং বাবু মহলে ডাক্তার ভগবদ্ধু বসু এবং ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নৃত্যবিদ্যায় পটু ছিলেন; তাঁহারা আসরে রাজিন থাকিলে অনেক নর্ত্তকী সহসে নৃত্য করিত। লক্ষ্ণৌয়ের "কথকবিন্দা" দুই ভাই নৃত্যকলায় অসাধারণ পটুতা দেখাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার কবিওয়ালাদের মধ্যে হারু, বঞ্চন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নর্ত্তক ছিল। আমরা ইহাদের অনেকের নাচ দেখিয়াছি। নাচ-গান আনন্দ উল্লাস ত সুখের পরিচায়ক—স্বাস্থ্যের দ্যোতক। সে স্বাস্থ্য নাই, সে সুখ নাই, তেমন সুদোলের আনন্দ উৎসব নাই। আছে কেবল ঘেটু ফুল এবং বাবু জাতীয় পুরুষ!

গৌতম পূর্ণিমা।

আজি হাজার বৎসর পূর্ব্বে, এই বৈশাখী পূর্ণিমায় কপিলাবস্তু নগরে সিদ্ধার্থ শাক্য সিংহ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই এই পূর্ণিমার উৎসব বৌদ্ধ জগতে খুব সাগ্রহে হইয়া থাকে। বাঙ্গালার বজ্রযানী বৌদ্ধগণ এই পূর্ণিমায় ওলাইচণ্ডীর পূজা করিতেন। উলা নগরের বৈশাখী চণ্ডীর উৎসব তাহারই শেষ নিদর্শন। উলার বারোইয়ারী এবং বৈশাখী উৎসব তাই দক্ষিণ বাঙ্গালার সকলের উৎসব ছিল। উলার ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যাইয়া

বারোইয়ারীর চাঁদা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। এ সময়ে অনেকেই উলায় যাইয়া উৎসবে যোগ দিতেন। সে বারোইয়ারী নাই, সিদ্ধার্থের জন্মদিনের পৌর্ণমাসীর উল্লাস-আনন্দও নাই। বৈশাখ মাসে বাঙ্গালা দেশটা যেন উৎসবে মাতিয়া থাকিত। তালের রস (তাড়ী নহে—টাটকা তালের রস) পান, দেহে অগুর চন্দন প্রলেপ এবং পুষ্পালঙ্কারের প্রাচুর্য্য এই বৈশাখে ঘটিত। বালিকা হইতে কিশোরী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী কুলকামিনী নূতন নারিকেল ফুলের অলঙ্কার পরিত এবং কদম্ব বা পলাশের বা বকুলের ডালে দোলা টাঙ্গাইয়া দোল খাইত। কবি বঙ্গকিশোরীর রূপ বর্ণন করিতে যাইয়া বলিতেছেন যে, দোলায় দুলিতে দুলিতে বঙ্গনারী এক একবার নীল আকাশের দিকে ছুটিয়া উঠিত, অপ্সরাদিগের কেমন রূপ তাহা দেখিবার অনুসন্ধিৎসায় তাহারা ছুটিয়া উঠিত, নবসজল জলদ দামের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যাই বিদ্যুদ্দাম ঝলসিয়া উঠিত, অমনি তাহারা স্বর্গের অপ্সরার রূপের ঝলক দেখিয়া ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া আসিত এবং ফিরিবার মুখে স্বর্গীয়াদিগকে শ্রোণীভারের অপূর্ব্ব গঠন দেখাইয়া লজ্জা দিত। এমন অনেক পুরাতন কবিলিখিত বঙ্গমহিলার রূপের বর্ণনা আছে। হায় সে রূপ, হায় সে সুখ ও স্বাস্থ্য! এখন বাঙ্গালী নারী যেন তাসের বিবি, কোমর নাই, শ্রোণীভার নাই, উরস নাই, বাহুলতা নাই। বাঙ্গালী পুরুষেরও সে রূপ নাই; শেষ রূপবান্ বাঙ্গালী ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন, রাজা চন্দ্রনাথ ও আনন্দনাথ। এখনকার বাঙ্গালী নরের আকার অনেকটা দুস্থকায় বাঁঠালের মতন, মাথা ছোট, বুক ছোট, উদর হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত বিষম স্ফীত। ঠিক যেন একটি মেথরের বালতির নীচের দুইটা শীর্ণপদ এবং উপরে দুইটা বাখারীর বাহু লাগাইয়া রাখিয়াছে। এমন নর-নারী নাচিতে পারে না, হাঁটিতে পারে না, কন্দুকে ক্রীড়া করিতে পারে না, সন্তরণেও পটু নহে। আমোদ উল্লাস করিবে কে? তাই বাঙ্গালায় "ফুলদোল" নাই, খেলা-ধূলা নাই, আমোদউল্লাস নাই,—আছে কেবল বাড়ী, গাড়ী, দাড়ী, চশমা ও ছিপছিপে ছড়ি! সে ফুল বাগান নাই,—আছে কেবল ঘেটু ও বাকস, নোনা বন এবং কচু বন! কোথায় সিদ্ধার্থ, কোথায় বা শ্রীচৈতন্য আর কোথায় বা পূর্ণিমাপঞ্চের মহামহোৎসব। কোজাগর, রাস. দোল, বৈশাখী ও শ্রাবণী পূর্ণিমার উল্লাস হলাহল করিবে কে? তাই—

"মনে পড়িল রে, আমার সেই ব্রজভূম!"

"চুড়ি লিবি গো ?"

"চুড়ি লিবি গো"—যখন বাবুরা আফিসে থাকেন, কলিকাতার অলিতে-গলিতে জনমানবের গতাগতি বিরল হইয়া উঠে তখন স্থূল-মাংসল, ঘনঘোরকৃষ্ণ-কায় নারীবিশেষ নিদাঘ রৌদ্রের তাপে তাহার চর্ম্মবর্ণ বিভাকে বেগুনিয়া রঙে ফুটাইয়া তাম্বুলরাগরঞ্জিত স্ফীত অধরৌষ্ঠের পার্শ্বের মিশি-মাখা একজোড়া দন্ত-পাতির বাহার বিকাশ করিয়া চুড়ির কিরি করিয়া বেড়ায়। তাহার কণ্ঠ ধ্বনিও অপূর্ব্ব ; অশ্রুতপূর্ব্ব এবং অননুকরণীয় ; সে কণ্ঠারাবে বীণাবাদিনীর সপ্তস্বর যেন পুরতন সেতারের ভাঙ্গা মেরজাব-ঝঙ্কৃত জিলে আওয়াজে ক্ষণে ক্ষণে বাহির হইয়া থাকে। "নারী বিশেষ" বলিয়াছি, তাহার হেতু এই যে, আকারে-প্রকারে ভাষায় ভঙ্গীতে এ নারীর জাতি নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সে বাঙ্গালাও বেশ বলে, হিন্দী ও উর্দ্দুর আমেজে শ্রুতিমধুর, আর কোটরগত নয়নযুগলের বিলোল কটাক্ষ বিক্ষেপ বঙ্গমহিলার বিশিষ্টভাব স্তোতনা করে, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানী নারীর চটুলচাটুপটুতার পরিচয় দেয়।

"চুড়ি লিবি গো"—আ মরি মরি! কেমন কড়ি মধ্যমের বিকাশ! এ স্বর-বিন্যাসে চাতুরী এবং মাধুরী 'ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ"—হিসাবে শ্রোতার মনে যেন প্রয়াগসঙ্গমের ইঙ্গিত করিতেছে। এ স্বর মাধুরী শ্রবণ করিয়া একবার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মজিয়াছিলেন, আর আজ "ভবনদীর পারে এসে বিড়াল বসেছেন আফ্রিকে" হিসাবে অন্তদন্তহীন, শুষ্ককর্ম্মদার দেহযষ্টি লইয়া আমাদিগকেও ফিরে-ফিট্টি জীবন খেলা খেলিবার আশায় নূতন করিয়া আচমন করিতে ইচ্ছা করে! হাঁক—ডাক,—আবার গাও, ঐ মিঠে কড়ি মধ্যম ফুটাইয়া, বুলবুল পোস্তার কল্লোল-কোলাহলকে পরাজয় করিয়া সোহিনী-সোহাগিনী আবার গাও—চুড়ি লিবি গো! কলিকাতার রাজপথ তোমার কণ্ঠমাধুর্য্যে মুখর হইয়া উঠুক!

খটাখট—ফটাফট! অমনি গলির দুই ধারের দোতালা বাড়ি সকলের সদর দরজা খুলিয়া গেল, কোনটা বা অর্দ্ধ আবৃত রহিল। এক গৃহের দ্বার সম্মুখে এক সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা, একটি পঞ্চম বর্ষের দিগম্বর বালকের হাত ধরিয়া "চুলীবালী, এ বালিতে আয়" বলিয়া ডাক দিল। একটা কবাট ভেজান, অন্যটা একটু

খোলা এক দরজা ফাঁক হইতে সিন্দুর বিভাসমুজ্জল সীমন্তের সিকি অংশ বিকাশ করিয়া সচকিত নেত্রে এক কিশোরী ডাকিলেন—"ওরে এই বাড়িতে আয়! তোর ত সব দেশী চুড়ি? ঘেসো কল চুড়ি আছে?" এই কথা শেষ করিয়াই কিশোরী চন্দ্রবদনকে কবাটরূপ মেঘের আড়ালে শরতের চাঁদের মত চকিতে লুকাইয়া কোকাধ্বনিপরাজয়ী তীব্র কণ্ঠে আব্দারের সুরে বলিয়া উঠিলেন—"এস না মা! কেবল শুয়ে থাক্‌বেন! হ্যাঁ! আমার যে চুড়ি নাই।" স্থূলোদরী চুড়িওয়ালী দুই কবের পাশ দিয়া মুচকি হাসির বিদ্যুদ্দাম ছুটাইয়া সর্ব্বাগ্রে কিশোরীর দ্বারস্থ হইলেন। গলির অপর পার্শ্বের কবাট পাট-খচিত গৌরাঙ্গ দিগম্বর বালক বিরক্তির চিৎকার করিয়া বলিল—"আমার কাছে আয়, চুলী পল্‌বো। দাদী, চুলীবালী আস্‌ছে না।" বালকের সরল উদার আহ্বান কৃষ্ণকায়া কোমলাঙ্গীর স্থূলচর্ম্ম ভেদ করিয়া হৃৎক্ষেত্রে পঁহুছিল না।

চুড়ি কি?

আজকালকার যুবজন জানেন কি, চুড়ি কিসের নিদর্শন? চুড়ি Co-operation এর নিদর্শন। স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য, ধনী ও দরিদ্র, নর নারী ও এই যুগের মধ্যে Co operation ফুটাইবার এবং বজায় রাখিবার চুড়িই একমাত্র চিহ্ন। চুড়ি পরিতে বিক্রেত্রীর জাতি বিচার কেহ করে না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কিশোরী গামছা পরিয়া অর্দ্ধনগ্না হইবে, সেও করুল, তথাপি চুড়ি পরিবেই। চুড়ি যে তাহার এয়োতির লক্ষণ। দরিদ্র চুড়িওয়ালী তাহার কর্কশ কঠোর করে কোটীধনীর শতচাঁদ নিঙড়ান সুধা পুঞ্জীকৃত, নিরীহবোধে করযুগলের মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া সেই পুঞ্জায়মান নবনীতের যাজ্ঞ যাজ্ঞে চুড়ি পরাইয়া দেয়। তমাল না পাইলে যেমন মাধবীলতা ভূতলে বল্লরী বিস্তার করিয়া শোভা ফুটায় না, তেমনই মনের মতন মানুষ না মিলিলে, পতিদেবতার শীতল ঘটচ্ছায়ায় না দাঁড়াইলে নারীজীবন ধন্য হয় না, পতিদেবতার দেবী ইনি,—এ বার্ত্তা ঘোষণা করে চুড়ি। চুড়ি বর্ণ গৌরব বাড়ায়। সবুজ, কালো লাল চুড়ি দুই মণিবন্ধের চম্পক রাশির বর্ণ গৌরব ফুটায় না কি? সোণার সোণা মিশিয়া যায়—সোণার চুড়ির দীপ্তি হাত দুইখানির কনক-বর্ণদ্যুতির সাগরে যেন ডুবিয়া যায়! কিন্তু কাচের চুড়ি যে অঙ্গে থাকে সে অঙ্গের বিভা ফুটাইয়া তোলে। অতএব চুড়ি co-operation এর নামান্তর মাত্র।

চুড়ি—CO-OPERATION.

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশীর আমলে চাকাই শাখার খুব প্রচলন হইয়াছিল। গুরুদেব

সুরেন্দ্রনাথ তখন জেলায় জেলায় ঘুরিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি চুড়ি ভাঙ্গা সংগ্রহ করিতেন। চুড়ি কাচ—বিদেশীয় সামগ্রী অতএব ভাঙ্গ চুড়ি। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"তুই কাচ পেয়ে কাঞ্চন হারালি, ছিঃ ছিঃ মন তোর কপাল পোড়া" তাই; তখন কাঞ্চন পাইবার আশায় বঙ্গ মহিলাকুল করধৃত কাচ দূরে ফেলিয়াছিলেন। কালচক্রের আবর্ত্তনে আবার চুড়ির ফিরি আরম্ভ হইয়াছে। যে কাচের বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজ বাঙ্গালাকে সর্ব্বাগ্রে বাঁধিয়াছিল, আবার তাহারই ফিরি আরম্ভ হইয়াছে। এ চুড়ির ফিরি করিতেছে তাহারা, যাহারা পনর বৎসর পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়াছিল। কালের মহিমাই এমন। বলয় সমাহারে শৃঙ্খলের উৎপত্তি হয়, শৃঙ্খলই বন্ধনের উপযোগী। চুড়ি বলয়াকার—কাচ-বলয় এবং বলয় সমাহার বটেও। অতএব চুড়ি Co-operationএর প্রতীক। এ চুড়ি পরিবে কে? নবীনা কিশোরী, নবীন নাগরা। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গবাতে যে নবীনা বাবু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, উহা তাহাদেরই মণিবন্ধ ভূষা হইবে। নব নব যে "নিতুই নব"—এই নবীন বাবু জাতি নিতুই নব, জনে জনে আকারে প্রকারে বসনে-ভূষণে স্বতন্ত্র। উহাদের হাব-ভাব চলন বলন নিতুই নব। উহারা কাচ মূল্যে সত্যই কাঞ্চন বেচিয়াছে। গৃহে সোণার আচড়টি নাই, অথচ বসনবিন্যাস অতিমাত্রায় অধিক। চুড়ি ইহারাইত পরিবে। কিন্তু হিন্দু মহিলার হাতে চুড়ি পরা ত সোজা নহে, ঠাকুরাণীর অনুমতি চাহি। ঠাকুরাণী যে নিদাঘের দ্বিপ্রহরে সুখশয়নে শায়িতা। চুড়ি পরা ত সোজা নহে, কাপড় ছাড়িয়া, গামছা পরিয়া তবে হাতখানি আগাইয়া দিতে হইবে। পারিবে কি? ঐ শুন, চারিদিক্ হইতে "চুড়ি পরিবি গো" আবার ধ্বনিত হইতেছে। চুড়ির ফিরি করিতে সবাই উদ্যত; খোদ বড়লাট হইতে ছিষ্টে পরাণে পর্য্যন্ত সবাই কোমর বাঁধিয়াছে। চুড়ি পরার তিন স্তর আছে—প্রথম মুখোমুখী হইয়া উপবেশন, দ্বিতীয় পাণিগ্রহণ, তৃতীয় জোর করিয়া হাত টিপিয়া ধরিয়া চুড়ির অনুপ্রবেশন। সে টেপনে হয় ত বা অনেকবে কাঁদিতে হইবে, কাহারও কাহারও হাত কাটিয়া শোণিত নির্গলিত হইবে। পারিবে কি এমন চুড়ি পরিতে? একবার চুড়ি নবীর খাঁজে বসিলে, কাপে কাপে জাতিয়া বসিলে Co-operation ভরপুর হইবে। পারিবে কি? ঐ শুন পেশোয়র হইতে পাবনা পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে রব উঠিয়াছে,—

"চুড়ি লিবি গো!"

সভার উদ্বোধন। *

এই জেলারই পল্লীমাঝে
বিদ্যাসাগর দয়ার অবতার
জন্মেছিলেন পুরুষ প্রধান—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান গো বিধাতার।
তাঁর জীবনের পুণ্য প্রভা
পুণ্যস্মৃতি—বলয় সম ফিরে
এই স্থানেরই লতাপাতা
ধূলা মাটী—আশীষ দানি' ফিরে!
ছিলেন নাক' কেবল তিনি
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর নাম,
ছিলেন নাক' কেবল তিনি
যোগী গৃহী অশেষ গুণধাম,
ছিলেন নাক' কেবল দাতা
স্বাধীনচেতা সমাজ সংস্কারক,—
ছিলেন তিনি বাংলা ভাষার
আদি গুরু সাহিত্যসাধক!
যতই কেউ আজ উচ্চস্বরের
হ'ক না কবি, হ'ক না সাহিত্যিক
কবির কবি, ঔপন্যাসিক
অস্বীকার কেউ করবে নাক ঠিক্
সবাই তাঁহার কাছে ঋণী,
মহাঋণী সবাই তাঁহার কাছে
তাঁহার চরণ ধূলির স্পর্শে
'সাধনারে' ধন্য করিয়াছে!
তাঁই আজ্‌কের এই শুভদিনে
আত্মা তাঁহার ঊর্দ্ধলোক ঐ হ'তে
'সম্মিলনকে' স্বস্তিযুক্ত
সিদ্ধিযুক্ত করুক বিধিমতে!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ,

* মেদিনীপুর জেলার 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে' পঠিত।

৺ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(জীবনী-প্রসঙ্গ।)

সূচনা

যে সকল প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর প্রাণপাত পরিশ্রমে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিয়াছে—দৈব-প্রেরণার প্রভাবে প্রভাবান্বিত যে সকল মনস্বী বাঙ্গালীর সভক্তি বঙ্গসাহিত্য-সেবায় কথা-সাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে, সেই সকল মনস্বী বাঙ্গালীর মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা বঙ্গসাহিত্য-প্রতিভার জাগরণের উদ্বোধক ছিলেন, তারকনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম। যখন টেক-চাঁদের ললিত লেখনী আলালী-কথা শেষ করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে—যখন টেকচাঁদী কল্পনা অধ্যাত্মচিন্তায় বিভোর—যে সময় গুপ্ত কবির স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী কল্পনা, সরস ও তীক্ষ্ণ পরিহাস রচনার স্রোতে ভাটা পড়িয়াছে, যে সময়ে মধুসূদন নানা দেশীয় কাব্য-কুসুম হইতে মধুসংগ্রহ করিয়া অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করিয়াছেন—যে সময় বাঙ্গালা দেশ দীনবন্ধুর হাসির স্রোতে ভাসমান, যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যাকাশে উদিত, ঠিক সেই সময়ে অজস্র হাসি অশ্রুর প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া প্রতিভাশালী সাহিত্যশিল্পী তারকনাথ বঙ্গসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন।

ইতিহাসে এমন এক একটী বিচিত্র জীবনী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া বিশেষত্ব ও অপূর্ব্বত্বে সাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করেন। তারকনাথের জীবন অধ্যায় আলোচনা করিলে আমরা এইরূপই অসাধারণত্ব ও অপূর্ব্বত্ব দেখিতে পাই।

ইতি-কথার সহিত জীবন-কথার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইতিহাসে জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের উন্নতি ও কীর্ত্তিকাহিনী আলোচিত হয়, যাঁহারা সেই উত্থান-পতনের সংগ্রামে সাহায্যকারী ও সংশ্লিষ্ট, জীবন-কথায় তাঁহাদেরি কীর্ত্তিকলাপের কথা আলোচিত হয়। "যাহারা শক্তির প্রসাদাৎ কিম্বা সাধনার বলে আপনার

জীবনকে বহুজীবনের সহিত মিলাইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা জীবনের অমৃত বিলাইয়া কি আলেখ্য দেখাইয়া মনুষ্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে উপরে তুলিয়াছেন, তাঁহারা সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও আমাদের মধ্যে সতত উপস্থিত। পৃথিবী তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যার পদ্মাসন, শ্মশান তাঁহাদের স্বর্গারোহণের সোপানমঞ্চ"। *

যিনি অর্দ্ধশতাব্দীকাল বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া আছেন, যাঁহার স্বর্ণলতা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস—সেই প্রতিভাশালী কালজয়ী সাহিত্য-শিল্পীর জীবন-কথা আলোচনার যোগ্য। স্বর্ণলতার মত সৌভাগ্য অপর কোন সামাজিক উপন্যাসের অদৃষ্টে ঘটে নাই। স্বর্ণলতা প্রকাশিত হইবার পর বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে স্বর্ণলতাকে আদর্শ করিয়া বৎসর বৎসর কত শত সহস্র উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; উপন্যাসক্ষেত্রে, তারকনাথের প্রভাব কিরূপ অপ্রতিহত, ইহা হইতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বর্ত্তমান উপন্যাস-ক্ষেত্রে তাঁহারি স্বর্ণলতার যুগ চলিতেছে।

যাঁহারা প্রতিভামাহাত্ম্যে বিশ্ব-সাহিত্যে আসন লাভ করিয়াছেন, জাতি-বিশেষে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা বিশ্বলোকে পুনর্ব্বার দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন—যাঁহারা দেশকালের সঙ্কীর্ণ সীমাচক্র অতিক্রম করিয়া নিরবধিকাল বিপুলা পৃথিবীতে আপনার বাস্তুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, দেশবিদেশ তাঁহাদিগের স্মৃতিসংস্থাপনে কৃতপরিকর না হইলেও অনিষ্ট হয় না, বিপুল মানবহৃদয় কোন না কোন প্রতিভাগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রীতি-পদ্মাসন দিয়াছে; পাত্রবিশেষের সঙ্কীর্ণ অনভিমত কিংবা অনভিরুচিজনিত চেষ্টা-চর্চ্চায় তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই। আমাদের বাল্মীকি, ব্যাস কিংবা কালিদাস এইরূপে দেশকাল জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া সাহিত্যের অমরলোকে বাস করিতেছেন এবং ব্যক্তিগত রুচিচর্চ্চার সমক্ষে অদৃশ্য হইয়া আছেন। †

ইংরাজ আগমনের ফলে—ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের ফলে, বাঙ্গালীর সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক জীবনে নূতন আদর্শ, নূতন আকাঙ্ক্ষার স্রোত প্রবাহিত হয়, এই নবভাবের সূচনার ফলে বঙ্গ-সাহিত্য নবতরঙ্গে ভাসমান। ইংরাজ প্রভাবের বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই। যখন সে

---

* স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

† শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন প্রণীত বঙ্গবাণী।

ইতিহাস লিখিত হইবে—"তখন দূরস্থ দর্শকের দৃষ্টিপথে যেমন মার্ত্তণ্ডোদয়স্থ-কালে অরুণরাগরঞ্জিত সমুচ্চশৈলশিখরাবলীই পতিত হয়, তেমনি দূরস্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিপথে যে সকল বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-গৌরবোজ্জ্বল নাম পতিত হইবে, তাঁহাদিগের অন্যতম—'তারকনাথ'।

যশোহরের কথা।

জন্মভূমি।

শৌর্য্যবীর্য্যকীর্ত্তিগাথায় মুখরিত, পণ্ডিত-সাধু-ভক্তের লীলাভূমি, কবিত্ব কবি-প্রতিভায় আলোকিত যশোহর জিলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমাস্থ অধীন বাগআঁচড়া গ্রামে স্বর্ণলতা-প্রণেতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। * বাগআঁচড়া প্রসন্নসলিলা বেত্রবতীর তীরবর্ত্তী; বেত্রবতী ভৈরবের শাখা; ভৈরব যশোহরের উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে বহিয়া মধুমতীর সহিত মিশিয়াছে। ভৈরবের শাখা বেত্রবতী কপোতাক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া যাদবপুর, খুলনা অতিক্রম করিয়া কাকপাশার নিকট কপোতাক্ষের সহিত মিশিয়াছে।

মহাপুরুষগণের প্রতিভার পুণ্যালোকে দেশ আলোকিত হয়। তাঁহাদের জনক জননীর নামের সঙ্গে তাঁহাদের জন্মভূমিও অমরত্ব লাভ করে। এই জন্যই মার্কিন ঋষি ইমার্শন বলিয়াছেন—

"The race goes with us on their credit. The knowledge that in the city is a man who invented the rail road, raises the credit of all the citizens."†

এই জন্যই আজ কবিবর জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব, চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নান্নুর, সাহিত্যিকের—ভক্তের চক্ষে তীর্থক্ষেত্ররূপে বিরাজিত। চির-স্মরণীয় কাশীরাম, কৃত্তিবাসের জন্মভূমি শিঙ্গি ও ফুলিয়া গ্রাম সাহিত্যিকের

* নলীয়া হইতেই তারকনাথের জন্ম স্থান বাগগ্রাম ১৮৮২ খৃঃ অব্দে নড়াইলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গেজেটিয়ার পাঠে জানা যায় যে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যখন খুলনাকে যশোহর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র জিলায় পরিণত করা হয়, সেই সময় বনগ্রামকে মহকুমায় পরিণত করিয়া যশোহরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই সময় হইতে তারকনাথ যশোহরবাসী বলিয়া পরিচিত এবং আমরা তাঁহাকে যশোহরের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

† Representative men—Uses of great men.

নিকট পুণ্য সাহিত্য-পীঠস্থলে পূজিত। এই কারণেই আজ বাঙ্গালীর নবযুগের আদিপুরুষ, নবতরঙ্গের অগ্রদূত, রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগর গ্রাম দেশবাসীর শ্রদ্ধার ও গৌরবের স্থল। এই জন্যই আজ কাঁটাল-পাড়ায় বঙ্কিম-সম্মিলনী—যশোহর সাগরদাঁড়ীতটে মধুমেলা—মূলাযোড়ে ভারত-চন্দ্রের মেলা;—সেনহাটীতে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হইতেছে।

একদিন যশোহরজননীর প্রিয়সন্তান, বাঙ্গালার শেষবীর প্রতাপাদিত্যের শৌর্য্য-বীর্য্যের যশোগাথায় দেশ মুখরিত হইয়াছিল, একদিন ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের সাধনা-প্রেম-ভক্তির প্লাবনে যশোহর ভাসিয়াছিল, একদিন ভক্তপ্রবর অসাধারণ বিদ্বান্, জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য গোস্বামী ভ্রাতৃযুগল রূপ ও সনাতনের অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রভায় যশোহর আলোকিত হইয়াছিল—আর এযুগে কবি-কুলচূড়ামণি মাইকেল মধুসূদনের, মহিলার কবি স্বরেন্দ্রনাথের, গীত-রচয়িতা বিখ্যাত মধুকিন্নরের, ঔপন্যাসিক স্বনামধন্য তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বদেশ-প্রেমিক, ভক্ত শিশিরকুমার প্রভৃতি সুসন্তানগণের যশোমাল্যে যশোহর মণ্ডিত।

প্রতিভাশালী মহাপুরুষগণের জীবন ও চরিত্রগঠনে বংশপ্রভাব ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ সাহায্য ও প্রভাব বিস্তার করে, তাহা দেখিবার বিষয়। প্রতিভাশালী তারকনাথের চরিত্রের ও প্রতিভার মূল্যনিরূপণ করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে কিরূপ বংশবীজে—কিরূপ বংশের বিকাশ ধারায় পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অবস্থার অনুকূল সাহায্যে তারকনাথের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই বংশবীজের আধার পূর্ব্বপুরুষগণের কথা জানিতে হইবে।

তারকনাথের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি বাসস্থান ও তাঁহাদের কথা।

গাঙ্গ বংশ।

বংশ পরিচয়।

তারকনাথের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি বাসস্থান যশোহর নহে; "বিক্রমে বিক্রমপুর ছিল যে বিক্রমপুর"—যে বিক্রমপুরে বাঙ্গালী তাহার অতীত জীবনে জ্ঞান, মনীষা, শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল—সেই অতীত গৌরব স্মৃতির

শ্মশান বিক্রমপুর তারকনাথের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস। ইঁহাদের বংশ সুপ্রসিদ্ধ বেগের কুলীনবংশ। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেগে গ্রামটী কুলীনের দুর্গবিশেষ।

গাঙ্গবংশের আদিপুরুষ রাঘবের প্রপৌত্র ইন্দ্রনারায়ণ বিক্রমপুরের বাস উঠাইয়া নদীয়ায় আসিয়া বসবাস করেন। ইন্দ্রনারায়ণ অতিশয় সুপুরুষ সঙ্গীত-বাদ্যকুশলী ছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে যেরূপ দেহ-সৌন্দর্য্যের অধিকারী করিয়াছিলেন, তেমনি মানসিক সৌন্দর্য্য ও প্রতিভামণ্ডিত করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ কুলীনের দুর্গ বিক্রমপুর ত্যাগ করিয়া কিরূপে নদীয়ায় আসেন, আমরা নিম্নে সেই কথা বিবৃত করিতেছি।

বাগআঁচড়ার চৌধুরীদের কথা।

নদীয়া জিলার বাগআঁচড়ার চৌধুরী বংশ প্রবল পরাক্রান্ত ও ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। চৌধুরীদের অসামান্য প্রতাপ, পরাক্রম, যশঃ ও ঐশ্বর্য্যখ্যাতি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহাঁদের গুড় উপাধি ছিল; সাধারণতঃ ইঁহারা খাঁ চৌধুরী নামে পরিচিত ছিলেন। চৌধুরীরা রাজা উপাধি-মণ্ডিতও ছিলেন। ইতিহাস-বিখ্যাত রামচন্দ্র খাঁ এই চৌধুরীবংশীয়; ইতিহাসে রামচন্দ্র খাঁ রাজা বলিয়াই কথিত। আধুনিক বেনাপোল হইতে উত্তর মুখে গেলে চৌধুরীদের বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে মহারাষ্ট্র ও পিণ্ডারিগণের অত্যাচারে বাঙ্গালা দেশ উৎপীড়িত হয়, সেই সময় ইতিহাস-বিখ্যাত রাজা রামচন্দ্র খাঁ অমিতবিক্রমে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যেরূপ শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই তাহা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন।

চৌধুরীরা শ্রোত্রীয় শ্রেণীর। ইঁহাদের গুড় দোষ ছিল। তৎকালে শ্রোত্রিয়গণ কুলীনের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলে, আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন। কুলীনদিগের চারি ঘেল বরা, ফুলে, খড়দহ, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী। চৌধুরীরা খড়দহ মেলের একটী সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন; কিন্তু মনোমত সুপাত্র মিলিতেছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইন্দ্রনারায়ণ সুপুরুষ দিব্যকান্তি, সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতবিশারদ। সঙ্গীতালোচনার জন্য ইন্দ্রনারায়ণের যশঃ দেশবিদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে এতাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার

সমকক্ষ কলাবিৎ কেহ ছিল না। দেশ বিদেশ হইতে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীরা আসিয়া তাঁহার নিকট নানা-বিধ শিক্ষা করিত। সঙ্গীতালাপের জন্য তৎকালীন গুণজ্ঞ রাজন্যবর্গের বাটীতে ইন্দ্রনারায়ণের নিমন্ত্রণ হইত এবং তাঁহারা তাঁহার সঙ্গীতালাপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কারে সম্মানিত করিতেন। দেশবিদেশে গুণীগুণজ্ঞগণের নিমন্ত্রণরক্ষার্থ তাঁহাকে প্রায়ই বিদেশে গমন করিতে হইত। বাগআঁচড়ার চৌধুরীরাও এক সময়ে নিজ বাটীতে আহ্বান করিয়া কলাবিৎ ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গীতালাপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সবিশেষ পরিচয় গ্রহণ করেন। বহু অনুসন্ধানে যখন মনোমত কুলীন সুপাত্র মিলিল না, অবশেষে চৌধুরীরা নৈকষ্য কুলীন সুগায়ক প্রিয়দর্শন ইন্দ্রনারায়ণকে মনোনীত সুপাত্র স্থির করিয়া তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্থির বিক্রমপুর হইতে বিবাহের জন্য তাঁহাকে আনয়ন করা মহা দুঃসাধ্য ব্যাপার; কুলীন-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণ কুলমর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া কখনই শ্রোত্রিয়-কন্যা বিবাহ করিবেন না। চৌধুরীরা এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, পুনরায় তাঁহাকে সঙ্গীতালাপের ব্যপদেশে কৌশলে বাগআঁচড়ায় আনয়ন করিয়া বীয় কন্যা পাত্রস্থা করিবেন। ইন্দ্রনারায়ণের নিকট নিমন্ত্রণপত্র লইয়া একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী প্রেরিত হইল। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীদের নিমন্ত্রণপত্র সাদরে গ্রহণ করিয়া সপারিষদ নৌকাযোগে বিক্রমপুর হইতে নদীয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন।

পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও সকলে একবাক্যে প্রিয়দর্শন সুকণ্ঠ কলাকুশলী ইন্দ্রনারায়ণের স্বর-মাধুর্য্য-লীলার প্রশংসা করিতে লাগিল। চারিধারে ধন্য ধন্য রব উঠিল। ইন্দ্রনারায়ণ তৎপর দিবস চৌধুরীদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে চৌধুরীরা তাঁহাকে মন্ত্রণাকক্ষে লইয়া গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কুলীনশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণের সহিত গুড়দোষভাবাপন্ন শ্রোত্রীয়কুমারীর বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া ইন্দ্রনারায়ণ বিস্মিত ও রাগান্বিত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ অকুতোভয়ে মহা-প্রতাপশালী জমিদার চৌধুরীদের সম্মুখে সব্যঙ্গে বলেন, আপনারা কি আমাকে নয়শত নিরানব্বই টাকা দেবেন যে, আমি কুলীন হইয়া শ্রোত্রিয়কন্যা বিবাহ করিব? চৌধুরীরা তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রনারায়ণের প্রস্তাবে সম্মত হন; অধিকন্তু জমিদারী দান করিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। তৎকালে নয়শত নিরানব্বই টাকা বড় সামান্য অর্থ নয়; একজন শ্রেষ্ঠ ভূস্বামীর শ্রেষ্ঠ জমিদারী বিশেষ বলিয়া আমাদের মনে হয়। ইন্দ্রনারায়ণ বাগআঁচড়ার চৌধুরীদের প্রবল পরাক্রম ও

ঐশ্বর্য্যের কথা সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। তিনি চৌধুরীদের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া বিবাহে সম্মতি দান করেন। সেই সময় হইতে ইন্দ্রনারায়ণের বংশাবলী অদ্যাপি বাগআঁচড়ায় বসবাস করিতেছেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিস্তর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। গাঙ্গুলীরাও পণ্ডিত বিদায়ীস্বরূপ অনেক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। এখনো এই বংশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের স্বাক্ষরিত শিলমোহরাঙ্কিত ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির দান পত্র বা পাট্টা আছে।

তারকনাথের জন্ম।

তারকনাথের শৈশবের বন্ধু স্বর্গীয় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন, "হেমবাবু কালস্রোতের যে ভাগে দেখা দেন, সে ভাগ অতি বিষম। কালস্রোত তখন কেবলই ভাঙ্গিতেছিল; ভাঙ্গিবে বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল, গড়িব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল না। হেমবাবুর জন্মসময়ে কোন কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে,—ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে হইবে,—প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে,—চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে,—সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি, অনাচারে অত্যাচারে, স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া, অকালে কালস্রোতে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা হইত।"* —তারকনাথও এই কালস্রোতের ভাঙ্গন-গড়নযুগে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দঃ বাঙ্গলা সন ১২৫০ সাল বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে তিনটী কারণে স্মরণীয়। (১) এই বৎসরে বাঙ্গালীর ইমার্সন স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও বাঙ্গালীর সেক্সপীয়র বঙ্গের গ্যারিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। (২) এই বৎসরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়; এই বৎসরে তত্ত্ব-সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনীর জন্ম হয়; (৩) আর এই বৎসরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংস্রবে আসিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য মনস্বী অক্ষয়-কুমার ও প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের মিলন হয়। অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর-মিলন বৎসরে—১২৫০ সালের ১৬ই কার্ত্তিক ইং ১৮৪৩ ৩১শে অক্টোবর বুধবার দিনে বঙ্গ সাহিত্যিকের উজ্জ্বল নক্ষত্র তারকনাথ বাগআঁচড়ার পল্লী-ভবনে ভূমিষ্ঠ হন। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর মিলন-বৎসর, কালীপ্রসন্ন-গিরিশচন্দ্র ও তারকনাথের জন্ম বৎসর বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় বৎসর বলিতে হইবে।

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত কবি হেমচন্দ্র নামক পুস্তিকার ভূমিকা।

তারকনাথ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত-বংশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তারকনাথ রাঘবের "সন্তান"। রাঘবের সন্তানেরা অধিকাংশ বিশিষ্ট জ্ঞানী ও কৃতবিদ্য। নিম্নে প্রদত্ত বংশলতা হইতে তারকনাথের আভিজাত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

বৈশাখের রৌদ্র।

বৈশাখের রৌদ্রপুরে গলে একি স্বর্ণ?
ক্ষুধিতের অন্ন, না তৃষিতের অর্ঘ?
কেহ বলে, "কি ভীষণ," কেহ বলে "কান্ত"—
"এ কে শর বর্ষণ করে?"—কহে পান্থ।
কেহ বলে "সোমরস," কেহ "সোমরশ্মি"—
কেহ বলে "হুতাশন', যার সব 'ভস্মি'।"
কেহ বলে "চপলার একি লীলালাস্য?"
কেহ বলে "কমলার কৌতুক হাস্য।"
কেহ বলে "ভার্গব রুধিরের অর্ঘ্যে
করিতেছে তর্পণ বসি' দূর স্বর্গে।"
কেহ বলে "ঝরিতেছে বসুতের ঝর্ণা,"
কেহ বলে "উড়িতেছে রক্তের তর্ণা!"
কেহ বলে "সাগ্নিক জ্বালিয়াছে বহ্নি!"
কেহ বলে "চন্দনচর্চ্চিত অহি!"
কেহ বলে "রুদ্রের একি শিব চণ্ড—
এক হাতে বরাভয়, আর হাতে দণ্ড।"
কেহ বলে "ওগো দেব, কি অমিয় বণ্ট?"
কেহ বলে "কালকূট,—কোথা নীলকণ্ঠ'?"
তবু ঝরে চারিধারে কনকের চূর্ণ,
মন-মণি-মঞ্জুষা ভরু করি তূর্ণ!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ,

নববর্ষের অভিভাষণ।

(সম্মিলনী অনাথ-বান্ধব-সমিতি।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদশিষ্য উতঙ্ক একদা কোন কর্ম্মসূত্রে নাগলোকে প্রবেশ লাভ করিয়া দেখেন—এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! দেখিলেন, দুই জন স্ত্রী সুচারুবাপদণ্ডযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন। তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং দ্বাদশ অর-যুক্ত একখানি চক্র (চর্কা) ছয়টি শিশু কর্ত্তৃক ঘূর্ণিত হইতেছে। কৌতূহলাবিষ্ট প্রত্যাগত উতঙ্ক গুরুসমীপে রহস্যজ্ঞ প্রাপ্ত হইলে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বেদ কহিলেন,—তুমি যে দুইটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দ্বাদশ-অর-যুক্ত ঘূর্ণ্যমান যে চক্র দেখিতেছ, তাহা দ্বাদশমাসসংবলিত সংবৎসর; যে ছয়টী শিশু তাহা ঘুরাইতেছে দেখিয়াছ, তাহারা বসন্তাদিঋতু; যে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের যে সূত্র, তাহা দিবারাত্রির পর্য্যায় জানিবে।

নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে,—দিবারাত্রির এই সিতাসিতবর্ণ সূত্র—অতি সূক্ষ্ম সুদীর্ঘ এই সময়-সূত্র কাটিতে কাটিতে, দীর্ঘস্থূলকায় শিশু ঋতু হেলায়, হাসিয়া খেলিয়া —বার মাসের বর্ষ-চক্র ঘুরাইয়া,—অনাথ বান্ধবসমিতির তের পর্ব্ব সমাধা করিয়া,—আজ নববর্ষে তাহাকে চতুর্দ্দশবর্ষকিশোর উপনীত করিয়া দিল।

বিগত ত্রয়োদশবর্ষের ক্ষীণ সম্বলটুকু ধরিয়া, আশানৈরাশ্যের উচ্চাবচ পথ অতিক্রম করিয়া, সংশয়-গ্লানি বিদ্রূপ বিদ্বেষের প্রাচ্যপ্রতীচ্য দক্ষিণোদীচ্য বাত্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া, শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে অনাথবান্ধবসমিতি ত্রয়োদশবর্ষান্তে আজ যেখানে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে বলা যাইতে পারে—সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী। অনাথ আতুরগণের দৈনন্দিন দুঃখদারিদ্র্যে দেশবাসীর হৃদয় আর্দ্র হইয়াছে,—সত্যই আর্ত্তের সেবাধর্ম্মে সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে,—দীন-দরিদ্রের অকারবন্ধু বৈকুণ্ঠের আসন টলিয়াছে,—তাই আজ অনাথবান্ধবসমিতি 'ভ্রাতানাথস্য বান্ধবাঃ' নামে বঞ্চিত হয় নাই।

'উপকারো জগন্মাতঃ'—উপকার জগতের মাতা; 'বিশ্বস্য জননী দয়া',—দয়া বিশ্বের জননী-স্বরূপা, তিনিই আমাদের ভাই, ভগ্নি, আমাদের 'সমিতি'ই—ভাই ভাই মিলিত হইয়া যে সেবানুষ্ঠান—সে সেবাধর্ম্মের

'কর্ম্মভূমি'। এই পবিত্র মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অনাথবান্ধবসমিতির সেবক-মণ্ডলী ভগবৎপ্রসাদে এবং স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির বহু সজ্জনের সৎপরামর্শে, যাচিত ও অযাচিত আনুকূল্যে এবং অল্পবিস্তর অর্থসাহায্যে, হিন্দুর গ্রাম্য গার্হস্থ্যজীবনের সুধার ধাম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন মনে হয়, কে আছে এমন সুকৃতী, সজ্জন—যে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিয়া, শীতার্ত্তকে বস্ত্র দিয়া, রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দিয়া, বিপন্ন বিদেশী পথিকের পাথেয় দিয়া, নিরভিভাবক কিশোরবয়স্ক বালকের শিক্ষাকল্পে বৃত্তি দিয়া, যম-নিয়ম-কামা সহায়হীনা দুঃস্থ ভদ্রবিধবার দাদশীর দিনে সংবাদ লইয়া, জীর্ণপর্ণশায়ি-দরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণের ও কপর্দ্দকশূন্য বিপন্ন গৃহস্থের প্রাঙ্গণরক্ষিত ক্বচিৎ বা অরক্ষিত শব সৎকারের ব্যয় বহন করিয়া—কৃতার্থ হইতে, অকর্ম্মণ্য জীবনের ধারা নূতন খাতে প্রধাবিত করিতে, প্রকৃত কাজের মানুষ হইতে,—পরাঙ্মুখ হয়? এই সকল কাজের বোঝা মাথায় করিয়া, বড় আশা করিয়া আমরা সাধারণের কৃপাভিখারী হইয়াছিলাম। সমিতির প্রতিষ্ঠাতৃপরিচালকগণের মনের পরিবর্ত্তনে ও ঔদাসীন্যে; কি অবস্থাবৈগুণ্যে, অথবা বিকৃতরুচি ও বিবর্ত্তিত বিপর্য্যস্ত চিন্তা-ধারার ঘাতপ্রতিঘাতে যেন দেশের অনাথগণের বহুদিনের আশাভরসা ভঙ্গ না হয়,—সেবাশুশ্রূষার ত্রুটি না হয়—সমিতির সেবাপরাধ না হয়—এই ভাবনায় আমরা মহাপ্রাণগণের আনুকূল্যে, উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে নির্ভর করিয়া-ছিলাম। আজ কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে। অনেকেই আমাদিগকে সহানুভূতিপ্রদর্শনে ও অর্থসাহায্যদানে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাই আজ দেশের অনাথ আতুরগণের নীরব কাতর প্রার্থনা আমাদের কণ্ঠ মিশাইয়া কাতর-কণ্ঠে অদ্যকার সভাস্থ মহাপ্রাণ দেশ নিকট জনে জনে আবার আমাদের নিবেদন—এই মঙ্গলকর সদনুষ্ঠানটি স্থায়িত্বসম্পাদন ও ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত করুন,—যিনি যেমন পারেন, আর্থিক সাহায্য বা কায়িক পরিশ্রমে সমিতির সহায়তা করুন। সমিতির বর্ত্তমান অবস্থার যথোচিতার্থ ক্রমোন্নত বর্ষের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইল,—আশা হয় এই বিবরণপাঠে, সমিতি ক্ষুদ্রশক্তি হইলেও ইহার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে কতটা অগ্রসর হইতেছে, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কিন্তু আর্ত্তসেবা ব্যতীত এই সমিতির দ্বারাই ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—সমিতির সভ্যগণের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন ও সহানুভূতি প্রসারের চেষ্টা এবং আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কীর্ণ জীবনের উন্নতিবিধান—কতটা সংসাধিত হইতে পারে, বহিরঙ্গসাধনের

সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গসাধনের পথ কত দূর সুগম করিতে পারা যায়, এক্ষণে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া—যথাসম্ভব তাহার আলোচনা করা বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের জাতীয় সামাজিক জীবনের এখন রাক্ষসী বেলা। না রাত্রি—না দিন। রাত্রি আসে আসে—দিন ত গিয়াছে! ঘন ঘোর গোধূলিতে চির-পরিচিত গিরি, দরী শাখী, পাখী—স্থল, জল—সমাচ্ছন্ন! অদূরে গ্রামের উন্নত দেবমন্দিরসমূহ, দেশের দ্রব্যজাত—আমাদের ঘরের মানুষ, ঘরের জিনিষ—সমস্তই অস্পষ্টপটবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। কিছুই আপনার বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে না, তাই, কিছুই আপনার বলিয়া মানিতে পারা যাইতেছে না। ওদিকে পশ্চিমাকাশে কি চাকচক্যময় জলদপটল-পাটলের আপাতরমণীয় শোভা! দেখিয়া, নয়ন ভুলিয়া যায়, মন মজিয়া যায়, আত্মবুদ্ধি লোপ পায়,—বিচারশক্তি বিলাসআবেশে জড়িমাপ্রাপ্ত হয়! এ রাক্ষসী বেলায়—রক্ষোযক্ষ-গন্ধর্ব্বগণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এই রাক্ষসী বেলায়, রাক্ষসী মায়ায়—রাক্ষসে স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে, জটিল তপস্বী সাজে, গৃহলক্ষ্মী হরণ করে। এ সময়, অধার্ম্মিকে ধর্ম্মের বর্ম্ম পরে, সরল সাধুপ্রকৃতির চিত্তবিকৃতি জন্মে, বিদ্যাবান্ অবিদ্যার মোহে পড়ে,—বিদ্যাধরেরা জয়োল্লাসে কামের গান গায়। হায়! কোথায় গেল—সেই দুঃস্বপ্নহারণ, অজ্ঞাত-তিমিরহরণ, অরুণকিরণ! কোথায় গেল—সেই জবাকুসুমসঙ্কাশ জ্ঞানের সূর্য্যপ্রকাশ! কোথায় গেল—সেই উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতস্বরে ভারতীর প্রথম প্রভাতী—যজ্ঞের সমাগান! কোথায় গেল—'হুতধূমকেতুশিখাঞ্জনস্নিগ্ধসমৃদ্ধশাখং, প্রাধ্যায়নাভিভূতসমুচ্চরচ্চারু পতত্রি-শিঞ্জং' তপোবন! কোথায় গেল—মধ্যাহ্নের সেই গৌরব-রবিভাস্বর নীলাম্বরে উড্ডীন আর্য্যের সনাতন কেতন ষড়্দর্শন! প্রোজ্জ্বল দিবা ও কালরাত্রির এই সন্ধিক্ষণে—এই রাক্ষসী বেলায়, রাক্ষসী মায়ায়—সে চার্ব্বাকগর্ব্বখর্ব্বকারী নাস্তিক্যনীতিভীতিহারী ষড়্দর্শনের অদর্শন ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। তা না হইলে, আমরা ওই পশ্চিমের বাহ্যচাকচিক্যময় জড়বাদ-জলদ-পাটল সম্ভোগমনোহর শোভা দেখিয়া ভুলিব কেন? যজ্ঞদ্বেষী, হব্যকব্যনাশী যক-কিম্পুরুষবর্গের কিল-কিলায়,—বিনয়ন বিদ্যাধরনিকরের কাম-কাকু-কূজনগীতে, অঙ্গভঙ্গীতে,—হাহা-হুহুগণের হী হী হাস্যে, লাস্যে, হুঙ্কারে—আমরা এমন জড়বুদ্ধি, হতবীর্য্য, বিক্ষিপ্তচিত্ত, ভ্রষ্টলক্ষ্য, আত্মবিস্মৃত, বিজাতীয়বিষজর্জ্জরিত হইয়া যাইব কেন? প্রতীচ্যের ওই উচ্চশিরোমেঘডম্বরপ্রতিম রুসো-মিলের সাম্যবাদ, হক্সলি

স্পেন্সরের দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ববাদ, ডিভিড্ হিউমের সংশয়বাদ, অগষ্ট্ কোন্তের সিদ্ধান্ত বা অপসিদ্ধান্তবাদ ইত্যাদি বাদানুবাদ—এত সাধ করিয়া এ দেশে সরবরাহ করিব কেন? পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী প্লুটোক্রেসী-ডেমোক্রেসীর অস্ত্র ঝন্‌ঝনা, সোশিয়ালিষ্ট্ অ্যানার্কিষ্ট্ নিহিলিষ্ট্ বিটগণের চটচটা,—এত ঘটা করিয়া বরণ করিয়া আনিতে যাইব কেন? দেশের নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক যখন পরাহত, নিহত—তখন বিদেশের নাস্তিকাধম ফোয়ারবাক্ এ দেশে মাথা কাড়া দেয় কেন?—এ রাক্ষসী বেলায় বিদায় দিতে গিয়া আমরা কুশিয়ায় দেশ, তর্কের তক্ষকপুরীতে পরিণত করিয়াছি—পরলোকগ্রাহী নীলমস্ত শিক্ষকে ও ছাত্রব্যংসকে বিদগ্ধ জননী জন্মভূমিকে অহরহ দগ্ধ করিতেছি! এ রাক্ষসী বেলার ঘোরা গোধূলিধূলিতে আমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে—ঘরের দেবতা, কোলের মানুষ—চিনিয়া লইতে পারিতেছি না। চক্ষু গিয়াছে, কিন্তু কর্ণ ত বধির হইয়া যায় নাই! ওই—শুন, ওই সন্ধ্যার পুণ্যপাঞ্চজন্যশঙ্খধ্বনি!—আবর্ত্তপুষ্করমেঘনির্ঘোষে কি গম্ভীর ভগবদ্বাণী—দিগ্‌দিগন্তে সমীরিত হইতেছে

"স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।"

* * * *

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

পুনরপি, শুন—শুন, ওই আশার অধিক আশ্বাসবাণী—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

—ভগবদ্বাণীতে বিশ্বাস রাখিলে, আর্ষশাস্ত্রে আস্থা থাকিলে মহাজনে শ্রদ্ধাবুদ্ধি না হারাইলে,—'সর্ব্বাণি ভূতানি দিশো দ্রবন্তি' এ রাক্ষসী বেলা কাটিয়া যাইতে পারে;—এ রাক্ষসী মায়া টুটিয়া যাইতে পারে;—আমার কালরাত্রির করাল তিমির ঘোচিয়া সৌভাগ্যের—জ্ঞান বিজ্ঞানের—পূর্ণচন্দ্রোদয় হইতে পারে!

মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো?—উঠে বই কি! 'স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য',—স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে,—ভয় কি? পরধর্ম্ম—পরের বিদ্যা-কলা-বিলাস শ্রেয়ঃ হইলেও 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ'—বিগতগুণ স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ ও অমৃতের মতন মানিলে,—জাতির মান থাকে বই কি!—সমাজের মুখ উজ্জ্বল হয় বই কি।—

দ্বারা তাহার শনৈঃ শনৈঃ প্রকাশ করিয়া, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমমাত্র পাথেয় লইয়া আমরা যেন দিন দিন নিয়তির গন্তব্য কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারি। কতকগুলি শিথিল অভ্যাস, অনার্জ্জিত চরিত্র, অসংযত চিত্ত ও শ্রমবিমুখ অপটু শরীর লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে, কাজ উঠিবে না। কেবল খেয়ালের জোরে, অন্ধপ্রবৃত্তির আবেগে, ক্ষণিক উদ্দীপনার চাঞ্চল্যে কিছুদিন ছুটাছুটি করিলে, কিছু আর ছুটি মিলিবে না। মরণ লিখিতে হইবে—এ ব্রতের আজীবন অনুষ্ঠান, সর্ব্বস্বান্তেও ইহার দক্ষিণান্ত হয় না। এ নিষ্ঠার কাঠা নাই,—এ প্রেমের পার নাই। জীবপ্রেমে জগৎ আপনার কর,—সেবা কর! জীবপ্রেমে আপনাকে জগতের কর,—সেবা কর, সেবা কর! জনে জনে নারায়ণজ্ঞানে, ভগবানের নামে,—সেবা কর, সেবা কর! অনাথ বান্ধবসমিতি! অনাথবন্ধুর নামে, অনাথ বন্ধুর প্রেমে,—অনাথগণের সেবা কর, সেবা কর! আর,—কর্ম্মান্তর নাই, ধর্ম্মান্তর নাই। দেখিবে—নর-সেবার নরদেব তোমার সম্মুখে—'সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ'—সহস্রপদে তোমার পূজা লইবার জন্য কতই আগ্রহে অগ্রসর হইতেছেন,—সহস্রচক্ষু দিয়া তোমার প্রতি কতই সদয়দৃষ্টিপাত করিতেছেন,—সহস্রমস্তক ঈষৎ নত করিয়া কতই প্রেমভরে তোমার ভক্তিপ্রীতির সুকৃচন্দন গ্রহণ করিতেছেন! আবার দেখিবে—তোমার সেবা স্বচ্ছ চিন্মুকুরে সেই নর-দেবের ছায়াভত মূর্ত্তি—চিন্ময় অধিদেবরূপে অধিরাজিত! সর্ব্বোপরি দেখিবে—ওই বাহিরের নর-দেব, ও এই অন্তরের অধিদেবের উদয়ে আরও দশাঙ্গুলি ঊর্দ্ধে—'স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠন্' অতিদেব দশদিক্ পূর্ণ করিয়া, স্বরাট্ বিরাট্ সমন্বয় করিয়া ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ত্রিদেব,—'জ্যোতীরসোঽমৃতং' ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ,—তিনে এক, একে তিন! তিনি যে স্থূলের স্থূল, সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম, কারণের কারণ,—পরমেশ্বর! তিনি যে আত্মার আত্মা আপনের আপন, পরের পর—পরাৎপর! তিনি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্র, হৃদয়ের হৃষীং, ভক্তের অন্তর্য্যামী, প্রাণের প্রাণারাম, কণ্ঠের হরিনাম! তিনি ভাবের ভগবান্, কর্ম্মের শ্রীকৃষ্ণ, সাধনের শিব, দুর্গতিহরণের দুর্গা, শাপমোচনের শ্রীরাম!—সবই এক, একই সব। তিনি পতিতের পাবন, বিপদের মধুসূদন, নিধনের অন্নপূর্ণা, ভীতশরণাগতের বরাভয়করা তারা!—যে যেমন, তার কাছে তেমন। তিনি মুরলীধারণে দ্বিভুজ, চতুর্ব্বর্গফলদানে চতুর্ভুজ, দশদিক্‌পালনে দশভুজা, মোহিত-মোহ অর্জ্জুন-নয়নে 'অনন্তবাহু বিশ্বতোনেত্র'!—যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ। তিনি ধন-দারিদ্র্যনাশনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্মী, মনোদারিদ্র্যনাশের মূর্ত্তিমান্ শ্রী

গণেশ, বাগ্‌দারিদ্র্যস্খালনের সাক্ষাৎ সরস্বতী!—যে মা' চায় সে তা' পায়। তিনি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপেণ, ক্ষুধিতে ক্ষুধারূপেণ, তৃষিতে তৃষারূপেণ, দয়ার্দ্রে দয়ারূপেণ, কান্তে কান্তিরূপেণ, ভ্রান্তে ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা,—হৃদয় ভরিয়া যায়, হাত যোড় হইয়া যায়, মাথা নুয়াইয়া যায়—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে!—কোটি প্রণাম—মা! তোমার রাঙা পায়!

হে অনাথবান্ধবসমিতির অধিষ্ঠাত্রীদেবতা! মা অন্নপূর্ণে!—

—নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী
ভক্তাভীষ্টকরী সদাশিবকরী গৌরী উমা শঙ্করী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী—

ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ—এস, এস—মা! ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ—অনাথসেবকগণের হৃদয়াসনে বস, বস—মা! আজ যুক্তকরে, মুক্তস্বরে, কাতরে—ডাকিতেছি

অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি নমোহস্তু তে॥

বৈঠকী।

যখন ভাবের পরম্পরা অব্যাহতভাবে সমাজে চলিতে থাকে, যখন বাঁধা-ছাঁদা সিদ্ধান্তের আলোচনা এবং আলোড়নে সমাজচিন্তা বিভোর হইয়া থাকে, যখন পূর্ব্বাপর সদ্‌গতিরক্ষা জন্য সমাজ-মনীষা ব্যস্ত থাকে, তখন নব বর্ষে পুরাতনের হিসাব-নিকাশ করিতে হয়, তখন নব বর্ষে নবভাবের উদ্রেকের চেষ্টায় ভাসায় ঝঙ্কার ছুটাইতে হয়। এখন ত সে দিন নাই, সে নূতন পুরাতনে, অতীতে ও ভবিষ্যতে একাত্মতার হেমশৃঙ্খল পরিস্ফুট নাই। জগতের ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব্ব মহামুহূর্ত্ত। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের মুখে, খৃষ্টান এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কালে এশিয়া এবং ইয়োরোপ মহাদেশে যে খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছিল, এখনও ঠিক তেমনই সন্ধিক্ষণ,—তেমনই যুগসন্ধি উপস্থিত হইয়াছে! চিরসহচর পুরাতন যাইতেছে, পুরাতন সংস্কার, পুরাতন ভাব, পুরাতন সমাজ, খৃষ্টান, ও ইস্‌লাম সভ্যতার পুরাতন বেদী যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্পের উদ্বেল উৎক্ষেপে কোন্ অজ্ঞের অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছে। যে নবীন পুরাতনের স্থান অধিকার করিতে আসিতেছেন, তাঁহাকে চিনি না, জানি না, বুঝিবা তিনি ভূমিষ্ঠও হন নাই। তবে যে বিধাতার চিরন্তন বিধান আছে যে, এই সৃষ্ট জগতে শূন্য স্থান থাকিতে পারে না,—থাকে নাই, কদাপি থাকিবেও না, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, চিরদিনের সংস্কার বশে পুরাতনের বিলয় সাধন দেখিয়া বলিতে হইতেছে—চির নবীন আবার আসিতেছেন,—"নব, নব যে নিতুই নব"—সেই নিতুই নবীনের আবার বিকাশকাল সমাগতপ্রায়। এখন

যখন, তখন অজ্ঞাতপরিচয়; কাজেই এই প্রকৃত নবীনের সম্বর্দ্ধনা ত করিতে পারি না, ভাষায় ভুলাইবে না, তাহার ন্যায় নবীনের পদতলে যাইয়া লুটাইয়া পড়িবে, ভাব ও রস সাগরতটের শুচিবল্লরীর ন্যায় বেলাভূমের ক্রোড়ে যাইয়া ধীরে ধীরে লুটাইয়া পড়িবে এবং নবীনতার কোমল পেলব বালুকাবিতারে সোহাগের ঊর্ম্মিমালা রচনা করিয়া যেন সভয়ে দূরে পালাইবে। কাজ কি নবীনের আরাধনা করিয়া? কাজ কি নববর্ষের প্রত্যুদ্গমন করিয়া? এ নবীন কুক্ষিসংলগ্ন ভাবমঞ্জুষায় কেমন লীলা যে সঞ্চয় করিয়া আনিতেছেন, তাহা ত জানি না! অতএব নববর্ষের উদ্বোধনে প্রয়োজন নাই।

* * * * *

পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার ও মানবতার কেন্দ্র ইয়োরোপে অতি ঘোর ও উৎকট পরিবর্ত্তনের যে ঝটিকাবর্ত্ত এখনও চলিতেছে, যাহার উত্তালতরঙ্গভঙ্গের বিক্ষোভ ভারতবর্ষেও আসিয়া লাগিতেছে, তাহার প্রকৃত পরিচয়, গতি ও পরিণতির কোন সমাচার ঠিকমত শিক্ষিত সমাজ রাখিতেছেন না। সবাই যেন নিজের ভাবে বিভোর হইয়া "আপনার চেঁয়ে" ধাইতেছেন। রুষ গেল—শ্বেত জারের জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য গেল, অষ্ট্রিয়া গেল, হাপ্সবর্গদিগের মাধুর্য্যের সাধনা গেল, রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীও যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল, আধুনিক জার্ম্মাণ-সম্রাট কৈসার যেন খড়্গহস্তের ন্যায় মাথা তুলিয়া ইয়োরোপকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, সেও সমর বিপ্লবের অনল মণিখনি মানবতার এক অপূর্ব্ব আদর্শ কেন্দ্র কুস্তন-তুনিয়া বা ইসলাম রূম এবং খলিফা ও ইসলাম সম্বন্ধ গেল! সে নরত্ব, সে নারীত্ব, সে ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্যী ভাবে গোষ্ঠীর উন্মেষ, সে সৌন্দর্য্য-সাধনা ও তাহার বিকাশ, সে আমিত্ব এবং সে তুমিত্ব, সহস্রাধিক বৎসর খৃষ্টান এবং মোসলেম ভাবের মন্থনজাত সমাজব্যাপী সে অপূর্ব্ব শালীনতা গেল! যাহা আদরের, যাহা সোহাগের, যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণ দিয়াছি, কত প্রাণ হইয়াছি, যাহা সহস্রাধিক বৎসরকাল সভ্যজগতের ঐহিক ও পারত্রিক অবলম্বনস্বরূপ ছিল—সে সকলই গেল! আর তাহার স্থানে কি যে অজ্ঞেয় বিস্মৃতির কন্দর হইতে উত্থিত হইতেছে, তাহা ত জানি না। কি এক কেনিল, পঙ্কিল, পিচ্ছিল উৎকট-উদ্ভট পদার্থ সমাজ-আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারমিশ্রিত কোটী বুদ্বুদখচিত হইয়া, দশদিক দুর্গন্ধে পূর্ণ করিয়া উপরে উঠিতেছে, তাহাকে ত চিনি না। প্রেম, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য সবই যেন উহার দাবদাহে গলিত জীববসার ন্যায় বহিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। কি এ পরিবর্ত্তন? ধর্ম্ম নাই, ধার্ম্মিক নাই, দেবতা নাই, দেবারাধনা নাই, চারিদিকে পূজ্যপূজার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, কেবল গির্জ্জাঘর আছে, ধর্ম্মযাজকগণ পদাঘাতে ধূলায় লুটাইতেছেন,—সতীর রোদনে নরক নগর, ধর্ম্মের অবসাদে ধার্ম্মিক নীরব। কেমন এ পরিবর্ত্তন! রাজ্য নাই, সমাজ নাই, সমাজশাসন নাই। এ কেমন নবীনের পরিচয় হইবেন না কেন? কারণ এ রাক্ষসী লীলা যে তোমার হইতেছে।

মনে পড়ে সে ইসলাম অভ্যুদয়! কোটিক্ষণী-ফণাবিস্তার কম্পিয়া, শ্রবণ-ভৈরব ফীৎকারে মহোরগের গমনভঙ্গ্য, কোটিশার্দ্দূলের ক্রীড়াভঙ্গ্য, মনে পড়ে সে মোসলেম অভ্যুদয়! কিন্তু তাহাতে ভগবান্ ছিলেন, পয়গম্বর ছিলেন, ইহপর-কালের আদর্শ ছিল—ভাব ছিল এবং ভাবুকতা ছিল। এ যে তাহা নহে! চার্ব্বাকের নাস্তিকতায় একটু মাধুর্য্য ছিল, ষ্টোইক্‌দিগের সংযমে একটু কোমল শিষ্টাচার ছিল,—ইহাতে যে তাহার কিছুই নাই। রুষের দেশে, লেলিন-শাসিত প্রদেশে, সনাতন মস্কোভী নগরে যে উৎকট লীলাভিনয় হইতেছে, তাহার প্রতি একবার তাকাইয়া দেখ-দেখি। মধ্য ইয়োরোপে কি খেলা চলিতেছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর দেখি! তোমার সনাতন হিন্দুয়ানীর মাপকাটিতে, তোমার ঊনবিংশ শতাব্দীর খৃষ্টান সভ্যতার সিকন্দরী গজে তাহাকে মাপিয়া পাইবে না। উহাতে বৌদ্ধমতের নাস্তিকতা আছে, পরন্তু সদ্ধর্ম্মের মাধুরী নাই; উহাতে ইস্‌লামের ভৈরব ধ্বংসবাদ আছে, পরন্তু ইস্‌লামের ঔদার্য্য এবং ভাবপ্রসন্নতা নাই। ধূমাবতীর কুক্ষিগতা, ছিন্নমস্তার পাদলিতা, বিপরীতরতা বিলাসিনীর অঞ্চলাবৃতা কে এ বৈরিণী—পিশাচী নবীনা? বৃলিমুষ্টির ন্যায় ইয়োরোপের চারিটা সাম্রাজ্যকে যে আকাশে উড়াইয়া দিল, কে এ প্রমাথিনী তাণ্ডবনৃত্যপরা নবীনা-অপরিচিতা—বুঝিবা অপরিচিতা নারী? ইহার পরিচয় লইবে না কি? ইসলামের ঢেউ যেমন তোমাকে খাইতে ধাইয়াছিল, সোমনাথ হইতে সারনাথ পর্য্যন্ত যে ঢেউয়ের খেলায় সব পুরাতন বিচ্ছিন্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছিল—তেমনই মোসলেম উদ্বেলভাব ঢেউ লওয়ার মতন একবারও অনন্তের অজ্ঞেয় ঊর্ম্মির ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতভূমিকেও ছিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে। যাহারা শুনিতে জানে তাহারা আগামী প্লাবনের মৃদু কুল রব শুনিতে পাইতেছে, যাহারা দেখিতে জানে, তাহারা উহার নিঃশ্বাহী দাবানলে অতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে! ভবাগত বংশীধ্বনির বলদেবীদিগের আস্বাদন-বাণী এখন শ্রবণ-মধুর হইতে পারে; পরন্তু পরে যে উহা কৃষ্ণভদ্রের মৃত্যুরাবে পরিণত হইবে। কাহার ও বৈশিষ্ট্যতা কি ইহার আক্রমণে রক্ষা পাইবে? কি মুসলমানের পক্ষে ইহা যে "তুমার আদর" নহে, তাহা যে বলিবে! তাই পূর্ব্বাহ্নে ইহার প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহা কি পুরাতন-সনাতনের শ্মশান-লীলা নবীনের সূতিকাগার কি এখনও নির্ণীত হয় নাই?

বাঙ্গলা দেশে আজকাল আর ফার্শি সাহিত্যের বা ভাষার আলোচনা হয় না। বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই ফার্শী ভাষা ও সাহিত্য ভুলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সাদী, হাফেজ, ফির্দৌসী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণকে ভুলিয়াছে। বঙ্গদেশের এমন এক সময় ছিল—বড় বেশী দিনের কথা নয়—অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাঁহারা ফার্শি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতেন, সাদীর গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ পন্দনামা, প্রভৃতি, হাফিজের দীওয়ান, ফির্দৌসীর শাহনামা অন্ততঃ [illegible] করিলে তাহাদের দিন কাটিত না। সাদী, হাফেজ, ফির্দৌসী [illegible] জনের

সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। বৈঠক খানার বৈঠকী-আলাপে ভারত-চন্দ্র, ঘনরাম প্রভৃতির সঙ্গে সাদীর কাব্যের শ্লোক আবৃত্তি,হাফিজের গোল মাতান গজলের আলাপ, ফিরদৌসীর শাহনামার সহিত আমাদের পুরাতন গড়ন সাদৃশ্যের আলাপ চলিত। আর সে দিন নাই—সে বৈঠকখানা নাই—সে বৈঠকী আলাপও নাই, আজকাল তাহার পরিবর্ত্তে বাবুর দলে [illegible], মিল্টন-আলাপ চলিতেছে। মনীষার অবতার সাদীর নীতিকথা সাধারণে প্রবাদবাক্যের ন্যায় ব্যবহৃত। বঙ্গদেশের শেষ খাঁটী কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সাদী ও হাফিজময় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার সম্ভাব শতক, সাদী ও হাফিজের বাঙ্গালা-সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঢাকাই কবি হরিশচন্দ্র মিত্রও সাদী-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও উপরোক্ত কথা প্রযোজ্য। কবি কৃষ্ণচন্দ্র, কবি হরিশচন্দ্রের দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে পার্সী ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা লোপ পাইয়াছে। সংস্কৃত,পালী, পার্সী ও আরবী প্রভৃতি আর্য্যভাষার আলোচনার জন্য এবারকার মেদিনীপুরে সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক ললিতকুমার হিন্দু মুসলমানকে আহ্বান করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের বিষয় ললিত কুমারের আহ্বানের পূর্ব্ব হইতে আমাদের স্নেহভাজন শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র নন্দী ফার্সী কবির জীবন কথা, কাব্যালোচনা করিয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতিকামী হিন্দু ও মুসলমানের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সাদীর জীবন-কথা কাব্য-পরিচয়, কসিদাও গজল্ সম্বন্ধে সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রে সুরেশচন্দ্র যে কয়টী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন [illegible] গুলিই মূল্যবান্, বঙ্গ সাহিত্যে অপূর্ব্ব, সুচিন্তিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, প্রথম আলোচনা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ। প্রত্যেক সন্দর্ভে লেখকের পরিশ্রম, [illegible] সংযম ও দক্ষতার [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিই বাঙ্গালা [illegible] ফার্সী কবি ও তাঁহাদের কাব্য সাহিত্যের আলোচনার সূত্রপাত করেন। [illegible] দেখাদেখি সম্প্রতি 'আলোচনা' পত্রে হাফিজের কাব্যালোচনা হইয়াছে। যাহারা সত্যই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি-কামী, তাঁহারা এইরূপে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করুন

বিপিনচন্দ্রের নূতন পুস্তিকা।

আমার স্বাধীনতা।

তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলেই পাইবেন।

কুড়ি আনা হইলে ভিঃপিঃ তে তিন টাকা।

পাল ব্রাদার্স।

৫৫। বি কাঁসারীপাড়া রোড ভবানী পুর কলিকাতা।

সাহিত্য ৩২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩২৯ সাল।

রাধা-ভাব।

"রাধাকৃষ্ণের ছবি নিয়ে বিভোর হয়ে
লম্পটেরও দেখা নয়কো শক্ত;
তাহার জন্য যেজন সংসার ছেড়ে দিয়ে
কৌপীন নিতে পারে—সেই ভক্ত।"

দ্বিজেন্দ্রলাল।

একদিকে 'লাম্পট্য' ও অপরদিকে 'কৌপীন' এই দ্বিবিধ চরম অবস্থার কোনো একটী দিকে প্রবৃত্তি দিবার প্রচ্ছন্ন সঙ্কল্প লইয়া বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সূচনা না করিলেও, এইজন্যই আজ ইহার উপযোগিতা অনুভব করিতেছি যে, সাহিত্য-রসিক-সম্প্রদায়ের কোনো কোনো সুরসিক উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ভিতর প্রেম-প্রকৃতির পূর্ণ প্রতিমা শ্রীরাধিকার প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

যে সকল সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করিয়া মানবাত্মা আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, আপনাপন তত্ত্ববুদ্ধি ও রসানুভূতির পরিচয় দিয়াছে, সৌন্দর্য্যদৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়াছে,—এবং কাব্যে, কথাসাহিত্যে, ধর্ম্মগ্রন্থে ও ভক্তিশাস্ত্রে যে সংজ্ঞাগুলির আশ্রয়ে যুগযুগান্তের ধ্যান-ধারণা সঞ্চিত থাকিয়া গিয়াছে, 'রাধা' এই সংজ্ঞাটিও তাহাদের মধ্যে একটী।

কথাসাহিত্যে এই 'রাধা' একটী প্রেম-চরিত্র—মিষ্টিকের অনুভূতিতে জীবাত্মা-পরমাত্মার দিব্য-দ্যোতক রূপক,—কাব্যে যৌন-প্রীতির বিশেষ একটী রূপ; যাহা 'নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ'—সাধকের চক্ষে রাধ্-ধাতুভূত একটী আরাধনার বৃত্তি,—ভক্তের বোধিমূলে আদ্যাশক্তি, সতীকুলরাণী, প্রাণাধিষ্ঠাত্রী, পরমাপ্রকৃতি সর্ব্বোপরি ইনি কৃষ্ণ-প্রিয়া, আর সেই কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—'ব্রহ্মাণ্ডে সকলি কৃষ্ণ'—'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। এই শেষ কথাটী ছাড়িয়া দিলে 'রাধা'-রহস্যের সেই বিশিষ্টতাটীই নষ্ট হয়, সেজন্য নাকি ভক্তিশাস্ত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থেও 'রাধা' বিজড়িতা।

এই 'রাধা' সম্প্রতি আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যে তথা বর্ত্তমান নরনারী-সমাজেও নাকি সুলভ ও সহজ হইয়া উঠিয়াছেন। এ সুসংবাদে অবশ্যই আমরা নিরুৎসাহ হই নাই, কেননা কি ভক্তিশাস্ত্র, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি অধ্যাত্ম-চিত্র, এ সমস্তই সাধারণ নরনারীকেই, মহৎ হইতে মহত্তর ভাব-লোকে উন্নীত ও অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই যদি না হয়, তবে জনসমাজে ও-সকলের কোনো অর্থ বা উপযোগিতা থাকে না। রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বে যাহা বুঝাইতে চাওয়া গিয়াছিল, তাহা যদি সাধারণ্যে আজ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই অনায়াস হইয়া গিয়া থাকে, তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে,—সেক্ষেত্রে, এই বিশ্বগোলকই যে গোলোকধাম হইয়া উঠিয়া তত্ত্ব-দ্রষ্টাগণের ধ্যানের সত্যকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশই থাকে না।

২।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস-সাহিত্য, পল্লীজীবন ও নাগরিক জীবনের বহুবিধ ত্রুটি, বিচ্যুতি, মানব-হৃদয়ের অনেক করুণ ও কোমল চিত্র-সম্ভার, সখ্য-দাস্য-মধুর-বাৎসল্য প্রভৃতি রস-হিল্লোল এবং বিশেষ ভাবে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের কল্পনা-অগম্য স্থলসমূহ হইতে বিবিধ সৌন্দর্য্য বহন করিয়া আনিয়া অবলীলাক্রম তুলিকা-সঞ্চালনের গুণে আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছে। সৌন্দর্য্য-উদ্ঘাটনের আকস্মিকতা, তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যপথে অনায়াস রসসঞ্চার শরৎ-প্রতিভার একটী বিশিষ্টতা। আর একটী বিশিষ্টতা এই যে, তিনি নায়ক-নায়িকার কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়াই হৃদয়-চিত্র ও ব্যক্তি-চরিত্র ফুটিতে দিয়া নিজে প্রচ্ছন্ন থাকিতেই ভালবাসেন, 'ক্রিটিক'-হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া অন্তর-বাহির বিশ্লেষণ করেন কদাচিৎ। এই শরৎ-সাহিত্যের 'শ্রীকান্তে' লক্ষ্মী-রূপ 'রাজলক্ষ্মী'-সম্পর্কে কোনো বিশেষজ্ঞের লেখনী মুখ হইতে আমরা এমন একটী মন্তব্য পাইয়াছি—যাহাকে কোনোক্রমেই আলোচনার অযোগ্য মনে করিতে পারি না, যেহেতু 'রাধা-ভাব' সম্বন্ধে সাধারণতঃ বিরূপ মনোভাব আমাদের মধ্যে সহজ হইয়া উঠিয়াছে, উক্ত মন্তব্য হইতে তাহা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ শরৎ বাবুর ভাষার ভিতর দিয়াই ঐ রাজলক্ষ্মীর পরিচয় গ্রহণ করা যাক্—

শ্রীকান্ত যখন "মনসা পণ্ডিতের পাঠশালায় সর্দ্দার পোড়ো সেই সময় রাজলক্ষ্মীর দুই পুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার মাকে

তাড়াইয়া দেয়। স্বামি-পরিত্যক্তা মা, সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন ৮।৯ বৎসর, সুরলক্ষ্মীর বারো তেরো। মায়ের ভয়ে ঐ মেয়েটা বইচির বনে ঢুকিয়া প্রত্যহ একছড়া পাকা বইচি ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া শ্রীকান্তকে দিত। সেটা ছোট হইলে পুরাণো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীকান্ত তাহাকে চপেটাঘাত করিত, এবং মার খাইয়া মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোজ হইয়া বসিয়া থাকিত"। কিন্তু মারের ভয়েই সে ক্লেশ স্বীকার করিত কিনা, তদ্বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়া কাহিনী-কথক ইসারায় বলিয়াছেন যে, ঐ বয়সেই সে মনে মনে শ্রীকান্তের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।

তারপর এক ভঙ্গ-কুলীন পাচক-ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত "এ রাজে ও রাজ্যে" সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। বছর দেড়েক পরে পীহাজরে সুরলক্ষ্মী মরিল এবং আরও বছর দেড়েক পরে এই রাজলক্ষ্মী কাশীতে মরিয়া শিবত্ব লাভ করিল"

ঐ 'মরিয়া' অবস্থায় নাচগান শিখিয়া ক্রমে সে পাটনার প্রসিদ্ধ 'পিয়ারী বাইজী' হইয়া উঠিল, রাজা-রাজড়ার দরবারে মুজরা আরম্ভ করিল, এবং ঘটনা-চক্রে তাহার বাল্য উৎপীড়ক ও শিক্ষক শ্রীকান্তের দেখা পাইল। সেই অর্দ্ধ-উদাসীন মহান বৈরাগীটিকে দেখিবামাত্র সে চিনিল, প্রাণের মধ্যে তাহার জন্য দরদ অনুভব করিল, এবং সেই রাত্রেই তাহাকে একা শ্মশানে যাইতে প্রস্তুত দেখিয়া বাক্যে ও ব্যবহারে যে মমতা-মুকুল বিদ্রোহ প্রবাশ করিতে লাগিল, তাহা সম্পূর্ণ আন্তরিক আর বুঝিবা অস্বাভাবিকও নয়।

রবীন্দ্রনাথের 'পণ্ডিতা' ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মুখে আসিয়া অনুভব করিয়াছিল—

"ধন্য রে আমি, ধন্য বিধাতা,
গড়েছ আমারে রমণী করি'
তাঁর দেহময় ওঠে মোর জয়
ওঠে জয় তাঁর [illegible] ধরি'—"

অপর পক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গ দেখিয়াছি—

"আনন্দে, না ভয়ে,
ফোটে [illegible]
ছোট [illegible]—

এক্ষেত্রে সেরূপ বিকল্প [illegible] পিয়ারী [illegible]

জোর দেখাইল, রসিকতাও করিল—শ্রীকান্ত বিরক্ত হইল, শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল, অবশেষে তাহার চোখের জল ও প্রাণের টানের সম্মুখে অল্পে অল্পে টলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে শ্রীকান্ত যাহা বুঝিল, তাহা তাহারই ভাষায়—"আমার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে সময় পাইয়া, মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া তাহারই মত আর একটা দুর্ব্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া একেবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিস্ময়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; কিন্তু 'যাও' বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাও জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই নাই; কিন্তু পুলক যে হৃদয়ের কানায় কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে। লোকসান যা' হয় হোক্, হৃদয় যে ইহাকে ত্যাগ করিতে চায় না।"

না চাক্, আপত্তি নাই—কেননা 'সীমাহীন আত্মার আসন' শ্রীকান্তের চক্ষে আপাততঃ ঐ পতিতার দরদী হৃদয়। আত্মা অবশ্য বলহীনের লভ্য নয়, এবং 'একটা গোপন দুর্ব্বলতা দিয়া আর একটা প্রচ্ছন্ন দুর্ব্বলতাকে সাদরে ডাকাও' আত্মার আসন রচনা নয়—তথাপি শ্রীকান্ত পিয়ারী-ব্যাপারে অস্বাভাবিক, অশ্রদ্ধেয় বা সহানুভূতি লাভের অযোগ্য কিছুই নাই—সর্ব্বত্রই উহা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া বহমান।

এখন, এ-সম্বন্ধে মন্তব্য যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা এই :—

"হিন্দুসমাজে রাজলক্ষ্মী সর্ব্বকালে থাকিবে নিন্দিতা; তাহার মহনীয় চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে হিন্দুপরিবারের বাহিরে। হিন্দুপ্রাণ শরৎ বাবু অতি সাবধানে রাজলক্ষ্মীকে স্থাপিত করিয়াছেন—গৃহের বাহিরে। সামাজিক জীবনে যাহা নিন্দিত, তাহাই বাহিরে (স্বাধীন) প্রেমের সত্তায় বিরাট, এই স্বাতন্ত্র্য স্বাধীন-তার যুগে রাজলক্ষ্মীর চরিত্র অতুলনীয়। রাজলক্ষ্মী প্রেম-প্রকৃতির পূর্ণ প্রতিমা—কুলনাশা প্রেমের, শ্রীরাধিকার প্রতিচ্ছবি।"...সহ-সম্পাদক—পরিচারিকা, অগ্রহায়ণ ১৩২৮।

এ মন্তব্য পড়িয়া মনের ভিতর হইতে যে 'জিজ্ঞাসা' উত্থিত হয়, তাহা এই যে 'প্রেমের সত্তায় বিরাট' যাহা কিছু, তাহাকে 'বিরাট' বুঝিয়াও যদি নিন্দা করা হিন্দুসমাজের ব্যবসা হয়, তবে সে সমাজের বা সেই বিচার-বুদ্ধির মূল্য কতটুকু? সামাজিক জীবন পরিহার না করিলে যদি 'বিরাট প্রেম' না [illegible] সমাজে আমরা থাকি কেন? হিন্দুপরিবারের 'সত্য'

মাপিবার মাপকাটি যদি এতই ছোট হয় যে, 'বৃহৎ সত্য' তাহা দিয়া মাপা চলে না, তবে সে মাপকাটি ভাঙ্গিয়া ফেলি না কেন? তারপর, 'প্রেম-প্রকৃতির পূর্ণপ্রতিমাকে' নিন্দা করিয়া হিন্দুসমাজ তাহার অপূর্ণ-প্রেমবুদ্ধি বহির্বিশ্বে বিঘোষিত করিতে লজ্জায় নতশির হয় না কেন? কুলনাশা প্রেমের, শ্রীরাধিকার প্রতিচ্ছবি যদি ঐ রাজলক্ষ্মীই হন, তবে হিন্দুর চক্ষে তিনি নিন্দিতা হইবেন কেন? 'রাধার' সৃষ্টি কি হিন্দুভাবুকগণেরই সৃষ্টি নয়? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, দেবীভাগবত, নারদ-পঞ্চরাত্র, তন্ত্রশাস্ত্রাদি কি হিন্দুসমাজেরই সামগ্রী নহে?

তবে? তবে রাজলক্ষ্মী নিশ্চয়ই 'শ্রীরাধিকার প্রতিচ্ছবি' নয়, এবং কুলনাশা প্রেমের অর্থও 'কাশীতে মরিয়া শিবত্ব' লাভান্তে ব্যাসকাশীতে বাঁচিয়া জীবত্ব প্রাপ্তি মাত্র নয়।

৩।

৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনী একসময় 'রাধা' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিল। তাহাতে প্রধানতঃ জয়দেবের 'রাধা'ই গৃহীত হয় ও ইহাই বলিবার চেষ্টা হয় যে, আমাদের সাহিত্যে সীতা, উমা প্রভৃতি প্রেম-চরিত্রের অভাব নাই, তথাপি 'রাধা'কে বাদ দেওয়া যায় না। নারীর প্রেমকে মাতৃ-ভাবে, পত্নীভাবে, কন্যাভাবে, আমরা পৃথক পৃথক করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু 'রমণী'-ভাবে দেখি নাই—'রাধা'-চিত্র সেইখানে আমাদের সহায়তা করিতেছে।

এখানে 'রমণী'-ভাব অর্থে নারী-পুরুষ সম্বন্ধীয় সেই বিশেষ Sex-attachment এর ভাবটাই লেখক বুঝিয়া লইয়াছেন—যাহাতে নাকি "প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে"—"প্রাণের মিলন চাহে দেহের মিলন" এই উক্তি-গুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইতে পারে। সেই জন্যই লেখক বলিয়াছেন যে, রাধার আবির্ভাবে বঙ্গীয় সমাজে একটা বিপ্লব বাধিয়া যায়। তারপর, রাধার আধিপত্য সাহিত্য ও সমাজে নানা স্তরে যে কিজন্য প্রসারিত হইয়া পড়ে, তাহার কারণ লেখক ইহাই নির্দ্দেশ করেন যে, ভাঙ্গনের মুখের প্রবল মত্ততা ছাড়া তাহা আর কিছুই নয়। এই যে নারী-পুরুষ সম্পর্কিত পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান আকুল মিলনেচ্ছা—যাহা পত্নীত্ব বা মাতৃত্ব বা দুহিতৃ-ভাব না হইয়াও 'রমণী' ভাব, তাহাই বলেন্দ্রনাথের 'রাধায়' আমরা দেখিতে পাই।

যে বৃত্তিটীকে আশ্রয় করিয়া নর-নারী পরস্পরের সাহচর্য্যে, কোন্ অনাদি অতীতকাল হইতে অনন্ত ভবিষ্যতের পানে নব নব সংস্করণে আপনাদিগকে

প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে, তাহাকেই 'আদিরস' নামে অভিহিত করিয়াও সমগ্র-সৃষ্টিরহস্যের মূলে ধরিয়া একদিন ব্রহ্মাণ্ড-রচনাখ্যান বিবৃত হইয়াছিল। এখানে আমরা দেখি—"বেদাশ্চ বেদমাতা চ সর্ব্বজ্ঞা রাধিকা স্বয়ং"। তিনি এই নিত্য বিশ্বগোলকের অন্তর্লীলা নিত্যাপ্রকৃতি —

"বৈকুণ্ঠে সা মহালক্ষ্মীর্মূর্ত্তিভেদে সরস্বতী,
প্রসূয় বেদান্ বিদিতা বেদমাতা চ সা সদা।
সাবিত্রী সা চ গায়ত্রী ধাত্রী ত্রিজগতামপি,
পুরা সংহৃত্য দুর্গঞ্চ সা দুর্গা চ প্রকীর্ত্তিতা ;
তেনাদ্যপ্রকৃতির্জ্ঞেয়া সর্ব্বাসুরবিমর্দ্দিনী,
সর্ব্বানন্দা চ সানন্দা দুঃখদারিদ্র্যনাশিনী ;
শত্রূণাং ভয়দাত্রী চ ভক্তানাং ভয়হারিণী,
দক্ষকন্যা সতী সা চ শৈলজা তেন পার্ব্বতী ;
সর্ব্বাধারস্বরূপা সা কলয়া সা বসুন্ধরা,
কলয়া তুলসী গঙ্গা কলয়া সর্ব্বযোষিতঃ।
সৃষ্টিং করোমি চ যয়া, তথা শক্ত্যা পুনঃ পুনঃ"—

এই ব্রহ্মাণ্ড-গোলকের কেন্দ্রীয়া প্রকৃতি বা রাস-মণ্ডলের নায়িকা, যিনি "বহ্নি-শুদ্ধাংশুকাধানা," যিনি গোলোক-নাথের রাস নৃত্য বা পরমাত্মার স্পন্দন হইতে ষোড়শ-কলায় পূর্ণা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন,—তিনি আর যাহাই হউন না কেন, 'সমাজ কর্ত্তৃক নিন্দিতা, অথচ (স্বাধীন) প্রেমে সত্তায়' বন্দিতা কোনো 'পতিতা রাজলক্ষ্মী'র ঘরে দিবাতে যান না।

এখানেও অবশ্য শৃঙ্গার-বর্ণনা আছে, কিন্তু সে বর্ণনার চারিদিকে দিক্‌চক্রবালে জ্যোৎস্নাপ্লুতে জ্যোৎস্নরুদ্ভাসম্ এমন উজ্জ্বল-রাগে উদ্ভাসিত, এবং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি-পরিবেষ্টিত সপ্তসাগর-সংযুক্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা এমন-ভাবে প্রাপ্ত-যোগ, যাহাতে Sublimity ছাড়া অন্য কোনো ভাব মনে আসে না এবং যাহা পড়িতে পড়িতে পাঠকের জ্যোৎস্না-স্নাত মনটি অনন্ত-কোশ জগতে জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

৩।

এখন কথা হইতেছে, যে বিশ্বগোলকের অন্তরতমা প্রকৃতিকে যে মহাকাশ নিজদেহে আহরণ করিয়া বিরাজমান—সেই শ্রীকৃষ্ণকে এ-কালের পুং-জাতীয়েরা, যাহা [illegible] হইতে উদ্ভূত, সেই প্রকৃতিকে স্ত্রী-জাতীয়েরা যদি

পরস্পর আত্মীয় ও আর্য্য বলিয়া দাবী করেন, তাহা হইলে নরনারী-সমাজের অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়ায়। নরনারী-হৃদয়ের দুটী দুর্বলতা সেক্ষেত্রে কি পরস্পরের সাহচর্য্যে আসিয়া একেবারে অন্দরের মধ্যে ঢুকিতে পারার পুলকে গদগদ হইয়া পড়ে, শরৎবাবুর ভাষায় যাহা "দু'খানি হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন দৌর্ব্বল্যকে পরস্পরের মধ্যে আহ্বান" এই সংজ্ঞায় নির্খুঁত সত্য-পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকেই কোনো সুলেখক † তাহাকেই "আত্মার সহিত আত্মার মিলন" বুঝিয়া এই মত দিতে পারে যে 'আত্মার সঙ্গে আত্মা মিলিলে দেহের সঙ্গেও দেহ মিলিবে'। ...এই ভ্রান্ত পাশ্চাত্য থিওরিটাই আধুনিক সৌন-নির্ব্বাচন সমস্যা ও Free-love এর মূলে কাজ করিতেছে। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বে নর-নারী 'ব্যক্তিগত আত্মার (individual soul) মিল-হেতু তাহাদের দেহের মিলনকে 'দিব্যভাবে' রূপে যদি বুঝিতে বা বুঝাইতে চাওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, ঐ তত্ত্ব-দৃষ্টিতে 'আত্মার' অর্থ পরিষ্কার হইতে এখনও বিলম্ব আছে। যার সহিত আত্মা মিলিয়াছে তার সহিত দেহ মেলে, তাহা হইলে ভগ্নী-ভ্রাতা বা পিতা-পুত্রীর 'সাদুএব্রুর' হওয়া তো অনেক কথাই হইয়া দাঁড়াইবে।... বোমা বেঁাদার একখানি পুস্তকে সেদিন দেখিতেছিলাম—"Clerumbault was not aware that in his daughter he had found the real wife of his heart and mind"—কিন্তু এখানে দেহের সঙ্গে দেহ মেলার কোনো কথাই নাই,—পরিপূর্ণ বন্ধু পিতা ও ভক্তিপরায়ণা কিশোরী কন্যা,—তাঁহাদের হৃদয়-ধর্ম্মের পরমাশ্চর্য্য ঐক্য ও বিচারবুদ্ধির ভিতরকার একটী নিগূঢ় মিলই এখানে প্রতিপাদ্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ভিতর দিয়া যে দ্বৈত-রহস্যের ধারা প্রবাহিত, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পরস্পর স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ-বদ্ধ, এবং লোক-পিতামহ ব্রহ্মা সেখানে সম্প্রদান ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাই। শৃঙ্গারের অধিকার যে স্বামি-স্ত্রীর পরস্পরের অপেক্ষা রাখে, এবং এজন্য তৃতীয় ব্যক্তির কর্ত্তৃক সে-অধিকার গ্রহণ করিয়া লওয়া আবশ্যক হয়, এ-কথা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কে কোনো পুরাণকারও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। এ অবস্থায় 'রাধা-ভাব' বলিতে অবৈধ আসক্তি-দুষ্ট বা পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জন' বুঝিবার কোনো উপায় নাই।

রাধা ও কৃষ্ণকে 'প্রাণ' ও 'প্রেম' symbol-হিসাবে গ্রহণ করিয়া যে

† শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সকল বৈষ্ণবকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাতেই 'বিধি' লঙ্ঘিত হইয়াছে—এবং রাধাকৃষ্ণ অবৈধ আসক্তিচর্চ্চার 'রূপকে' পরিণত হইয়াছে। ঐ সবের গীতি-সাহিত্যের উপর সুকী-সাহিত্যের কোনো প্রভাব থাকা আশ্চর্য্য নয়, যেহেতু সে সাহিত্যে কাম্য রমণীহৃদয়ে 'সীমাহীন আত্মদান' করিবার প্রথা খুবই স্পষ্ট; আর ঐ সকল পদাবলী পাঁচালী প্রভৃতিও ইংরেজ অধিকৃত ভারতে রচিত।

সম্প্রতি 'শ্রীরাধা' পতিতা-সমাজেও ঐ 'প্রেম' যোগে "ওমোসন" পাইয়াছেন। আশ্চর্য্য নয়—যেহেতু, পতিতারাই যে যথার্থ সতী, আর পতিব্রতারা অনুকম্পার পাত্র, এ ইঙ্গিত জগৎ-কবি-সভার গর্ব্ব রবীন্দ্রনাথও করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বলেন—

"সতীলোকে বসে আছে কত পতিব্রতা।
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা—
আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী,
খ্যাতিহীনা, কীর্ত্তিহীনা কত না কামিনী;
কেহ ছিল রাজসৌধে, কেহ পর্ণঘরে
কেহ ছিল সোহাগিনী, কেহ অনাদরে—
শুধু প্রীতি ঢালি দিয়া মুছি লয়ে নাম
চলিয়া এসেছে তা'রা ছাড়ি' মর্ত্যধাম।"...সবে এইটুকু।

কিন্তু :—

"তার মাঝে বসে আছে পতিতা রমণী
মর্ত্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতী শিরোমণি;
তারে হেরি' সতীগর্ব্ব গরবিনী যত
রূপসীরা লাজে নম্র করে অবনত;
তুমি কি বুঝিবে বার্ত্তা, অন্তর্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্ব-কাহিনী!"

এরূপ কাব্যবিচারের জন্য, রবীন্দ্রনাথের বয়স, প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া আমরা আজ তাঁহাকে ক্ষমা করিব,—বেহেতু ও-কবিতার মর্ম্ম যতই নিগূঢ় হোক্ না কেন, কোনো বাস্তব-বুদ্ধিনিষ্ঠ মানবহিতৈষীই সম্ভবতঃ আপনাপন [illegible] গর্ভধারিণীকে কলঙ্কিনী বলিয়া লোভ দেখাইয়া ঐ পতিতা-মাহাত্ম্য শুনাইবার [illegible] রাখিবেন না। কিন্তু সতীগর্ব্ব যদি তাঁহাদের গরবিনী

করিয়া ভোলে? উত্তর—রবীন্দ্রনাথের যিনি আরাধ্য, তাঁহার উদ্দেশে তিনি যদি বলিতে পারেন "সকল গর্ব্ব দূর করি' দিব, তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না" তবে যাঁহারা পাতিব্রত্যকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই বা সে গর্ব্বে গরবিনী না হইবেন কেন?

'সীতা' পুরাণবর্ণিত পাতিব্রত্যনিষ্ঠ সতীচরিত্র,—ইনি মর্ত্ত্যলীলা অবসানে কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু 'ক্লিওপেট্রা' যিনি নাকি আপন মনীষা-উদ্ভাবিত 'পাতিব্রত্য-নিষ্ঠাবলে' মিসরসাম্রাজ্ঞী হইয়া অবশেষে সীমাহীন আত্মার আসনবোধে? এ্যান্টনীকে সত্য সত্যই ভাল বাসিয়াছিলেন, তিনিই সম্ভবতঃ আজ কবির কল্পনা-স্বর্গে সতী-শিরোমণি এবং তাঁহার খ্যাতি, কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়া সীতা-সাবিত্রী লজ্জানতশির? এ সম্ভাবনা সত্য হইলে তথাকথিত স্বর্গ পতিব্রতাদের চরণস্থাপনারও অযোগ্য থাকুক, অযোগ্য থাকুক, যেহেতু উহাও অস্থায়ী 'ভোগভূমি' মাত্র।

এ কবিতাটীর কথা এই জন্যই তুলিলাম যে, প্রজ্ঞাস্পর্শহীন আসক্তিচর্চ্চার 'ব্যবস্থা-পত্র' হিসাবে কোনও কোনও আধুনিক উপন্যাসের বক্ষে বড় বড় অক্ষরে উহা আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাতিব্রত্যনিষ্ঠার বিরুদ্ধে বা অবৈধ আসক্তিপ্রাধান্যের অনুকূলে ও-জাতীয় কবিতাকে বিধি মনে করিলে, আমরা নিজেদের সহিত উহার জগদ্বিখ্যাত কবিকেও শ্রদ্ধাবান্‌দিগের চক্ষে অনুকম্পার পাত্র করিয়া তুলিব; কিন্তু এক হিসাবে ও কবিতার উপযোগিতা আছে। তামসমুহূর্ত্তে পরস্পর-আসক্ত নরনারীর পদস্খলন অসম্ভব নয়,—এরূপ পদ-স্খলনের ফলে যাঁহাদের অন্তরে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া ওঠে, বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে তাঁহাদের সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে; এবং শ্রদ্ধাসুকথিত গানের সাহায্য বা প্রাণ-গলা সহানুভূতি-সেচনে সেই অগ্নি-নির্ব্বাণের ব্যবস্থা করায় মহাপ্রাণতারই পরিচয় দেওয়া হয়। যাঁহারা একাজ করেন, তাঁহারা জানেন—

"সান্ত্বনা দেওয়া সহে তো সহজ, দিতে হয় সারা প্রাণ,
পরের প্রাণের অনল নিভাতে আপনারে বলিদান।"

বলা বাহুল্য, সাময়িক, অসংযমের ফলে নরনারী-জীবন মনুষ্যত্বের পরম ও চরম সার্থকতা-লাভের অযোগ্য হইয়া পড়ে না, যদি অবশ্য ঐ আসক্তিকেই বড় নাম দিয়া তাহারা আপনাকে ও অপরকে প্রতারিত করিতে না চায়।

---

৫ শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পঙ্‌ক্তিদ্বয়।

কিন্তু রাধা-ভাব এ পথ দিয়া হাঁটে না; উহা একটী মনোভাব বটে, তবে পুরুষ-সম্পর্কে বিশেষভাবে নারীমনোভাবই নয়; অথবা "যে যাহারে চায়, ধরিয়া হোথায়, দাঁড়াইল সারি সারি" এরূপ কোন ব্যাপারও নয়। অনেক সময় নর-নারীতে আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের মধ্যে ইহা অঙ্কুরিত হয় বটে, কিন্তু পুষ্টির জন্য উহা একটী তৃতীয়-কিছুর অপেক্ষা রাখে। 'Things which are equal to the same thing are equal to one another' ইউক্লিডের ঐ স্বতঃসিদ্ধ [illegible] (পথে অগ্রসর হইতে হইতে) তখন নরনারী আপনাপন প্রেম-মনের [illegible] সেই না প্রাণমনের সমতা উপলব্ধি করিয়া পুলক-মাধুর্য্যে পূর্ণ হইতে থাকেন, ঐ তৃতীয় কিছুর স্তরে উঠিয়া গিয়া আপনাপন বিশেষ সত্তাকে নির্ব্বিশেষে লীন করিয়া দেন। ঐ তৃতীয় কিছুকে পরমেশ্বর বল, 'ব্রহ্মই' বল, শ্রীকৃষ্ণই বল বা 'ভূমা'ই বল, তাহাতে বড় বেশী যায় আসে না,—মোট কথা, পরস্পরের জন্য নিজেদের সার্থকতা অনুভব না করিয়া একটা মহত্তর পরিণামের জন্য পরস্পরে। ঐ যোগিতা অনুভব করাই এখানে গোড়ার কথা এবং দৌর্ব্বল্যের সহিত দৌর্ব্বল্যের যোগে তাহা করা যায় না। 'ভক্তি'সংজ্ঞার "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" [illegible] যাহা সূচনা হইয়াছে, 'রাধাভাব' তদপেক্ষা অন্য কিছু বুঝাইবার জন্য [illegible] এই ভক্তির 'ভগবান্' কোথাও বা দৃশ্যমান বিশ্বজগৎ, কোথাও বা [illegible] প্রতির মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।'

৫।

নরাকৃতির অভ্যন্তরেও যেমন মাতৃকাশক্তি বিরাজমানা, নারীপ্রকৃতির মধ্যেও সেইরূপ পিতৃপ্রজ্ঞা প্রচ্ছন্ন,—উভয়ের ঠিক এমন একটী ভাবলেখা আছে, যেখানে উপনীত হইলে, বাহির ও ভিতর [illegible] স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সকল প্রভেদই এক নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতে ঠেকিয়া পরমাত্মজ্যোতিঃতে ঐক্য খুঁজিয়া পায়; অন্তরের প্রত্যন্তসীমায় এই যে মিল, ইহাই পুরুষ-প্রকৃতির মিলন, Sex বুদ্ধির বিলয়, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব। এই মিলে মিলিত হইবার বহুপূর্ব্বেই দেহের বাহিরে মনের একান্ত নিচ্ছেদবুদ্ধি নরনারীর মধ্যে লয় হইয়া উঠে, সুতরাং 'দেহের সঙ্গেও দেহ মেলা'—যাহা এখনকার বিপরীত দিকেরই সত্য বা পুরুষ-প্রকৃতির [illegible] ভেদ-বুদ্ধিরই ফল,—এ অবস্থায় পরিহাসের মতই শোনায়।

যাহাকে আমরা will-power বা ইচ্ছাশক্তি বলি, [illegible] তাহার এলাকা অধিকার ও অতিক্রম করিয়া। ইচ্ছাশক্তির [illegible] অপরকে অবশ করি ও আমরা করি মাত্র,—কিন্তু নিজেরা [illegible]

অন্যকে আপন সত্তায় প্রাপ্ত হই আনন্দের ভিতর দিয়া, এই জন্য রসশাস্ত্রমতে 'রাধা' হ্লাদিনী-শক্তি। হৃৎপিণ্ডের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের যোগানন্দময় ভাবে, সৌন্দর্য্যে ও বৈচিত্র্যে পূর্ণ, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় বহিরাকাশকে হৃদয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মাকাশে আলিঙ্গন করার ভাবে আমরা ঐ হ্লাদিনী-শক্তির চরণমধু-রসাস্বাদ পাই। আমাদের অন্তরবাসিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃকাশক্তিকেই আমরা "দেহি-পদ-পল্লবমুদারম্" মন্ত্রে আবাহন করিয়া ব্রহ্মচরণ-মধু ভিক্ষা চাই—কিন্তু 'দেহের সহিত দেহ মিলাইবার' অধিকার লাভের জন্য, কোনো মানিনীর মান দূরীকরণার্থ, ঐ মন্ত্র ব্যবহার করি না।

তন্ত্রে 'গোলোক' বর্ণনায় যে 'রাধা'-সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে, তাহা হইতে তা ধারণাই করা যায় না, কেমন করিয়া ইনি Sex-attachment এর 'ভাব-মূর্ত্তি' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বর্ণনাটী সংক্ষেপে এই :—

"বৈকুণ্ঠস্য দক্ষভাগে গোলোকং সর্ব্বমোহনম্,
তত্রৈব রাধিকা দেবী দ্বিভুজো মুরলীধরঃ।
শুদ্ধতত্ত্বময়ং দেবি নানা দেবেন শোভিতম্
মধ্যদেশে গোলোকাখ্যং শ্রীবিষ্ণোর্লোভমন্দিরম্।
বৈষ্ণবস্য মহামোক্ষো যত্রৈব পরমেশ্বরি,
ইতি স্থানস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপেণ ময়োদিতম্॥
বীজকোষস্য বাহ্যে তু বেষ্টিতং তোয়মণ্ডলম্,
প্রমাণং সুন্দরং তোয়ং যথা ক্ষীরোদসাগরম্।
ধৃতস্য জ্যোতিষাকারং কোটীচন্দ্রসমপ্রভম্,
বলয়াকার-রূপেণ সুশুভ্রং তোয়মণ্ডলম্,
গঙ্গাদি-সরিতঃ সর্ব্বাস্তথৈব ভান্তি সুন্দরি।
ইন্দ্রাদি দেবতাঃ সর্ব্বে স্তুবমানা নিরন্তরম্
গন্ধর্ব্বাপ্সরনাগাদি কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাস্তথা॥
নানাভূষণবিলাসেন সদা চৈকাগ্রচেতসঃ
বিষ্ণুগানং প্রকুর্ব্বন্তি স্তুতিভক্তিপরায়ণাঃ
দেবা গানং প্রকুর্ব্বন্তি চতুর্ব্বক্ত্রেণ বেধসা,
মালবাস্তাশ্চ, ষড়্রাগাঃ ষট্‌ত্রিংশদ্রাগিণী তথা।
বসন্তাদ্যাশ্চ-ঋতবস্তিষ্ঠন্তি তত্র সন্ততম্।
নানাঋতুপ্রসূনেন ভূষিতং মুরলীধরম্।

তত্রৈব রাধিকা দেবী নানাসুখবিলাসিনী
বদতী মুরলীগানং কুরু কান্তপ্রমোহনম্ ॥
যেন শব্দেন কামস্য উৎপত্তির্জায়তে সদা,
তদ্রাগঞ্চৈব তত্তালং কুরু গানং প্রযত্নতঃ ॥
এবমানন্দসংযুক্তা মহাবেশবিলাসিনী
বাহতাগে সদা ভাতি রাধিকা ভক্তবৎসলা ॥"

এ 'রাধা-তত্ত্ব', তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, কবিমানস স্বর্গেরই দেব-দেবী,—যে ভক্তহৃদয় ইঁহাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছে, সেখানে মর্ত্য-স্বপ্ন অপেক্ষা বিশ্বস্বপ্নই উজ্জ্বলতর। শ্রদ্ধা ও ভক্তির দীপালোকে তিনি গানে-সুরে অপরূপ যে প্রতিমার আবৃতি করিয়াছেন, তাহা রক্তমাংসের নহে। এখন, আমাদের প্রয়োগ-বিজ্ঞান যদি ঐ রাধিকাকে সুরলোক হইতে পাড়িয়া আনিয়া রক্ত-মাংসের দেহমন্দিরেই প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তবে যাঁহার বাঁশরীগানে বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ হইয়া বিচিত্র পথে কর্ম্মপ্রেরণা প্রাপ্ত হয়,—আনন্দে, উৎসাহে, প্রেমে, ভক্তিতে ও শক্তি-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে,—যিনি "অন্তরমাঝে বসি' অহরহ" আমাদের মুখ-দুঃখের দিনদিন মানব-ভাষা কাড়িয়া লইয়াও 'দিব্যসুরে' আপন কথা শুনাইয়া আমাদের মনগুলিকে "ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে—আরো ঊর্দ্ধলোকে" তুলিতে থাকেন,—সেই সর্ব্বচন্দনিন্দা কবিপ্রকৃতিকেই 'শ্রীরাধিকা' বলিয়া বুঝিলে ভুল করা হইবে না। এই কবিপ্রকৃতিকেই সম্বোধন করিয়া আমরা বলিতে পারি—

"সর্ব্বানন্দা চ সানন্দা দুঃখদারিদ্র্যনাশিনী
শক্রণাং ভয়দাত্রী চ ভক্তানাং ভয়হারিণী"।

৬।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, শরৎ বাবুর "রাজলক্ষ্মী"কে শ্রীরাধি-কার আসন দান করিয়াও তাহাকে 'হিন্দুসমাজে নিন্দিতা' এই বিশেষণে বিশিষ্ট করা অপেক্ষা, 'শ্রীরাধিকা' না জানিয়াও হিন্দুচক্ষের সহানুভূতি দান করার আবশ্যকতা আছে। তাহার মধ্যে 'বিবাট' কিছু আছে এমন অবশ্যই আমরা মনে করি না, তবে শ্রীকান্ত-সম্পর্কে তার যে সেবাপরায়ণতা, এবং সাধারণতঃ যে পরোপকার-বৃত্তি ও কল্যাণবুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহার ভিতর বিরাগের কিছুই নাই, বরং প্রেমের অনেক আছে। হিন্দুপ্রাণ শরৎ বাবু গৃহের বাহিরে রন্ধন না করিলেও এরূপ অনেক রাজলক্ষ্মীই নিজগুণে বা

অবস্থাবৈগুণ্যে গৃহের বাহিরে রক্ষিত হইবে,—কোনো শ্রীকান্ত যদি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় বা তাহাদের দ্বারা উপকৃত হয়, এমন কি কালে তাহাদের লইয়া সংসারীও হয়, তাহা হইলে সে আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হইবার কিছু না দেখিলেও নিন্দা করিবারও কিছু দেখিব না। নিন্দা করিবার আবশ্যকতা সেইখানেই অনুভব করিব, যেখানে হিন্দু-সন্তান ওরূপ চরিত্রকে 'শ্রীরাধিকা' বলিয়া ভুল করেন।*

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

"বাঙ্গালী টলষ্টয়"

(১)

এই কথাটা অরবিন্দের। ১৯০৬ ইংরাজীর এপ্রেল মাসে বরিশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অভিনয়ের অবসানে স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে প্রথমে ঢাকা এবং মৈমনসিংহ যাই। মৈমনসিংহ হইতে ফিরিবার সময় অরবিন্দ ও আমি কুমিল্লায় যাই। সুবোধ বাবু নারায়ণগঞ্জ হইতে সোজা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কুমিল্লা হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে আমরা কালীকচ্ছ গ্রামে যাই। কালীকচ্ছে ঠিক প্রচারের উদ্দেশ্যে যাই নাই। কালীকচ্ছের দেওয়ানবাড়ীতে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে কালীকচ্ছ ঘোড়ার গাড়ীতে প্রায় ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার পথ। এত কাছে আসিয়া কন্যাকে না দেখিয়া যাওয়াটা ভাল দেখায় না বলিয়াই আমি কালীকচ্ছ যাইতে চাই। কুমিল্লা হইতে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন মহাশয়কে আমরা সঙ্গে লইয়া যাই। আমার খাতিরে অরবিন্দ বাবু এবং শরৎ বাবু আমার সঙ্গে কালীকচ্ছে যান। ইহা বাহিরের কথা। ভিতরকার কথা এই যে, ইঁহারা বৈবাহিক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নাম আগে হইতেই

* জগজ্যোতি লাইব্রেরীতে পঠিত।

শুনিয়াছিলেন। তাঁহার চাল-চলনের কথাও লোকমুখে অনেকটা শুনিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবুকে দেখিবার জন্যই তাঁহারা আমার আত্মীয়তার আবরণে কালীকচ্ছে যাইয়া মহেন্দ্র বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমরা বোধ হয় দিন দুই কালীকচ্ছে ছিলাম। মহেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া শুনিয়া এই সময়েই অরবিন্দ বাবু তাঁহাকে 'বাঙ্গালী টলষ্টয়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আমার আত্মীয় বলিয়া মহেন্দ্র বাবুর কথা লিখিতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচবোধ হয়। এই সঙ্কোচ ঠেলিয়া রাখিয়া একবার "বিজয়ার" তাঁহার চরিত-চিত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। "বিজয়াও" উল্টিয়া গেল। আমার সে চিত্রাঙ্কণও শেষ হইল না। বিধাতার তাহা ইচ্ছা ছিল না। এখন সে কথা লিখিবার সমীচীন সময়ও বটে। কারণ, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে টলষ্টয়ের কোনও কোনও আদর্শ দেশময় ছাইয়া পড়িতেছে। এ সময়ে আমাদের ঘরের টলষ্টয়ের কথা বলাও প্রয়োজন, শোনাও ভাল।

(২)

অরবিন্দ যদিও মহেন্দ্র বাবুকে বাঙ্গালী টলষ্টয় বলিয়াছিলেন; কিন্তু টলষ্টয়ের গ্রন্থাদির সঙ্গে মহেন্দ্র বাবুর যে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, এমন মনে হয় না। আমাদের ইংরাজীনবীশেরা সকলেই টলষ্টয়ের নাম জানেন এবং মোটামুটি অনেকেই বোধহয় তাঁহার চরিত্র ও জীবনের আদর্শের কথাও কিছু কিছু পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবুও টলষ্টয়ের নাম অবশ্যই জানেন, এবং এই যুগের একজন সাধু পুরুষ বলিয়া টলষ্টয়কে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু টলষ্টয়ের গ্রন্থাদি যে বেশী পড়িয়াছেন, এমন বলা যায় না! মহেন্দ্র বাবু কেতাবের কীট নহেন; বই পড়ার অভ্যাসটা তাঁর খুব বেশী নাই। অবসরও অল্প। এ দেশে টলষ্টয়ের যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি উপন্যাস। গল্প, উপন্যাসাদি পড়ার প্রবৃত্তি মহেন্দ্র বাবুর মধ্যে কখনও দেখি নাই। গত পনর কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিনি কোনও উপন্যাসাদি পড়িয়াছেন কি না সন্দেহ। নিজের জীবন ও চরিত্রের প্রেরণা মহেন্দ্র বাবু টলষ্টয় বা অন্য কাহারও নিকট হইতে পান নাই। যে প্রেরণা তিনি পাইয়াছেন, তাঁহার পিতৃদেব আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের জীবন গঠন এবং চরিত্র হইতে। এ কথা ভাল করিয়াই জানি। অরবিন্দ বাবু মহেন্দ্র বাবুকে বাঙ্গালী টলষ্টয় বলিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া টলষ্টয়ের শিক্ষার প্রভাবে বা চরিত্রের অনুকরণে মহেন্দ্র বাবুর জীবন ও চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, এরূপ কল্পনার কোনও হেতু

নাই। অরবিন্দ বাবুও, মনে হয় না যে এই অর্থে মহেন্দ্র বাবুর এই নামকরণ করিয়াছিলেন।

টলষ্টয় কতকগুলি আদর্শের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যীশু খৃষ্টের শিক্ষা ও চরিত্র হইতেই টলষ্টয় তাঁহার এ সকল আদর্শের মূল প্রেরণা প্রাপ্ত হন। টলষ্টয় যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারের অতি প্রাকৃত কল্পনা এবং কুসংস্কারবর্জ্জিত উদার খৃষ্টধর্ম্ম। আধুনিক খৃষ্টিয়ান জগতে বহু মনীষী এবং সাধকেরা নানা ভাবে ও নানা আকারে এই উদার ও বিশ্বজনীন খৃষ্টিয়ান আদর্শই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। টলষ্টয়ের কিন্তু ধর্ম্মের উপরেও খৃষ্টীয়ান সাধনা ও খৃষ্ট-চরিত্রের মোহর অঙ্কিত আছে।

মহেন্দ্র বাবু যে আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেব যে সত্যের সাধন করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাও টলষ্টয়ের ধর্ম্মের এবং আদর্শের মত উদার ও বিশ্বজনীন বটে। কিন্তু তাহার উপরে বিশেষভাবে খৃষ্ট-চরিত্রের কিম্বা খৃষ্টিয়ান সাধনার মোহর অঙ্কিত নাই। মহেন্দ্র বাবুর আদর্শ আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষতঃ এই বাংলা দেশের সনাতন প্রকৃতি, পুরাগত সাধনা এবং পরিচিত সিদ্ধি হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। টলষ্টয়ের সঙ্গে মহেন্দ্র বাবুর যে গুণসামান্য লক্ষ্য করিয়া অরবিন্দ বাবু তাঁহাকে বাংলার টলষ্টয় কহিয়াছিলেন, তাহা বিদেশী বস্তু নহে। বিদেশের বিশেষ প্রেরণা হইতেও তাহার উৎপত্তি হয় নাই। কোনও প্রকারেই তাহা জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কোনওরূপ অনুচিকীর্ষার ফল নহে। কিন্তু এ বস্তু বাংলার মাটি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিলাতে জন্মিলে মহেন্দ্র বাবু হয়ত একজন জন মুলার হইতে পারিতেন, রুষে জন্মিলে হয়ত বা তিনি টলষ্টয়ের মতন একজন বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক না হউন, কিন্তু বিশ্বসত্যের ও বিশ্ব-মৈত্রীর একজন সবল সাধক হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যাহা আছেন, তাহা হইতেন না। এই কথাটা না বুঝিলে এবং না ধরিলে এই বাঙ্গালী টলষ্টয়-চরিত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব হইবে।

(৩)

পনর বছর আগে মহেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া অরবিন্দ বাবু যেমন তাঁহাকে বাঙ্গালী টলষ্টয় কহিয়াছিলেন, আজ হয়ত কেহ তাঁহাকে দেখিয়া বাংলার গান্ধী এই মর্য্যাদাও প্রদান করিতে পারেন। টলষ্টয়ের সঙ্গে যদি মহেন্দ্র বাবুর তুলনা সম্ভব হয়, টলষ্টয়ের উপযুক্ত শিষ্য মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেই বা সে তুলনা

সঙ্গত হইবে না কেন! ফলতঃ মহাত্মা গান্ধী যে সত্যাগ্রহের আদর্শ প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, মহেন্দ্র বাবুর চরিত্রে সে আদর্শটী পরিস্ফুটভাবে বহুদিন হইতে প্রকট হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবুর জীবনে বহুদিন হইতে এ সংসারের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়াছে। এক শ্রীদয়াময় জগদীশ্বর ব্যতীত মহেন্দ্র বাবু আর কাহাকেও তাঁহার জীবনের প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং কোনও মানুষকে তাঁহার ভৃত্যরূপেও গ্রহণ করেন না। তাঁর বাড়ীতে বেতন-ভুক্ ভৃত্য নাই। ভালবাসিয়া যাহারা তাঁহার সেবা করে, সে সেবা তিনি নিঃসঙ্কোচে ও সাদরে সেই প্রেমের সঙ্গে গ্রহণ করেন। কিন্তু টাকা দিয়া কাহারও সেবা বা সাহায্য পাইবার অধিকার ক্রয় করেন না। এ সংসারের বাহিরের কোনও প্রকারের বাধ্য-বাধকতা তিনি মানেন না। প্রেমের বশ্যতা ব্যতীত আর কোনও প্রকারের বশ্যতার দাবী তিনি সংসারের কোনও সম্বন্ধেই গ্রাহ্য করেন না। কাহারও উপরে সে দাবী তিনি করেন না, এমন কি পুত্র-কন্যাদের উপরেও নহে। আর নিজের বা অপরের উপরে কাহারও প্রেমের দাবী ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারের দাবী তিনি মানিতে রাজী নহেন। যেমন তিনি বেতন-ভুক্ ভৃত্য রাখেন না, তেমন তিনি নিজেও বেতন লইয়া কাহারও কোনও কর্ম্ম করেন না। বহুদিন হইতে তিনি শ্রীদয়াময়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আকাশ-বৃত্তি অবলম্বনের দ্বারাই সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। ব্যবসায়ে তিনি ডাক্তার। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার মত এমন সুদক্ষ চিকিৎসক কেহ নাই। দূর দূরান্ত হইতে দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্য লোকে তাঁহার দ্বারস্থ হয়। কিন্তু মহেন্দ্র বাবু এজন্য কাহারও নিকট কোনও প্রকারের নির্দ্দিষ্ট দর্শনী বা মূল্য গ্রহণ করেন না। কেহ বা কিছু দেয়, কেহ বা কিছু দেয় না বা দিতে পারে না। যে যাহা দেয়, তাহা এক টাকাই হউক, আর এক শত টাকাই হউক, তাহাকে মহেন্দ্র বাবু শ্রীদয়াময়ের দানরূপে মাথা পাতিয়া লয়েন। কিন্তু যাহা আসে, দিনের মধ্যেই প্রায় তাহা খরচ হইয়া যায়। ভবিষ্যতের জন্য তিনি কিছুই সঞ্চয় করেন না। এই সঞ্চয়ের বাসনাটাই তাঁহার বুদ্ধিকে আঘাত দেয়। তাঁহার নিকটে দুনিয়ার মালিক একজন। সেই দুনিয়ার মালিকের ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় এই সংসারচক্র নিয়ত ঘুরিতেছে। তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের রঙ্গমঞ্চে একমাত্র সূত্রধর। জগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক মানবাত্মা তাঁহারই হাতে পুতুল-নাচের পুতুলের মতন রহিয়াছে। তিনি যাকে যে ভাবে নাচান, তিনি সেইভাবেই নাচেন। এখানে

মানুষের কৃতিত্বের অভিমানেরই বা স্থান কোথায়, অকৃতিত্বের অবসাদেরই বা অবসর কই? পুরাতন উপনিষদে পড়িয়াছিলাম—

যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারং ঈশং
তদা পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনং শান্তমুপৈতি।"

অর্থাৎ সাধক যখন নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প অদ্বৈত পরম পুরুষকে এই বিশ্ব-জগতের একমাত্র কর্ত্তারূপে প্রত্যক্ষ করেন, তখন পাপ, পুণ্য প্রভৃতির ভেদ-বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া উঠিয়া তিনি নিরঞ্জন শান্তভাব অথবা নিরঞ্জন শান্তস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন। এই শ্রুতিবাক্য মহেন্দ্র বাবুর মধ্যে অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর এইখানেই টলষ্টয় বা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মহেন্দ্র বাবুর পার্থক্য। এই পার্থক্যের অর্থ মহেন্দ্র বাবুর চরিত্র ভারতের সনাতন সাধনার উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রতীচ্য খৃষ্টিয়ান সাধনার উপরে গড়িয়া উঠে নাই। মহেন্দ্র বাবু ঘোরতর অদ্বৈতবাদী। টলষ্টয় এবং গান্ধী সেরূপ অদ্বৈতবাদী নহেন। মহেন্দ্র বাবু এজগতে একটা পুণ্যের এবং আর একটা পাপের এই দুইটা পরস্পর-বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। পাপ এবং পুণ্য, উভয়ের ভিতর দিয়াই এক অনাদি অনন্ত লীলাময় প্রভুর লীলা প্রকট হইতেছে; এবং এই পাপ এবং পুণ্যের বিদ্যালয়ের পাঠ পড়াইয়া তিনি জগতের জীবকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছেন। ইহাই মহেন্দ্র বাবুর সাধনের মূল সূত্র। আর এই-খানেই বোধ হয় টলষ্টয় এবং গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য।

(৪)

মুরারিপুকুরের বোমার মামলায় মহেন্দ্র বাবুর ভাগিনেয় উল্লাসকর এবং পুত্র অশোকচন্দ্র, আর তাঁহার শালাপুত্র নগেন্দ্রনাথ ও ধরণীনাথ ধরা পড়িলে মহেন্দ্র বাবু কলিকাতায় আসেন। সে সময় একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি কহিয়া-ছিলাম—"বেহাই, দুইটী নিরপরাধ স্ত্রীলোকের হত্যা হইল, ইহা প্রাণে বড় লাগে"। মহেন্দ্র বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বেহাই, মরণটা কি অপরাধের ফল? কে কাকে মারে? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই সকল ঘটে। এর উপরে কি আর কোনও কথা আছে?" ইহার উপরে আমার কোনও কথা বলার ছিল না। যে কথাটা কহিয়াছিলাম, তার জন্যও লজ্জাবোধ করিতে লাগিলাম।

মহাত্মা গান্ধী কাহারও উপরে হাত তুলিতে চাহেন না। কোনও প্রকারের শারীর বলপ্রয়োগের দ্বারা কোনও কার্য্যসিদ্ধি করিতে গেলে, তাঁর ধর্ম্মবুদ্ধিতে

বিশেষ আঘাত লাগে। তিনি চাহেন না, দুনিয়ার এমন অবস্থা হউক যাহাতে মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হইবে না। প্রেমের শক্তিতে তিনি পরকে পরস্পরকে চালাইবে। হিংসা দ্বেষ দমনে বিশ্বাস করেন। অপরাধীর শাস্তি হউক, গান্ধী তাহা চাহেন। অন্যায় অবিচারে তাঁহার বিশ্বাস আছে। তবে অত্যাচারীকে তিনি হাতে না মারিয়া ভাতে মারিতে চাহেন। পঞ্জাবের অত্যাচারের জন্য দায়ী এবং ওডায়ারের ফাঁসি হওয়া উচিত; এবং যতদিন না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সে অত্যাচারের প্রতিকার হইল না—মহাত্মা নানা স্থানে সময়ে এমনই কথা কহিয়াছেন।

মহেন্দ্রচন্দ্র এরূপ অহিংসায় বিশ্বাস করেন না। সংসারের ভার আমাদের উপরে আসিয়াছে, তাঁর ইচ্ছায় অত্যাচারী অত্যাচার করে, তিনিই তাহার শাসনও করিয়া থাকেন। দাস কি কখনও প্রভুর সংসারে নিজের উপরে ন্যায় অন্যায়ের বিচারের ভার লইতে পারে? তাহার অধিকার সেবায়; দণ্ডধারণে নয়। তবে প্রভুর আদেশে সে দণ্ডদানও করিতে পারে, দণ্ড দিতে পারে। কিন্তু ইহাতে তাহার কোনও স্বামিত্বের অধিকার জন্মিতে পারে না। এই জন্য মহেন্দ্র বাবু কাহাকেও কোনও প্রকারের শাসন করিতে চাহেন না। এমন কি পরিবারের ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগের উপরে তিনি কোনও প্রকারের শাসন চালান না। প্রত্যেক নিজেদের প্রকৃতির মতে গড়িয়া উঠুক, ইহাই তাঁহার শিক্ষার আদর্শ।

যেমন পরিবারে, তেমনি সমাজে, সকলেই তিনি এই নীতির অনুসরণ করিয়া চলেন। পরিবারের লোকে পরস্পরকে শাসন করিতে যায়, তিনি ইহা দেখেন। কিন্তু তাহাদের কর্ম্মব্যাপারে তাঁর জোর করিয়া নিজের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে যান না। এমন কি কোনও বিষয়েই তাহাদের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করেন না। সমাজের লোকের সঙ্গেও তিনি এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। সম্প্রতি একটা ঘটনার কথা শুনিয়াছি, যাহাতে মহেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রের এই দিকটা উজ্জ্বল প্রকাশ পাইয়াছে। কিছুদিন হইল গ্রামের দু' চারিটি লোক মিলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে অত্যন্ত প্রহার করে। এমন কি তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কাও উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র বাবু এ সময়ে বাড়ীতে ছিলেন না। কলিকাতায় এই অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠেন এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। আদালতে মামলা করিয়া অত্যাচারীর সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করা সকলেরই অভিপ্রেত হয়

তাঁহারা মহেন্দ্র বাবুর অপেক্ষায় রহিলেন। বাড়ী আসিয়া সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া শুনিয়াছি, মহেন্দ্রবাবু ভাল-মন্দ কোনও কথাই কহিলেন না। নীরবে এই অত্যাচার সহিয়া গেলেন। তাঁহার অন্তরে এই অত্যাচারের প্রতিবিধানের কোনও ইচ্ছার উদ্রেক হইল না। এই ঘটনাকে তিনি তাঁহার ইষ্ট-দেবতা শ্রীদয়াময়ের লীলা বলিয়া মাথা পাতিয়া লইলেন। আদালতে যাওয়া ত দূরের কথা, গ্রামের লোকেরাও এই অপরাধীর কোনও দণ্ডবিধান করুন, মহেন্দ্র বাবু ইহাও ইচ্ছা করিলেন না। তবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় যাহা হয় হউক।

একদিন আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে মহেন্দ্র বাবু আহার করিতে বসিয়াছেন। বন্ধু-পত্নী আদর করিয়া খাওয়াইতেছেন। আমাদের সমাজে যেমন রীতি আছে, তিনি নানা প্রকারের মিষ্টান্ন মহেন্দ্র বাবুর পাতে চাপাইয়া তাঁহাকে খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র বাবু হাত তুলিয়া কহিলেন, "ঠাকুর আর চাচ্ছেন না, আর কিছু পাতে চাপাবেন না।" বন্ধু-পত্নী হাসিয়া কহিলেন, "আপনার ঠাকুর যদি এখন একটী স্ত্রীলোক চাহেন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে তাই আনিয়া দিতে হইবে?" মহেন্দ্র বাবু ধীর গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "ঠাকুর যদি চান, আমার সাধ্য কি, আমি তাঁকে না [illegible]

এই [illegible] মহেন্দ্রের জীবনের মূলসূত্রটী প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নিকটে ভজন ও ভোজন দুইই সমান। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে আছে—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত, তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ যে যে কর্ম্ম করেন, তাহাই ব্রহ্মেতে সমর্পণ করেন। মহেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রে এই শাস্ত্রোপদেশ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অহৈতুকী ভক্তি মহেন্দ্রচন্দ্রের সাধনার ভিত্তি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি একমাত্র কর্ত্তা, তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে নিজের কর্ত্তৃত্ব, স্বামিত্ব প্রভৃতি ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া অন্তরে বাহিরে সকল প্রকারের অবস্থা ও ঘটনার মধ্যে সেই ইচ্ছাময়ের বিচিত্র লীলা দেখা ও সম্ভোগ করাই মহেন্দ্রচন্দ্রের জীবনের একমাত্র সাধ্য। আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা কহিয়াছে, সেই অবস্থালাভই মহেন্দ্র-চন্দ্রের লক্ষ্য। অথবা লক্ষ্য বলিলেও বোধ হয় তাঁহার জীবনের ও চরিত্রের মূল সত্যের অপলাপ হয়। কারণ, ইহাতেও নিজের একটা সংস্কার আছে বলিয়া বুঝায়। তাঁহার অজ্ঞাতসারে এরূপ বা অন্য প্রকারের কোনও সঙ্কল্প

অন্তরের অন্তস্তলে থাকিলেও জ্ঞানের ভূমিতে মহেন্দ্রচন্দ্র তাহাকে কোনও স্থানই দিবেন না। আমার ইহাই মনে হয়। একটী ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে।—

"ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মিলন হবে
তব প্রেম আবির্ভাবে, আত্মা হবে স্বর্গধাম।"

এই সঙ্গীতটী মহেন্দ্রচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়। দু' একবার তাঁহাকে প্রাণ, মন আত্মা নিজের সমুদয় প্রকৃতিকে একাগ্র করিয়া এই সঙ্গীত গাহিতে শুনিয়াছি। এই সঙ্গীতের অন্তরালে মহেন্দ্রচন্দ্রের জীবনের ও সাধনের সঙ্কেতটী ধরিতে পাওয়া যায়।

(৫)

এই বিশ্বে ভাল ও মন্দ, উপদ্রব ও নিরুপদ্রব, বিগ্রহ এবং শান্তি সকলই আছে। আলো এবং ছায়ার মতন এ সকল বিরুদ্ধ ভাব মানুষের প্রকৃতির ভিতরে তাহাদের চরিত্রে এবং কর্ম্মে অপরিহার্য্যরূপে পরস্পরের সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে। এ সকলের দ্বারাই বিশ্বের বিচিত্রতা সম্পাদিত হইতেছে। মন্দ ভালকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। আবার ভাল এই মন্দকেই নিজের প্রভাবেই ভাল করিয়া দিতেছে। পাপ পুণ্যের প্রভাকে উজ্জ্বল করে। পুণ্য পাপকে শোধন করিয়া দেয়। বিগ্রহ শান্তির মূল্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করে। মারা-মারি কাটাকাটির ভিতর দিয়াই আমাদের শান্তির মর্য্যাদাবোধ জন্মে। আবার শান্তি আপনার লোভনীয় মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া বিগ্রহের প্রকৃতিকে সমূলে নষ্ট করে। এই ভাবেই লীলাময়ের এই সংসারলীলা চলিতেছে। এই লীলার সন্ধান যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে যাহা ঘটে, তাহাই 'ভগবদ' ইচ্ছার প্রকাশ। তাঁহারা নিজেদের ভগবানের লীলা-পুত্তলী বলিয়া মনে করেন। জগতের সকল মানুষকেই এই ইচ্ছাময়ের লীলা-পুত্তলীরূপেই দেখেন। সুতরাং ভাল এবং মন্দ, শান্তি এবং বিগ্রহ, প্রেম এবং অপ্রেম, পুণ্য এবং পাপ, এ সকল ভেদাভেদ দর্শনে তাঁহারা কখনও বিচলিত হন না। সংগ্রামের ভিতরেও তাঁহারা তাঁহাকেই দেখেন—যিনি আবার শান্তির পঙ্কজ সরোবরে নিজের অঙ্কলক্ষ্মীর সঙ্গে চিরদিন বিহার করেন। মহেন্দ্রচন্দ্র এই দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন। আর এইখানেই টলষ্টয় কিম্বা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মহেন্দ্রচন্দ্রের বিশাল প্রভেদ দেখিতে পাই। তবে আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে টলষ্টয় এবং মহাত্মার সঙ্গে মহেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রের আশ্চর্য্য সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সাদৃশ্য

দেখিয়াই অরবিন্দ ষোল বৎসর আগে মহেন্দ্রচন্দ্রকে বাংলার টলষ্টয় কহিয়াছিলেন।

(৬)

টলষ্টয়ের মতন মহেন্দ্রচন্দ্রও অতি সম্ভ্রান্ত এবং সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ ৺রামদুলাল মুন্সী ত্রিপুরা রাজদরবারের দেওয়ান ছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদের বাড়ীকে এখনও কালীকচ্ছে দেওয়ান-বাড়ী কহে। রামদুলাল সেকালের রীতি অনুসারে পার্শী এবং বোধহয় আরবীও শিক্ষা করেন। ঠিক বলিতে পারি না, বোধহয় তিনি সংস্কৃতও জানিতেন। বেদান্ত-দর্শনের মূল সত্যগুলি যে তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গে যেমন রামপ্রসাদ, পূর্ব্ববঙ্গে সেইরূপ রামদুলাল শাক্ত-ভজন সঙ্গীত রচয়িতারূপে প্রসিদ্ধ। এই সকল শাক্ত সঙ্গীতকে আমাদের দেশে "মালসী" কহে। আমার বাল্যকালে রামদুলালের মালসী আমাদের অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক পত্রিকা "প্রতিভা"তে রামদুলালের একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিলাম। এটী রামদুলালী মালসীর মধ্যে যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, এমন বলিতে পারি না। কিন্তু রামদুলালের সাধনার ভক্তির দিক্‌টা তেমন ফুটিয়া না উঠিলেও, তত্ত্বের দিক্‌টা বেশ ফুটিয়াছে। এই সঙ্গীতটী এখানে তুলিয়া দিলাম।

জানি গো জানি গো তারা, তুমি জান ভোজের বাজী।
যে নামে যে ডাকে তোমায়, তাইতে তুমি হওত রাজী॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ।
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী বলে রাধিকাজি॥
শাক্ত বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি।
শিল্পী বলে বিশ্ব-কর্ম্মা, বদর বলে নাবের মাঝি॥
মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা।
আল্লা বলে ডাকে তোমায় সৈয়দ, পাঠান, মোগল, কাজী॥
শ্রীরামদুলালে বলে, বাজী নয় এ জেন ফলে।
এক ব্রহ্ম দ্বিধাভেবে মন আমার হয়েছে পাজী॥"

রামদুলাল সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এক [illegible] তৈয়ার করিয়াছিলেন। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করিয়া গুরুদেবকে আমন্ত্রণ করেন। অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিন গুরুকে বাড়ীটা দেখাইতে লইয়া

যান। বাড়ী দেখা শেষ হইলে, "বাড়ীটা কেমন হইয়াছে," গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন। গুরু কহিলেন, "বাবা, এমন বাড়ীতেই ত বাস করতে হয়।" ইহার পর রামদুলালের আর সেই গৃহে বাস করা হইল না। বাড়ীটার উপরে গুরুদেবের লোভ পড়িয়াছে দেখিয়া পরদিবস তিনি গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান না করিয়া যথাবিধি গুরুদেবের চরণে বাড়ীটি দান-উৎসর্গ করিলেন। রামদুলালের এই কীর্ত্তিকথা আজিও সে অঞ্চলের লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

মহেন্দ্রচন্দ্র এই দেওয়ান রামদুলালের পৌত্র। পিতামহের সমৃদ্ধি এখন আর নাই। কিন্তু সে সম্ভ্রম কমে নাই। বরঞ্চ বোধ হয় বা বাড়িয়াছে। বিস্তৃত ভদ্রাসন বাড়ী। কিন্তু কোথাও কোনও প্রকারের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ নাই। এক সময়ে মহেন্দ্রচন্দ্র বিস্তর উপার্জ্জনও করিতেন। ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে ধনবৈভবে সমৃদ্ধ হইতেও পারিতেন। কিন্তু বহুদিন হইতেই তিনি টলষ্টয়ের মতন সে-পথ পরিত্যাগ করিয়া একরূপ দারিদ্র্য-বৃত্তি অবলম্বন করেন। এখনও ইচ্ছা করিলে তিনি স্বচ্ছন্দে অন্য ভদ্রলোকের মতন দু' পাঁচজন দাসদাসী রাখিতে পারেন। এক সময়ে অনেক চাকর-বাকর ছিল। কিন্তু একদিন রোগী দেখিতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি শ্রীদয়াময়ের দাস। আর দয়াময়ের দাস বলিয়া সকল সন্তানেরও দাস। তাঁর ত কোনও দাস-দাসী থাকিতে পারে না। সেই দিনই বাড়ী আসিয়া সকল প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ চুকাইয়া দিলেন। সেদিন হইতে বাড়ীর পুত্র কন্যারাই পরস্পরের এবং অতিথি অভ্যাগতের পরিচার্য্যা করিয়া আসিতেছে।

মহেন্দ্রচন্দ্রের গৃহে সর্ব্বদাই অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হবেন। কেহ বা রোগের চিকিৎসা করাইতে আসেন। তাঁহার পিতা আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বিস্তর মন্ত্র-শিষ্য আছেন। তাঁহাদের অনেকে গুরুদেবের সমাধি দেখিতে আসেন, আত্মীয়-কুটুম্বের ত কথাই নাই। অরবিন্দ যখন মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যান, সেই সময়েও অনেকগুলি অতিথি-অভ্যাগত ছিলেন। আর মহেন্দ্র বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ নিজেদের হাতে এ সকল অতিথির পরিচর্য্যা করিতেন। টলষ্টয়ের মতন মহেন্দ্র বাবুও লোকের সঙ্গে সকল প্রকারের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ কাটিয়াছেন। তবে পদ্ধতিটা আমাদের নিজের; য়ুরোপ হইতে ধার করা নহে। আমাদের "স্বদেশীর" জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই মহেন্দ্র বাবু স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ করেন। আজিকালি যাহাকে খদ্দর কহে, সেইরূপ ধুতি এবং চাদর—ইহাই মহেন্দ্র বাবুর পরিধেয়। জামা জোড়া বোধ হয় তিনি

বহুদিন ব্যবহার করেন নাই। ইংরাজীতে যাহাকে Simple life কহে, মহেন্দ্র বাবু বহুদিন হইতেই তাহা অবলম্বন করিয়াছেন। আর এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই অরবিন্দ তাঁহাকে বাংলার টলষ্টয় কহিয়াছিলেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

৺ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(জীবনী প্রসঙ্গ)

২

পিতা ও পিতৃব্যগণ।

গাঙ্গুলী বংশ কুলে শীলে মর্য্যাদায় বিদ্যাবত্তায় প্রসিদ্ধ। তারকনাথের পিতা মহানন্দ সত্যবাদী, স্বাধীনচেতা, নিষ্ঠাবান্, পরদুঃখকাতর ও সহৃদয় ছিলেন। ইঁহারা তিন সহোদর। শ্রীমন্ত জ্যেষ্ঠ, মহানন্দ মধ্যম, ও গঙ্গানন্দ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ শ্রীমন্ত হোগলা পরগণার জমিদারের নায়েব ছিলেন। মহানন্দ গৃহে থাকিয়া ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। কনিষ্ঠ গঙ্গানন্দ মেদিনীপুরে নবাব সরকারে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার বেতনও যথেষ্ট ছিল। তৎকালীন প্রথানুসারে তিন-ভ্রাতাই পারস্য ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া সাধারণের নিকট ইঁহারা মুন্সী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল ও সুখে দিনপাত হইত। ধর্ম্মনিরত তিন ভ্রাতা দেশহিতকর অনেক পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ইহারা দরিদ্রের মাতাপিতা ও বন্ধু ছিলেন। দানশীলতার জন্য গাঙ্গুলীবংশ চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীনেরা এখনও ইঁহাদের দানশীলতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। গাঙ্গুলী-বাটীতে হিন্দুর সমস্ত পূজাপার্ব্বণ সম্পন্ন হইত। তারকনাথও পুণ্যচরিত্র পিতা ও পিতৃব্যগণের এই সমস্ত সদ্‌গুণরাশি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন ধার্ম্মিক দানশীল ও পরহিতব্রতধারী বংশে জন্মগ্রহণ না

করিলে কেহ কি কখনও উত্তর জীবনে এমন দানশীল হইয়া চৈত্রের দাবদগ্ধ পিপাসাতুর পথিকের পিপাসা নিবারণের জন্য জলসত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে? তারকনাথ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা পিতৃপিতৃব্যগণের পুণ্যপদাঙ্ক ও পূতচরিত্রানুস্মরণে।

তারকনাথের মাতার কথা।

শ্রীমন্ত গাঙ্গুলীর সংসার একটী আদর্শ হিন্দু পরিবার। তাঁহার পরিবারে চারিধারে শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, শৃঙ্খলা ও হিন্দুর একনিষ্ঠ ধর্ম্মভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। বাড়ীর বড়বধূ উমাদেবী ছেলেদের লালনপালন করিতেন। মেজবধূ রাসমণি তারকনাথের জননী গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। গঙ্গানন্দের দুই বিবাহ, প্রথমা স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁহার ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠা বলিয়া তাঁর উপর সংসারের ছোট ছোট কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। তারকনাথের জেঠাইমা এতই মধুর ও স্নেহভাষিণী ছিলেন যে, বাড়ীর এমন কি পল্লীর সমস্ত ছেলেরা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট থাকিতে ভাল বাসিত।

তারকনাথের জননী রাসমণি মৃদুভাষিণী, অতিশয় দয়াবতী, সরলা, ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা ও পরদুঃখকাতরা রমণী ছিলেন। তাঁহার আকৃতি ও শারীরিক গঠন প্রণালী বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও খর্ব্বাকৃতি ছিল। তারকনাথ মাতা অপেক্ষা জেঠাইমার নিকট অধিকক্ষণ থাকিতে ভালবাসিতেন। সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতিগুণ যেমন তারকনাথ মাতৃপ্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার স্বাভাবিক সরল ও উদার প্রেম-স্নেহপ্রবণ হৃদয়ও মাতৃপ্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মাতৃ-বিয়োগ ও জেঠাইমা।

অষ্টমবর্ষ বয়সে তারকনাথের মাতৃ বিয়োগ হয়। তারকনাথ স্নেহময়ী দেবীসদৃশী জেঠাইমার স্নেহক্রোড়ে লালিত পালিত হন। তারকনাথের মাতার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জেঠাইমা মাতৃ-বিয়োগ-কাতর তারকনাথের জন্য অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সদাসর্ব্বদা তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল,—কেমন করিয়া এই মাতৃহীন বালককে ভুলাইয়া রাখিবেন? কেমন করিয়া বালক মাতৃ-অভাব বুঝিতে না পারে? পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, বড় গৃহিণী বাটীর ছেলেদের লালন-পালন করিতেন এবং বাটীর সকল ছেলেরাই তাঁহার নিকট অধিক সময় থাকিতে

ভালবাসিত। শিশু তারকনাথও মাতা অপেক্ষা অনেকক্ষণ জেঠাইমার নিকট থাকিতেই ভালবাসিত। দেবীসদৃশী জেঠাইমা এমনই স্নেহ-গুণে তারকানাথকে লালন পালন করেন যে, তারকনাথকে কখনও মাতৃ-অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। মাতৃ-স্বরূপিণী জেঠাইমার স্নেহের কথা শতবার শত মুখে তারকনাথ তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের নিকট ব্যক্ত করিতেন।

বাল্য-জীবন বাল্যক্রীড়া।

তারকনাথের শৈশব ও বাল্যজীবন সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় নাই। যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা একে একে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে দুইজন বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহারা তারকনাথের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। শিশু তুলারাশি মীনলগ্নে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে দেখিয়া, শিশুর পিতার ইচ্ছানুযায়ী শিশুটীর নামের আদ্যক্ষর 'ত' যোগে তারকনাথ নামকরণ হয়।

তারকনাথের শৈশবকাল অত্যন্ত সুখে ও আদরে অতিবাহিত হইয়াছিল। শিশু তারকনাথ সমস্ত পরিজনের নয়নের মণিস্বরূপ ছিলেন। তারকনাথের জন্মের বহুপূর্ব্বে শ্রীমানের কয়েকটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

ছয় বৎসর বয়সে গুরুমহাশয় জয়মল্লিকের নিকট তারকনাথের হাতেখড়ি হয়। গাঙ্গুলীদের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপের এক অংশে জয়মল্লিকের পাঠশালা বসিত। মল্লিক মহাশয় জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাঠশালায় শিশু তারকনাথের মেধা বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি দেখিয়া গুরুমহাশয় সাতিশয় মুগ্ধ হন। ক্রমে শিশু তারকনাথ আপনার অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধা ও স্মরণশক্তিবলে অন্যান্য ছাত্রগণ অপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া গুরু জয়মল্লিককে উত্তরোত্তর বিস্মিত করিতে লাগিল।

গুরু মহাশয় জয়মল্লিকের পাঠশালাটি কিরূপ ছিল, পাঠকগণ যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্বর্ণলতার পাঠশালার চিত্রটী একবার স্মরণ করুন। তারকনাথ নিজ শৈশব-স্মৃতি অনেক আত্মীয় ও পুত্রগণের নিকট মধ্যে মধ্যে কথা-প্রসঙ্গে বলিতেন। স্বর্ণলতায় চিত্রিত পাঠশালার চিত্র তাঁহার মধুর শৈশব-স্মৃতিপূর্ণ পাঠশালার চিত্র।

বাল্যকালে তারকনাথ অতিশয় চঞ্চল প্রকৃতি ছিলেন। জেঠাইমাকে ইহার জন্য চিন্তিত থাকিতে হইত। বাল্যে দুষ্টামি ও চাঞ্চল্যের হাত এড়াইতে

না পারিলেও তারকনাথ লেখা পড়ায় কখনও অমনোযোগী ছিলেন না, জেঠাইমার স্নেহ-শাসন-গুণে নিত্য পাঠ সাঙ্গ না করিয়া কখনও ক্রীড়ায় বাহির হইত না। বাল্যের এই পাঠানুরক্তি সম্বন্ধে তারকনাথের অন্যতম বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু বাহাদুর মহাশয় বলেন, "মেডিকেল কলেজে পাঠকালীন বরাবরই তারক বাবু যেমন আমোদ ও ক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন, তেমনি অসাধারণ রকমের অধ্যায়নশীলও ছিলেন। এই জন্য আমরা বন্ধুরা বিদ্রূপ করিতাম। একদিন তারক বাবু কথাপ্রসঙ্গে তাঁর শৈশবের পড়াশুনার সম্বন্ধে একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, পড়াশুনার সময় খেলার সঙ্গীরা আসিয়া ক্রীড়ার প্রলোভন দেখাইত বলিয়া তাঁহাকে পালঙ্কের নীচে লুকাইয়া পড়া শুনা করিতে হইত।—"

বালকেরা সাধারণতঃ বহুভাষী হয়; কিন্তু তারকনাথ শৈশবে চঞ্চল ছিলেন বটে; কিন্তু অন্যান্য বালকের মত বহুভাষী ছিলেন না; তিনি অতিশয় অল্পভাষী ছিলেন। উত্তর জীবনেও দেখা গিয়াছে, তিনি বরাবর অল্পভাষী।

বাল্যকাল হইতেই তারকনাথের কথাবার্ত্তা অতিশয় মিষ্ট ছিল। দশমবর্ষীয় বালক তারকনাথ একদিন পাঠশালায় যাইবার জন্য অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, একটি বলিষ্ঠকায় ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য খুব চীৎকার করিতেছে। তারকনাথ ভিক্ষুকের চীৎকার শুনিয়া মনে মনে বড়ই চটিয়া যায় তারপর তাহাকে অতিশয় বলিষ্ঠকায় দেখিয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে দেখিয়া আরও চটিয়া ভিখারীকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলে; পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবার কথা তারক বলিতেছেন, এমন সময়ে তারকনাথের জেঠাইমা ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন; জেঠাইমা তারকনাথের কথা শুনিয়া বলেন, ছিঃ বাপ! ভিখারীকে ফিরাইতে নাই; ভিখারীকে ফিরাইলে পাপ হয় বলিয়া তিনি ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দিলেন। ভিক্ষুক এতক্ষণ একমনে তারকনাথের মুখপানে তাকাইয়া তার কথা শুনিতে ছিল; ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া ভিক্ষুক বলিল, মাঠাকরুণ! এই ছেলেটি কি আপনার? ছেলেটীর কথাগুলি বড় মিষ্ট, ঠিক যেন ময়নার বুলি।"

তারকনাথ বাল্যকাল হইতেই স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বী ছিলেন। তারকনাথ জেঠাইমার কথা শুনিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনে কখনও ভিখারী অথবা প্রার্থীকে ফিরাইবে না। শৈশবে বালকের সুকুমার হৃদয়ে জেঠাইমার

উপদেশে-পরোপকার বৃত্তির যে বীজ নিহিত হইল, যৌবনে প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর ও আদর্শচরিত্র ধার্ম্মিকপ্রবর রামতনু লাহিড়ী এই দুই মহাপুরুষের সাহচর্য্যফলে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া প্রৌঢ়ে মহান্ মহীরুহের সৃষ্টি করিয়াছিল। তারকনাথ কতশত দুঃখীর অভাব মোচন করিয়াছিলেন; অর্থাভাবে বিদ্যার্থীর বিদ্যা শিক্ষার অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া কত শত বিদ্যার্থীর বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; ক্রমে আমরা পরিচ্ছেদান্তরে যথাসময়ে এই সমস্ত কথা বলিব।

তারকনাথের মাতা ও জেঠাইমা যেরূপ দয়াবতী পরোপকারিণী ছিলেন, তাঁহাদের প্রকৃতিটিও নারীপ্রকৃতির সুকুমার সৌন্দর্য্যে ভূষিত ছিল। তারকনাথের হৃদয়-বৃত্তি নারীর সুকুমার ও কোমল হৃদয়-বৃত্তির মতই কোমল ছিল। শৈশব হইতে তিনি কখনও কাহারও দুঃখকষ্ট বা অশ্রুমলিন মুখ দেখিতে পারিতেন না। শীতের সময় একদিন একপ্রতিবেশীর বাটীতে একটী ভিখারী বালক গৃহস্থের নিকট মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিয়া শীতবস্ত্র প্রার্থনা করিল। বালক তারকনাথ সেই বাটীর একটী বালক-সঙ্গীর সহিত চণ্ডীমণ্ডপে ক্রীড়া করিতেছিল, ভিখারী বালক ক্রমান্বয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া শীতবস্ত্রের জন্য বাটীর গৃহিণীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল; কিন্তু কেহই ভিখারীর কথায় কর্ণপাত করিল না দেখিয়া বালক তারকনাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাটীতে আনিয়া নিজ শীতবস্ত্রখানি সানন্দচিত্তে দান করিয়া জেঠাইমাকে ভিখারীর সমস্ত কথা বলিল। জেঠাইমা তারকনাথের কথা শুনিয়া বলিলেন, কি করে নূতন জিনিষটা দিয়ে দিলি?—তারকনাথ ইহার উত্তরে বলিল "কেন জেঠাইমা তুমি ত বলেছ ভিখারীকে ফিরাইতে নাই"—ইহা শুনিয়া দয়াবতী স্নেহময়ী জেঠাইমা তারকনাথকে চুম্বন করিয়া গভীর স্নেহে বুক জড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এক দিবস বাটীতে একটী বৃহদাকার রোহিত মৎস্য আসিল। বাটীর অন্যান্য বালকেরা ও তারকনাথ জেঠাইমাকে ঘিরিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এই মাছটা আমার, এই মাছটা আমার, বালকগণকে শান্ত করিবার জন্য প্রত্যেককে এক একটী মাছ দেখাইয়া জেঠাইমা বলিলেন, এইটী তোমার, এইটী তোমার। প্রথমেই তিনি তারকনাথের মৎস্যটী কাটিয়া ফেলিলেন, মৎস্যটী যেমন দ্বিখণ্ড হইল সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ধারা বহিতে লাগিল,—তারকনাথ রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত মৎস্য দেখিয়া, ওমা, আমার মাছের একি হ'ল গো বলিয়া চক্ষে কাপড়

দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল ;—বালক কিছুতেই শান্ত হয় না, সমস্ত দিন মৎস্যের জন্য ক্রন্দন করিল। ইহার পর হইতে কখনও তারকনাথের সম্মুখে মৎস্য কুটা হইত না।

তারকনাথের বাল্যক্রীড়া সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিব। বাগআঁচিড়া গ্রামে ভগবান্ সেন নামক একজন প্রাচীন কবিরাজ ছিলেন। কবিরাজ মহাশয় গাঙ্গুলীদের পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে থাকিতেন। তারকনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অতিশয় স্নেহপাত্র ছিলেন। কবিরাজ ভগবান সেন রোগীর জন্য নানাবর্ণের বড়ী প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতেন। কবিরাজ-বাটীর প্রাঙ্গণে তারকনাথ সঙ্গীসহ খেলা করিত; কখনও কখনও একাকী বসিয়া কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ প্রস্তুত ক্রিয়া মনোযোগপূর্ব্বক দেখিত। তারকনাথ বৈদ্যের মত, মাটী গুবকী দিয়া নানাপ্রকার বড়ী প্রস্তুত করিত; সঙ্গীদের মধ্যে ও আপন ভাই ভগ্নীদিগের মধ্যে কবিরাজী-ক্রীড়া করিত। সঙ্গীরাও রোগীর মত অবনতমস্তকে সাগ্রহে আপনাপন রোগের ঔষধ বলিয়া তাহা গ্রহণ করিত। এই কবিরাজীক্রীড়া দেখিয়া তারকনাথের পিতা মহানন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "ইহার যেরূপ এখন হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর অনুরাগ দেখিতেছি, একে ডাক্তারী পড়াইলে কালে একজন ভাল ডাক্তার হইবে। পিতা মহানন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

"পৃথ্বীরাজ" ও "শিবাজী" *

(কিঞ্চিৎ সমালোচন)

ইদানীন্তন প্রথর সভ্যতালোকের যুগে মহাকাব্য প্রণয়ন হইতে পারে কিনা † এ সম্বন্ধে বোধ হয় লর্ড মেকলেই প্রথম তদীয় 'মিল্টন' বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার তর্কবিতর্কের সমস্ত কথা এস্থলে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক, নিম্নে কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত হইল :—

"He who in an enlightened and literary society, aspires to be a great poet, must first become a little child. He must take to pieces the whole wel of his mind. He must unlearn much of that knowledge which has perhaps constituted hitherto his chief title to superiority. His very talents will be a hinderance to him. His difficulties will be proportioned to his proficiency in the pursuits which are fashionable among his contemporaries, and that proficiency will in general be proportioned to the vigour and activity of his mind. And it is well if after all his sacrifices and exertions, his works do not resemble a lisping man or a modern ruin."

পঠদ্দশায় যখন এ সকল কথা পড়িয়াছিলাম, তখন বেমন করিয়া এ গুলিকে বেদবাক্যের ন্যায় মানিয়া নিয়াছিলাম। নাবিক সিন্দবাদের স্কন্ধে সেই আরণ্য-বৃদ্ধ যেমন চাপিয়া বসিয়াছিল, আমাদেরও কাঁধে তেমনি মেকলে প্রভৃতিরা চাপিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ভগবৎকৃপায় যখন ইংরেজীন ভূতের বোঝা

---

* "সাহিত্য-সভা"র ত্রয়োবিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে (২৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত। এই সভায় গ্রন্থকার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

† গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় " শিবাজীর " প্রস্তাবনায় এই-কথাটার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যথোচিত আলোচনা করেন নাই।

কতকটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া একটু স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিলাম, তখন দেখিলাম, ইহার ন্যায় এতবড় ছেঁদো কথা আর হইতে পারে না। যে 'মিল্টন' সম্বন্ধে মেকলে এই প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন—তিনি যদি বাইবেল সাহিত্যে পরম পণ্ডিত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি তদীয় মহাকাব্য "প্যারেডাইজ লষ্ট" লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তার পর সুষ্ঠু শব্দপ্রয়োগ, অলঙ্কারের অবতারণা ইত্যাদির নিমিত্ত শব্দশাস্ত্রে ও অলঙ্কার শাস্ত্রাদিতে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে চলে না। পূর্ব্বতন সাহিত্যাদিতে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে স্বীয় রচনার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারপূর্ব্বক দোষসংস্কারের ক্ষমতা জন্মে না। ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদিতে দখল থাকিলে ঐ সকল বিষয়াবলী হইতেও কাব্যের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ইহার চমৎকারিত্ব সম্পাদন করা যাইতে পারে। আমাদের কালিদাস সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন—তাঁহার রঘুবংশ তাই সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাকাব্য হইয়াছে। মাঘ ভারবি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন ছিলেন। বাঙ্গালাভাষারও মহাকাব্য লেখকগণ—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি—এক একজন অত্যুচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কালিদাসের যুগ ভারতবর্ষের এক অত্যুৎকৃষ্ট যুগ ছিল—উচ্চ সভ্যতার আলোকে উহা প্রোজ্জ্বল ছিল। আর ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রখররশ্মিপাতের সময়েই মধুসূদনাদির অভ্যুদয় হইয়াছে। ফলতঃ, সাহিত্যদর্পণাদিতেও 'মহাকাব্যের' যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাতে বরং এমন সব কথা রহিয়াছে, যাহাতে সুসভ্য সমাজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিরই একার্য্যে হাত দেওয়া সঙ্গত মনে হইবে—অবশ্য তাঁহার কবিপ্রতিভা থাকা চাই।

অতএব শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'পৃথ্বীরাজ' ও শিবাজী' মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কোন অসঙ্গত কাজ করেন নাই—বরং তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা যতদূর অবগত আছি, তিনি এ কার্য্যের খুবই উপযুক্ত ব্যক্তি।

পরন্তু সুযোগ্য গ্রন্থকার যোগীন্দ্র বাবু নানা প্রকারে আমাদের এমন ধারণা জন্মাইয়াছেন, যেন তাঁহার গ্রন্থকে আমরা 'কাব্য' মাত্র না ভাবি। 'পৃথ্বীরাজের' উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন—"কবিতার রসবিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।" 'উপক্রমণিকা" ও "প্রস্তাবনা" লিখিয়া সুদীর্ঘ 'মুখবন্ধ' প্রদান করিয়া, ভূরি ভূরি পাদটীকা এবং নানাবিধ চিত্র * দ্বারা তিনি

* যখন এতগুলি চিত্র দিয়াছেন, তখন দুই একের প্রতিপাদ্য ঘটনাবলীর স্থান নির্দ্দেশক দুখানি মাত্র চিত্র দিলেই শোভন হইত।

গ্রন্থদ্বয়কে পরিশোভিত করিয়া ইহাদের এমন একটা আকার দিয়াছেন যাহাতে আমরা এগুলি পদ্যেগ্রথিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ মনে করি। কবি তাঁহার কাব্য লিখিয়া যাইবেন—তাহা অবশ্যই "কান্তাসম্মিততয়া" উপদেশ প্রদায়কও হইবে। পরবর্ত্তী রসজ্ঞগণ উহার সমালোচনা লিখিবেন, টীকা করিবেন; প্রকাশকগণ চিত্রাদিদ্বারা উহার সৌষ্ঠব বিধান করিবেন। স্বয়ং কবিই যদি সব করিয়া গেলেন—তবে সমালোচকগণের অন্ন থাকিল কি? বিশেষতঃ "কবিতারসমাধুর্য্যং কবিরেত্তি ন তৎকবিঃ," ইহা মনে রাখিয়াও গ্রন্থকৃৎকবির টীকাটিপ্পনী হইতে বিরত থাকাই উচিত। ফলতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কবি—ইংরেজী, বাঙ্গালা—সংস্কৃত যে কোনও ভাষায়ই গ্রন্থ লিখিয়া থাকুন—এমনটি করিয়াছেন বলিয়া তো মনে হয় না। এটা যোগীন্দ্র বাবুর একটা বিশেষত্ব, সন্দেহ নাই।

কাব্যদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়াবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কবি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক মনে করি—কেন না যোগীন্দ্র বাবুই মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত "মটো" (motto) রূপে "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরো গুরুতর লাভ"—ইত্যাদি ৺বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ যোগীন্দ্র বাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় হয় নাই—কোনও সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাও কবিজনোচিত বিবিক্তপ্রিয়তারই নিদর্শন, সন্দেহ নাই।

যোগীন্দ্র বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন; এবং সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি এযাবৎ মাতৃভাষার সম্যক্ চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। বহু-দিন দেওঘরে হেড্‌মাষ্টারি করিয়াছিলেন;—সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহোদয় ঐস্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াও তদীয় সাহিত্য সেবাপ্রবৃত্তি সম্যক্ উৎসাহিত হইয়া পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে—একথা অবশ্যই আমরা ধরিয়া লইতে পারি। তখন তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিনা জানি না; তবে তাঁহার প্রাথমিক রচনার মধ্যে "একা-দশ অবতার" নামক একখানি ব্যঙ্গকাব্যের বিষয় আমরা অবগত আছি; গ্রন্থকার তাহাতে "ধূর্জ্জটি" নাম ধারণপূর্ব্বক স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরমানন্দ) প্রভৃতির (তদানীং "বঙ্গবাসীর" পরিপোষক দলের) উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছিলেন। * তারপর যোগীন্দ্র বাবু বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রম করিয়া

* পুস্তক খানি এখন দুষ্প্রাপ্য—স্বয়ং গ্রন্থকারের নিকট চিঠি লিখিয়াও পাওয়া যায় নাই, বাল্যে

মেঘনাদবধকাব্যের মহাকবি মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত সঙ্কলনপূর্ব্বক বঙ্গীয় সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইয়াছেন ; এইগ্রন্থে তাঁহার মৌলিকতা, গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও লিপিচাতুর্য্য সম্যক্ প্রকটিত হইয়াছে। অথচ চরিতাখ্যায়কের প্রেমান্ধতা ইহাতে নাই বলিলেই হয়। মধুসূদনের যে যে স্থলে দোষ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইয়াছে, যোগীন্দ্র বাবু তাহা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই এবং ঐরূপ স্থলে প্রায়শঃ তাঁহার সমাজহিতৈষণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সাধু সাধ্বীগণের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনেও যোগীন্দ্র বাবু লেখনী প্রয়োগ করিয়াছেন—'তুকারাম চরিত,' 'অহল্যাবাইএর জীবন চরিত' এবং "পতিব্রতা গ্রন্থাবলী" তাহার ফল। আর্য্যরমণীগণের একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা পরপুরুষের ছায়াস্পর্শও সহিতে পারে না, সেই ভাবের ব্যত্যয় ঘটাইতে একদল লেখক আজকাল বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—এবং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ এই দলের অগ্রণী। সনাতন ধর্ম্মের খাদ্যাখাদ্য, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার যেমন এখন একদল উৎপথপ্রতিপন্ন লোকে "হাঁড়িধর্ম্ম" "ছুৎমার্গ," ইত্যাদি বলিয়া আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতেছে—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও তেমনি পাতিব্রত্যের সনাতন উচ্চ আদর্শের খর্ব্বতা বিধানে কৃতসংকল্প হইয়া নারীসমাজের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। যোগীন্দ্র বাবু ঐ গ্রন্থাবলীতে ভারতের আদর্শ সতী-সাধ্বীদিগের চিত্রপ্রদর্শনপূর্ব্বক মহিলাগণের মহান্ উপকার করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার স্বদেশ ও স্বকীয় সমাজের হিতেচ্ছা প্রকটিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে তিনি কবিত্বশক্তিরও অনুশীলন করিয়াছেন—তদীয় "কঠোপনিষদের পদ্যানুবাদ" বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার একখানি কবিতাপুস্তকও * প্রকাশিত হইয়া প্রশংসালাভ করিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে একটি কবিতা বিদ্যালয়ের বালকগণের পুরস্কার-বিতরণী সভায় বহুস্থলে আবৃত্ত হইতে শুনিয়াছি, সেইটির নাম "মানচিত্রদর্শনে।" কবিতাটি দেশভক্তির উদ্দীপক এবং রচয়িতার মাতৃভূমির প্রতি অনাবিল প্রেমভাবের পরিচায়ক।

এইরূপে, সাহিত্যক্ষেত্রে সুলেখক, সুকবি ও স্বদেশানুরাগিরূপে প্রণিতযশা

ইহা পড়িয়াছিলাম, একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র আছে। তবে ইহা যে 'সরস' জিনিষ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* এ ছাড়া আমো পুস্তক (পদ্য এবং গদ্য) তৎকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে—বাহুল্য বশতঃ উল্লেখ করা হইল না। সবগুলিই সুলিখিত ও সর্ব্বজনপ্রশংসিত।

হইয়া পরিণতপ্রজ্ঞ যোগীন্দ্রবাবু 'পৃথ্বীরাজ' রচনায় প্রবৃত্ত হন। মধুসূদন দত্ত প্রথমবয়সে ইংরেজী ভাষায় 'ক্ষিয়শঃপ্রার্থী' হইয়া 'ক্যাপ্টিভ্ লেডী' লিখেন। এই 'লেডী'—পৃথ্বীরাজমহিষী 'সংযুক্তা'। মধুসূদনচরিত-লেখক যোগীন্দ্রবাবুর "পৃথ্বীরাজ" লেখনে 'ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী' কোনওরূপ অনুপ্রাণন করিয়াছে কিনা, তাহা বলিতে পারি না—তবে উভয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে ঘোরতর প্রভেদ বর্ত্তমান। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' আলোচনার ফলে তদীয় চরিতকারের হৃদয়ে মহাকাব্য লিখিবার সংকল্প জাগিয়াছিল কিনা, তাহাও বলা যায় না। "পৃথ্বীরাজে" মেঘনাদের অমিত্রাক্ষরছন্দঃ ব্যবহৃত হয় নাই—বরং পরবর্ত্তী "শিবাজী" এই ছন্দে আগাগোড়া রচিত। পরন্তু 'মেঘনাদবধ' যেমন সোণার লঙ্কার পতনের ইতিহাস, 'পৃথ্বীরাজ' ও স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির অধীনতাপাদনের ইতিবৃত্ত; উভয়েই বিষাদাত্মক কাব্য—মেঘনাদের প্রমীলার চিতারোহণ-দৃশ্যে পরিসমাপ্তি, পৃথ্বীরাজেরও শেষ দৃশ্য সংযুক্তার চিতারোহণ। তবে, মধুসূদন ঐ বিষাদাত্মক কাব্যের পরে অবসাদের প্রতিক্রিয়ার্থক অপর কোনও কাব্য লেখেন নাই—যেমন তাঁহার আদর্শকবি মিল্টন 'প্যারেডাইজ লষ্ট' লিখিবার পরে "প্যারেডাইজ রিগেইণ্ড" লিখিয়াছেন! এবিষয়ে যোগীন্দ্র বাবু মিল্টনের মত "পৃথ্বীরাজ" কাব্যের অবসাদ দূরীকরণার্থে "শিবাজী" লিখিয়া আমাদের হতাশহৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। "পৃথ্বীরাজ" কাব্যে গ্রন্থকার হিন্দুর পতনের ইতিহাস বিবৃত করিতে গিয়া এই অধঃপতনের নিদাননির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে তিনি তাঁহার স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুসারে স্বদেশের হিত সাধনকল্পে নানাভাবে সমাজের—তথা হিন্দুধর্ম্মেরও—গলদ ঘাটিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার দেশহিতৈষণার আন্তরিকতাসম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই—এবং তজ্জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; অথচ তিনি একজন প্রবীণ ও প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী বলিয়াও আমাদের অশেষ সম্মানভাজন। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার কতকগুলি কথা আমরা প্রতিবাদের যোগ্য মনে করি এবং তৎকরণার্থই এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

জগতের সমস্ত ব্যাপারই শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশেচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে। এইটি সর্ব্বপ্রথম কথা। তারপর ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়—পুণ্যে বৃদ্ধি, পাপে ক্ষয়—এটাও একটা মোটা কথা। এরূপ কথাই ইংরেজীতে 'ট্রুইজ্‌ম্' বলিয়া আখ্যাত হয়। যোগীন্দ্র বাবু 'পৃথ্বীরাজে' ভারতের পতনের কারণ ইহাই

নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'শিবাজী'তে তো 'মটো'রূপে বলিয়াছেন—"পাপে ধ্বংস পুণ্যে স্থিতি বিধি বিধাতার" ইত্যাদি। ইহাতে বাদপ্রতিবাদের কোনও কথা নাই। আমরাও বলিব, সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ কলিপ্রভাবে দিনদিন অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। একখানি পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলেই কলির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে :—

"ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিতস্তপো বিরহিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং
ক্ষৌণী মন্দফলা নৃপাশ্চ ফুটিলাঃ শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ।
লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়োঽতিচপলাঃ পাপানুরক্তা জনাঃ
সাধুঃ সীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি প্রায়ঃ প্রবৃত্তে কলৌ॥"

স্থানবিশেষে জলবায়ু দূষিত হইয়াছিল বলিয়াই যেমন ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি অভিনব ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তেমনি এই কলিকলুষিত সমাজের উপপ্লবের নিমিত্ত নানা দিগ্দেশ হইতে বিভিন্ন জাতি আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কলি যদি এপ্রকারই হইল, তবে কি লোক ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? তা নয়;—ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দ্বারা ভূরিশঃ আক্রান্ত হইলেও লোক যেমন ঔষধ ব্যবহার করে—আক্রমণ পরিহার করিবার জন্যও যেমন সাবধান হয়, তেমনই, অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইলেও আমাদিগকে তৎপ্রতিবেধক ব্যবস্থার অধীন হইতে হইবে—সাবধানে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ "ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিতঃ" সন্দেহ নাই—তথাপি একপাদ ধর্ম্ম এই ঘোর কলিতেও থাকিবে—নচেৎ সংসারস্থিতি অসম্ভব, কেন না, 'ধর্ম্মই' সকলকে "ধারণ" করিয়া রাখিয়াছে—"ধারয়তীতি ধর্ম্মঃ"। অতএব আমাদের সকলেরই এই এক চতুর্থাংশের ভিতরে অবস্থানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হওয়া উচিত। এই ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিতে পারিলে, আপাতঃ মন্দদশাপন্ন হইলেও পরিণামে কল্যাণ অনিবার্য্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে যাইতেছে; কলির পর পুনরায় সত্যযুগের আগমন সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত বিষয়। প্রকৃতির যে লীলা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাহাতে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন, সায়ং রাত্রি ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতেছে—আবার গ্রীষ্ম বর্ষাদিও চক্রবৎ ঘুরিতেছে। যে বৃক্ষটি আজ পুষ্পফলে সুশোভিত, কিয়দ্দিন পরে ইহা পত্রাদিশূন্য মৃতপ্রায় পরিলক্ষিত হইলে, পুনরায় নূতন পত্রমুকুলাদির আবির্ভাবে ইহা শ্রীসম্পন্ন হইয়া আমাদের নেত্রোৎসবের কারণ হইবে। আমাদের 'সনাতন' ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধেও ঐ কথা

বলিতে পারি—এবং এই অবসাদের মধ্যে এইরূপ ভাব পোষণ করিয়াই আমরা সান্ত্বনালাভ করিয়া থাকি। স্পষ্ট কথায় বলিব যে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, অথবা মূর্ত্তিপূজা, অথবা আচারধর্ম্ম, ইত্যাদি যে সকল বিষয় সনাতনধর্ম্মের বিশেষত্ব, এগুলির উপর সেই মোসলমান আক্রমণের সময় হইতে (কেন তাই বলি কেন, বৌদ্ধবিপ্লবের যুগ হইতেই) প্রচণ্ড আঘাত হইতেছে, মনে হয় যেন সনাতনধর্ম্মের ভিত্তিভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু ভয় নাই। যিনি গীতার শ্রীমুখে বলিয়াছেন "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" তিনিই এই সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবেন। এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে—সমস্তই কলির বিকার—কালক্রমে এই বিকার কাটিয়া যাইবে। "ভাল"র জায়গায় "মন্দ" আসিতে দেখিয়া ঈশ্বরবিশ্বাসী ইংরেজ কবি টেনিসনের উক্তি মনে পড়ে—

Old order changeth yielding place to new
And God fulfils himself in many ways
Lest one good custom should corrupt the world.

যখন লোকের দশার মন্দ ঘটে, তখন তাহার গুণও দোষে পরিগণিত হয়, গরীব যদি বিনীতভাবেও অপরের ত্রুটি দেখাইয়া দেয়, তবে তাহার উপর "বে আদব" প্রভৃতি কটূক্তিবর্ষণ হয়; ভাগ্যবান্ যদি অন্যের দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহার মর্ম্মপীড়াও জন্মান, তথাপি "স্পষ্টবাদীর" সুখ্যাতি লাভ করেন। তাই প্রবাদ হইয়াছে "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী"—এবং "তেজীয়সাং ন দোষায়"। হিন্দুরমণী জীবনের সারসর্ব্বস্ব পতিদেবতার অসহ্য বিয়োগযাতনা পরিহারকল্পে তথা পরলোকে স্বামীসহ চিরসম্মিলন আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক তদীয় চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সতীত্বের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল, ইহার ব্যাখ্যা হইল "নৃশংস বর্ব্বর" প্রথা। কেননা, হিন্দু এখন পরপদানত ভাগ্যহীন জাতি। এদিকে রুশবিজয়ী জেনারেল নোগি সস্ত্রীক "হারিকিরি" করিয়া স্বর্গত মিকাডোর অনুগমন করিলে—জগতে ধন্য-ধন্য রব পড়িয়া গেল। কেননা জাপানের এখন একাদশে বৃহস্পতি—জাপান সৌভাগ্যশালী। এই ভাবেই আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ—অর্থাৎ ইংরেজী-শিক্ষাদীক্ষায় যাঁহারা গঠিত, সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের ব্যবস্থাগুলির বিচার করিয়া থাকেন। বিজেতা জাতির যা' কিছু তা'ই ভাল, আর আমরা পদানত, আমাদের যা' কিছু তা'ই খারাপ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে

ইঁহাদের এইটিই ধারণা। তাই হিন্দুদের বর্ণাশ্রম বিভাগকে "জাতিধর্ম্ম দ্বেষ" নামে পৃথ্বীরাজ-কবি ভূয়োভূয়ঃ অভিহিত করিয়া, ইহা আমাদের অবনতির এক-তম নিদানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং" বলিয়া শ্রীভগবান্ যাহা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। "যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত্য দেশের কাউণ্ট টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষিগণের ও সোসিয়ালিষ্টগণের জীবনের চরম স্বপ্ন; ভারতবর্ষীয় যে সমাজে—শৃঙ্খলার ফলে এখনো হিন্দু জাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অন্য জাতীয়গণের তুলনায় অনেক কম; ভারতবর্ষের সে পুণ্য সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্যদেশের দারুণ জীবন সংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়;" * কেবল কাউণ্ট টলষ্টয় কেন, গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর "রিপ্লাবিক্" ঐ এবং কোম্‌তের দর্শনেও যাহার ন্যায় সমাজব্যবস্থা আদর্শরূপে কথিত হইয়াছে; সেই বর্ণভেদকে এভাবে হেয়রূপে প্রতিপাদিত করা সমাজহিতৈষী যোগীন্দ্র বাবুর উচিত হয় নাই। হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, কাল প্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই বর্ত্তমান অধোগতি ঘটিয়াছে। যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় অনেকেই ইহার ভিতরে একটা "দ্বেষ" দেখেন—ইহা ব্রাহ্মণকে শূদ্রের প্রতি "তুই হীন," "তুই ছোট" বলিতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু তাঁহারা এটুকু তলাইয়া দেখেন নাই যে, জাতিভেদের সঙ্গে অপর একটা বিষয়ও আছে; তাহা "জন্মান্তর বাদ"। ব্রাহ্মণজন্ম যদি শ্লাঘনীয় হয়, তবে ইহা পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতিরই ফল; ইহজন্মে দুষ্কৃতি করিলে আবার নীচযোনিতে যাইতে হইবে। এই যদি শাস্ত্র ব্যবস্থা হয়, তবে দম্ভদ্বেষ ইত্যাদির অবসর কোথায়? একজন অন্যের হাতে না খাইলেই যদি ঘৃণাপ্রকাশ হয়, তবে সদাচার ব্রাহ্মণ যে অনুপনীত বা অমন্ত্রক প্রাণাধিক আত্মীয়ের হাতেও খান না, এটাও কি 'ঘৃণা' বশতঃ? ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে আছে, তদীয় প্রপিতামহদেব তাঁহাকে কত স্নেহ কত আদর করিতেন, কিন্তু একদিন বালক শিবনাথ প্রপি-তামহের পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করাতে তিনি আর সেদিন আহার করেন নাই। আমাদের পল্লীগ্রামে আমরা নাপিত ধোবা এমন কি মোসল-মানকেও দাদা, কাকা, চাচা ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া সম্মান দেখাইয়াছি। তবে সহরে শুনিয়াছি সাহেবের হোটেলে গিয়া আহারে বসিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট

* ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কৃত "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। ডাঃ রায় জাতিবিভাগের বিষম বিরোধী হইয়াও যে এটুকু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা আমাদের শ্লাঘ্য বটে।

ব্যক্তিবিশেষকে দেখিয়া বাবু বলিয়া উঠিলেন, "বেটা উইল্‌সন্ এবার জাভ্‌টা মাম্বলে—সোণার বেণের সঙ্গে এক সাথ খেতে বসালে।" এরূপ চিত্র দেখিয়া কোনও ব্যবস্থায় বিচার চলে না।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জাতিভেদকে পতনের কারণ বলা কোনও রূপেই সঙ্গত হয় না। 'জয়চন্দ্র' ও 'পৃথ্বীরাজ' উভয়েই একজাতীয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত, ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ তো জাতিভেদমূলক নহে। সেইরূপ মীর্ জাফর ও সিরাজউদ্দৌলা একই ধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি ভেদ আসিল কোথা হইতে? পতনের মূলে একতার অভাব তাহা বর্ণভেদমূলক নহে, দূরকাঙ্ক্ষতা স্বার্থপরতা ইত্যাদিই অনৈক্যের নিদান। রাজনীতিক্ষেত্রে ইহাই সার কথা United we stand, divided we fall—

"একতায় স্থিতি আর অনৈক্যে পতন" কবি রঙ্গলাল যথার্থই বলিয়াছেন—

"একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন;
সেভাব থাকিত যদি পার হ'য়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন?"

অতএব জাতিবিচারের উপর দোষারোপ করা বৃথা। বরং ভিন্ন জাতীয়ের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ এবং আহার বিহার ইত্যাদি না করাতে হিন্দুর বিশেষত্ব-টুকু এত শতাব্দীর অধীনতা সত্ত্বেও বজায় আছে—নচেৎ হয়তো এই জাতি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইত।

যোগীন্দ্র বাবু 'পৃথ্বীরাজ' কাব্যের 'গ্রন্থাভাসে' 'দ্বিতীয় সর্গে' 'চতুর্দ্দশ সর্গে' 'পঞ্চদশ সর্গে' হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অনেক গলদ ঘাটিয়াছেন, তন্মধ্যে কতক-গুলি যে ন্যায্য কথাই আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আবার কতক-গুলি বিষয় গ্রন্থকারের সমাজসংস্কারবিষয়ে পক্ষপাতিতা হেতুক কাব্যে স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে 'জাতিধর্ম্মদ্বেষ' বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। সুখের বিষয়, 'প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে মোসলমানদের টিট্‌কারীর সুন্দরজবাব কবি তুঙ্গাচার্য্যের মুখে (দশম সর্গে) দেওয়াইছেন।* এছাড়া আমাদের, অর্থাৎ

* এই নিমিত্ত আমরা যোগীন্দ্রবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ, মূর্ত্তিরূপে যে সংস্কারকের দলভুক্তভা তাঁহার সম্বন্ধে অনুমিত হইয়াছে; তাঁহারা ত মূর্ত্তিপূজাকে 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া এটাও পতনের একটা কারণ বলিয়া থাকেন—"enervating influence of idolatry" কথাটা ইঁহাদেরই উক্তি।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী শাস্ত্রবিশ্বাসীর, মনে আঘাত লাগিতে পারে এমন কথা প্রাগুল্লিখিত অংশে রহিয়াছে—সেগুলির জবাব চলিতে পারে; তন্মধ্যে সহমরণ প্রথাসম্বন্ধেও ইতঃপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু অপর সকল কথার আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিবিস্তৃত হইয়া যায়, তাই এস্থলে ক্ষান্ত হইলাম। বিশেষতঃ ঈদৃশ দু'একটি বিতর্কের জবাব ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধের উত্তরে "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি-নিরাস" নামক পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

যেগুলি ন্যায্য বলিয়া ধরিয়া নিয়াছি সে সকল বিষয় প্রত্যেক জাতির পতনের ইতিহাসেই দেখা যায়; যথা গৃহবিবাদ মূলক অনৈক্য ইত্যাদি।

আমাদের জাতিগত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে কবি মোসলমানদের আক্রমণ ও ভারত অধিকার কল্পনা * করিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার নিজেরই উক্তি প্রতিকূল বলিয়া বোধ হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অর্থতো পাপের সংশোধন ও দূরীকরণ?—মোসলমান আসাতে আমাদের কোন্ পাপটা লুপ্ত হইয়াছে, কবি তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে ভাল হইত। "পৃথ্বীরাজ" কাব্যে সমাজের যে যে দোষ কবি দেখাইয়াছেন, তাহা শিবাজীর অভ্যুত্থান সময়েও প্রায় সমস্ত বর্ত্তমান ছিল—তথাপি শিবাজীর অভ্যুদয় হইল কেন?

"শিবাজী" কাব্যের একাদশ সর্গে রামদাসস্বামীর মুখে কবি যে সকল যুক্তি-দ্বারা শিবাজীকে উৎসাহদান করিয়াছেন, তাহার অনেকটা পৃথ্বীরাজেও খাটে এবং দু'একটা কবির কল্পনাপ্রসূতও বটে। শিবাজীর ন্যায় পৃথ্বীরাজও উৎসাহী শূর ছিলেন, একবার মোসলমানদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিতও করিয়াছিলেন। শিবাজীর যেমন 'সখীবাই' পৃথ্বীরাজেরও সংযুক্তা "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ" ইত্যাদি ছিলেন। পরন্তু পৃথ্বীরাজের চিতোররাজের ন্যায় মিত্র ছিলেন—শিবাজীর ঈদৃশ কোনোও মিত্র সহায় ছিল না। পৃথ্বীরাজের যেমন কনোজ কাশ্মীর প্রতিপক্ষ ছিল, শিবাজীরও জয়সিংহ প্রভৃতি রাজপুত একদিকে, অপরদিকে বিজাপুর প্রতিপক্ষ ছিল—অথচ মোগল তখন সম্রাট্‌ভাবে মহারাষ্ট্রের উপরও আধিপত্যসম্পন্ন ছিল, পৃথ্বীরাজের শত্রু মোসলমানের তখন ভারতবর্ষে

* ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "সংক্ষিপ্ত জীবনী" (৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) গ্রন্থে আছে, তিনি নাকি কোনও ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের স্বধর্ম্মবিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্তার্থে এদেশে মোসলমানের আগমন হইয়াছে। ৺ ভূদেব বাবুর এই অভিমত সামাজিক কল্পনা মাত্র—পরমার্থতঃ যদি তিনি এই মত পোষণ করিতেন, তবে "সামাজিক প্রবন্ধে" ইহার আলোচনা দেখিতাম—এই গ্রন্থই তাঁহার পরিণত বয়সের চিন্তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল।

কোনও অধিকারই ছিল না। সমগ্র মহারাষ্ট্র যেমন শিবাজীর অনুরক্ত ছিল, আজমীর ও দিল্লী এই দুই রাজ্যের লোকও পৃথ্বীরাজের জন্য প্রাণ দিতে সতত প্রস্তুত ছিল। শিবাজীর যেমন সাধু রামদাস গুরু ছিলেন, কবি পৃথ্বীরাজকেও তাদৃশ একটি গুরু—তুঙ্গাচার্য্য দিয়াছেন। জাতিভেদ মহারাষ্ট্রেও ছিল, দিল্লীতেও ছিল। ধর্ম্মভেদ (শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি) দিল্লীতেও যেমন ছিল, মহারাষ্ট্রেও তেমনই ছিল। কবি যে শৈব ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের দাঙ্গা, অথবা দেবমন্দিরে দেবদাসীর প্রশ্রয় অথবা চাণ্ডালের (পারিয়ার) প্রতি ব্রাহ্মণের ঘৃণার ভাব * ইত্যাদি (পৃথ্বীরাজের) পঞ্চদশ সর্গে দেখাইয়াছেন—সেগুলিতো আধুনিক কথা, শিবাজীর অভ্যুদয়ের পরের কথা, এসকল চিত্র "শিবাজী"তেও তো (অগস্ত্য মুনি ইচ্ছা করিলে রামদাসকে) দেখাইতে পারিতেন—যেমন "পৃথ্বীরাজে" তুঙ্গাচার্য্যকে দেখান হইয়াছে। "পৃথ্বীরাজে" যেমন মোসলমানেরা হিন্দুদের ধর্ম্ম ও সমাজের নিন্দা করিয়াছে, "শিবাজী"তেও (পঞ্চম সর্গে এবং দ্বাদশ সর্গে) তেমনই করিয়াছে—ইহাতে অন্য ধর্ম্মীর চক্ষে উভয়ের সময়েই হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের মৌলিক বিষয়গুলি নিন্দনীয়ভাবেই প্রতিভাত হইয়াছে।

অতএব মোসলমানের আগমনে আমাদের প্রায়শ্চিত্তটা (কেবল অত্যাচার ভোগ ব্যতীত) কিরূপে হইল, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। কলির প্রবলতা হেতুক ধর্ম্মের সঙ্কোচবশতঃ আমরা যে পাপের ভোগ ভুগিয়াছি ও ভুগিতেছি, সেটা নিঃসন্দেহ। মোসলমান দ্বারা সংশোধনটা কোনভাবে হইল তাহা বুঝা গেল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগতের সমস্ত কার্য্যই ভগবদিচ্ছায় ঘটিতেছে, এই মোসলমান কর্ত্তৃক ভারত অধিকার অবশ্যই তাঁহারই ইচ্ছায় সংঘটিত। কবি যোগীন্দ্র বাবু ইহাতে "উদ্দেশ্য" দেখিয়াছেন এবং "শিবাজী" কাব্যের অন্তিম সর্গে রামদাস স্বামীর মুখে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

"দুর্জ্ঞেয় বিধির বিধি, কিন্তু লক্ষ্য তাঁর
চরম কল্যাণ। বৎস দেখ বুঝি তুমি,
অধর্ম্মে অসদাচারে জাতিজ্ঞাতি দ্বেষে
মগ্ন দেখি হিন্দুগণে বিশ্বপতিদেব
পাঠাইলা মুসলমানে, অভিপ্রায় তাঁর

* পরন্তু গুণবান্ চণ্ডালের প্রতি সম্মাননার কথাও তো দেখা যায়—যথা "চাণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ" "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে" ইত্যাদি।

জ্ঞানে প্রেমে ধর্ম্ম তারা করিবে প্রচার ;
হবে শিষ্য, হবে গুরু আদানে প্রদানে।
শিখিবে মাধুর্য্য প্রেম ঔদার্য্য হিন্দুর ;
শিখাইবে মানবের ত্রাতাপাতা যিনি
প্রচারিলা যাঁর কথা পূর্ব্ব ঋষিগণ
এক অদ্বিতীয় তিনি, অরূপ অব্যয়।
বুঝাইবে তাঁর কাছে চণ্ডালে ব্রাহ্মণে
নাহি ভেদ জাতিদর্প ধর্ম্মবিঘ্নকর।
কিন্তু মোহবশে ভুলি' কর্ত্তব্য-আপন
শতশত বর্ষ তারা রহি হিন্দুস্থানে
না পড়িল হিন্দুশাস্ত্রে, না লভিল জ্ঞান ;
না পারিল শিখাইতে না শিখিল নিজে ;
বিচারিল ধ্বংসে ভঙ্গে সিদ্ধ হবে কাজ।
প্রভুত্ব ঐশ্বর্য্য লভি মজিল ব্যসনে,
অবজ্ঞায় অত্যাচারে পীড়িল হিন্দুরে।
প্রচারিল জাতিভেদ জেতাজিতরূপে
শতগুণ মর্ম্মন্তুদ।—"

এখানে, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে এই যে একটা "উদ্দেশ্য" আরোপিত হইল, কবি দেখাইলেন যে, সেই উদ্দেশ্য বিফল হইল—মোসলমানগণ না শিখাইল, না শিখিল। অর্থাৎ ভগবানের চালে ভুল হইল। যোগীন্দ্র বাবু বোধ হয় এটা ভাবিয়া দেখেন নাই— দেখিলে এরূপ লিখিতেন না। অপিচ মোসলমানের ঈশ্বর আর পূর্ব্ব ঋষিগণের 'ব্রহ্ম' (অরূপ অব্যয় দ্বারা ইহাই বোধ হয়) একই জিনিস নহে ; "নেদং যদিদমুপাসতে" আর মোসমানের উপাস্য (সগুণ) "রহিম ও রহমান্ (দয়ালু ও ন্যায়বান্) আল্লা একবস্তু হইতেই পারে না। দুঃখের বিষয়, কবি ("পৃথ্বীরাজ" দশম সর্গ) তুঙ্গাচার্য্য দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে মোসলমান-দিগকে তর্কে নিরুত্তর করাইয়াও (তাও ভবানীভক্ত-শিবাজীর গুরুমুখে) এইরূপ বলাইলেন।

কবি আরও একটি ভুল করিয়াছেন—এই "শিবাজী"রই "গ্রন্থাভাসে।" তিনি ক্ষত্রিয়-বিনাশ নিমিত্ত পরশুরামকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। পরশু-রাম ত্রেতাযুগের অবতার—ত্রেতার মধ্যভাগে তিনি ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ ধরণীকে

নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" যিনি মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যে আইসেন, পরশুরাম তিনিই—তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপ—সেটাও ত্রেতা দ্বাপর কলিব্যাপী—বড়ই অশোভন হইয়াছে। প্রাণিবধে একটা পাপ আছে—বিষধর সর্প মারিলেও কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; পরশুরাম তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু বলগর্ব্বিত যে দুষ্টক্ষত্রিয়গণ নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের সমূলে ধ্বংস সাধন করিয়া তাঁহার অনুতপ্ত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। তাঁহার ক্ষত্রিয় নাশের ফলে ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয়হীন অথবা বীর্য্যহীন হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং পরশুরামের পরবর্ত্তী —এবং পরশুরামের ক্ষাত্রতেজোগর্ব্ব দূরীকরণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণে পরিণত করিয়াছিলেন। * ইহারও বহুপরে মহাভারতের যুদ্ধ হয়—তাহাতে অসংখ্য ক্ষত্রিয় যোগদান করেন এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ভারতযুদ্ধের পর অশ্বমেধপর্ব্বেও সুবহু ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দেখা যায় এবং দ্বারকায় যদুবংশ তাহারও পরে (মুষলপর্ব্বে) বিধ্বস্ত হয়। যোগীন্দ্র বাবু ব্রাহ্মণ পরশুরামের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া বরং ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা জ্ঞাতিবধজনিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেই শোভন হইত। তবে শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা বহুদিন হইল সংবরণ করিয়া গিয়াছেন, শিবাজীর আবির্ভাবের প্রাক্কালে তাঁহাকে টানিয়া আনা যায় না, এই যদি আপত্তি হয়, তবে স্থানটা "সহ্যাদ্রি" স্থলে "বৈকুণ্ঠ" করিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। যত নষ্টের মূল তো শ্রীকৃষ্ণই—কেন না অর্জ্জুন তো জ্ঞাতিবধ করিতে নারাজ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইনিই "যুধ্যস্ব ভারত" বলিয়া প্ররোচনা দিয়া বিপুল কুরুকুল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু বহু ক্ষত্রিয়ের সংহারসাধন করিয়াছিলেন। ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া অশ্বমেধে হতাবশিষ্ট বহুক্ষত্রিয়ের বিনাশে সহায় হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজের অতিবিশাল বংশটি নির্ম্মূল করিয়া তবে ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। কবি বরং আরো আড়াই হাজার বৎসর পরবর্ত্তী আর একজন অবতারকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পারিতেন—ইনি রাজ্যপাট ছাড়িয়া প্রথম যৌবনেই যতিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" বলিয়া যে এক বাণী প্রচার করিলেন, তাহার ফলেই ভারত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, এটা অনেকেই বলিয়া থাকেন ও

* ব্রাহ্মণের কুলে ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন পরশুরামের জন্মবৃত্তান্ত এস্থলে স্মরণযোগ্য। বাহুল্য ভয়ে সেই কাহিনী বিবৃত করা হইল না।

বটে। যে যাহা হউক, পরশুরাম ব্রাহ্মণ বলিয়া এবং তৎকৃত ক্ষত্রিয়ধ্বংস ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিত বিগ্রহ ব্যাপার বলিয়া যদি কায়স্থ কবি এই উদ্ভট দৃশ্যের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। তবে যোগীন্দ্র বাবু কায়স্থকে ক্ষত্রিয় মনে করেন কিনা, এবং তাঁহার ঈদৃশ জাত্যভিমান আছে কিনা, আমরা অবগত নহি, তাঁহার কাব্যে তো জাতিধর্ম্মদ্বেষের বহুশঃ নিন্দাবাদই রহিয়াছে।

এখন পৃথ্বীরাজের পতন এবং শিবাজীর উত্থান সম্বন্ধে যথামতি দুএকটি কথা বলা যাইতেছে।—

শৌর্য্যবীর্য্য আভিজাত্য ইত্যাদি নানাবিষয়ে পৃথ্বীরাজ শিবাজী অপেক্ষা শ্রেয়ান্ ছিলেন,—শিবাজী সামান্য একজন জায়গীরদারের ছেলেমাত্র, শিক্ষাদি বিষয়েও হীন ছিলেন। তথাপি শিবাজীর পরম সৌভাগ্য বশতঃ সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছিল এবং তাঁহার কৃপায় 'ভবানীতে' দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। "পৃথ্বীরাজে" তুঙ্গাচার্য্য কবির কল্পনামাত্র—এবং এই তুঙ্গাচার্য্যকেও কবি এক "মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি"র উপাসক করিয়াছেন—"দেবী শুভঙ্করী" দেশমাতৃকার সাকার মূর্ত্তি—৺ভূদেব বাবুর "পুষ্পাঞ্জলি"তে এইরূপ মূর্ত্তি কল্পিতা হইয়াছেন এবং ৺বঙ্কিম বাবু "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে ইঁহারই বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু রামদাসশিষ্য শিবাজী এইরূপ 'কল্পিত' মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন না—তন্ত্রসম্মত জাগ্রৎ দেবীমূর্ত্তির ভক্ত ছিলেন—তাঁহার কৃপালব্ধ 'অসি' দ্বারা সমরবিজয়ী হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ নানাগুণসম্পন্ন হইয়াও ইন্দ্রিয়-বিজয়ী নিষ্কামব্রতাবলম্বী পুরুষ ছিলেন না—দেশের প্রতি মোসলমানদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন প্রণয়-ব্যাপারের প্রশ্রয় দিবার সময় নহে, সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের সাক্ষাৎ মাতৃষ্বস্রেয় ভ্রাতার কন্যা—কবি এই সম্পর্কই গ্রাহ্য করিয়াছেন। শাস্ত্রতঃ এই কন্যা পরিণয়যোগ্যা নহে। তাও আবার প্রবল প্রতিপক্ষের দুহিতা। পৃথ্বীরাজের ঐদিকে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এদিকে শিবাজী এ সকলের অতীত ছিলেন—৺ভূদেব বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস "অঙ্গুরীয় বিনিময়ে" দেখা যায়, শিবাজীর নিমিত্ত একটা প্রণয়ের ফাঁদ কল্পিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে পতিত হন নাই। শিবাজী যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ যদি একটু

* নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলম্" এরূপ কথা পুরাণে আছে, তদ্দ্বারা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অল্প পরেই যে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হয়, তাহাই সূচিত হইতেছে।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

"পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্"—

পুণ্যশ্লোক ৺ভূদেব বাবুর সুকৃতির পরিচয় আমরা তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ যশোবিবর্দ্ধক পুত্র ৺মুকুন্দদেব বাবু হইতেই সমধিক পাইয়াছিলাম। সেই মুকুন্দদেব আজ পরলোকপ্রাপ্ত। জানি না ৺ভূদেববাবুর প্রবর্ত্তিত সংকার্য্য সমূহ ভবিষ্যতে কিরূপে চলিবে, তবে আশা আছে, মুকুন্দদেবও পুণ্যলক্ষণ ছিলেন। তাঁহার সন্ততিবর্গ পিতৃপিতামহের নামযশঃ অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইবেন।

ছাত্রজীবনের শেষভাগে ভূদেববাবুর প্রবন্ধাবলী পড়িয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়াছিলাম—কর্ম্মজীবনে প্রবেশকাল হইতেই স্বধর্ম্ম ও স্বকীয় সমাজে অনুরক্তিহীন বহু ব্যক্তিকে ভূদেব-প্রবন্ধাবলী পাঠ করিতে প্রবর্ত্তিত করিয়া ফল পাইয়াছি; ফলতঃ বিলাতী মোহের এমন অমোঘ ভেষজ খুব কমই আছে। সে যাহা হউক, সামাজিক প্রবন্ধের উৎসর্গপত্রেই সর্ব্বপ্রথম মুকুন্দবাবুর নাম অবগত হইয়াছিলাম। তৎপশ্চাৎ 'অনাথবন্ধু' উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম—ইনি পিতার উপযুক্ত পুত্রই বটেন।

১৩০৫ সালে বোধ হয় পরোক্ষভাবে মুকুন্দদেব বাবুর সঙ্গে পত্রালাপ হইয়াছিল। তখন তাঁহার শ্বশুরের সার্জ্জন মেজর হেমচন্দ্র ব্যানার্জ্জী শ্রীহট্টের সিভিল-সার্জ্জন ছিলেন, আমিও তথাকার স্কুল ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টর ছিলাম। তিনি আমাকে 'অনাথবন্ধু' উপন্যাসখানি দিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিতে বলেন। আমি তাঁহার নিকটে একখানি চিঠিতে নাতিসংক্ষিপ্ত সমালোচনা (ইংরেজী ভাষায়) লিখিয়া * পাঠাই—তাহা তিনি মুকুন্দদেব বাবুকে প্রেরণ করিলে মুকুন্দবাবু

* কি লিখিয়াছিলাম স্মরণ নাই, তবে একটি কথা এখনও মনে আছে, তাহার মর্ম্ম এই—"ভূদেব বাবু পারিবারিক প্রবন্ধ প্রভৃতিতে যে সকল নীতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, উপযুক্ত পুত্র মুকুন্দদেব বাবু যেন সেগুলিরই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই (অনাথবন্ধু) উপন্যাসখানিতে একটি আদর্শ হিন্দুপরিবারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।"

সন্তোষ প্রকাশ করেন—এবং তাহারূপ বাঁধান একসেট ভূদেবগ্রন্থাবলী (খুব সম্ভব উপহারস্বরূপে) পাঠাইয়া দেন। দুঃখের বিষয়, সেইখানি হস্তান্তরিত হইয়া প্রনষ্ট হইয়াছে।

১৩১৬ সালে যখন ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে যাই—তখন পথিমধ্যে দৈবাৎ রেলগাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়—সঙ্গে একটী রুগ্ন ছেলে ছিল, সম্ভবতঃ সেটিই তাঁহার প্রিয় পুত্র সোমদেব। আলাপপ্রসঙ্গে মল্লিখিত 'অনাথবন্ধু' সমালোচনার কথাও বলিয়াছিলেন—এবং আমার প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তার পর ১৩২৪ সালে পূজার বন্ধে ৺ কাশীধামে গিয়া মণিবাটে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি—এবং পরবৎসর (১৩২৫ সালে) পুনশ্চ পূজার বন্ধে কাশীধামে গেলে অনেকদিন একত্র ভ্রমণ করিয়া বিশেষ ভাবে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হই। সেইবার তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া স্বামী ভাস্করানন্দের গুরু পণ্ডিত অনন্তলালজীর সদনে এবং ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলে শ্রীযুত স্বামী জ্ঞানানন্দজীর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পরে আর কাশীও যাই নাই—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্যও আর ঘটে নাই।

সাক্ষাৎকার যদিও কয়েকবার মাত্র হইয়াছিল, তথাপি প্রথমবারের আলাপেই তাঁহার প্রতি আমার এমন একটা শ্রদ্ধানুরাগের ভাব জন্মিয়াছিল যে, তাঁহাকে চিঠি পত্র লিখিতে অকপটে মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছি—এমন কি কোনও কোনও কথা তাঁহার অপ্রিয় হইতে পারে জানিয়াও লিখিতে কুণ্ঠাবোধ করি নাই; এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মনে করিয়া "শ্রীচরণকমলেষু" পাঠ লিখিয়াছি, এবং যদিও তিনি স্বভাবানুগত বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া 'কল্যাণীয়বরেষু' লিখেন নাই, তথাপি একখানি পত্রে এমনও লিখিয়াছিলেন যে, বোধহয় পূর্ব্বজন্মে আমরা ভ্রাতা ছিলাম। এইরূপ লিখিবার একটা কারণ এই ছিল যে, তাঁহার সঙ্গে আমার যে সকল বিষয়ে পত্রালাপ অথবা সাক্ষাৎপর কথাবার্ত্তা হইয়াছে; তাহাতে দুই জনের মতের মিল সর্ব্বদাই হইত, কেবল একটি বিষয়ে হয় নাই—তাহা প্রকাশ্যমান পত্রেই দৃষ্ট হইবে।

তাঁহার কাছ হইতে চিঠিপত্র বহু পাইয়াছি—অধিকাংশই সংরক্ষিত হয় নাই—যেগুলি আছে, তাহার সবটি ছাপাইতে গেলে প্রবন্ধ অতিবিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তাই এস্থলে একখানি মাত্র চিঠি প্রকাশ করা যাইতেছে—এখানি তাঁহার লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে দীর্ঘতমঃ এবং তাঁহার বিষয়ে ও ৺ ভূদেব বাবুর

অনেক কথা ইহাতে থাকায় ইহা পাঠকবর্গের নিকটে সমধিক উপাদেয় হইবে বলিয়াই বিশেষতঃ প্রকাশযোগ্য মনে করিলাম।

১৩২৪ সালে ৺ বঙ্কিমচন্দ্রের বাটিকার পরিচায়ক ফলকখানি উদ্ভাবিত হইলে সাহিত্যিকগণের অনেকেই ইহার প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যোগদানপূর্ব্বক উৎসাহ প্রদান করেন। তৎপরে সংকল্প করা হয় যে, ৺ ভূদেব বাবুর বাড়ীতে ও ৺ অক্ষয় সরকার মহাশয়ের ভবনেও তাদৃশ ফলক যোজিত হইবে। কিন্তু মুকুন্দবাবুর এবং শ্রীমান্ অজয়চন্দ্র সরকারের এ বিষয়ে আপত্তি আছে জানাতে উহা হইতে নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হই—এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে এরূপ বাধা পাওয়ায় আর কুত্রাপি ফলকস্থাপনের প্রস্তাব করিতে সাহসী হই নাই। পরন্তু মুকুন্দবাবুর এ ব্যাপারে অনভিমতি দেখিয়া একটু ব্যথিতও হইয়াছিলাম; কেন না তাঁহার সঙ্গে ইতঃপূর্ব্বে (অতঃপরও) আর কোনও বিষয়ে মতের গরমিল হয় নাই। চিত্তক্ষোভ বশতঃ তাঁহাকে পত্রে একটু কড়া কথাও লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম—ঠিক ভাষাটা স্মরণ নাই—তবে মুকুন্দবাবুর উত্তর (অর্থাৎ প্রকাশ্যমান পত্রখানি) হইতেই তাহা প্রতীত হইবে।

৺মুকুন্দ দেবের পত্র।

অসীধাম, বেনারস সিটি।

২২।৬।১৯১৮

নমস্কারপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন :—

আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্রপাঠে সুখী হইলাম। তবে প্রস্তরফলক আমার ও পরিজনবর্গের মনঃপূত নয়, এজন্য বিষয়টী "একবার" নিখুঁতভাবে আমার চক্ষুদিয়া দেখার চেষ্টা করিলেই, আমার সহিত একমত হইবেন। তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

১। গ্রন্থকারের স্মৃতি পোষণ হয়—তাঁহার "গ্রন্থের পাঠে এবং প্রচারে"। যাহাতে ভূদেবগ্রন্থাবলী এক সেট করিয়া সকল শিক্ষিত অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে এবং সকল সাধারণ লাইব্রেরীতে থাকে, সেজন্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি। আপনিও নিজে এবং সাধারণের মধ্যে চেষ্টা করুন। [অনুমতি হইলে ভূদেবগ্রন্থাবলী আপনার বা আপনার তেমন কোন গোঁহাটিস্থ বন্ধুর জন্য ভিঃ পিঃ তে পাঠাইতে পারি। পুস্তকগুলি বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের। ভূদেব গ্রন্থাবলীর প্রচার আরও একরূপে

বর্জ্জিত হইতে পারে। সমগ্র গ্রন্থাবলীর পুরা মূল্য ১০৲ ডাকমাশুল ৸০। দুইখণ্ডে বাঁধান। সকলে অত খরচ একসঙ্গে করিতে সক্ষম নহেন। এজন্য সামাজিক, পারিবারিক, আচার, পুষ্পাঞ্জলি, স্বপ্নলব্ধ ভারতেতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ, বিবিধপ্রবন্ধ দুইভাগ, ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৯১৭ পর্য্যন্ত আনিয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহা এখনও কোন ইংরাজী পুস্তকেও পাওয়া যায় না) পুরাবৃত্তসার প্রভৃতি কোন একখানি কিনিয়া প্রতিবর্ষে একএকটি প্রীতি-ভাজন বা প্রীতিপাত্রীকে দেওয়া ভাল। "স্বদেশ-স্বধর্ম্ম-ভক্ত-প্রধান ৺ভূদেব বাবুর স্মরণে...উপহার দিলাম; যেন তাঁহার শিক্ষা এবং চরিত্র তোমাতে অল্পপ্রবিষ্ট হয়, এই আশীর্ব্বাদ করি।" এইরূপ ভাবে ৪ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যদি বৎসরে ৪০০ খণ্ড মোট পুস্তক (১ লক্ষে ১ খানি) বিতরণ হয়, তাহার ফলও কম হইবে না [যদি অনুমতি করেন কোন এক বা দুইখণ্ড পুস্তক আপনার বা আপনার বন্ধু কাহার জন্য ভিঃ পিঃ তে পাঠাইতে পারি।]

২। কর্ম্মীর স্মৃতি পোষণ হয় তাঁহার কর্ম্মের প্রসারে। বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড সংস্কৃত শিক্ষার সাহায্যে—তিনি নিজে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার স্মৃতি—সংস্কৃতের অধ্যাপকের স্মৃতি। পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের মত ছিল যে, যাহাতে সম্মানিত ব্যক্তির নাম সংসৃষ্ট হইয়া কোন দেশহিতকর কর্ম্ম হয়, তাহাই করা উচিত। তিনি পূজ্যপাদ পিতামহ দেবের নাম সংসৃষ্ট করিয়া বিশ্বনাথ ফণ্ড দেশহিতকর কার্য্যের জন্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। "সম্মানের সহিত" শাস্ত্রাধ্যাপনায় কিছু কিছু সাহায্য করিয়া কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর আদর্শ দৃঢ়-চরিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের রক্ষা বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের একান্তই প্রয়োজনীয়। নচেৎ পূর্ব্বপুরুষের গৌরব এবং আদর্শ হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হইয়া পড়িব। দেশের এই প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের অনু-করণে তাঁহার পরিজনেরা, ভক্তেরা এবং সাধারণে চাঁদা দ্বারা ভূদেববৃত্তি ফণ্ড স্থাপন করিয়া বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ডসমিতির হস্তে পরিচালনার জন্য দিয়াছেন। নয় হাজারের অধিক টাকা জমা হইয়াছে। বিশ্বনাথ বৃত্তি মূল দলিলের সর্ত্ত অনুযায়ী সুধু বাঙ্গালার বাহিরে বা দর্শনের টোল ভিন্ন অন্য টোলে দেওয়া যায় না। সাধারণের চাঁদায় গঠিত ভূদেব বৃত্তি সর্ব্বত্র সকল টোলেই দেওয়া যায়। উহার কয়েকটি ৺কাশীতে এবং একটি কুলীন ব্রাহ্মণদিগের পিতৃভূমি কনৌজের চতুষ্পাঠীতে দেওয়া হইতেছে। এই "ভূদেববৃত্তি ফণ্ডে" সাধারণের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তিসম্পন্নেরা মধ্যে মধ্যে চাঁদা দিয়া থাকেন। বাহিরের কেহ না দিলেই

সে সপ্তাহে সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডার হইতে ১, দেওয়া হয়। এই ফণ্ডে মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান ২০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়েরা শ্রাদ্ধ, বিবাহ, পূজা, পরীক্ষা পাস, প্রথম উপার্জ্জনের টাকা প্রাপ্তি, প্রভৃতি উপলক্ষে দিয়াছেন এবং দিতেছেন। উহা 'পারিবারিক' ব্যাপার নহে। সাধারণের স্থায়ী ভাণ্ডার। [ইচ্ছা হইলে যাহা মনে উঠে কিছু পাঠাইয়া দিতে পারেন এবং বন্ধুদেরও দিতে বলিবেন]।

৩। হিন্দুসম্মত ভাবে স্থানীয় স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে স্থানটি সাধারণকে উৎসর্গ করিতে হয়। গুরুগোবিন্দের জন্মস্থান পাটনায় হরমন্দির এবং রামমোহন রায়ের জন্মস্থান খানাকুল কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনই ঠিক কার্য্য। পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের জন্মস্থানটি তিনি তাঁহার খুড়তুত ভাইয়ের অংশে দিয়াছিলেন; হরীতকীবাগানের সে বাড়ীটা তাঁহারা অপরকে বেচিয়াছেন। সম্ভবতঃ, ঐ বাড়ী কিনিয়া লইয়া তাহা সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়া প্রস্তরফলক বসাইতে যে ৮। ১০ হাজার টাকা পড়িবে, তাহা সাধারণের চাঁদায় উঠিবার সম্ভাবনা নাই। উঠিলে এবং তাহাতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলে ভূদেববৃত্তি-ফণ্ড হইতে সেই চতুষ্পাঠীতে সাহায্য হইতে পারিত। তবে হয়ত সেই বাড়ীর বর্ত্তমান অধিকারীর ওরূপ প্রস্তরফলক লাগানয় আপত্তি হইবে না। তাঁহাদের নাম প্রভৃতি জানি না; তবে সে বাড়ী ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের হাতে পড়ার সম্ভাবনা, এরূপ 'শুনিয়া' ছিলাম।

৪। চুঁচুড়ার বড় বাড়ীটী ফিরিঙ্গি ওলন্দাজদিগের নির্ম্মিত এবং মুসলমানদের নিকট হইতে পূজ্যপাদ ৺পিতামহদেবের দেহান্তের দশ বৎসর পরে বেমেরামত অবস্থায় অল্পমূল্যে পাওয়ায় খরিদ হয়। পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের দেহান্ত হয় ও বাটীর ঘাটে। তিনি ঐ বাড়ীর অধিকারী ১৮ বৎসর ছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে অনেক সময় অন্যত্র থাকেন। আমি মেটে ১২।১৩ বৎসর উহাতে কাটাইয়াছি; অবশিষ্ট সময়অন্যত্র বা অন্য বাটীতে কাটিয়াছে। আমার ছেলেদের জন্ম নানা চাকুরীস্থানে। উহা পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের "পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী" নহে। ঐ প্রাসাদ পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবেরই যোগ্য ছিল। আমি উহা ভাড়া দিয়াছি; ভাড়াটে উঠিয়া গেলে বা উপযুক্ত মূল্য পাইলে "বোচ্‌ব" এবং তাহার কিছু অংশ বিশ্বনাথ ফণ্ডে এবং সৎকর্ম্ম ভাণ্ডারে দিব সব দোষ কাটিয়া যাইবে। অন্নকষ্টেও ছেলেরা স্বধর্ম্মপালন জন্য মুষ্টিভিক্ষা দেয়, দেব ব্রাহ্মণ, অতিথির পূজা করে, ইহা অবশ্যই চাই। কিন্তু ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটার

জন্য অল্প কষ্টেও থাকুক এরূপ তামসিক ভাব আমার মনে নাই। পূজ্যপাদ পিতৃদেব ঐরূপ মায়া মোহ কাটাইয়া দিবার জন্য যত্ন করিতেন। যদি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত থাকিত—পাটের দালালীতে যেরূপ টাকা আসিতেছিল, তাহা বজায় থাকিত, তাহা হইলে ধনের জোরে ঐ বাড়ী হয় ত একপুরুষ চালাইতে পারিত। ফলতঃ সর্ব্বদাই অবস্থার মত ব্যবস্থা অক্ষোভে দুর্বৃষ্টি সহ করিতে হয়। ছেলেরা সেই উপদেশই পায়—এবং আমিই অগ্রণী হইয়া তাহাদের পথ দেখাইয়া দিয়া থাকি। হয় ত আমিই ঐ শ্বেতহস্তী বেচিয়া যাইব। উহার উপযুক্ত নহি।

৫। ৺বঙ্কিম বাবুর "বিধবা কন্যার" উপর লোক-লজ্জার চাপ পড়িয়া প্রস্তর ফলক এবং "ক্ষণিক উৎসব" জন্য "অব্যবহৃত" বাড়ীর মেরামতাদিতে অনেক টাকার খরচটা সম্ভবতঃ তাঁহাদের ক্ষণিক উত্তেজনার পর কষ্টের কারণ হইয়াছে। * উহা কলিকাতার বাড়ী নয়। যদি "সাধারণে" অধিকাংশ টাকাটা চাঁদা দিত এবং তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে টাকা না লইয়া সাধারণ ভাবেই কিছু লইয়া একটী ফণ্ড স্থাপন বা ভূমিসম্পত্তি ক্রয় করিয়া পরিষৎকে দিত এবং সেই আয় হইতে বর্ষমধ্যে প্রকাশিত যে বাঙ্গালা পুস্তকখানি দেশের লোকের সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী, তাহার জন্য একটি "বঙ্কিম স্বর্ণপদক" † দিবার ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলে সাধারণেরই শ্রদ্ধা এবং সুবুদ্ধি প্রকাশিত হইত সন্দেহ নাই। পদকটির একদিকে "বঙ্কিম সাহিত্যপদক" এবং ১৩২৫ প্রভৃতির (পর ২ বৎসরের) সাল এবং অপর দিকে "বন্দেমাতরং" খোদিত হওয়া সঙ্গত। এখনও ইহার জন্য চেষ্টা করিলে প্রয়োজনীয় হাজার দেড়েক টাকা সহজেই উঠিবে। বিহারে হিন্দীর উন্নতি জন্য তথায় যে "ভূদেব হিন্দীপদক" প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত। পদক রৌপ্যের বা কাঁসার হইলেও ক্ষতি নাই।

৬। খৃষ্টান কর্ত্তৃক দ্বারা 'গোর স্থানের' অনুকরণে প্রবর্ত্তিত "প্রস্তর ফলক"

---

* পূজনীয় মুকুন্দ বাবুর অনুমান ঠিক্ নহে বলিয়া, আমার বিশ্বাস। ৺বঙ্কিম বাবুর বাড়ীটি "অব্যবহৃত" নাই—পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ সেবাদি ঐ বাড়ীতে এখনও চলিতেছে; বার্ষিক মেলার উৎসবে মেলা—বসে; উহা বিক্রয় বা হস্তান্তরিত হউক এইরূপ অভিপ্রায় বোধ হয় ৺বঙ্কিম বাবুর উত্তরাধিকারীদের নাই। ফলকসংস্থাপন সময়ে যে সামান্য অর্থব্যয় হইয়াছিল তাঁহারা উহা সানন্দে বহন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধলেখক।

† স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক "বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতিসমিতি" কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় বি, এ, ও ইণ্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের জন্য ব্যবস্থিত রহিয়াছে। প্রবন্ধলেখক

সম্বন্ধে এইবারে মনঃস্থির করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। নিজে ঐ হুজুক একবার পড়িয়াছিলেন বলিয়া এখনও সত্যকথা এবং দুরন্ত [illegible] বুঝিতেই ইহা করিবেন না এবং পারিবেন না ইহা যদি আমার মনে হইত, তবে এত লিখিতাম না। আপনাকে প্রকৃতই শ্রদ্ধা করি; নচেৎ অপরে অনুদারতা বলিলে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিতাম। বুঝাইবার কোন চেষ্টাই করিতাম না। ইহা অনুদারতা নহে। পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শিক্ষার প্রভাব। তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন জন্য হুগলীর ইমামবাড়ীর ন্যায় অট্টালিকার উৎসর্গ তাঁহার মনঃপূত নহে; সে টাকায় যে অনেক বৃত্তি হইতে পারে! দেশময় স্বদেশভক্তি ও স্বধর্ম্মভক্তির প্রসারেই তাঁহার স্মৃতির পূজা হয়। ভারতবাসীর হৃদয়ে নবযুগের আবির্ভাবই তাঁহার পূজা। বাহিরের আড়ম্বর তিনি একান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া শিখাইয়া গিয়াছেন। বাড়ীটী হয়ত অচিরে বেচিতে হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাতে প্রস্তরফলক বসাইবার জন্য আমার লোক ডাকা এবং সে কথা সেই সভায় না বলা অসত্যাচরণ—তাঁহার প্রতি আমাদের অসম্মান প্রদর্শন তাঁহার নাম লইয়া খেলা করা। প্রস্তর ফলক বসাইলে বাড়ীটার দাম বাড়িবে, একথা তর্কের জিদে আমাকে বলিয়া ফেলা অবধি আপনি অনুতপ্ত হইয়াছেন, ইহা আমি নিজের মনে বুঝিতে পারিয়া সে কথা মন হইতে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছি। যখন বহুশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের উভয়েরই বণিক-জন্ম ছিল, তখন ও সব কথা আমরা পরস্পরকে হয়ত বলিয়া থাকিব। সে যাহা হউক আমার পূর্ব্বপত্র এবং ভূদেবজীবনী পড়িয়া ঐ বৃহৎ বাটীটী বাবার পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী বলিয়া মনে হইল কিরূপে? যাহাদের পল্লীগ্রামে বহু পুরুষের ভিটা আছে, ঐ বাটী সম্বন্ধে আমাদের মনে সে ভাব জন্মে নাই। আমাদের প্রতি পুরুষেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস উঠিয়া গিয়াছে। কোথা কুশদহ যশোহর, কোথা বদনগঞ্জ, কোথা নতিবপুর, কোথা হরতকী বাগান, কোথা চুঁচুড়া, এইত চলিতেছে! ভাইপোরা চুঁচুড়ায় যায় না। বাবা বলিতেন "ব্রাহ্মণের চক্ষে বাড়ী ঘর ধন সম্পত্তি বালুকাস্তূপ, এই ঝড় হইল, এই উড়িয়া গেল। পূর্ব্ব পুরুষদত্ত চরিত্রের দৃঢ়তাই সারাৎসার—তাহাই একমাত্র লক্ষ্য"। ইহা সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রেরও শিক্ষা। কোথায় কালিদাসের জন্ম বা দেহান্তের স্থানের নিদর্শনস্বরূপ প্রস্তরফলক? কুমার সম্ভব জন্মস্থান। দেশীয় ধরণে বৃত্তির এবং কতকটা ইউরোপীয় ধরণে মেডালফণ্ডে উপকার আছে; উহাই চালান হউক। দেশীয় ধরণে স্থান উৎসর্গ করিয়া যদি প্রস্তর ফলক বসে তাহাও করা হউক এবং তথায় অবশ্য কোন শিক্ষামন্দির স্থা[illegible]

হউক ; নচেৎ উহার উপকারিতা কোথায় ? গ্রন্থাবলীর প্রচার দ্বারা শিক্ষা প্রসারিত হউক। তাহাই "প্রকৃত সভার" কার্য্য। সভায় একটা পাথর বসাইয়া সরিয়া পড়িলেই কি সত্য সত্য শ্রদ্ধার কার্য্য সাধারণের পক্ষে সম্পন্ন হইয়া যায় ? ইহা যে একান্তই অশোভনের এবং মনকে আঁখি ঠারার কার্য্য। সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহে "কর্ত্তব্য পঞ্জিকার" ন্যায় রাখানই প্রধান কার্য্য। তাহার উপর সামাজিক প্রবন্ধ এই কথা "শ্রীরামচরিত্রের সর্ব্বদা অনুশীলন"—রামায়ণ পাঠ।

৭। এইবার সভার কথা। যাঁহারা উৎসব করিতে আসিবেন, তাঁহাদের সকলের ঘরেই যদি এক সেট করিয়া ভূদেবগ্রন্থাবলী না থাকে এবং তাহা না পড়িয়া থাকেন এবং ছেলেমেয়েদের সে শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে * * * বাবুর "বিলাতী কাপড় পরিয়া স্বদেশী বক্তৃতার" মত কার্য্য ঘটিবে না কি ? সেদিন বাঁকিপুরে "ভূদেব স্মৃতি" সভায় একজন পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের দোষ ধরিয়া বলিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণে অত্যধিক ভক্তি করিতেন। সাধারণ সভাগৃহে সকলেরই সকল কথা বলিবার অধিকার আছে। গৃহস্থ বাড়ীতে সাধারণ সভা আনিয়া শ্রাদ্ধদিনে ঐরূপ কথা শুনা পুত্রের কষ্টকর এবং অতিথিকে সেজন্য কিছু প্রতিবাদ করায় বা কাহাকেও কোন কথা তীব্র ভাবে বলিতে দেওয়ায় একান্ত দোষের হইবে। সেইজন্য অধ্যাপক এবং আত্মীয় এবং পরিচিত পাড়ার লোক নিমন্ত্রিত হন, এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি জনসাধারণের হট্টগোল হয় না। তাইপো ভাগিনের প্রভৃতির ন্যায় ভক্তেরা নিমন্ত্রণ ব্যতীতই আইসেন—৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়, শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর, শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস মল্লিক, শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক ভক্ত প্রতিবারই আসিতেন এবং আইসেন। কেহ বা মধ্যে মধ্যে আইসেন। তাঁহাদেরই যে কাজ, তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতে হয় না। সেই ভাবে প্রকৃত ভক্ত সকলেই সর্ব্বদা আসিতে পারেন। তাঁহারা যে ভক্তিপ্রভাবে আমার ভাই। নচেৎ বক্তৃতা করিতে উঠিয়া কেহ বলিলেন "ভূদেবচন্দ্র" [বই পড়া দূরে থাকুক, বইয়ে নামটাও পড়েন নাই !] কেহ বলিবেন "পারিবারিক প্রবন্ধ খুব ভাল, সামাজিক প্রবন্ধ প্রভৃতি আমি ভাল করিয়া পড়ি নাই" [শ্রীযুক্ত হর সাহেব হাবাণচন্দ্র রক্ষিত "ভিক্টোরিয়া যুগে বঙ্গ সাহিত্য" নামক সুমুদ্রিত গ্রন্থে ঠিক ঠিক্ এই কথাই লিখিয়াছেন !] এ সকল কথা সাধারণ সভার স্থলে চলে শ্রাদ্ধবাড়ীতে সুবিধায় নয় ! ! আমি অনেক স্মৃতিসভায় গিয়াছি এবং বক্তৃতা

শুনিয়াছি "অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং" বক্তৃতায় তামসদান গ্রহণে কাজেই উৎসাহ হয় না।

৮। এইবারে সাহিত্য পরিষদের * কথা। যদি লর্ড কার্জ্জন প্রস্তরফলক বসাইয়া দিতেন, কোন কথা বলিবার "বাধ্য" ছিল না; আমার অনুমতিও লওয়া হইত না, Act of state, গৃহস্বামী অনুমতি দিলেই উৎসর্গের ভাব আসে; আমি মুকুজ্জে ব্রাহ্মণ; আমার ঘাড়ে "রায় বাহাদুর" চাপাইয়া আমার ব্রাহ্মণ্য মর্য্যাদা কমাইয়া রাখিয়াই দিয়াছেন—তথাপি সাহস হয় নাই যে, আপত্তি করি। কমিশনার সাহেবকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলাম যে, কোথাও একবিঘা মাত্র নিষ্কর জমি বখসিস করা হইলে পুরুষানুক্রমিক সেই কৃপা স্মরণে থাকিত—এ দেশীয় প্রথামত কার্য্য হইত। তিনিও হাসিলেন। দায়ে পড়িয়া আমি শুধু ঐ সনন্দ লইয়াছি। খেলাত জন্য বৃথা অর্থের অপব্যয় করি নাই। গবর্ণমেণ্ট ভয় ভক্তির পাত্র। পরিষৎ নিজেদের জিনিস—উহাতে প্রীতি ভক্তি আছে; উৎকট ভয় নাই—এই জন্য উহাকে বুঝান যায়, সব কথাই খুলিয়া বলা চলে। "পরিষদে'র (স্বদেশীয়ের) কৃপা বা সম্মান অগ্রাহ্য করা হইতেছে না। যখন পরিষৎ পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের একখানি তৈলচিত্র রাখিতে চাহিলেন, সে সম্মান পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে সানন্দে কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু যখন দামী "ফ্রেম" দিবার কথা পরিষৎ বলিলেন, তখন জানাইলাম যে, তাহা ৺পূজ্যপাদ পিতৃদেবের মতানুযায়ী নহে; তাঁহার বাড়ীতে দামী ফ্রেমে অর্থব্যয় করিতে তিনি দেন নাই। পরিষৎ আপনার দেশের লোকসমষ্টি, কথাটার সারবত্তা শ্রদ্ধা এবং প্রীতিজন্য বুঝিলেন। এক্ষণে কথা এই যে, ভ্রমণকারীদের চক্ষু আকর্ষণ জন্য কি প্রস্তরফলক? না শুধু স্থান নির্দ্দেশজন্য? যাঁহারা তাঁহার "ভক্ত" অনুসন্ধায়ী ভ্রমণকারী, তাঁহারা বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী, বিশ্বনাথ ট্রষ্ট আফিস, বুধোদয় যন্ত্র, এডুকেশন গেজেট আফিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেখিতে পাইবেন। উহারা প্রস্তরফলক অপেক্ষা সঙ্গীব! যদি কখন ওগুলি ওখান হইতে উঠিয়া যায় এবং বাড়ীগুলি হস্তান্তরিত না

* এ স্থলে (এবং ইতঃ পূর্ব্বে ৩য় প্যারায়) মুকুন্দ বাবু 'সাহিত্য পরিষদে'র উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার একটু কারণ আছে। যে স্মৃতিফলক বসাইবার সঙ্কল্প ছিল, তাহা 'সাহিত্য পরিষদে'র যোগে করিবার জন্য অভিপ্রায় পোষণ করিতেছিলাম—খরচাটা অবশ্য নিজেই দিতাম। ব্যক্তি বিশেষের কৃত কর্ম্ম অপেক্ষা সাহিত্য পরিষদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত সমিতির একটা অনুষ্ঠান সমধিক শ্লাঘনীয় হইত। প্রবন্ধলেখক।

ভাসিয়া বা ষ্ট্রাণ্ডরোড হইয়া পড়ে, তখন একটা থামে প্রস্তরফলক "হয়ত" মন্দ হইবে না! কিন্তু হিন্দুর চক্ষে তাহারও প্রয়োজন নাই। তাঁহার সেই পবিত্র দেহভস্ম ত ভাগীরথীজলেই বিসর্জ্জন করিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছি এবং তাহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। তাঁহার চরিত্রের এবং শিক্ষার স্মৃতি বজায় থাকুক!

৯। শেষ কথা। আমাদের মতের মিল খুবই আছে—সেই জন্য এত করিয়া লিখিলাম। যদি প্রস্তরফলক সম্বন্ধে ইহাতেও মতের মিল না হয়—সেই-টুকু মাত্র গরমিল থাকিতেই দিন—ও বিষয়ে আর তর্ক করা বৃথা হইবে। "সংযমে আনন্দ প্রীতি, তর্কে বহুদূর!" বার দুই প্রীতির সহিত পত্রখানি পড়িবেন। অনেক পরিশ্রমে লেখান এবং নকল করান। তর্কের ঝোঁকে "অনুদার" বলিয়া ঠোকর দেওয়ায় আমি "গোরস্থানের অনুকরণে পাথর বসান" বলিয়া সে দোষ খণ্ডাইয়া দিলাম। শোধ বোধ হইয়া গিয়াছে। এ সকল এখন চিরকালের জন্য ভুলিয়া আসল কার্য্যে যেন আমরা একমনে চেষ্টা করি—তাঁহার শিক্ষার প্রচার। আড়ম্বর বর্জ্জন করিয়া ইউরোপীয় কার্য্যশৃঙ্খলা হিন্দুর সাত্ত্বিকভাবে গ্রহণ।

এখানকার মঙ্গল। আপনারা কুশল সংবাদ দিবেন। বিশ্বনাথ ফণ্ডের প্রকাশিত হিন্দুকণ্ঠহার পাঠাই। এবারের শ্রাদ্ধবাসরে অধ্যাপক পণ্ডিত এবং বিদ্যার্থী এবং সমবেত আত্মীয়গণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। আপনিও সেই শ্রেণীর বলিয়া 'ভূদেবচরিতম্' ও পাঠাইয়াছিলাম। উহা পূর্ব্ব বৎসর শ্রাদ্ধ দিনে বিতরিত হয়; ট্রষ্ট ফণ্ডের কোন কোন অধিক-বিক্রয়-সম্ভাবনা-শূন্য পুস্তক কিনিয়া লইয়া বিতরণ ব্যবস্থা রাখিয়াছি। আমি এবং আমার পুত্র এডুকেশন গেজেট লিখি এবং তাহার পরিচালনা করি। কিন্তু দাম দিয়া খরিদ করি। এই জন্য এডুকেশন গেজেট বা ভূদেবচরিত প্রথম খণ্ড (যাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে) উপহারস্বরূপে দিতে পারিলাম না। পত্র লিখিয়া ভিঃ পিঃতে লইতে পারেন।

ভবদীয়—

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

ইহার উত্তরে আর তর্ক চলে নাই—এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ফলক স্থাপনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। তবে এতদুত্তরে অনবধানতাজনিত ভ্রমের জন্য (যথা হুগলীর বাড়ীটি ৺ ভূদেব বাবুর স্বোপার্জ্জিত ভদ্রাসন মনে করা) এবং অপরাধের জন্য (যথা—ফলকস্থাপনে বাধা দেওয়াতে অনুদারতার আরোপ)

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পত্রে ৺ মুকুন্দদেব যে যে বিষয়ের অনুরোধ করিয়াছিলেন (যথা, ভূদেবগ্রন্থাবলী, ভূদেবচরিত ও এডুকেশন গেজেট গ্রহণ) তাহা যথাসাধ্য প্রতিপালনপূর্ব্বক স্বকৃত অন্যায্য ব্যবহারের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তও করিয়াছিলাম।

৺ মুকুন্দদেব কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, এই চিঠিখানি হইতে তাহাও অনেকটা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। ফলতঃ বর্ত্তমান কালে ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চপদবী-সমারূঢ় ব্যক্তিগণের মধ্যে তাদৃশ লোক খুব দুর্লভ। বাঙ্গালী-সমাজ একটি রত্ন হারাইয়া দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

মনে বড়ই আশা করিয়াছিলাম, কিয়ৎকাল পরে যখন অবসর গ্রহণ করিব, তখন শ্রীবিশ্বনাথের চরণপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ৺ মুকুন্দদেবের সমসুখ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইব—দুরদৃষ্টবশতঃ তাহা হইল না; তিনি চলিয়া যাওয়াতে কাশীবাসের একটি প্রলোভনীয় জিনিস যেন হারাইয়া গেল।

কিন্তু যাঁহারা কাশীপ্রাপ্ত হন, তাঁহাদের জন্য শোক করিতে নাই; মুকুন্দদেব যে অবিমুক্তপুরীতে দেহত্যাগ করিয়া শিবসাযুজ্য লাভ করিলেন—সংসারের বহুবিধ দুঃখ যন্ত্রণা এড়াইয়া শাশ্বতী শান্তির অধিকারী হইলেন—তদীয় ভক্তানুরক্তের পক্ষে এটা সান্ত্বনার বিষয় এবং আনন্দেরই কথা—সন্দেহ নাই।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

বুরো পাওয়া।

কলিকাতা শিকদার বাগানলেনে পেনসনপ্রাপ্ত সবজজ রায় রসময় মিত্রের পুত্র সাবান দিয়া মাথা ধুইয়া—পিছু দিকুকার ছোট কাটা-চুলগুলো সম্মুখের বড় চুল দিয়া ঢাকিয়া কৃষ্ণবর্ণ মুখখানি পুনঃপুনঃ তোয়ালে দিয়া ঘষিতে ছিল, এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন—"ট্রেণটা ফেল করবি নাকি?"

কার্ত্তিক বলিল—"ট্রেণের এখন ঢের দেরি; বাবার যেমন আজ—মেয়ের বাবা ছেলের বাড়ী এসে পুড়ে থাকতে পথ পাবে না—না ছেলে তার বাড়ী গিয়ে দেখা দিয়ে আসবে," বলিয়া কার্ত্তিক ধোপার পাট ধাড়াইয়া পোষাক পরিবার চেষ্টা করিতেছিল। মা বলিলেন "হ্যাঁ পাগল তারমত বুদ্ধি হতে তোর অনেক বাকী—সেযে রাজকন্যে তা রাত্রি লাভ জানিস?" "তাইবলে আমি গিয়ে বলব ওগো আমি তোমাদের জামাই—হতে এলাম।" "তা কেন বলবি? মেয়ের দাদামশায় জেতে নিয়েছেন দেখিস গেলে কত আদর হবে।"

কার্ত্তিক উৎসাহে আঁটি আস্তিনের গোতাম আঁটিতে আঁটিতে সেটা মানান-সই হলোনা বুঝিয়া ঐ অঙ্গে টাইফলার কোট হাটে সজ্জিত হইয়া কনে দর্শন আশায় সাইকেল সহ চলিল।

বেলা তখন প্রায় এগারটা, আনন্দমোহন তখন কাছারি ঘরে বসিয়া একটা থেলো হুকায় তামাক খাইতেছিল। কাছারির মোটা মাদুরী পাতা। একখানা স্বতন্ত্র মাদুরে বসিয়া মাসিবার সম্পর্কে নাতা পুত্র সম্মুখে করিয়া সুদকষ্টি করিতেছেন।

আর একখানা মাদুরে কন্যা, আর তাঁর যুবতী নাতনী হাজারি এবং গ্রামের সুধীর নামক একটী যুবক,। সুধীর কোম্পানি কাগজের সুদের হিসাব করিয়া হাজারিকে বাঙ্গালায় লেখাইয়া দিতেছিল।

ইতিমধ্যে সাইকেল সহিত কার্ত্তিকচন্দ্র গৃহ প্রবেশ করিয়া আনন্দ মোহনকে বলিল "ওহে তোমাদের কর্ত্তাকে ডেকে দাওতো হে।" (যেন চাকর বসিয়াছিল আগন্তুক কার্ত্তিকচন্দ্রের কায়দা কানুন দেখিয়া কাহারা কি বলিবে) বলিয়া বাহিরে গেল। কার্ত্তিকের প্রশ্ন কর্ত্তা বারছই "তোমায় গিয়ে"—বলিয়া

চুপ করিলেন। হাজারি নিপুণ দৃষ্টে চাহিয়া সুদের হিসাব লিখিয়া লইয়া অতি-রামকৃত আদায়ের টাকার থাক ফর্দ্দের সঙ্গে মিল করিয়া তোড়ায় তুলিতেছেন, এদিক তার লক্ষ্য ছিল না, হতাশ হইয়া কার্ত্তিকচন্দ্র পুনরায় একটু জোরগলা বলিল "কর্ত্তাকে ডাক না হে।" কর্ত্তা বলিলেন "তাইত তোমায় গিয়ে।"

কার্ত্তিক চটিয়া বলিল "তুমি কি শুস্তে পাওনা?"

"বয়েস দোষ তোমার নিয়ে।" "শুস্তে তো পাওনা আমি কেমন জোর তুমি হে কেবল তোমার গিয়ে তোমার গিয়ে করচ।"

কর্ত্তা বলিলেন "চটলেন কেন প্রভো, তামাক ইচ্ছে করুন।" বলিয়া হস্তস্থিত হুকাটা কার্ত্তিকের নিকট ধরিলেন। কার্ত্তিক 'ননসেন্স' বলিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইয়া জলন্ত দেসলায়ের কাঠি টা মসিরুদ্দা উদ্দেশে কর্ত্তার দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

কর্ত্তা যুবকের ফিরিঙ্গী মেজাজে আমোদ উপভোগ করিয়া আত্মপ্রকাশে বিলম্ব করিতে ছিলেন।

হাজারি কর্ত্তাকে ধরাইয়া দিল। হাজারি কোম্পানির কাগজের তাড়া আর টাকার থলে হাতে লইয়া উঠিয়া যাইতে যাইতে কার্ত্তিককে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তুমি কি টাকা কর্জ্জ করবে?" হাজারির কথার মধ্যে নসিরাম সুদকষ্টি ফর্দ্দ ঠিক করিয়া বলিল "কর্ত্তা সুদকসা ঠিকই হয়েছে।" আগন্তুক কর্ত্তা চিনিয়া হাতের সিগারেট দূরে ছুড়িয়া থতমত খাইয়া বলিল "আমি আপনাকে চিন্তে পারিনি, আমি রায় রসময় মিত্রের পুত্র।"

সুপ্রভাত! ওরে ভুতো কুর্শি নিয়ে আয়, কুর্শি নিয়ে আয় ভুতো। শুনচ সুধীর এর বাবা মহত লোক আমার তিন তিনটে হার মামলা জিতিয়ে দিয়াছেন—ব'স—ব'স।" বসবার যোগ্য আসন না পাইয়া কার্ত্তিক অতিকষ্টে মাদুরের উপর বসিল। সুধীর বৃদ্ধবয়সে আনন্দ মোহনের রসাল কথাগুলি শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ নাত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"দেখ্‌চিস দিদি কর্জ্জ নিতে আসেনি কর্জ্জ দিতে এসেছে। এত দিন পরে আমার দখল উচ্ছেদ।" হাজারি "থাম থাম" বলিয়া চলিয়া গেল। আনন্দমোহন বলিল "চটিস্‌নে নাতো মানুষ ভীমরথি হয়েছে।"

হাজারি চলিয়া গেলে সুধীরও বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আনন্দ মোহন বলিল "অপেক্ষা কর বাবা, কথা আছে।" আনন্দমোহন কার্ত্তিককে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"নামটী কি?"

কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মিত্র।

নামে রূপে বেশ মিল ক্যামন্ সুধীর! সুধীর 'না হাঁ' কিছুই বলিল না। কার্ত্তিক সুধীরের মধ্যস্থতায় বিরক্ত হইয়া সুধীরকে প্রশ্ন করিল "তুমি কি এ বাড়ীর সরকার?" সুধীরের উত্তর দিবার দরকার হইল না। আনন্দ মোহন বলিল "উনি সরকার নন উনি আমার অনারারি পরামর্শদাতা" বুঝলে ভায়া। বৃদ্ধের দেওয়া এই শ্রেষ্ঠ আসন কার্ত্তিকচন্দ্রের মনোমত হইল না! আনন্দ মোহন তাহা বুঝিল। 'ভায়া বুঝি মাটী কাটার কাজ করে থাকেন।' বলিয়া আনন্দমোহন ভ্রূভঙ্গি করিয়া কার্ত্তিকের দিকে চাহিল কার্ত্তিক একটু বিরক্ত হইয়া বলিল "না না আমার কোন কাজ করার প্রয়োজন হয় না।"

তা হলে আমার অনুমানটা ভুল, আমি নাকের নীচে অই কালো চিহ্ন দেখে মনে করেছি বুঝি ওটা মাটীকাটা মজুরের সাক্ষী। কার্ত্তিক তীব্র উপহাসে অপ্রস্তুতের মত বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আনন্দ মোহন অবস্থা বুঝিয়া বলিল—ভায়া, ভাবী সম্বন্ধটা খুব রসাল, কিনা নাতজামাই! যাক্ মনে কিছু করোনা। এখন কাজের কথা হোক "আমার যে কাজ বাকি ছিল, তা সেরে নিয়েছি, তোমার বাবাকে গিয়ে বলগে—আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে বিয়ের যেদিনটী পাব, সেই দিনে বিয়ে দেব। তুমি আর দেরি করো না; একটার গাড়ী ধরতে পারবে। তোমার বাবাকে এই সুসংবাদটা দাওগে।"

সুসংবাদ "সু" হইলেও প্রাণান্তকর ক্ষুধায় বৃদ্ধের অসময়ে বিদায়ের বাণীটা কার্ত্তিকচন্দ্রের ক্ষুধিত জীবনকে একেবারে রসহীন করিয়া দিল।

বিবাহের পর প্রতিশোধের কল্পনা লইয়া কর্ত্তিকচন্দ্র বিদায় হইল। আনন্দ মোহন ডাকিল—ভূতো তামাক দে—সুধীর বলিল "তা হ'লে আমিও যাই।"

"না বাবা একটু বস্‌তে হবে বিশেষ পরামর্শ আছে" সুধীর বসিল। ভূতনাথ তামাক দিয়া গেল। আনন্দ মোহন তামাক টানিতে টানিতে বলিল—বুঝলে সুধীর! এই রকম ট্যাস ছোড়াগুলোকে দেখলে আমার আপাদমস্তক জ্বলে যায়। আমি কারও বাড়ী যাইনি, অনেক ছেলে আমার কাছে এসেছে সব কি এই এক রকমের? দেশের হলো কি বলো তো বাবা?

সুধীর বলিল, "যখন যেটা চলে সেটাই আগ্রহ করে ছেলেরা করে থাকে।" "কই তোমায় তো কিছু করতে দেখি না।" সুধীর প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া বলিলওটার জন্য কিছু যায় আসে না। ছেলের স্বভাব যদি ভাল হয়—মুখের কথা

কাড়িয়া লইয়া বৃদ্ধ বলিল—আরে বাবা—ভাল মন্দের বিচার ঐ দেখেইতো হয়।

কথা শেষ করিয়া আনন্দমোহন কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া তামাক খাইতে খাইতে বলিল—বাবা সুধীর তোমার এমে পাসের খবর বেরল? সুধীর বলিল—গেজেট হয়নি, আমার একটী বন্ধু লিখেছে "তুমি প্রথম শ্রেণীতে পাস করেচ" "বেশ বাবা বেঁচে থাকো।" একটী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম। "হাজারির বিয়ের জন্য আমাকে বড় ভাবতে হচ্চে। সামাজিক প্রথাকে উপেক্ষা করে আমি হাজারিকে এতবড় করেছি—আর তো রাখা উচিত নয়, সমাজ উপেক্ষা করলেও আর একটা দিক আছে। বিশেষ আমি বৃদ্ধ হয়েচি, এসময় বিয়ে না দিয়ে আর রাখা চলে না। এপর্য্যন্ত যত ছেলে দেখেচি সব গুলিই প্রায় ঐ কার্ত্তিকের মত, আমার আপনার বলতে কেউ নেই। আমি কি করব, আমায় একটা সুপরামর্শ দাও বাবা—আমি সেই জন্যই তোমাকে বলতে বলেছি।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুধীর বলিল "কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমি ভাল ছেলে দেখে দিচ্চি।"

"অপেক্ষা—আর মোটেই করা চলে না। আর তুমি যাকে ভাল বলে দেবে, সে ছেলে ভাল হবে; কিন্তু বিয়ে দিয়ে হাজারিকে পরের ঘরে পাঠাতে আমার বুকের হাড়গুলো ভেঙ্গে যাবে। ছমাসের মেয়ে আমি বুকে করে মানুষ করেছি। একদিনের তরে আমি চখের আড়াল করতে পারিনি। কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমোহনের চক্ষু দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল।

সুধীর বৃদ্ধের বেদনাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনার পছন্দ মত ছেলেও পাওয়া যায়। আপনি দুঃখ করবেন না, ছেলে দেখার ভার আমি নিলাম।"

সুধীর—আপনার লোকের মত কথা বলে তোমার কথায় আশ্বস্ত হতে পারচি; কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠচে, ওর আবদার সহ্য করবার—বৃদ্ধ আর বলিতে পারিল না। অত্যধিক স্নেহ বশতঃ কাঁদিয়া ফেলিল। সুধীরও আনন্দমোহনের দুঃখে সহানুভূতির সুরে বলিল—তাইত জেঠামশায়, আপনার পক্ষে বিষয়টা বড় গুরুতর হয়ে উঠেচে। আনন্দ মোহন কোচার কাপড়ে চখের জল মুছিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—সুধীর, তুমি ইচ্ছা করলে কথাটাকে খুব সহজ করে নিতে পার।

সুধীর নিরুদ্বেগে তখনি তখনি উত্তর দিল—আমার ইচ্ছায় যদি সহজ হয়, আমি এখনি তা করতে প্রস্তুত আছি। সাহস পাইয়া আনন্দ মোহন বলিল, তুমি হাজারিকে গ্রহণ কর—আমার মা-বাপ-মরা মেয়ে সুধীর—আনন্দমোহন সুধীরের দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

এতদিন পরে এই ছোট লোকের ছেলের উপর আনন্দমোহনের এত অনুগ্রহ হইবে, সুধীর ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই; সুধীর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—জেঠা-মশায় এত ছোট হতে চাচ্চেন কেন? আমার চাইতে অনেক ভাল ছেলে আছে, আমি এনে দিব। সুধীর শান্ত শিষ্ট এবং বিনয়ী হইলেও তাহার আত্মমর্য্যাদার অভাব ছিল না—হাজারির সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব মাত্রেই সে যে আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিবে, আনন্দমোহনের মনে একথা কখনই উদয় হয় নাই। সুধীরের উত্তর শুনিয়া তাহা ভাল রূপেই বুঝিয়া লইয়া আনন্দমোহন কাতরকণ্ঠে বলিল, বাবা আমার সময় পুরে এসেছে। আমার অনুরোধ শুনে আমায় নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে দাও সুধীর—বৃদ্ধের চক্ষের জল সুধীরের বদ্ধ হস্তের উপর টপ টপ করিয়া পড়িতেছিল। বৃদ্ধের বিগলিত স্নেহধারার উপর সুধীর কঠিন আঘাত না করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—মা ভিন্ন এ কথার উত্তর আমি দিতে পারি না।

সন্দেহাকুলিতচিত্তে আনন্দমোহন বলিল,—তোমার মত কথাই হয়েচে, বেশ তাই হবে।

সঙ্কল্প অনুরূপ কাজ করার প্রণালীতে আনন্দমোহন সিদ্ধহস্ত—সেই অবস্থায় সুধীরের সঙ্গে তাহার মায়ের নিকট গিয়া আপনাকে অতি নীচ প্রতিপন্ন করিয়া সুধীরের মায়ের নিকট বেশ শান্তভাবে সম্মতি পাইয়া বিদায় হইল।

সুধীর কিন্তু বিশেষ সন্তুষ্ট না হইয়া মাকে বলিল "মা কাজটা ভাল করলে না।"

সুধীরের মা বলিল, ওর জন্য পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। এই সেদিন পর্য্যন্ত মনে পড়ে সুধীর, যেদিন এনটেন্স পাস করার খবর বেরুল. তাতে ঠাট্টা তারপর জলপানি পেলি তার খবর বেরুল, তাতে বলে কি, খেয়ে বাঁচলো, গুণ টানা কায়েত, এই চেয়ে আর পড়ে কাজ কি? আর সেই লোক আমার বাড়ী এসে তার সব ভুল স্বীকার করে ঘাট মান্‌লে আর তার নাত্‌নী এসে আমার উঠোন ঝাট দেবে, সে সুযোগ ছাড়তে পারলাম না, আর এ বড় মানুষটার মাথা মুড়িয়েও দিতে পারলাম না। সুধীর—তুমি কি হাজারিকে চেন না?

"চিনে জেনে মত দিয়েছি। ভাল করলেনা পরে অনুতাপ করবে।"

"আমার ভালোর দরকার নেই বাবা, তোর তো ভাল হোক।"

"তোমার মন্দ করে আমার ভালো—তাতো কখন সহ্য করতে পারবোনা।

"তা ঘটবে না—আমি যাতে সম্মতি দিয়েছি তার ওপর কথা কস্‌নে।"

"তোমার সম্মতির ওপর কথা কইবার সাধ্য আমার কখনও হবেনা মা।"

"আমি সাত বছরেরটী নিয়ে বিধবা হয়েছি, তখনও তুই যে সুধীর এখনও তুই সে সুধীর। সুধীরের মাতার সুখদুঃখসম্মিলিত অশ্রু সুধীরের তর্ককে জয় করিল। সুধীর আর কথা কহিল না।

ঠিক সময়ে বিবাহ হইল। রায় রসময় মিত্রের প্রকাণ্ড একটা দাও হাত-ছাড়া হওয়াতে পুত্রের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়া মনস্তাপের শান্তি করিলেন। গিন্নী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছার চুলের মধ্যে এমন কি ছিল যে, তুমি ওর মাথাটা মুড়িয়ে দিলে।

কর্ত্তা সরোষে উত্তর দিলেন—ব্যাটার গোপ ছাঁটা আর চুল কাটা দেখেই তারা হেসে ফিরিয়ে দিয়েছে।

তা' দিক্ ছেলের কি আর বিয়ে হবে না! কর্ত্তা মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—বিয়ে হবেনা কেন? তিন লাখ টাকার বিষয়টা আর ঘরে আস্‌বেনা?

বিবাহের পর কৃপণ আনন্দমোহন সুধীরের সুবিধা ও সন্তোষ বিধানের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া পড়িল। সুধীরকে পাইয়া তাহার সন্দিগ্ধ মন অনেকটা শান্ত হইয়াছিল।

হাজারি বয়স্থা হইলেও তাহার দাদা মশায়ের নিকট শিশুর মত ব্যবহার পাইয়াছে—দাদা মশায়ের আদর যত্ন স্নেহ ষোল আনাই হাজারি উপভোগ করিয়াছে। এখন তাহার সে স্বত্বের অংশীদার সুধীর, তারপর হাজারির চির পরিচিত সুধীর—সুধীরের নিকট হাজারি তাহার আবাল্য স্বাধীন বৃত্তিগুলি সংযত করিয়া অবনত হইতে গোটেই রাজি হয় নাই। বৃদ্ধ রাহিরের শৃঙ্খলায় যত্নবান্ হইয়া তাহার সুব্যবস্থা করিল; কিন্তু অন্দরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান ঘটিয়া রহিল, তাহার তত্ত্ব লইবার চেষ্টা করে নাই বা সেজন্য তাহাকে এ সংবাদ শুনাইবার মত লোকও কেহ ছিল না। কাজেই ব্যবধানটা দিনে দিনে একটু গুরুতর আকার ধারণ করিল। স্বামী স্ত্রীর কথা পর্য্যন্ত বন্ধ! এই অবস্থায় আনন্দ মোহনের শেষ ডাক

আসিলে তাহার বহুকালের কষ্টার্জ্জিত অর্থের মমতা ছাড়িয়া বিদায় হইতে হইল।

দাদা ম'শয়ের বিয়োগে হাজারি শোকাকুলা হইলে সুধীর হাজারিকে প্রবোধ দিবার সুযোগ পাইয়াছিল। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর হাজারির সমস্ত সঙ্কোচ ঘুচিয়া যাওয়ায় সে পূর্ণ স্বাধীনা হইয়াছিল। কাজেই সুধীরের কোন প্রকার প্রতীক্ষা করার তাহার দরকার হয় নাই।

আনন্দমোহনের নামটা দেশে ইচ্ছা করিয়া কেহ করিত না। এই নামাপবাদটা ঘুচাইবার জন্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আনন্দ মোহনের নামে একটা ডাক্তার পাশ করিয়া দিবার জন্য নসিরাম সরকার দিয়া সুধীর-হাজারিকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। হাজারি রুক্ষভাবে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিল—সুধীর হাজারির গর্হিত আচরণে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না করাতে বাড়ীর চাকর চাকরাণীর মধ্যে একটা শ্লেষের ইঙ্গিত চলিতেছিল। সুধীর তাহা বুঝিয়াছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও এবাড়ী হইতে এ অবস্থায় অন্যত্র চলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত, এই বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাহাকে চলিতে হইল। শ্রাদ্ধের মধ্যে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা হইল, তাহার ফলভাগীও সুধীরকে হইতে হইল।

ছোট তরফের বাড়ী নিমন্ত্রণ—জ্ঞাতিভোজ উপলক্ষে ছোটকর্ত্তার মেয়ে শিবরাণী হাজারিকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আসিয়াছিল। বাহিরের লোক টাকা কর্জ্জ আর কাজ ছাড়া বড় একটা কেহ এবাড়ীর দিকে আসে না। শিবরাণী কখন কখন হাজারির নিকট আসিত; কিন্তু তার সঙ্গে ভাল করিয়া মিশিবার অবকাশ হাজারির হইত না। নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া সিবু হাজারিকে একটু সতর্ক করিতে ইচ্ছা ছিল; কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া শিবরাণী সে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া চলিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পরীক্ষাচ্ছলে শিবরাণী সুধীরের মাতার সঙ্গে একটী স্বতন্ত্র স্থানে আহারের ঠাঁই করিয়া শিবরাণীই হাজারীকে ডাকিল। হাজু দি, তোমরা শাশুড়ী-বৌতে এক যায়গায় থারে এস। শিবরাণীর কথা শুনিয়া হাজারি বিরক্তভাবে বলিল, না না তা হবে না। সহজ ভাবে শিবরাণী বলিল, শাশুড়ীর সঙ্গে বসে খেতে হচ্চে বুঝি!

বিরক্ত সহকারে হাজারি বলিল "খেতে এসেছি খেতে দাও, সম্পর্ক গোছানর দরকার কি?"

কথাটা শুনিয়া শিবরাণীর মুখ লাল হইল। হাজারি বেহিসাবী—তাহা গ্রাহ্য করিল না।

সুধীরের মা নিকটে ছিল, কথাগুলো তাই তিনি শুনিতে পাইলেন। শিবরাণীর কৌশলে আহারের কাজটা স্বতন্ত্র স্থানেই হইল।

হাজারির কঠিন আঘাতের উপর প্রতিঘাত করিবার আশায় হাজারি যেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার অনতিদূরে সুধীরের মাতা শিবরাণীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। শিবরাণী হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "খুড়িমা আপনার বৌমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হলো কি?

ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সুধীরের মা বলিলেন "বৌমা কে?—আমি তো বিয়ে দিইনি, বিয়ে দেব।"

বজ্রধ্বনির মত সুধীরের মায়ের কথাটা হাজারির বুকের মাঝে আঘাত করিল। কথার উত্তর দিবার কোন শব্দই হাজারির জুটিয়া উঠিল না। হাজারি নীরবে আঘাত সহ্য করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। ঘটনাটা শিবরাণী কর্ত্তৃক পাকাপাকি হইয়াছে বুঝিয়া রাগটা তাহার উপর হইল। হাজারির চির-অভ্যস্ত নিঃসঙ্কোচভাবকে আজকের ঘটনায় একটু দমিত হইতে হইল।

নসিরাম টাকা কাগজ লইয়া হাজারির প্রতীক্ষা করিতেছিল, হাজারির পরাজয়ের চাপটা নসিরামের উপর পড়িল। নসিরাম আজ আর নীরবে সহ্য করিল না, নসিরাম শান্তভাবে বলিল, না তোমার তিরস্কারের কোন মূল্য নেই। তুমি নিজে ভুল বুঝেছ। সরকারের উত্তরে বলিল "কি ভুল বুঝেছি—বুঝিয়ে দিতে পার?" "আমার সফলতার উপর তোমার দুষ্ট মন্তব্য প্রকাশই ভুল।" বলিয়া সরকার নিঃসঙ্কোচে হাজারির মুখের দিকে চাহিল। হাজারি আজ আর বেশী কথা কহিল না। মঙ্গলা তাহার [illegible] প্রতিপালিকা। সরকারকে বিদায় করিয়া মঙ্গলাকে কাছে ডাকিয়া বসিতে বলিল। কথাটা কি করিয়া মঙ্গলার নিকট উত্থাপন করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। মঙ্গলা আসিয়া চুপ করিয়া বসিল, সেও কোন কথা বলে না। বিরক্ত হইয়া হাজারি বলিল, তোকে বোবার মত বসে থাকতে ডাকলাম?

মঙ্গলা বলিল "কি বলবে বল দিদিমণি!" "তোর মুণ্ডু বলবে" বলিয়া হাজারি উঠিয়া গেল। তার অশান্ত মনকে শান্ত করিবার জন্য একজন কাউকে তার প্রয়োজন, কিন্তু তার সে প্রয়োজন, তার পরিবারস্থ কাহারও দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে না, সে একটা অভাব অনুভব করিয়া তাহার চঞ্চল মনকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেছিল না।

হাজারি ছোট তরফের বাড়ী যে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে; তাহা সেই মুহূর্ত্তে সুধীরের কাণে আসিয়া পৌছিয়াছে। কথাটা শুনিয়া সুধীর বাড়ী আসিয়া দেখিল তাহার মা বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। হাজারির ব্যবহারের কথা সুধীরকে তিনি ইচ্ছা করিয়াই শুনাইলেন। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া মা বলিলেন "বাবা ওবাড়ী যাও।" সুধীরও মাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিল—"কাল সকালে যাওয়া যাবে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজরাজ ঘোষ।

গচ্ছিত ধন।

(ছোট গল্প)

কমলা যেদিন সেই মৌন সাঁঝের বেলায় আমাদের সকলের কাছ থেকে চির বিদায় নিলে, সেদিন সে তা'র একমাত্র আদরের মেয়েটি ছবিকে আস্তে আস্তে আমার হাতে তুলে দিয়ে তার সেই শীর্ণ রোগপাণ্ডুর মুখখানি একটু ক্ষীণ হাসিতে উদ্ভাসিত করে ম্লান চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিটুকু আমার চোখের উপর রেখে ব'ল্লে,—"যাবার সময় আমার ছবিকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম, এ তোমার কাছে গচ্ছিত রইল, দেখো যেন এর অযত্ন ক'রোনা।"

সন্ধ্যার অস্তগামী-সূর্য্যের শেষ রক্তিম রশ্মিটুকু পর্য্যন্ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল; গৃহস্থের ঘরে মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা প্রচার ক'রে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিধ্বনি তুল্‌লে; একটী স্নিগ্ধ শীতল মলয়োচ্ছ্বাসে তরুশাখাগুলো মর্ম্মরিয়ে কেঁপে উঠ্‌লো। কমলার মুখের শেষ হাসিটুকুও আস্তে আস্তে আমার চোখের সাম্‌নে মিলিয়ে গেল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তারও জীবনসূর্য্য কোন অজ্ঞাত এক গভীর মৃত্যুসাগরের অতল তলে ডুবে গেল; আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ছবিকে সে বড় ভাল বাস্‌তো,—প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে। তাই সে তাকে কারো কাছে রেখে স্বস্তি পেতোনা; সারাদিন নিজের স্নেহভরা বুকটির ভিতর

তা'কে জড়িয়ে ধ'রে রাখ্‌তো, আর মাঝে মাঝে তার সেই কচি কচি গোলাপী গাল দুটি স্নেহের চুম্বনে চুম্বনে রাঙিয়ে দিত। তার সখীরা কত ঠাট্টা ক'র্ত্তো, কত লোকে কত কথা ব'ল্‌তো, কিন্তু সবই সে হেসে উড়িয়ে দিত। মনে মনে ব'ল্‌তো—"এই যে আমার সর্ব্বস্ব; এর জন্যেই ত' আমি, কতদিন কত দেব-দেবীর কাছে কত প্রার্থনা ক'রেছি, কত ব্রত নিয়ম ক'রেছি, কত পূজা মান্‌ত দিয়েছি! ছবি তো আমার শুধু মেয়ে নয়, ওযে আমার ঠাকুরের দান! ওর অযত্ন হ'লে ঠাকুর রুষ্ট হবেন!"

তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুটি বছর কেটে গেল;—ক্রমে কমলার মধুর স্মৃতি একটু একটু ক'রে বিস্মৃতির সাগরে ডুবে যেতে লাগ্‌ল';—শুধু তখনই একবার মাঝে মাঝে তা'র কথা তা'র আকৃতি মনে প'ড়তো যখন ছবি তার সেই সরলতা মাখান কথা গুলিতে আমার শ্রবণ পরিতৃপ্ত ক'রতো; আর তা'র কথা শুনে তার মুখ পানে চেয়ে চেয়ে অনেক কথা মনে প'ড়ত,—শেষে অনেক কষ্টে টেনে একটী অত্যন্ত বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলতুম্—এই পর্য্যন্ত।

তারপর মায়ের শত পীড়াপীড়িতে আবার বিয়ে ক'র্‌লুম; আবার জেমনি ঘর সংসার পাত্‌লুম;—ক্রমে প্রভার সোণার কাঠিটির মোহন স্পর্শে আমি কমলার স্মৃতি একদম্ ভুল্‌লুম,—আর তা'কে দিনান্তে একবারও মনে পড়ে না। তাই এখন ভাবি—পুরুষ কি স্বার্থপর! সে আমায় প্রাণ দিয়ে ভাল বাস্‌তো, কিন্তু তার সেই ভালবাসার প্রতিদান দিলুম—মাত্র দুটি বছরের মধ্যেই তা'র স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষে ভুলে! আর নারী—তারাও কি-কম স্বার্থপর?

ক্রমে ক্রমে কমলার মরণ কালের রক্ষিত গচ্ছিত ধন ছবি—তা'কে পর্য্যন্ত অনাদর ক'র্ত্তে লাগ্‌লুম! শেষে এমন হ'ল যেন ছবিকে দূরে রাখ্‌তে পার্লেই, আমায় শান্তি, প্রভাও আমায় প্রায়ই সেই প্রকার উপদেশ দিত। এখন বুঝছি—সে তেমন উপদেশ দিত—তা'র প্রকৃতির বশবর্ত্তী হ'য়ে। হায় নারী! নিজে মায়ের জাত হ'য়ে কেমন ক'রে অপরের সন্তানের উপর তোমার অন্তরে এমন কুটিল ঈর্ষা জাগে?

শেষে প্রভার পরামর্শে ওপাড়ায় আমার এক পিসতুত বোনের কাছে ছবিকে পাঠিয়ে দিলুম। ছবিকে যেদিন আমি সেখানে রেখে আসি, সে দিন কি তার আকুল কান্না! কিন্তু সে কান্না দেখেও ত' সেদিন তা'র মায়ের শেষ অনুরোধের কথা আমার মনে পড়েনি! হায় আমার পাষাণ প্রাণ! তা'র সে স্মৃতি শক্তি যে তখন এক কুহকীর কুহকজালে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কে বুঝি

আমার সে পূর্ব্বের হৃদয় চুরি ক'রে সেখানে তখন আর এক নূতন হৃদয় নূতন ধাতু দিয়ে গড়ে দিয়েছিল! তাই তা'র তখন এত পরিবর্ত্তন!

তারপর পাহাড়ে সাপ যেমন ক'রে তার নিঃশ্বাসের আকর্ষণ শক্তিতে তার শীকারকে অনেক—অনেক দূর থেকে নিকটে তা'র মুখের সাম্‌নে টেনে আনে, প্রভাও ঠিক তেম্‌নি ক'রে বিশ্বের সমস্ত পরিচিত বস্তুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আমায় তা'র কাছটিতে টেনে নিলে। একদণ্ডের অদর্শনে সে মুখ ভার ক'রে বস্‌তো বাড়ী ফিরতে একটু রাত হ'লে কান্না কাটিতে আমায় অস্থির ক'রে তুল্‌তো! ক্রমে ক্রমে আমিও যেন তা'র মন্ত্রে বশীভূত হ'য়ে শীকারীর সম্মুখে স্বরমুগ্ধ কুরঙ্গীর ন্যায় তা'র কাছে ধরা দিলুম,—সেও আমায় ধীরে ধীরে পাশবদ্ধ ক'র্লে।

এম্‌নি ক'রে প্রায় দুবছর কাট্‌ল। সেদিন দুপুররাতে প্রভার সঙ্গে পাশা পাশি শুয়ে কত গল্প ক'র্চ্ছি, এমন সময় ওবাড়ীর চাকর এসে খবর দিলে, "ছবির বড় জ্বর, বুকের স্পন্দন যেন হঠাৎ দ্রুত হ'য়ে উঠ্‌লো। দেহটীও এতবার আমার অস্ত্রাঘাতেই বুঝিবা কেঁপে উঠেছিল। উত্তর ক'র্লুম,—"খুব বেশী কি?" সে ব'ল্লে, "হাঁ; একটু আগে ১০৬॥০ পর্য্যন্ত উঠেছিল, এখন একটু একটু ক'রে কম্‌ছে।" আমি ব'ল্লুম, "এখুনি যেতে হবে কিনা কিছু বলেছে না কি?" সে ব'ল্লে, "হাঁ ডাক্তার আন্‌তে হবে।" আমি ব'ল্লুম, "আচ্ছা যাও, যাহয় ক'র্চ্ছি।"

কিন্তু যাহয়, করার মধ্যে এই হ'ল যে প্রভার পরামর্শ মত সে রাত্রের জন্য ডাক্তার ডাকা স্থগিত রইল। সে ব'ল্লে ও এম্‌নি জ্বর হ'য়েছে, ভাল হ'য়ে যাবে; এই রাত্তিরে ঠাণ্ডায় বেরিয়ে আমার অসুখ ক'চ্চে। দেহের অসুখ হয়ত তখন সে রাত্তিরে বেরুতে না দিয়ে সে আট্‌কেছিল, কিন্তু মনের অসুখ যে তা'র চেয়ে শতগুণ তেজে আজ পর্য্যন্ত আমার অন্তরটীকে দিনরাত জ্বালাচ্ছে—ওঃ সে যে দু'রারোগ্য হ'য়ে উঠেছে, সারা জীবন তেম্‌নি ক'রে সেদিনকার রাতের মত অতি সাবধানে প্রভার পাশে শুয়ে থাক্‌লেও ত' আর সে অসুখ আমার সারবে না।

সকাল বেলা গিয়ে দেখ্‌লুম, তখনও ছবির ১০৩' জ্বর—তা'র উপর আবার জ্বর আস্‌ছে। কাছেই একটী হাতুড়ে ডাক্তার ছিল—তা'কে ডাক দিলুম। রোগী পরীক্ষা ক'রে সে আশ্বাস দিলে,—কোনও ভয় নেই, ম্যালেরিয়া জ্বর, ভাল হ'য়ে যাবে।

সেদিন আর ওবাড়ী যাইনি। তারপর দু'দিন তেম্‌নি ভাবে কাট্‌লো;

প্রত্যহ একবার ক'রে সন্ধ্যার সময় ছবির খোঁজ নিয়ে আস্‌তুম—সেও বুঝি বা নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে !

শনিবারের দিন একটু সকাল সকাল আফিস থেকে এসে ঘরে ব'সে আছি, এমন সময় মধু চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলে, ছবি বড় ছট্‌ফট্‌ ক'র্চ্ছে, জ্বরও, বড্ড বেড়েছে, আর মাঝে মাঝে কিসব ভুল ব'কছে।

মনের ভিতরটা কেমন আকুলিবিকুলি ক'রে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি প্রভাকে না জানিয়েই একটা জামা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে প'ড়লুম। এবাড়ী এসে দেখি ছবি তেম্‌নি ছট্‌ফট্‌ ক'র্চ্ছে, আর কেবল ভুল বক্‌ছে—"মা তুমি এসেছ ? আমায় নিয়ে যাবে ? যাওনা মা আমায় নিয়ে। না—বাবার কাছে আমি থাক্‌বো না। বাবা আমায় ভালবাসে না, নূতন মা'কে ভাল বাসে। আমি তোমার কাছে থাক্‌বো। নতুন মা ভারি দুষ্টু, তুমি কেমন লক্ষ্মী, নয় মা ?" প্রাণটা ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো। হঠাৎ চেয়ে দেখলুম—কত দূরে, আজ এ কতদূরে এসে প'ড়েছি ! একেবারে তীরে ! আর এক পা এগোলেই ডুব্‌তে হবে ! মনে প'ড়ল,—কমলার সেই শেষ কথাগুলি। তার সেই মহামূল্য ধনটী আমার কাছে সে গচ্ছিত রেখে গেছল' ; আর আমি তা'র কত অবহেলা ক'রেছি ! বুঝ্‌লুম তা'র স্বর্গীয় আত্মার কাছে আমি আজ কত অপরাধী ! এ অপরাধের শাস্তি যে আমার পেতেই হ'বে। সে আমায় বিশ্বাস ক'রে তার প্রাণের বস্তুটি আমার কাছে রেখে গেল—আর আমি মূর্খ বিশ্বাস-ঘাতক আমি—তা'র কি অবহেলাই না ক'রেছি ? সেই শুভ্র কুসুম কোরকটী কি নিষ্ঠুর ভাবেই না পদদলিত ক'রে ছিন্ন ভিন্ন ক'রেছি ! আর ত' উপায় নাই। এই ক্ষুদ্র সরল শিশুর পবিত্র আত্মা—এও যে আমায় চোখ রাঙিয়ে তিরস্কার ক'র্ব্বে ! ছিঃ-ছিঃ—কি নীচ—কি ঘৃণ্য আমার কাজ ! সমস্ত মনটী তীব্র অনুশোচনায় ভরে উঠলো।

তখনই বেরিয়ে গেলুম সাহেব ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার ডাকতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা ক'রে মুখ বিকৃত ক'রে বল্লেন,—"আশা নেই, আজ রাতেই শেষ।" মস্ত বড় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাঁর হাতে ভিজিটের টাকা কয়টী গুঁজে দিয়ে চাকরটীকে অষুধ আন্‌তে পাঠালুম, নিজে গিয়ে ছবির শিয়রে ব'সলুম।

রাত ১১টার পর থেকে জ্বর ছাড়তে আরম্ভ করলে। ক্রমে ক্রমে সে যেন দুর্ব্বল অবসন্ন হ'য়ে বিছানায় নেতিয়ে প'ড়ল। সমস্ত শক্তির তা'র শীর্ণ পাণ্ডুর

দেহটীকে আগলে জেগে ব'সে রইলুম,আর ভগবান্‌কে ডাক্‌তে লাগলুম,—দয়াময় আমার ছবিকে বাঁচাও! আর আমি ওকে অবহেলা ক'র্ব্বো না,—যেমন যত্নে যেমন বিশ্বাসে সে আমার হাতে একে সঁপে দিয়েছিল—ঠিক তেম্নি যত্নেই আমি রাখব তারে!—হরি হে। শুধু একটীবার মাত্র। এবারকার মত অন্ততঃ আমায় ক্ষমা কর; কিন্তু আমার অপরাধের ভার বুঝি বড় বেড়ে উঠেছিল, তাই ভগবান্ আমায় ক্ষমা কর্ত্তে চাইলেন না। শেষ রাত্রে ভাই ছবি আমার কোলে মাথা রেখে ধীরে ধীরে চিরজন্মের মত চোখ বুজলো। দিদি কেঁদে উঠলেন,—আমি চোখের কোণের কয় ফোঁটা তপ্ত অশ্রু কোঁচার খুঁটে মুছে ফেল্‌লুম। মনে মনে ব'ল্‌লুম,—একটী স্বর্গগতা অবলার বুকের ধন আমার দোষে আজ এমন অবহেলায় তাচ্ছিল্যে নষ্ট কর্‌লুম,—একটি কোমল শিশুর পবিত্র প্রাণ আজ আমি বিনষ্ট কর্‌লুম—আমার নির্ম্মমতার উষ্ণ উত্তাপে কোমল ফুলকুঁড়িটী অকালে শুখিয়ে ঝ'ড়ে প'ড়ল। ভগবান্, এ অপরাধের কি শাস্তি!

ভোর বেলা যখন কমলার শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু পর্য্যন্ত গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরলুম—প্রভা তখন দালানে আমার অপেক্ষায় গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে। চেহারা দেখে বুঝলুম, সেও কাল সারা রাত ঘুমোয়নি।

খবর কি?—খুকি—

তা'র কথায় বাধা দিয়ে কম্পিতকণ্ঠে ব'ল্‌লুম,—"তোমার শত্রুর শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত এই মাত্র গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম!—এখন আমার সব বন্ধন ছিন্ন হ'য়েছে,—এইবার আমায় আরও মুক্ত ক'রে তোমার হৃদয়ে জড়িয়ে নাও।"

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

গয়ার কথা।

(২)

ব্রহ্ম গয়া।

রামায়ণে।

পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনবাসকালে যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভরত সকলের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে, রামচন্দ্র পিতৃ-সত্যপালনের জন্য বনবাস করিতেছেন বলিয়া ভরতকে উত্তর প্রদান করেন, এবং তাঁহাকেই রাজ্য গ্রহণ করিয়া পিতার সত্য পালন করিতে উপদেশ দেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, গয়াপ্রদেশে গয়নামে কোন ধীমান্, যশস্বী, বাগ্মিক পিতৃগণের প্রীতিকামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন যে,—"সন্তান পুৎনামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্রনামে অভিহিত হয়, এই পুত্রই পিতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে। এই জন্য লোকে গুণবান্ ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী বহু পুত্রের কামনা করিয়া থাকে; কারণ, তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ গয়ায় যাইবে। *।

মহাভারতে।

পাণ্ডবগণের বনবাসকালে কাম্যকবন হইতে অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের জন্য হিমালয়ে তপস্যা করিতে গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার বিরহে অত্যন্ত

---

* শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতিগীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষেব পিতৃন্ প্রতি॥ ১১।
পুন্নাম্নো নরকাদ্যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ॥ ১২॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্গয়াং ব্রজেৎ॥ ১৩॥
রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭ অধ্যায়।
(বঙ্গবাসী সংস্করণ)

কাতর হইয়া পড়েন। সেই সময়ে দেবর্ষিনারদ তথায় উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে তীর্থযাত্রা ফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ঋষিসত্তম পুলস্ত্য ভীষ্মকে সে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া যে যে তীর্থে গমন করিলে, যে যে ফল লাভ হয়, তাহারই বর্ণনা করেন। সেই প্রসঙ্গে গয়ার কথা এইরূপ বলিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গয়ায় উপস্থিত হওয়া মাত্র অশ্বমেধ ফল লাভ, এবং কুলের উদ্ধার সাধন করা হয়। সেখানে ত্রিলোকবিশ্রুত অক্ষয় বট আছে, তথায় পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। মহানদীতে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিলে, তাঁহারা অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং কুলেরও উদ্ধার সাধন হয়। তাহার পর ধর্ম্মারণ্য-পরিশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিলে, ব্রহ্মলোকের প্রাপ্তি ঘটে, উক্ত সরোবরে ব্রহ্মা এক যূপকাষ্ঠ নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই যূপকাষ্ঠ প্রদক্ষিণ করিলে, বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। তৎপরে লোকবিশ্রুত ধেনুক তীর্থে গমন করিয়া, তথায় একরাত্রি বাস এবং তিল ও ধেনু প্রদান করিলে, সর্ব্ব পাপবিমুক্ত হইয়া সোমলোকে গমন করা যায়। পূর্ব্বে পর্ব্বতে সঞ্চরণকালে সবৎসা কপিলার যে সমস্ত পদচিহ্ন তথায় নিপতিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল পদচিহ্ন স্পর্শ করিলে সমস্ত অশুভ কার্য্য নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর মহাদেবস্থান গৃধ্রবটে গমন করিয়া, শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিলে, ব্রাহ্মণগণের দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠিত, এবং অন্যান্য বর্ণের সকল পাপ বিনষ্ট হয়। তাহার পর সঙ্গীত-নিনাদিত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিলে, তথায় সাবিত্রীর পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় ব্রাহ্মণ সংশিতব্রত হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিলে, দ্বাদশ-বার্ষিক সন্ধ্যা উপাসনার ফল লাভ ঘটে। সেখানে যোনিদ্বার নামে বিখ্যাত তীর্থে অভিগমন করিলে, লোক যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে যে ব্যক্তি গয়ায় বাস করে, তাহার সপ্তম কুল পবিত্র হয়। লোকের বহু পুত্রের কামনা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাদের মধ্যে যদি কেহ গয়ায় গমন, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করে। তাহার পর কন্যতীর্থ গমন করিলে, অশ্বমেধের ফল ও মহতী সিদ্ধি লাভ ঘটে। তাহার পর যেখানে ধর্ম্ম নিত্য বিরাজমান, সেই ধর্ম্মপ্রস্থে সমাহিত হইয়া গমন করিয়া, কূপোদক পান, ভোজন, স্নান, এবং পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিলে, পাপ মুক্তি ও

স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। সেখানে শ্রান্তি ও শোক বিনাশন মতঙ্গাশ্রমে প্রবেশ করিলে, অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তাহার পর ব্রহ্মতীর্থে গমন করিয়া ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইলে, রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ৩।

পাণ্ডবেরা অর্জ্জুনবিরহিত কাম্যক বনে বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, তাঁহাদের পুরোহিত ধৌম্যকে কোন রমণীয় বনের নাম উল্লেখ করিতে কহিয়া,

---

"ততো গয়াং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ৮২ ॥
তত্রাক্ষয়বটো নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তত্র দত্তং পিতৃভ্যস্তু ভবত্যক্ষয়মুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥
মহানদ্যামুপস্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অক্ষয়ান্ প্রাপ্নুয়াল্লোকান্ কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ৮৪ ॥
ততো ব্রহ্মসরো গত্বা ধর্ম্মারণ্যোপশোভিতম্।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি প্রভাতায়েব শর্ব্বরীম্ ॥ ৮৬ ॥
ব্রহ্মণা তত্র সরসি যূপশ্রেষ্ঠঃ সমুচ্ছ্রিতঃ।
বৃগং প্রদক্ষিণং কৃত্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৮৬ ॥
ততো গচ্ছেত্ত রাজেন্দ্র বেদুকং লোকবিশ্রুতম্।
একরাত্রোষিতো রাজন্ প্রযচ্ছেৎ তিলধেনুকাম্ ॥ ৮৭ ॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোমলোকং ব্রজেদ্ধ্রুবম্।
তত্র চিহ্নং মহদ্রাজন্নদ্যাপি হি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥
কপিলা সহবৎসা বৈ পর্ব্বতে বিচরত্যুত।
সবৎসায়াঃ পদান্যত্র দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভারত ॥ ৮৯
তেষু পস্পৃশ্য রাজেন্দ্র পদেষু নৃপসত্তম।
যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম তৎ প্রণশ্যতি ভারত ॥ ৯০
ততো গৃধ্রবটং গচ্ছেৎ স্থানং দেবস্য শূলিনঃ।
স্থায়ীত ভস্মনা তত্র সঙ্গম্য বৃষভধ্বজম্ ॥ ৯১
ব্রাহ্মণেন ভবেচ্চীর্ণং ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি ॥ ৯২
উত্তরঞ্চ ততো গচ্ছেৎ পর্ব্বতং গীতনাদিতম্।
সাবিত্র্যাস্তু পদং তত্র দৃশ্যতে ভরতর্ষভ ॥ ৯৩
তত্র সন্ধ্যামুপাসীত ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
তেন হ্যপাস্তা ভবতি সন্ধ্যা দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৯৪
যোনিদ্বারঞ্চ তত্রৈব বিশ্রুতং ভারতর্ষভ।
তত্রাভিগম্য মুচ্যেত পুরুষো যোনিসঙ্কটাৎ ॥ ৯৫

বিবিধ আশ্রম, সরোবর নদী পর্ব্বত প্রভৃতির কথা বর্ণনা করিতে বলিলে, ধৌম্য পূর্ব্বদিক্ হইতে সে সকল বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বদিকে রাজর্ষিসৎকৃত গয়নামে গিরিবর আছে, এবং দেবর্ষিসেবিত মঙ্গলকর ব্রহ্মসরোবরও বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার জন্য প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন যে, লোকের বহু পুত্র কামনা করা উচিত, কারণ তাহাদের মধ্যে যদি কেহ গায়ায় গমন, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও নীল বৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে উর্দ্ধতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষের উদ্ধার হয়। সেখানে মহানদী ও গয়শির আছে, এবং অক্ষয়করণ বটও রহিয়াছে। তাহাতে পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিলে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। তথায় পুণ্যসলিলা ফল্গু নাম্নী মহানদী প্রবাহিত হইতেছেন *।

কৃষ্ণশুক্লাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যৌ বৎসলবঃ।
পুনাত্যাসপ্তমং রাজন্ কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৫
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৯৭
ততঃ ফল্গুং ব্রজেদ্রাজংস্তীর্থসেবী নরাধিপ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সিদ্ধিঞ্চ মহতীং ব্রজেৎ ॥ ৯৮
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ধর্ম্মপ্রস্থং সমাহিতঃ।
তত্র ধর্ম্মো মহারাজ নিত্যবাস্তে যুধিষ্ঠির ॥ ৯৯
তত্র কূপোদকং পীত্বা ততঃ স্নাতঃ শুচিস্তথা।
পিতৃন্ দেবাংশ্চ সন্তর্প্য মুক্তপাতো দিবং ব্রজেৎ ॥ ১০০
মতঙ্গস্যাশ্রমস্তত্র মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
তৎপ্রবিশ্যাশ্রমং শ্রীমচ্ছুশোকবিনাশনম্ ॥ ১০১
গবাময়ণযজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
ধর্ম্মং তত্রাভিসংস্পৃশ্য বাজিমেধমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মস্থানমনুত্তমম্।
তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র ব্রহ্মাণং পুরুষর্ষভ ॥ ১০৩
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ।
ততো রাজগৃহং গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপঃ ॥" ১০৪
মহাভারত বনপর্ব্ব ৮৪ অধ্যায়।
(বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

* "তস্যাং গিরিবরঃ পুণ্যো গয়ো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।
শিবং ব্রহ্মসরো যত্র সেবিতং ত্রিদশর্ষিভিঃ ॥ ৮

পাণ্ডবেরা তীর্থযাত্রা আরম্ভ করিয়া, ক্রমে ক্রমে প্রয়াগে উপস্থিত হন। তথা হইতে রাজর্ষি গয় কর্ত্তৃক অভিসংস্কৃত মহীধর তীর্থে গমন করেন। সেখানে গয়শির পর্ব্বত ও পুণ্যসলিলা মহানদী বিরাজিত, এবং ঋষিগণসেবিত পবিত্র-শেখর পুণ্য ধরণীধর ও ব্রহ্মগয় তীর্থ অবস্থিত। তথায় ভগবান্ অগস্ত্য দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সনাতন ধর্ম্মরাজ বাস করিতেছেন। তথা হইতে নদী সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং সেইখানে ভগবান্ পিনাকপাণি মহাদেব নিরন্তর সন্নিহিত রহিয়াছেন। পাণ্ডবেরা তথায় চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিয়া, ঋষিযজ্ঞ সমাধান করিলেন, এবং অক্ষয়বটে ও অক্ষয় দেবযজ্ঞন-ভূমিতে উপবাস করিয়া, অক্ষয় ফল লাভের অধিকারী হইলেন। অনন্তর শত শত তপোধন ব্রাহ্মণেরা আসিয়া, আর্ষবিধানানুসারে চতুর্ম্মাস্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। বিদ্যা-তপোবৃদ্ধ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ সভামধ্যে সমাসীন হইয়া, যাজ্ঞিকদিগের পুণ্যময়ী কথা বলিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বিদ্যাব্রতাভিযিক্ত কৌমার ব্রতধারী শমঠ অমূর্ত্তরয়তনয় রাজর্ষি গয়ের কথা এইরূপভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অমূর্ত্তরয়-পুত্র রাজর্ষি গয় এইখানে একযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রচুর অন্নের বিতরণ ও ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে শত সহস্র অন্নাচল ও ঘৃতকুল্যা প্রস্তুত হয়, শত শত দধির নদী ও শত সহস্র ব্যঞ্জন প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। গয়রাজা প্রতিদিনই যাচকদিগকে এইরূপে অন্নদান করিতেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিও নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিত। দক্ষিণাদানকালে বেদধ্বনি আকাশ স্পর্শ করিত, তখন অন্য কোন প্রকার শব্দ শুনা যাইত না। ঐ অদ্ভুত পুণ্যধ্বনি সঞ্চারিত হইয়া ভূলোক, দ্যুলোক ও দশদিক পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত, তাহাতে সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িত। পরে লোকে এইরূপ গাথা গান করিত যে, "মহাভেজা গয়

যথার্থং পুরুষব্যাঘ্র কীর্ত্তয়ন্তি পুরাতনাঃ।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেবো গয়াং ব্রজেৎ ॥ ৯
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
উদ্ধরত্যুভয়তস্ত্যা দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ১০
মহানদী চ তত্রৈব তথা গয়শিরো নৃপ।
যত্রাসৌ কীর্ত্যতে বিপ্রৈরক্ষয্যকরণো বটঃ ॥ ১১
যত্র দত্তং পিতৃভ্যোঽন্নমক্ষয্যং ভবতি প্রভো।
সা চ পুণ্যজলা তত্র ফল্গুনামা মহানদী" ॥ ১২

মহাভারত বনপর্ব্ব ৮৭ অধ্যায় (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

রাজার যজ্ঞে দেশে দেশে সকলেই শুভ অন্নপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, অন্য কেহ যদি ভোজনাভিলাষী আছ, বল, তথায় এখনও পঞ্চবিংশতি অন্নাচল বিদ্যমান রহিয়াছে।" রাজর্ষিগয় যেরূপ সমারোহে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেরূপ কেহ কখনও করে নাই, এবং করিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। দেবগণ গয়দত্ত হবির্দ্বারা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, অন্যের দত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে আর পারিয়া উঠিতেছিলেন না। যেমন ভূতলের বালুকা, আকাশের তারকা ও মেঘের বারিধারা অসংখ্য, সেইরূপ গয়যজ্ঞের দক্ষিণাও কেহ গণনা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ব্রহ্মসরোবরের নিকট গয়রাজা এইরূপ অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। *।

গয়রাজার অপূর্ব্ব চরিত্র দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বে পুত্রশোকে কাতর রাজা

* "ততো মহীধরং জগ্মুর্ধর্ম্মজ্ঞেনাভিসংস্কৃতম্ ॥ ৮
রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্যুতে।
নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যা চৈব মহানদী ॥ ৯
বালীমমালিনী রম্যা নদীপুলিনশোভিতা।
দিব্যং পবিত্রকূটঞ্চ পবিত্রং ধরণীধরম্ ॥ ১০
ঋষিজুষ্টং সুপুণ্যং তৎ তীর্থং ব্রহ্মসরোত্তমম্।
অগস্ত্যো ভগবান্ যত্র গতো বৈবস্বতং প্রতি ॥ ১১
উবাস চ স্বয়ং তত্র ধর্ম্মরাজঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বাসাং সবিতাচৈব সমুদ্ভেদো বিশাম্পতে ॥ ১২
যত্র সন্নিহিতো নিত্যং মহাদেবঃ পিনাকধৃক্।
তত্র তে পাণ্ডবা বীরাশ্চাতুর্ম্মাস্যৈস্তদেজিরে ॥ ১৩
ঋষিযজ্ঞেন মহতা যজ্ঞাক্ষয়বটো মহান্।
অক্ষয়ে দেবযজনে অক্ষয়ং যত্র বৈ ফলম্ ॥ ১৪
তে তু তত্রোপবাসাংশ্চ চক্রুর্নিশ্চিতমানসাঃ।
ব্রাহ্মণাস্তত্র শতশঃ সমাজগ্মুস্তপোধনাঃ ॥ ১৫
চাতুর্ম্মাস্যেনাযজত আর্ষেণ বিধিনা তদা।
তত্র বিদ্যাতপোবৃদ্ধা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
কথাং প্রচক্রিরে পুণ্যাং সদসিস্থা মহাত্মনাম্ ॥ ১৬
তত্র বিদ্যাব্রতস্নাতঃ কৌমারং ব্রতমাস্থিতঃ।
শমঠো ধর্ম্মজ্ঞালন্নামূর্ত্তরয়সং গম্যম্ ॥ ১৭
শমঠ উবাচ।
অমূর্ত্তরয়সঃ পুত্রো গয়ো রাজর্ষিসত্তমঃ।
পুণ্যানি যস্য কর্ম্মাণি তানি মে শৃণু ভারত ॥ ১৮

সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন। অভিমন্যুবধের পর ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে সে কথা বলেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, অমূর্ত্তরয়ের পুত্র গয় একশত বৎসর হুতাবশিষ্ট মাত্র ভোজন করিয়া অগ্নির নিকট অভিলষিত বর লাভ করেন। সেই বর প্রভাবে তিনি শত বৎসর নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি ধনদান করিয়াছিলেন। যেখানে যত প্রাণী ছিল, গয়ের যজ্ঞে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিল যে, এরূপ যজ্ঞ আর কোথায়ও অনুষ্ঠিত হয় নাই। উক্ত যজ্ঞে মণি, মুক্তা ও হীরকে খচিত্র যে স্বর্ণময় বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল, গয়রাজা দক্ষিণাসমেত ব্রাহ্মণদিগকে সেই বেদী দান করিয়াছিলেন। যজ্ঞাবসানে পঞ্চবিংশতি অন্নপর্ব্বত, অসংখ্য রস নদী এবং রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধ

যস্য যজ্ঞো বভূবেহ বহ্বন্নো বহুদক্ষিণঃ।
তত্রান্নপর্ব্বতা রাজন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৯ ॥
ঘৃতকুল্যাশ্চ দধ্নশ্চ নদ্যো বহুশতাস্তথা।
ব্যঞ্জনানাং প্রবাহাশ্চ মহার্হাণাং সহস্রশঃ ॥ ২০ ॥
অহন্যহনি চাপ্যেবং যাচতাং সম্প্রদীয়তে।
অন্তে চ ব্রাহ্মণা রাজন্ ভুঞ্জতেঽন্নং সুসংস্কৃতম্ ॥ ২১ ॥
তত্র বৈ দক্ষিণাকালে ব্রহ্মঘোষো দিবং গতঃ।
ন চ প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদ্‌ব্রহ্মশব্দেন ভারত ॥ ২২ ॥
পুণ্যেন চরতা রাজন্ ভূর্দ্দিশঃ খং নভস্তথা।
আপূর্ণমাসীচ্ছব্দেন তদাপ্যাসীন্মহাদ্ভুতম্ ॥ ২৩ ॥
যত্র স্ম গাথা গায়ন্তি মনুষ্যা ভরতর্ষভ।
অন্নপানৈঃ শুভৈস্তৃপ্তা দেশে দেশে সুবর্চ্চসঃ ॥ ২৪ ॥
গয়স্য যজ্ঞে কে ত্বন্য প্রাণিনো ভোক্তুমীশ্বরাঃ।
তত্র ভোজনশিষ্টস্য পর্ব্বতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ২৫ ॥
ন তৎপূর্ব্বে জনাশ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে।
গয়ো যদকরোদ্‌যজ্ঞে রাজর্ষিরমিতদ্যুতিঃ ॥ ২৬ ॥
কথন্তু দেবা হবিষা গয়েন পরিতর্পিতাঃ।
পুনঃ শক্ষ্যন্ত্যপাদাতুমন্যেষাং কানিচিৎ ॥ ২৭ ॥
সিকতা বা যথালোকে যথা বা দিবি তারকাঃ।
যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ স্ম কেনচিৎ।
তথা গণয়িতুং শক্যা গয়যজ্ঞে ন দক্ষিণাঃ ॥ ২৮ ॥
এবংবিধাঃ সুবহবস্তস্য যজ্ঞা মহীপতেঃ।
বভূবুরস্য সবনাঃ সমীপে কুরুনন্দন ॥ ২৯ ॥"

মহাভারত বনপর্ব্ব ৯৫ অধ্যায়, ৮—২৯ শ্লোক। (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

দ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। মহারাজ গয়ের কীর্ত্তিস্বরূপ অক্ষয়করণবট ও ব্রহ্মসর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ কীর্ত্তিদ্বয়ের প্রভাবে যাজ্ঞিক গয় ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়াছেন ; ৯।

নারদ উবাচ।

গয়স্যামুর্ত্তরয়সং মৃতং স্বপ্নেষু শুশ্রুম।
যো বৈ বর্ষশতং রাজা হুতশিষ্টাশনোঽভবৎ ॥ ১ ॥
তস্মৈ হব্যবহং প্রাদাৎ তর্ভো বব্রে বরং গয়ঃ।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রতেন নিয়মেন চ।
গুরূণাঞ্চ প্রসাদেন বেদানিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ২ ॥
স্বধর্ম্মেণাবিহিংস্যাভ্যান্ ধনমিচ্ছামি চাক্ষয়ম্।
বিপ্রেষু দদতশ্চৈব শ্রদ্ধা ভবতু নিত্যশঃ।
অনন্যাসু সবর্ণাসু পুত্রজন্ম চ মে ভবেৎ ॥ ৩ ॥
অন্নং মে দদতঃ শ্রদ্ধা ধর্ম্মে মে রমতাং মনঃ।
অগ্নিশুশ্রূষা মে নিত্যং ধর্ম্মকার্য্যেষু পাবক ॥ ৪ ॥
তথা ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
গয়ো হ্যবাপ্য তৎসর্ব্বং ধর্ম্মেণাবীজয়ৎ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বপৌর্ণমাসাভ্যাং কালেষ্বায়ণেষু চ।
চাতুর্হোত্রৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈশ্চাবাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥
অসক্তং স যযৌ রাজা পরিসংবৎসরাস্ শতম্ ॥ ৬ ॥
গবাং শতসহস্রাণি শতমষ্টশতানি চ।
শতং নিযুতসহস্রাণি গবামপ্যযুতানি ষট্।
উষ্ট্রাণামযুতং সংপ্রাদাৎ পরিসংবৎসরাণ্ শতম্ ॥ ৭ ।
নক্ষত্রেষু চ সর্ব্বেষু দদন্নক্ষত্রদক্ষিণাঃ।
ইজে চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যথা সোমোঽগ্নিবাতথা
দৌবর্ণাং পৃথিবীং কৃত্বা য ইমাং মণিশর্করাম্।
বিপ্রেভ্যঃ প্রাদদদ্রাজা সোঽশ্বমেধে মহাক্রতৌ ॥ ৯॥
জাম্বূনদময়া যূপাঃ সর্ব্বে রত্নপরিচ্ছদাঃ।
গয়স্যাসন্ সমৃদ্ধস্য সর্ব্বভূতমনোহরাঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বকামমযুদ্ধাংশ্চ প্রাদাত্তাংশ্চ পাস্তথা।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রহৃষ্টেভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্য এবচ ॥ ১১ ॥
সসমুদ্রবনদ্বীপ-নদীনদ-বতীমুচ।
নগরেষু চ রাষ্ট্রেষু দিবি ব্যোম্নি চ সোঽবসৎ ॥ ১২ ॥

শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির তীর্থমাহাত্ম্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি অঙ্গিরা গৌতমকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া ভীষ্ম গয়াসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনবার ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ, গয়া, নীলবিন্দ পর্ব্বত ও ক্রৌঞ্চপদীতে গমন করিলে, একেবারে ঐ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ধর্ম্মারণ্য-পরিশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া অবগাহন করিলে, পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। *

হরিবংশে।

মনুর যজ্ঞে মিত্রাবরুণের অংশে ইলার উৎপত্তি হইলে, তিনি আবার পুরুষবেশে সুদ্যুম্ন হন। এই সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিনতাশ্বনামে তিন পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উৎকলের উত্তর দিক্, বিনতাশ্বের পশ্চিম দিক্, এবং গয়ের পূর্ব্ব দিক্ গয়াপুরী অধিকারভুক্ত হয়। *

ভূতগ্রামাশ্চ বিবিধাঃ সুতৃপ্তা যজ্ঞসম্পদা।
গয়স্য সদৃশো যজ্ঞো নাস্তন্যমিতি তেঽব্রুবন্ ॥ ১৩ ॥
ষট্‌ত্রিংশদ্‌যোজনায়ামা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা।
পশ্চাৎ পুরশ্চতুর্ব্বিংশদ্বেদী হ্যাসীদ্ধিরণ্ময়ী।
গয়স্য যজমানস্য মুক্তা বজ্রমণিস্থতা ॥ ১৪ ॥
প্রাদাৎ স ব্রাহ্মণেভ্যোঽথ বাসাংস্যাভরণানি চ।
যথোক্তদক্ষিণাশ্চাস্য বিপ্রেভ্যো ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১৫ ॥
যত্র ভোজনশিষ্টস্য পর্ব্বতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৬ ॥
কুল্যা কৃষ্ণবাহিন্যো রসানামভবংস্তদা।
বস্ত্রাভরণগন্ধানাং বাশয়ন
যস্য প্রভাবাচ্চ গয়ঃ
বটশ্চাক্ষয্যকরণঃ পু

* অশ্বপৃষ্ঠে গয়ায়াঞ্চ নি
তৃতীয়াং ক্রৌঞ্চপদ্যাং
নীলকণ্ঠ অশ্বপৃষ্ঠকে প্রেতশিলা, নি
সকলপদই বলিয়াছেন।

"তথা ব্রহ্মসরোগত্বা ধর্ম্ম
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি উপ
॥
(অনুশাসন, ২৫ অধ্যায়)।

* সুদ্যুম্নস্যাতু দায়াদাস্ত্র
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বি
উৎকলস্তোৎকলা রা
দিক্‌পূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ
(হরিবংশ, ১০ম অধ্যায়)

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

কালিদাসের জাতি নির্ণয়।

কবি কালিদাস ছিলেন্ন কোন্ জাতি
বাঙ্গালী, উড়িয়া, কিম্বা খোট্টা।
আসামী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী জাঠ
দ্রাবিড়ী অথবা মারহাট্টা॥
প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঘামাইয়া মাথা,
তত্ত্ব কিছু নির্ণয়িতে নারে।
সকলেই নিজ যুকতির বোঝা
চাপাইছে কালিদাসের ঘাড়ে॥
কেহ বলেন—কালী ছিলেন বাঙ্গালী
ইথে কিছুমাত্র নাহি সন্দ।
হুনুলুলুর এক তাম্রশাসনে
মিটাইয়া দিছে সব দ্বন্দ্ব॥
বলে অন্য জন—ওকথা বলিয়ে
কেন মিছামিছি পাও কষ্ট।
কালী ছিল খোট্টা খেত ডাল কটী
[illegible] রয়েছে তার স্পষ্ট॥
আ[illegible] ছিল উড়ে
[illegible] ছিল বিশাল টাক।
সর্ব্বা[illegible]রিপাটী
[illegible]াকিত তার নাক॥
বলে [illegible]লিদাস
[illegible]ষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী।
টিকি [illegible] টাক,
[illegible] যেন ঘোর মসী॥
অন্যে [illegible]াসী
[illegible]পুরোহিত বংশ।
কুতেলঙ্ [illegible]াত্রে
[illegible]রখেছে রাজা কংশ॥
এইরূপে [illegible]
কা[illegible] নির্ণীতে।
হায় কা[illegible]
[illegible]দের হাতে॥

শ্রীরাজকুমার সেনগুপ্ত।

বৈঠকী।

ইয়োরোপের সভ্যতার মূলবেদী হইল গতি ; উহাকে উন্নতিই বল, আর অবনতিই বল উহা গতি। আর ভারতবর্ষের আর্যসভ্যতা হইল স্থিতি-মূলক কেবল ভারতবর্ষই বলি কেন, যে সকল সভ্যতা ধর্ম্মের বনীয়াদের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সকলেরই মূল প্রকৃতি হইল স্থিতি। একটা সিদ্ধান্তের উপর স্থির রাখাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। কথাটা আমার নহে—মসিয়ে রেনালের।

ইয়োরোপের যে আধুনিক সভ্যতা, তাহা খৃষ্টানী সভ্যতা, উহাতে মার্টিন-লুথারের খৃষ্টানধর্ম্ম নাই, রোমের পোপের গুরুবাদমূলক রোমান কাথলিক খৃষ্টান ধর্ম্মও নাই। উহাতে আছে বর্ত্তমান কালের সায়ান্সের বা পদার্থবিদ্যার সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বসকল। সায়ান্স নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ; আজ যাহা সত্য, কাল তাহা মিথ্যা বা অপ্রকৃত সাব্যস্ত হইতেছে। সায়ান্সের উপর যে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, তাহা গতিশীল ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না।

ফরাসীবিপ্লবের পরে, নেপোলিয়নের অধঃপতনের পরে যে সভ্যতা ইউরোপে গজাইয়া উঠিয়াছিল, তাহা জর্ম্মণযুদ্ধের পরে, রুষ এবং অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পরে যে বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে বিসমার্ক এবং গ্লাডষ্টোনের আদর্শ যে নষ্ট হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতেছেন। আমরা এই আগামী পরিবর্ত্তনের ঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়াছি। আমরা—কাহারা, জান ? আমরা যাহারা ইংরেজী বা ইয়োরোপীয় শিক্ষা সভ্যতা অবলম্বন করিয়াছি, ইয়োরোপীয় নকলে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা সাময়িক খবরের কাগজ চালাইতেছি ; আমরা যাহারা বিলাতীপরিচ্ছদ না পরিধান করিলে ভদ্রভব্য হই না, এলোপ্যাথি ঔষধ না পাইলে রোগমুক্ত হই না,—তাহারাই ইয়োরোপের ঝঞ্ঝাবাতে জগন্নাথের ঢেউ খাওয়ার মতন কেবলই ঢেউ খাইবে।

একথাটা ঠিক ; যাহারা সেকালের হিন্দু বা মুসলমান, সনাতন হিন্দুয়ানী এবং মুসলমানী-আচার-পদ্ধতি-অবলম্বন করিয়া আছে, ইয়োরোপের ডামাডোলে তাহাদের তিলমাত্র বিচলিত হইতে হইবে না। পূর্ব্বে কখনও ত সনাতন সমাজকে তেমন ধাক্কা খাইতে হয় নাই, এখনই বা হইবে কেন ? তবে যাহারা গণ্ডী কাটিয়া বাহিরে গিয়াছে, তাহাদের নাকানী-চোবানী খাইতেই হইবে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে, ইয়োরোপমুখী জনগণকে আগামী পরিবর্ত্তন জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

কথাটা বলিবার একটু উদ্দেশ্য আছে। এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের আদর্শ-অনুকূল মাসিক পত্র আর বিকাইতেছে না, সকলকে স্বৈরিণী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহার হেতু এই, বিলাতী আদর্শে গড়া মাসিক পত্রিকা বিলাতী রুচির পরিবর্ত্তন জন্য, পুরাতন বিলাতী ঢঙ্গে আর বিকাইবে না। বিলাতে পুরাতন আদর্শের মাসিক পত্র যে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। নাইনটীন্থ সেঞ্চুরি, ফর্টনাইট্‌লী রিভিউ প্রমুখ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রগুলা এখনও অনেকটা পুরাতন ধারা বজায় রাখিয়াছে। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে সকল রকম রুচির মানুষই ত আছে; তাহার উপর সাময়িক পত্র পাঠ ইংরেজের ব্যসন নহে, নিত্যকর্ম্মবিশেষ। তাই সব রকমের লেখাই সে দেশে বিকায়।

* * * * *

ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের কুম্ভরাশি, উহা রমণীর কক্ষেই অধিকতর শোভা পায়। বটেও তাহাই। বাঙ্গালায় উপন্যাস-পূর্ণ-মাসিক পত্র এখন বিকায়, কেন না উহার পাঠিকা নারী—প্রধানতঃ পুরুষ নহে। নারী গল্প পড়িতেই ভালবাসে। আর পাঠক গ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালা-নবীশ পুরুষগণ। উভয়েই বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়, রিরংসাপূর্ণ গল্প গাছায় তুষ্ট হয়, ঘোর যুবতীর উৎকট নগ্নতাব্যঞ্জক ছবি দেখিয়া পরিতোষ লাভ করে। এই রুচির মুখে যাহারা ইন্ধন যোগাইতে পারেন, তাঁহারাই দু'পয়সা লাভ করেন। এখন আবার পয়সার মাপকাটিতে, কাটতীর মুখে ভাল মন্দের বিচার হইয়া থাকে। নহিলে "সাহিত্যে"র পুরাতন আদর্শ বজায় রাখিতে পারিতাম। তাহা পারিতেছি না, যে হেতু বিকায় না যে।

* * * * *

তথাপি সম্পাদক যে বৃদ্ধ, তাই তিনি পুরাতন এবং সনাতনকে ধরিয়া থাকিতে চাহেন। জানি বটে, আজকাল অনেকে বাঙ্গালায় গবেষণাপূর্ণ সন্দর্ভ-পাঠ করিতে চাহে না, সে সকল বিষয় পড়িতে হইলে ইংরেজীতেই তাহা পাঠ করে। বাঙ্গালায় আদর উপন্যাসে। এ বয়সে অত উপ-র ন্যাস করি কোন্ লজ্জায়। তবে এই উৎকট রুচি স্থায়ী হইবে না, সম্মুখে যে পরিবর্ত্তন আসিতেছে, তাহার চেউ খাইয়া এসব উল্টাইয়া যাইবে। প্রথমতঃ উহা ব্যয়বহুল বলিয়া উল্টাইবে, ভবিষ্যতে দেশে ও সমাজে এত নগদ টাকার আদান-প্রদান হইবে না, যাহার প্রভাবে মাসিক পত্রের জন্য লোকে প্রতিবর্ষে পাঁচ ছয় টাকা ব্যয় করিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাচর্চ্চার ও বিদ্যালাভের আদর্শ এবং পদ্ধতি বদলাইবেই। যতদিন তাহা না ঘটিতেছে, ততদিন সহিয়া থাকিতে হইবে। দাশরথি রায় বলিয়া গিয়াছেন "যে সয় সেই রয়, যে না সয়, সেই নাশ হয়।"

সাহিত্য, ৩২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

চাটনী।

প্রিয় সখী মনোরমা!

অনেকদিন পরে আজ তোমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পড়িয়া আমার গুপ্ত প্রেমের কাহিনীটী ব্যক্ত করিতেছি; পড়িয়া কেহ হয়ত আমায় বিকৃতমস্তিষ্ক বলিবেন, কেহ বা গ্রাহ্য করিয়া সে মতামতটুকুও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন।

প্রথমতঃ আমার নিজের একটা আবেদন ও বক্তব্য আছে, পুরুষজাতির নিকটে। তাঁহারা যদি বিশ বার দিনের মধ্যে প্রেমে পড়িয়াও, সদ্যোজাতকের ন্যায় পবিত্র থাকেন, ও তাঁহাদের যদি তাহাতে বংশমর্য্যাদা, কুল ও আভিজাত্য-গৌরবের ন্যূনতা না হয়, তা হইলে যদি আমি জন্মের-মধ্যে কর্ম্ম,—একবার প্রেমেই পড়িয়া থাকি, সেটা কি নিতান্তই অক্ষমার্হ ও দোষার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে? পুরুষজাতি মাত্রেই, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচকতার আধার বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার এ সবিনয় নিবেদনের ন্যায়সঙ্গত উত্তরদানে আমাকে নিতান্ত বাধিত করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।"

সে সময়টাও ছিল নিতান্ত মন্দ। ঋতুরাজ বসন্ত-সমাগমে, প্রতি তরু লতা নিম্ন জাতিবিশেষে নব নব আভরণে ভূষিত হইয়াছিল; কেহ বা দিগন্তবিস্তারী সৌরভময়ী কুসুমসজ্জায় আপনাকে সজ্জিত করিয়া যেন নব বধূর নব ফুলশয্যা-রাত্রির মতই আশা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তরুলতা সহকারের উপভোগসম্ভব বলিয়া যেন মদগর্ব্বে মত্ত হইয়াই সহকারের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছে; শীতাপগমে প্রকৃতিসুন্দরী যেন জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া নবীন হরিদ্‌বর্ণের বসন্ত সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সস্মিতমুখে বিশ্বসংসারের প্রাণিগণকে আবাহন করিতেছিলেন। পপি ও ডালিয়া ফুলের যেন আদি অন্ত ছিল না; যেদিকেই ফিরিয়া চাহিবে, পর্ব্বতগাত্রে বিচিত্রবর্ণের উজ্জ্বল ডালিয়া ও উজ্জ্বল রক্তজবাবিনিন্দিত পপি যেন মনুষ্যহস্তদ্বারা থরে থরে সজ্জিত। কে যেন অতি নিপুণ ও ক্ষিপ্রহস্তে পার্ব্বত্য

শীতের সমস্ত তুষারধবল চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া, অতি শৈত্য হেতু শুষ্ক তরুলতাকে নবীন জীবন ও যৌবন দানে সঞ্জীবিত করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন পার্ব্বত্যদেশে এত শীঘ্র সাধিত হয় যে, তুমি না দেখিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না।

আমারও তখন জীবনের নব বসন্ত সবে মাত্র সমাগত। লোকে বলিত, তোমরাও বহুবার বলিয়াছ—দর্পণেও নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতাম (অবশ্য পার্ব্বতীর বরপ্রাপ্ত দর্পণ কখনও মিথ্যা বলিবে না, কেন না জানত সে কথাটা?—কার্ত্তিক অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, বলিয়া তিনি অনবরত দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতেন, কখনও টেরী ফিরাইতেছেন, কখনও বা ফ্রেঞ্চ্ কাট্ দাড়ি ও নবনির্ম্মিত (বহুবার ক্ষৌরহেতু) গুম্ফে চাড়া দিয়া গণেশ বেচারীর নিকটে কেবলই স্বমুখের রূপ বর্ণনা করিতেন, গণেশ ওসব ভোগবিলাসের দিকে মোটেই রত ছিলেন না, তিনি ছিলেন পিতা আশুতোষ ভোলানাথেরই মত ভোলানাথ ও 'অল্পে সন্তোষ'। হাজার হোক, মাথাটী হাতিরই ত! সুতরাং ক্রমাগত কার্ত্তিকের নিকটে দর্পণের খ্যাতি শুনিয়া দর্পণে নিজ মুখ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কার্ত্তিকবাবুর হোয়াইট ওয়ে লেড লর সেলে ক্রীত, নূতন দর্পণখানি আছাড় দিয়া শতখণ্ডে চূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া রোষাগারে শয়ন করিলেন।

এদিকে মহাদেবের মৌতাতের সময় উত্তীর্ণপ্রায়; একে বয়স্ক মানুষ, তাহার উপরে তাঁহার সে বৎসর ভারতবর্ষে আসিয়া এত ম্যালেরিয়া ধরিয়াছিল, যে, ৫০ ফাইল কুইনাইন ও চারিশত গ্রেণ স্যালিসিন সেবনেও জ্বর যায় নাই, অবশেষে সমানে প্রত্যহ দুইবেলা আর্সেনিক্ সিনকোনা কম্পাউণ্ড করিয়া ছ' কৌটা করিয়া ৩ মাস সেবন করিয়া তবে জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। পুরাতন জ্বরের জন্য এক্ষণে সিদ্ধির সহিত প্রত্যহ অল্পমাত্রায় অফিংএন সেবন করেন। গণেশ সেবারে কলিকাতায় আসিয়া একটী সস্তাদরে ঘড়ি কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেই ঘড়িটি দেখিয়া সিদ্ধি ও অহিফেন তিনি স্বহস্তে মাত্রা করিয়া পিতাকে সেবন করাইয়া থাকেন।

নিয়মিত সময়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি গণেশের অদর্শনে ব্যস্ত ও চিন্তিত পার্ব্বতী, কার্ত্তিকের নিকটে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া শান্ত করিবার নিমিত্ত রোষাগারে গমন করিলেন। গণেশকে বলিলেন, "বাবা এইবার আর্সিতে মুখ দেখ গিয়া, আমি বর দিতেছি,—অদ্যাবধি যে কেহ দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে, সুন্দর কুৎসিত নির্ব্বিশেষে তাহার নিজের চক্ষে

আপনাকে পরম সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পার্ব্বতীর কথায় শান্ত হইয়া ত্রিলোকসিদ্ধিদাতা পুনরায় দর্পণে নিজ মুখ দর্শন করিলেন—কি সুন্দর ক্ষুদ্র নয়নদ্বয়! বৃহদাকার কুলার মত কাণ: দুটীরই বা বাহার কত! মোটের উপর গণেশ মনে করিলেন, তাঁহার মত রূপবান্ পুরুষ ইন্দ্রপুরীতেও দুর্লভ।)

সুতরাং আমিও দর্পণে দেখিতাম, আমার মত সুন্দরী দুর্লভ। নব বসন্ত সমাগমে তরুণ বনরাজীর ন্যায়, নবযৌবন-সমাগমে আমারও এ অতুল সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন তনুখানিও যেন বসন্তের রাণী গোলাপেরই মত অতুল শ্রীধারণ করিয়াছিল। বয়সটাও তখন অতি ভয়ানক—সপ্তদশবর্ষ মাত্র।—সুতরাং আপনারাই সকলে বিচার করিয়া বলুন, এররূপ সময়ে এবয়সে এরকম অবস্থায় প্রেমে পড়াটা কি নিতান্তই গর্হিত হইয়াছিল?

আপনারা যাহা বলেন, বলুন আমিত বলিতেছি—না।

সিমলা পাহাড়ে পিসতত দাদা কোন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তাঁহারই বাসায় আমি, আমার মা, দাদা এবং কনিষ্ঠভ্রাতা নানি, চারজনে গিয়াছিলাম। এই সময়ে বহু পুরাতন কথার উল্লেখ করিতে হইবে। জানত, আমরা নহা-কুলীন। বাবা ছিলেন—মুখ্যকুলীন। বাবা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতি উচ্চ শিক্ষিত, এবং মাতাও খৃষ্টানী মেমের নিকটে শিক্ষিতা হইয়াও কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য পাঁচবৎসর বয়সে আমার বিবাহ যে কিরূপে দিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া এখনও তাঁহাদের মস্তিষ্কের স্থিরতার বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ হয়।

শুনিয়াছি আমার পিতামহ অকস্মাৎ পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া পিতামহের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, প্রত্যাখান করিতে অক্ষম পিতা, পাঁচবৎসরবয়স্কা বালিকা আমাকে কলিকাতারই নিকটবর্ত্তী কোন জমিদারের মাতৃহীন একমাত্র পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক কিশোর পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। পাত্রও নাকি পরম সুন্দর! কিন্তু বিধাতার বিধান কে খণ্ডন করিবে? পিতামহের পরলোক গমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চারবৎসর পরেই, সহসা পিতামাতা একদিন শুনিলেন, আমার স্বামী তাঁহার বিমাতার সহিত 'মনান্তর' হওয়ায় গৃহত্যাগ করিয়াছেন। মাতা ত মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার নয়নেও অশ্রু দেখিলাম। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মাতা পরের

ছেলের জন্য অত কাঁদিতেছেন কেন? মা উত্তরে আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। আমারও একটু একটু মন কেমন যে করিতেছিল না, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কেন না আমার স্বামী যখনই আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিতেন, পকেটে লুকাইয়া আমার জন্য চিনের বাদাম ও চানাচুর প্রভৃতি উপঢৌকন আনিতেন।

মাতা যে তখন অত ব্যাকুল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন কেন, তাহা এক্ষণে বুঝিতেছি। মাতা মনে করিয়াছিলেন, আমার ছোট পিসিমার মত স্বামিও বুঝি চিরজীবন স্বামি-পরিত্যক্তা হইয়া অবশেষে মৃত্যুমিলনে মিলিত হইব।

তুমি আমার ছোট পিসিমার গল্প শোননি ত, তবে শোন। ছোট পিসিমার মৃত্যুতেই পিতামহ শোকে শরীর ত্যাগ করেন।

সাতটী পত্নীর ভাগের বস্তু—অতিকুলীন পতি ছোট পিসে মহাশয় ছোট পিসিমাররূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতাস্থ শ্বশুরালয়েই (আমাদের বাটীতে) অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। এজন্য ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া অন্যান্য সপত্নীগণ পানীয় জলের সহিত তীব্র বিষ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া পিসেমহাশয়কে নাকি বিকৃতমস্তিষ্ক করিয়া দেন।

পঞ্চবিংশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পিসেমহাশয়ের জ্ঞান সঞ্চার হয়। তিনি পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়া ছোট পিসিমাকে সে দেশে লইয়া যাইতে বলেন। ডাক্তারে বলিয়াছে ৪ দিনের মধ্যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া পিতামহ, পিতামাতা ও আমি পিসিমা সকলেই একত্রে গমন করিলাম। এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কি কথা হইয়াছিল, শুনি নাই।

তবে এটুকুই মনে আছে যে, অতি নিকট আত্মীয়—স্বামি বিয়োগ সম্ভাবনা শীঘ্র, জানিয়াও পিসিমার কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্য বা শোকপ্রকাশের লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। বরং তাঁহাকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বেশ নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দমনা বলিয়া অনুমিত হইতেছিল। সামান্য শিশু তখন আমি, কি করিয়া জানিব যে, পিসিমার সে প্রশান্তভাব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র।

মার মুখে শুনিলাম, মা পিতাকে বলিতেছিলেন, উমা (ছোট পিসিমার নাম) বলে, এবারে আর স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইবে না। পিতা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি? সে কি আত্মহত্যা করিতে চায়? মাতা উত্তর করিলেন, "না সে আত্মহত্যা মহাপাপ করিতে স্বীকৃত নহে, সে অনুমৃতা হইতে চায়। সে জানে

তুমি নানারূপ ওজর আপত্তি তুলিবে, আমায় শ্রীধর স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইয়া লইয়াছে যে, তোমার অনুমতি ও সাহায্য আমি দেওয়াইব। কারণ তুমি ডেপুটী, এবং এ গ্রামও নিতান্ত গণ্ডগ্রাম। তুমি ইচ্ছা করিলে পুলিশেও কিছু হাঙ্গামা করিবে না। তোমার ভগ্নীই যথার্থ পতিব্রতা সতী, আমরা কিছুই শিখিলামও না, জানিলাম না" বলিয়া পিতার পদধূলি মস্তকে লইয়া মাতা গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। পিতা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সেদিনটার দৃশ্য যেন জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমার মনে অঙ্কিত থাকিবে। পিসে মহাশয়ও ইহলোক ত্যাগ করিলেন; পিসিমাতার অন্যান্য সপত্নীগণ দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। পিসিমা কিন্তু প্রফুল্লমুখী। তাঁহার সীমন্তের দীর্ঘ রেখাঙ্কিত সিন্দুর যেন উজ্জ্বলতর হইয়া ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সকলের কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক আমার মাতার হস্তে প্রদান করিয়া শাঁখা দুই গাছিও উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "তরুকে" এই শাঁখা দুইগাছি বিবাহের সময় পরাইয়া দিও।

নব বিবাহমণ্ডপের ন্যায় শ্মশান বাট সমাচ্ছন্ন করিয়া পুষ্পমাল্য কড়ি ও খই ছড়ান হইতে লাগিল। স্থানীয় বাদ্যকরগণ বাদ্য করিতে লাগিল। অগ্নিসংযুক্ত চিতায় স্বামীর পদদ্বয় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া যখন, রক্তাম্বরপরিহিতা, আলুলায়িত-কেশা, প্রকোষ্ঠে দুইগাছি কলি ও কণ্ঠে দর্শক-গণদত্ত অজস্র পুষ্পমাল্য ভিন্ন অন্য অলঙ্কারবিহীনা পিসিমা বসিলেন, তখন উপস্থিত সকলেরই মনে কি রকম যেন একটা অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, ধূলায় লুটাইয়া সকলে নীচ ভদ্র বন্ধু গুরু নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে প্রণাম করিল; স্নিগ্ধ মধুর হাস্যে সমস্ত মুখখানি কি যেন এক প্রকার অপূর্ব্ব ভাবের সংমিশ্রণে উদ্ভাসিত করিয়া, হরিভুজ-চরণ-সেবা-নিরতা যাহার ন্যায়, তিনি সে প্রণাম প্রতিগ্রহণ করিলেন। তাহার পরে যে কি হইল, আর কাহারও কিছু মনে নাই।

পিতামহ একমাত্র আদরিণী কন্যার শোকে বৎসর গত হইতে না হইতে পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

পিতা দেশ দেশান্তরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও আমার স্বামীর কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। আমিও দিন দিন পিতামাতার অত্যধিক (ও বোধ হয় স্বামীর অভাব ভুলাইয়া রাখিবার জন্য) ও অসঙ্গত আদরে আরও অধিক অসন্তুষ্টমনা ও খ্যানখ্যানে হইয়া উঠিতেছিলাম। স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে

দ্বাদশবর্ষ অতিক্রান্ত না হইলে [illegible] বেশ ত্যাগ করিতে নাই, সুতরাং আমার আসন্ন লক্ষণের আড়ম্বরটুকু পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল।

এই সময়ে আমায় নিতান্ত অস্থিরমনা দেখিয়া পিতামাতা নানারূপ দেশ-ভ্রমণে ও দৃশ্য পরিবর্ত্তনে আমার মনের অবস্থা ভাল হইবে বলিয়াও বটে, ও তীর্থধামে বহুসংখ্যক নাগা সন্ন্যাসী, পরিচিত অপরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হয়,তাহাদের মধ্যে তাঁহাদের পলাতক জামাতার সন্ধান পাইবার উদ্দেশ্যেও বটে, আমাদিগকে,—আমার বড় দাদা, কনিষ্ঠভ্রাতা নানি, ও মাতা সঙ্গে একজন পুরাতন দাসী ও চাকর লইয়া বাহির হইয়া পড়িতে আদেশ করিলেন।

প্রথমেই গম্যস্থান হইল সম্বলপুর। সেখানে বাঙ্গালীদের অনেক বিশেষত্ব দেখিলাম। প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই বোধহয় অতিথিসৎকারপ্রিয় হয়। বোম্বে মেলে বেলা ২৷৷০ টার সময় গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। আমার দাদা আমাদিগকে সেকণ্ড্‌ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে পুরুষের গাড়ীতেই লইয়া গেলেন। বিশেষতঃ এই আমার প্রথম প্রবাস যাত্রা। একেইত আমি চিরকালই ভীরু-স্বভাবা ছিলাম। সুতরাং মেয়ে গাড়ীতে একা (যদিও মাতা সঙ্গে ছিলেন) যাইতে আপত্তি তুলিলাম দাদা আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া অন্যান্য জিনিসপত্র প্রয়োজনমত সত্বর যাহাতে পাওয়া যায়, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে অন্য কামরায় গমন করিলেন, আমাদের সহিত বহিল দাসী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নানি। মা তখনও গাড়ীতে। এই সময়ে একজন পার্সি ও তাঁহার স্ত্রী আমাদের কামরায় উঠিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বা অন্য একজন সম্পর্কীয়-কোন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া দুইটী বৃহৎ, ফুলের তোড়া লইয়া আমার দুই পার্শ্বে রক্ষা করিলেন—

আমায় যে মাতা অত লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু 'এটিকেট' শিক্ষা দেন নাই। একজন অপরিচিত পুরুষ কর্ত্তৃক দুই পাশে, ফুলের তোড়া রক্ষিত হইতে দেখিয়া আমি নিতান্ত পাড়াগাঁয়ে ভূতের মত কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিয়া স্ত্রীলোকের কামরায় চলিয়া গেলাম।

এত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু সম্বলপুরের দৃশ্য আমার অনভিজ্ঞ চক্ষে যেরূপ সুন্দর ও 'মনোমুগ্ধকর' লাগিয়াছিল,সেরূপ বুঝি তৃপ্তি কোথাও গিয়া পাই নাই। উষা সোনালী কিরণে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া যখন প্রভাতাকর্ণের প্রথমোদয়ের সহিত সম্বলপুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম, চতুর্দ্দিকে ধূমাচ্ছন্ন পর্ব্বত-শ্রেণীকে যেন প্রাবৃটকালের মেঘের মত স্তবকে স্তবকে কে যেন অতি নিপুণহস্তে

সজ্জিত করিয়া দিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ২।৪টা পার্ব্বতীয় দেবদারু বৃক্ষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মহানদী কি সুন্দর কি সুচ্ছতোয়া স্রোতস্বতী—বোটে করিয়া মহানদীবক্ষে হিরাকুঁদ ফল্ দেখিতে যাওয়া এখনও যেন স্বপ্নের মত চক্ষে লাগিয়া আছে!

সম্বলপুরে ২।১ জনের বাটী ব্যতীত প্রায় প্রতি বাটীতেই নিশাচর বামঘোর বিচরণ করিতেছেন; তাঁহাদের ও কুকুর হরিণ ময়ুর প্রভৃতি পশু পক্ষীর প্রভুত্ব সম্বলপুরে অত্যন্ত অধিক। কুক্কুট ডিম্ব এখানে অতি পবিত্র ও অতি উপাদেয় খাদ্য। আমরা যাঁহার বাটী গিয়া উঠিয়াছিলাম, তিনি সম্বন্ধে আমার মাসতত ভগ্নী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ও অত্যন্ত কুক্কুটমাংসপ্রিয়। আমরা নিষ্ঠাবান হিন্দু-সংসারে পালিত, কুক্কুটমাংস যেন পুষ্প চন্দনের ন্যায় নিতান্ত গায়ে মাখা আমাদের চক্ষে নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইত। আমরা যে দিদির বাটী গিয়া উঠিয়াছিলাম, তিনি তাঁহার স্বামী দুই পুত্র ব্যতীত সংসারে আর একটী উপরি লোক আছে—সেটী দিদির কনিষ্ঠা ভগিনী।

বহুদেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া নানা লোকের সহিত মিশিয়া, নানা চরিত্রের অভিজ্ঞতাজনিত যে বুদ্ধি, সে বুদ্ধি আমার আজ পরাজিত হইল। যে পরাজিত করিল, সে দিদির কনিষ্ঠা ভগ্নী। স্ত্রীচরিত্রে আমার অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া যে অহঙ্কার ছিল, তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইল। মায়ার (দিদির কনিষ্ঠা ভগ্নীর নাম) স্বামী এমে পাশ উকিল, অতি সুদর্শন। মায়া অতি কুৎসিতা, কিন্তু তাহার যেরূপ স্বামিভক্তি দেখিয়াছিলাম—তাহা কদাচ দৃষ্ট হয়। স্বামী তিন সন্তানের পিতা, কি প্রকারের পিতা, "পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ"। ভরণ পোষণ এবং প্রতিপালন ভগ্নীই করিয়া থাকেন। দিদির হুকুম ছিল না যে, তাঁহার বর্ত্তমানে অথবা অবর্ত্তমানে দুক্রিয়াসক্ত সুরাসক্ত (বাস্তায় পড়া মাতাল) ভগ্নীপতি তাঁহার বাটীর ত্রিসীমানায় পদার্পণ করে। স্বামী বিরহব্যাকুলা মায়া, ভগ্নী ও ভগ্নীপতি সে সময় পশ্চিমে গিয়াছিলেন, সে সুবিধাটুকু ত্যাগ করা নিতান্ত মূর্খতা মনে করিয়া ধার করিয়া গাড়ীভাড়া ও নেশার অর্থ দিয়া কলিকাতা হইতে স্বামীকে আনাইল।

স্বামী স্বামিনামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। হিন্দু-রমণীর মুখে একথা শোভা পায় না তুমি বলিবে; কিন্তু তুমিত জান "আমার সাহেবী চাল"। স্বামী যতদিন সম্বলপুরে ছিল, মায়া যেন সেবাদাসীরই মত তাহার পশ্চাতে ফিরিতেছিল,

যেদিন সে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল, সেদিন বেচারীর উচ্চরবে ও আলুলায়িত-বেশে ধরাশয়নে ক্রন্দন দর্শনে, আমার পাষাণপ্রাণেও যেন একটা কিসের রেখা পড়িয়াছিল। সেইদিন হইতে আমার স্বামীর অভাব আমাকে অধিকতর-রূপে পীড়ন করিতে লাগিল।

কি যেন একটা চাই, কিসের অভাব যেন অহোরাত্র আমাকে পীড়ন করিতেছে! কি যেন একটা বিশ্বগ্রাসী শূন্যতা আমার বুক জুড়িয়া বসিয়া আছে। এ কি এ! সম্বলপুর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম, একেবারে সিমলা—কিন্তু অন্তরের এ দৈন্য এ আকাঙ্ক্ষা যে মিটে না, কি যেন একটা এমন কিছু চাই, যাহা আমার হৃদয়ের অসীম শূন্যতা পূর্ণ করিয়া, আমার শুষ্ক নীরস হৃদয়কে পুনরায় 'বয়োপযোগী' সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে! এ কি বিধান করিয়াছ ভগবান্! একের অভাবে কেন যে সব শূন্যময়। তাহা এখনও বুঝিতে পারি না। কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় এ অকূল সংসারসাগরের স্রোতে ভাসিয়া কোথায় চলিয়াছি,—কোথায় আমার গন্তব্য স্থান! কিছুই জানি না।

এ রূপ-যৌবনের অতুল অর্ঘ্য সজ্জিত করিয়া কোন্ দেবতার জন্য বসিয়া আছি? দেবতা কোথায়? হায় স্নেহান্ধ পিতামাতা, এ কি করিয়াছ! পাঁচবৎসর বয়সে যদি বিবাহই দিলে, নয় বৎসর বয়সে যাহার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট, তাহাকে সংযত ব্রহ্মচারিণীর মত একাগ্রচিত্তে স্বামিপূজামন্ত্রে না দীক্ষিত করিয়া ক্রমাগতঃ তাহার বিলাসে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছ! যে আজীবন তুষানলে পুড়িয়া জ্বলিয়া মরিবে, সুশীতল বারি সিঞ্চনে তাহার সে প্রদাহযন্ত্রণার হ্রাস হয় না, অধিকাই হইয়া থাকে।'

৩

অনেকদিন বলিয়া দুই দাদাদের মত করাইয়া সেদিন সিমলা প্রদক্ষিণ করিয়া জ্যাকো (যক্ষ পর্ব্বত শৃঙ্গ) হিল দেখিয়া আসিবার কথা হইল। পূর্ব্বদিবসে ছোট সিমলা ও স্যানজলির টনেল হইতে মুসাব্রা পর্য্যন্ত দাদার সহিত পদব্রজে গিয়াছিলাম। চিরকাল একঙ্গেদী স্বভাব আমার, পদব্রজে ৭ মাইল যাওয়াটা যে নিতান্ত অনুচিত হইয়াছিল, তাহা সেদিন বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিলাম, —যখন পদতলের যন্ত্রণায় রোদন করিতে হইয়াছিল। মুসাব্রা যাইবার পথে একটী আফ্‌গানেজ অর্থাৎ অনাথ সাহেব বালক বালিকাদিগকে প্রতিপালন করার আশ্রম আছে, এবং স্যালভেশ্‌ন ফৌজও এখানে বিস্তর। কি সুন্দর

দৃশ্য! মুসাব্রার থরে থরে পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়া যেন চতুর্দ্দিক আলো করিয়া আছে। এক একটা স্থানে এরূপে ফুলগাছ সজ্জিত যে, প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম উহা মনুষ্যনির্ম্মিত। তাহার পরে শুনিলাম, ওসকল পর্ব্বতগাত্রে অধিরোহণ করা মনুষ্য অসাধ্য।

মুসাব্রায় একটী বিলাতি হোটেল আছে, সেখানে দাদা ও নানি কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলে আমরা ফিরিলাম। পথে দুইটী অতি সুন্দর বুঝি কবিবর্ণিত দেবদূতেরই মত সুন্দর শিশু দেখিলাম—ভাবিয়াছিলাম রাজা মহারাজা কুমার। শুনিলাম দরিদ্র কৃষকপুত্র।

পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া প্রায়ই অশ্বারোহী সাহেব দৃষ্ট হইতেছিল, দূর হইতে ঠিক ছবির মত তাহাদের দেখাইতেছিল। তারাদেবী হইতে সিমলা আরো সুন্দর দেখায়। লোকে বলে, দার্জ্জিলিংয়ের দৃশ্য সিমলা অপেক্ষা সুন্দর, কিন্তু আমারত মনে হয়, সিমলার সহিত দার্জ্জিলিং দামোদরের নিকটে থাকার ন্যায় উপমেয়। অভ্রভেদী তুঙ্গ নগোৎসঙ্গে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছে, হরিণ ময়ূর নির্ব্বিবাদে চলিতেছে—পার্ব্বত্য কৃষক রমণীগণ বুঝি হামির-জননী রুক্মারই মত দুইহাতে মহিষ অশ্বতর তাড়াইয়া কোন কোন স্থলে আপনারাও অশ্বতরে আরোহণ করিয়া দুর্গম অতি ক্ষীণ রেখার মত সব অপ্রশস্ত পার্ব্বত্য পথ বাহিয়া অন্য পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিতেছে। এক একটা কৃষক রমণী দেখিতেও কি সুন্দর। মস্তকের উপরে একটী বারিপূর্ণ মৃৎকলসী, দুইহাতেও দুইটী; পরিধানে একটী হিন্দুস্থানি রাঙ্গা কুর্ত্তা ও খোট্টাই কাপড় প্রকোষ্ঠ মাত্র গাছকতক কাঁচের চুড়ি, রমণী খড় (পর্ব্বত নিম্নস্থ অধিত্যকা) ভাঙ্গিয়া ঢালুপথ বহিয়া উপরে উঠিতেছে। পরিশ্রম হেতু বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম মর্ম্মরশুভ্র ললাটের উপরে বিগ্রহচরণে গঙ্গোদকের ন্যায় ঝরিতেছিল। গণ্ডস্থল ক্ষণে ক্ষণে পার্ব্বত্য ডালিয়ারই ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। গাঢ় কৃষ্ণতায় যুক্ত আকর্ণবিস্তৃত নয়নেরই বা কি বিদ্যুৎস্ফুরণকারী ভাস্বর চাহনি—

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠনই বা সুন্দর কত। মোটের উপর কৃষকরমণীর অমার্জ্জিত অনাবিল সৌন্দর্য্য দর্শনে, আমার রূপগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল। আমি সেইদিন হইতে দর্পণ ত্যাগ করিলাম।

জ্যাকো ছিলেও হাঁটিয়াই উঠিলাম। মাব সেদিন শুক্রবার ছিল বলিয়া মা আসিতে পারেন নাই। রিকস ওয়ালারা অন্যরাস্তা বাহিয়া আমাদের পূর্ব্বেই

গিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গোপরে পৌঁছিয়াছে। পিতা যে উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য বহু পরিমাণে সফল হইল। পর্ব্বতের উপর নিত্য নব নব রূপে প্রকৃতির খেলা দেখিয়া আমার অশান্ত হৃদয়ও যেন কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

জ্যাকো হিলে উঠিবার সময় আমার মনটা বড়ই প্রফুল্ল ছিল। চাকর শঙ্করের হস্তে প্রায় /৩ সের ছোলা ও একঝুড়ি ভুট্টা কিনিয়া দিয়াছিলাম। কেন না জ্যাকো হিলের উপরিভাগে হনুমান্‌জীর মন্দির; সেইখানে তাঁহার প্রায় অন্ন করিয়া ৭৫০০ শত অনুচর আছে, তাহাদের সন্তুষ্ট করা বিশেষ প্রয়োজন।

ডারউইন-বর্ণিত মনুষ্যজাতির পূর্ব্বে পুরুষদিগকে আমি বড় ভালবাসি। সেখানে সকলকে একত্র দেখিয়া কাপড়ে করিয়া ছোলা ও জনার পরিবেশন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি মনে যোগাইল। শঙ্কর, হনুমান্‌জীর মন্দিররক্ষক, দাদা, —সকলের নিষেধ না মানিয়া স্বহস্তে বানর ভোজন করাইতে সাধ হইল।

দেখিতে দেখিতে ৮।১০টা হনুমান আসিয়া আমার গায়ের উপর লাফাইয়া উঠিল। আমিত বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নির্ব্বাক—দাদা ও নানি তখন হনুমান্‌জীর মন্দিরের বামপার্শ্বস্থিত মনুষ্যখননের ন্যায় প্রকৃতিজাত কূপদর্শনে নিবিষ্টচিত্ত। শঙ্কর অনেক তাড়া দিল, তাহারা মানিল না। বিস্রস্তকেশা, অবগুণ্ঠনবিহীনা আমার অবস্থা তখন নিতান্তই শোচনীয় হইয়াছিল। বোধহয় দু একটা বাঁদরের হাতের চড়চাপড়ও অদৃষ্টে ঘটিত, যদি সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে হনুমান্‌জীর মন্দিরের সন্ন্যাসী নিজে আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বানরগণকে না বকিতেন; নিতান্ত অনুগত কুকুরের ন্যায় বানরগণ তাঁহার মৃদু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে সকলেই সরিয়া গেল। আমি এতক্ষণে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপণের অবসর পাইলাম।

দেখিলাম সন্ন্যাসীর চক্ষু তারকার মত উজ্জ্বল, কিন্তু নীলোৎপলের ন্যায় সুনীল নয়নে একটু কৌতুকমিশ্রিত হাস্যরেখা। বোধহয় তিনি মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে আমার কার্য্যকলাপ সমস্ত লক্ষ্য করিয়াছেন। মনে করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। এখনও ছেলেমানষি বুদ্ধি যায় নাই—বাবা আমায় বলিতেন, টম্‌বয়। টম্‌বয় গিরিটা এখানে না করিলেও চলিত, আমি মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিতে না চাহিতে তাঁহার সে ক্ষীণ হাস্যরেখা নয়ন ও অধরপ্রান্তে বিদ্যুতেরই ন্যায় চকিতে মিলাইয়া গেল।

আমি অঞ্চল হইতে একটী টাকা খুলিয়া সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে রাখিয়া পায়ে হাতদিয়া পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলাম। ততক্ষণে দাদাও আসিয়া পৌছিয়াছেন, এবং আমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। দাদা যখন আমাকে মাতৃভাষায় বোকা গাধা ও রাজভাষায় ষ্টুপিড্ প্রভৃতি নানারূপ নামে অভিহিত করিতেছিলেন, আমাকে নিতান্ত অপ্রতিভ দেখিয়া বোধ হয় সন্ন্যাসীর মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। আবার সে নীলমণিপ্রভ নয়নদ্বয় ঈষৎহাস্যস্পর্শে যেন বিদ্যুৎস্পর্শে নীলমণিরই মত ক্ষণকালের জন্য আমার মুখের উপরে পড়িয়া ঝকিয়া উঠিল। তিনি দাদাকে এমন সুন্দরভাবে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া "গতস্য শোচনা নাস্তি" কথাটা বুঝাইয়া দিলেন যে, দাদা আমায় বকিতে ভুলিয়া গিয়া এবং দেশকাল পাত্রাপাত্র ভুলিয়া গিয়া বড় বড় বেদবেদান্তসূত্র টানিয়া মহাতর্ক (দাদা ছিলেন ফিলজফি ও সংস্কৃত এম এ) জুড়িয়া দিলেন।

দাদা যখন তর্ক করেন, তখন আহার নিদ্রা কার্য্যাকার্য্য সব বিস্মৃত হইয়া যান। অন্য সময় হইলে আমি দাদাকে ডাকিতাম, কিন্তু দেখিলাম দাদা উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছেন। এক্ষণে সহস্রবার ডাকিলেও দাদার আমার কথা কর্ণগত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে আমার যে সে তর্ক শুনিতে ভাল লাগিতেছিল না, তাহা বলিলে সম্পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপ করা হয়। দাদা তর্ক করিতেছিলেন, আর আমি বিমুগ্ধচিত্তে সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেছিলাম। কি সুন্দর কণ্ঠস্বর তাঁহার—

কি সুন্দরদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী! যেন কিরাতবেশী পার্ব্বতীপ্রার্থী মহেশ্বর স্বশরীরে অবতীর্ণ! মস্তকে বৃহৎ শ্বেত কৃষ্ণবর্ণের মিশ্রিত কেশের আজানুলম্বিত জটাভার। জটা নিশ্চয়ই কৃত্রিম। যাহার কণ্ঠস্বর এরূপ তরুণ, যাহার পদক্ষেপে যেন নবীন বসন্ত ফুটিয়া উঠিতেছে—সে বৃদ্ধ! কখনই নহে, অসম্ভব।

তাঁহারা উভয়ে হনুমান্‌জীর মন্দিরের সম্মুখে পদচারণা করিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ মূলস্থিত উপলখণ্ডের উপরে বসিয়া পড়িলাম।

কি সুন্দর সন্ন্যাসীর চরণযুগল! কমলকলি অঙ্গুলিসমন্বিত যেন দুখানি রক্তকমল পত্র! শরীরের গঠন, অঙ্গ সৌষ্ঠবের ত তুলনা নাই। নানিও নিবিষ্টচিত্তে উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল, সে আমা অপেক্ষা দুইবৎসরের

বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও এবারে একে পাশ দিয়া জলপানি পাইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের তর্কে সে মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেছিল।

আমি গৃহে মাতার নিকটে শিক্ষিতা, সত্ত্বেও আমিও তাঁহাদের কথা কেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গের শেষ প্যারা লইয়া উভয়ের তর্ক হইতেছিল, আমার মনে হইল যেন উপলখণ্ডোপবিষ্টা আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সন্ন্যাসী উমার রূপবর্ণনা করিতেছিলেন। আমার ভুল হওয়াও অসম্ভব নহে।

এমন সময়ে নানি বলিয়া উঠিল, "দিদি সন্ন্যাসী কি সুন্দর দেখিতে"? আমার মনেও তখন সেই একই প্রশ্ন বার বার উঠিতেছিল। জ্যাক্কো পর্ব্বত হইতে সিমলার শোভাদর্শন, প্রকৃতি দর্শন সমস্তই সন্ন্যাসী দর্শনের নিকটে ভাসিয়া গেল। ক্রমাগত মনে হইতেছিল, কি সুন্দর সন্ন্যাসী! মর্ম্মরমূর্ত্তির ন্যায় ভাস্করের শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা কে এই মানব! প্রকৃতি দেবী যেন স্বহস্তে যেখানে যা সাজে, তাই দিয়ে এ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

দিবা অবসানপ্রায় দেখিয়া দাদার চমক ভাঙ্গিল। সন্ন্যাসী নানারূপ অনুনয় অনুরোধেও টাকা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না।

ফিরিবার সময় রিক্স করিয়া ফিরিলাম। শরীরও এত অবসন্ন যে, সমস্ত পথটা দাদা কথা কহিতেছিলেন কোন উত্তর দিই নাই। কেবল সন্ন্যাসীর কথা, আমি কোন উত্তর না দিয়া কেবলই হাঁ হুঁ দিয়া সারিয়া যাইতেছিলাম, সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে সন্ন্যাসী দেখিলাম। পরদিন আহারে বসিয়া নানি বলিয়া উঠিল, "মা সন্ন্যাসী যদি আমাদের জামাইবাবু হইতেন, তাহলে আমার ত অন্ততঃ খুব আনন্দ হইত।"

মা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিনা জানিনা, আমার ত সন্ন্যাসীর নামে সমস্ত শরীরের শোণিত যেন উত্তপ্ত হইয়া ধমনীতে বহিয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম যে, মুখও লাল হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ও অস্বাভাবিকরূপে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়া যে চিন্তার শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না, এইবারে তাহার অর্থ বুঝিলাম। বুঝিলাম—আমি মরিয়াছি।

বুঝিলাম যে আমি হিন্দুকুলকন্যা নামের অযোগ্যা। সতী লক্ষ্মী পিসিমার ভ্রাতুষ্পুত্রী, সতী লক্ষ্মী জননীর কন্যা আমি। এ কি কুপ্রবৃত্তি হইল আমার!

ভগবান্ এ কি করিলে! চিরজীবন তুষানলে যে দহিতেছে, তাহাকে আবার

নূতন করিয়া এ কি শাস্তি দিতেছ ঠাকুর! এবুঝি হিন্দুরমণীর উপযুক্ত নির্দ্দিষ্ট স্বামীর পাদুকা পূজা করিয়া অহোরাত্র তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকি নাই, সেই পাপের এ শাস্তি! এ অশান্তির অগ্নি অগ্নিগর্ভা আগ্নেয়গিরির ন্যায় কতদিন হৃদয়ের মাঝে লোকচক্ষুর অগোচরে জ্বালাইয়া রাখিব! সামান্য সাত দিনেই যে হৃদয় পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গেল। সন্ন্যাসী আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছিলাম, কেন তুমিও কন্দর্পপোম মূর্ত্তি লইয়া আমার বুভুক্ষু চিরতৃষ্ণায় কাতর হৃদয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলে! এক একসময়ে মনে হইত চোখ কানা করিয়া দিই। যতই কেন হৃদয় অঙ্গনে বসাইয়া স্বামী দেবতাকে পূজা করিতে চাই না—সেখানে সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া বসে।

৪

ও হরি! আবার সেই! কামনাদেবীর মন্দির প্রসপেক্ট হিলের উপরে। আমরা মা অবধি সকলে' মিলিয়া কামনাদেবীর মন্দির দর্শনে গিয়াছিলাম। দেখিলাম সন্ন্যাসী ভূতলে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে মন্দির প্রাঙ্গনস্থিত গাভীগুলিকে সবুজবর্ণের তৃণগুচ্ছ আহার করাইতেছেন। দাদা দেখিয়াই চিনিলেন, চিনিয়া প্রণাম করিলেন। পুনরায় দুইজনে বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মাতাও প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর মাকে প্রতি প্রণাম করিলেন। মা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এবারও দেখিলাম সন্ন্যাসী ঠাকুর মার প্রণাম গ্রহণ না করিয়া প্রতিপ্রণাম করিলেন, দর্শনে মা অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িলেন! "বাবা, ও কি করিতেছ উহাতে যে আমার অকল্যাণ করা হয়?" এবারেও দেখিলাম বিনামেঘে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় সন্ন্যাসীর চঞ্চল নয়ন প্রান্তে ঈষৎ হাস্য! সে হাসিতে জোৎস্নালোকে সুন্দরী পূর্ণিমারই মত তাঁহার সে সুন্দর মুখ সুন্দরতর হইয়া উঠিল।

তিনি মার কথায় কোন উত্তর প্রদান না করিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া দাদার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। দাদার কেমন একটা চিরন্তন অভ্যাস ছিল, দাদা যেস্থানে যাহারই সহিত পরিচিত হউন না কেন, সে একদিনের পরিচিত হইলেও তাহার নিকটে আমাদের সমস্ত পরিচয় প্রদান করিতেন। এস্থলেও সে চিরন্তন প্রথার ব্যতিক্রম হইল না। প্রসপেক্টহিলের উপর হইতে শতদ্রুনদী দৃষ্ট হয়। আমি তন্ময়চিত্তে কামনাদেবীর মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে ক্ষীণ শুভ্র রেখার মত শতদ্রু দর্শন করিতেছিলাম, অথবা সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেছিলাম? শুনিলাম বাটী প্রত্যাগমনের জন্য মাতা

আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, ; দেখিলাম সন্ন্যাসীও (উত্তরাইয়ের পথে চলিতেছেন) পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিতেছেন।

ইহার পর কিছুদিন পরেই আমরা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম।

সিমলা হইতে ফিরিবার পর একবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আমি ত পিতা-মাতার উপরে অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বাড়াইয়া তুলিলাম যে, মাসের মধ্যে একদিবসও বিনাবোদনে অতিবাহিত হইত না। অবশেষে মাতাকে পুনরায় দেশ ভ্রমণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। পিতামাতা অমত করিলেন না। এবারেও মাতাই সঙ্গে চলিলেন, পিতামাতা বোধহয় মনে করিতেছিলেন, আমি স্বামী দর্শনের জন্য লালায়িত। কিন্তু আমার অন্তঃকরণে স্বামীর স্থান কোথায়। অন্তঃকরণের মধ্য স্থিত দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আমি কি চাহি? কিসের অনুসন্ধানে এ লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া যেন কেন্দ্রচ্যুত উল্কাপিণ্ডের মত ছুটিয়া চলিয়াছি কে জানে, কে বলিয়া দিবে, আমার গন্তব্যস্থান কোথায়!

হৃদয় আসনে স্বামীর কল্পনা-গঠিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বসাইয়া পূজা করিতে চেষ্টা করিয়া প্রতিবারেই ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি; প্রতিবারেই স্বামিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসীমূর্ত্তি যেন হৃদয় জুড়িয়া বসিতে চায়।

এই একবৎসর যে যন্ত্রণা আমি সহিয়াছিলাম, বোধ হয় সপ্তম নরকেও মানুষে এত যন্ত্রণা ভোগ করে না। দিবানিশি রাবণের চিতা হৃদয়ে পোষণ করিয়া মানুষে কতদিন স্থির থাকিতে পারে! ধূ ধূ করিয়া অবিরত যে অগ্নি অন্তর বাহির দহন করিয়া জলিতেছে, তাহার শান্তি কোথায় গিয়া পাইব—

প্রথমে মনে মনে ভাবিয়াছিলাম—হয়ত বিদেশ ভ্রমণ করিয়া মনে শান্তি পাইব। কিন্তু কাশী ধরাসুন্দরী—কাশীতে গিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করিয়াও মনে শান্তি আসিল না।

প্রত্যহই প্রভাতে মাতা ও দাদা আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নানা দেব-দর্শনে বাহির হইতেন। আমি প্রতি দেবতার দ্বারে আমার এ জ্ঞানকৃত মহা-পাপের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছি, প্রতি দেবতার মন্দিরে মন্দিরে নিজ প্রায়শ্চিত্ত ও পাপক্ষালনের উপায় ভিক্ষা করিতাম; সন্ন্যাসীকে বিস্মৃত হইবার জন্য কি না করিতে পারিতাম! কিন্তু পাষাণে মূর্ত্তি অঙ্কিতের (রেখা পাতের) মত, হৃদয়ে যে মূর্ত্তি একবার অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, সে মূর্ত্তি মুছিলনা।

সারা হৃদয়টী প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা-কুসুমে আকীর্ণ করিয়া সন্ন্যাসীর পূজার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছি, কোথায় সন্ন্যাসী?

মান অপমান কুলমর্য্যাদা আভিজাত্যগৌরব সব বিস্মৃত হইলাম, মনে মনে স্থির করিলাম, সন্ন্যাসীর সহিত একবার যেমন করিয়া পারি শেষ সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত খুলিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করাইয়া তুষানলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কিন্তু সন্ন্যাসীর দর্শন মিলিবে কোথায়! মাতার নিকটে পুনরায় সিমলা গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলাম, মাতার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া স্বীকৃত হইলেন না।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বিশেশ্বরের আরতি দর্শন, আমাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল, সেদিনও আমরা তিনজনেই ও পুরাতন দাসী ইচ্ছাময়ীও সঙ্গে গিয়াছিল। ইচ্ছাদাসী সঙ্গে থাকিলে ভৃত্য বা অন্য পুরুষের প্রয়োজন হইত না। কেননা ইচ্ছাদাসী পুরুষেরই মত। আরতি বড় সুন্দর নিজ চক্ষে না দেখিলে সে সৌন্দর্য্য শুনিয়া উপভোগ করা যায় না। আমরা তন্ময়চিত্তে আরতি দর্শন করিতেছিলাম—দেখিলাম পুনরায় আমার জীবন মরণের সন্ধিক্ষণের ন্যায় সেই সন্ন্যাসী। এবারে আর সে মুখ পূর্ব্বের মত চিন্তা বা সংসারবাসনালেশ-শূন্য প্রফুল্ল নহে। সে অত্যুজ্জ্বল সুন্দর মুখে চিন্তার কালিমা পড়িয়াছে। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতই সে সুবিমল মুখে চিন্তাকালিমা যেন অত্যধিক অসঙ্গত দৃষ্ট হইতেছিল।

সহসা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই আরতি ভঙ্গ হইতে না হইতেই তিনি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। আমার এক-পার্শ্বে মাতা ও অপর পার্শ্বে ইচ্ছাদাসী বসিয়াছিল, আমি তাহাকে নিম্নস্বরে বলিলাম, ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের বাটী চিনিয়া এস, মাকে বলিও না। উনি উত্তম গণনা করিতে জানেন, আমি উহাঁকে হাত দেখাইতে ইচ্ছা করি।" ইচ্ছা নিঃশব্দে উঠিয়া, মা জিজ্ঞাসা করিতে অন্য প্রয়োজন আছে বলিয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। দশাশ্বমেধের ঘাটের নিকটবর্ত্তী একটি অপ্রশস্ত গলিতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের আস্তানা, পূর্ব্বরাত্রে ইচ্ছার নিকটে অবগত হইয়াছিলাম।

মার পূর্ব্বরাত্রে জ্বরের মত হইয়াছিল, মা সুতরাং গঙ্গাস্নানে নিশ্চিতই গমন করিবেন না, ইহা আমি ভালরূপেই জানিতাম। মার ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কাটা শিশু বালকের অপদেবতার ভয়ের অপেক্ষা অধিক।

সঙ্গে ঝি, পুরাতন ভৃত্য মনস্বামী (মাদ্রাজী চাকর) ও শঙ্কর তিনজনে চলিল। আমাদের নিজ বাটীভাড়া লওয়া হইয়াছিল, কোতয়ালপুরার নিকটে;

সুতরাং সেখান হইতে দশাশ্বমেধের ঘাট অনেক দূর পড়ে বলিয়া এক্কায় যাওয়া হইল। দাদা গঙ্গাস্নানের পক্ষপাতী ছিলেন না। স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক দাসীকে বলিলাম, সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকটে হাত দেখাইতে যাইব। মূর্খ দাসী ও ভৃত্যদ্বয়ও তাহাই বিশ্বাস করিয়া আমার সহিত চলিল।

সেখানে অনেক সন্ন্যাসীর আস্তানা। আমি কিন্তু প্রবেশ করিবামাত্র সন্ন্যাসীকে চিনিয়া লইলাম। যে মূর্ত্তি অহরহঃ অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, সে মূর্ত্তি যদি সহস্র লোকের মধ্যে থাকে চিনিয়া লইতে আয়াস পাইতে হইবে না।

সন্ন্যাসীর সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বামহস্ত প্রসারিত করিয়া দিলাম, "বলিলাম" ঠাকুর হাত দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া দাও ঝি ও ভৃত্য দুইজন সামান্য দূরে সেই গৃহেমধ্যেই উপবেশন করিল।

আমাকে এরূপ অতর্কিতভাবে দর্শন করিবার জন্য সন্ন্যাসী যেন প্রস্তুত ছিলেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মুখের সমস্ত রক্ত যেন নামিয়া গিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমতুল্য রক্তাভ মুখকে তুষারধবল করিয়া দিল। অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া তিনি আমার হস্তধারণ করিয়া যেন নিতান্ত তন্ময়চিত্তে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দেখিতেছেন, এইরূপে আত্মনিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন।

আমি যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম, দেখিলাম কিছুতেই কথা কহিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, এদিকে প্রতি মুহূর্ত্তই আমার নিকটে অমূল্য।

অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিলাম—"ঠাকুর যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামীকে বিস্মৃত হইয়া অন্য পুরুষে অনুরক্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি তুষানল ত?" বলিয়া পরক্ষণেই আমার শিশুকালে বিবাহ হওয়া, স্বামী নিরুদ্দিষ্ট, প্রভৃতি সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া, কিরূপে দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তির সহিত অবিরত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া—হিন্দুকুলকন্যার মন অপবিত্র লইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর জ্ঞানে মৃত্যুকে বরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া—তাঁহার নিকটেও সমস্ত কথা বলিবার কারণ কি বলিলাম—

বলিলাম "তোমার প্রেমের জন্য তোমার কাছে আসি নাই ঠাকুর! কি জন্য যে আসিয়াছি, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না, মহাপাপ জানিয়াও তথাপি মরণের পূর্ব্বে একবার তোমার মুখ না দেখিয়া মরিতে পারিব না।"

দেখিলাম সন্ন্যাসীর নয়নও অশ্রুসিক্ত। অতি কোমল মিষ্টস্বরে বলেন ফিরিয়া যাও, সেখানে গিয়া দেখিবে তোমার স্বামি আসিয়াছেন, আমি

আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেরূপ-শুভ্রসুকুমার হৃদয় লইয়া প্রথমে সিমলায় গিয়াছিলে, সেইরূপ শুভ্র সুন্দর তোমার হৃদয় চিরকালই থাকিবে।

স্বামি-সেবার অধিক স্ত্রীলোকের কোন ধর্ম্ম নাই, একমনে স্বামিসেবা করিলেই তোমার সমস্ত পাপ খণ্ডন হইয়া অগ্নিতে বিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় তোমার হৃদয় হিন্দুকুললক্ষ্মীর উপযুক্ত হইয়া উঠিবে"।

আমি অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। সন্ন্যাসী কি আমার সহিত উপহাস করিতেছেন! স্ত্রীলোকে কখনো দুইবার ভালবাসিতে পারে না। অপবিত্র আত্মা লইয়া হিন্দুরমণীর দেবতা স্বামীর নিকটে দাঁড়াইব কি করিয়া! মনে মনে একজনকে ভালবাসিয়া অপরের সহিত বাক্যালাপই বা কি প্রকারে করিব। হৃদয় ও শরীরের অধিপতি কি বিভিন্ন ব্যক্তি? কেন আমি কি—

বলিতে বলিতে থামিয়া গেলাম;—কেন না যাহা মুখে আনিতে ভীত হইতেছিলাম, মন সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "তা নহেত আর কি? আর কি নাম তোমার উপযুক্ত। প্রকাশ্যে বলিলাম—"ঠাকুর তুমি ভুল বুঝিয়াছ, স্বামীকে ভাল না বাসিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, ছলনা করিয়া সে অপরাধের মাত্রা আর বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। আমার মরণই শ্রেয়ঃ। মৃত্যু ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই।

"এইবার সন্ন্যাসীর প্রশান্ত-মুখে একটু বিচলিত ভাব দৃষ্ট হইল। তিনি বলিলেন "একমাস অপেক্ষা—করিয়া তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া—সমস্ত মনের পাপ তাঁহার নিকটে নিবেদন করিয়া তোমার মরা উচিত।"

এ কথাটা নিতান্ত মন্দবোধ হইল না। যথার্থই স্বামীর সম্পত্তি আমি, তাঁহাকে না জানাইয়া মৃত্যুরও অধিকার আমার নাই। মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আমি উঠিলাম। ঝিকে বলিলাম, সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেছেন—তোদের জামাইবাবু শীঘ্র দেশে আসিতেছেন। তোমরা কেহ মা বা দাদাকে আমার হাত দেখানোর বিষয় জানাইও না।

সত্য সত্যই কি সন্ন্যাসী ভবিষ্যদ্বক্তা? পাঁচ দিন পরেই বাবার টেলিগ্রাম আসিল,"তোমরা সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া এস। সুশীল (আমার স্বামীর নাম) ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমি তাহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় পরিচিত সকলেই তাঁহাকে চিনিয়াছি" ঝি ত নৃত্য করিতে লাগিল। মাতার ও দাদার ত আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু আমি? যাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ হওয়া উচিত, সেই আমি যেন চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

যেরকম জীবন্মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ আমি করিতেছিলাম, তাহার অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে ভাল।

৫

স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইবারপর হইতে, আমি শ্বশুরালয়ে খুব অল্প সময়ই থাকিতাম। শ্বশুর আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সৎশাশুড়ীও যেন পুত্র নিরুদ্দেশ হইবার পর হইতে, নিতান্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিতের ন্যায় ব্যবহার করিতেন! যে সময় আমি কাশী যাই, সে সময় পোষ্যপুত্র গ্রহণের কথা হইতেছিল। শ্বশুরের প্রথম পক্ষের পত্নী একটী শিশু রাখিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীও পুত্রহীনা। বিষয় সম্পত্তিও অনেক। যখন আমার মত গ্রহণে শ্বশুর আসিলেন, আমি বলিলাম—আমার কোন আপত্তি নাই।

এই সময়ে একবার শেষ চেষ্টার জন্য নানারূপ-সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছিল। স্বামী যেন সেই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াই বাড়ী ফিরিয়াছেন।

স্বামী যখন বাটী হইতে চলিয়া যান, তখন তাঁহার বয়স ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। তখনকার তাঁহার যে মূর্ত্তি আমার মনে অস্পষ্টচ্ছায়ার মত ছিল, সে মূর্ত্তিও পরম সুন্দর। কিশোর কন্দর্পের মত রূপবান্, তরুণবয়স্ক পুত্রের সহিত বিমাতার মনান্তরের কারণ কেহই জ্ঞাত ছিলেন না। আমার শ্বশুরও বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন প্রকার সদুত্তর পান নাই। আমার স্বামীও কখনো সে কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। দেশে আসিয়া শুনিলাম, স্বামী ভিন্ন বাটীতে বাস করিতেছেন। বিমাতার সহিত সাক্ষাৎও করেন নাই। এ মর্ম্মান্তিক ক্রোধের ভিত্তি কি, কে জানে যে, এই দীর্ঘ নয়বৎসরেও সে ক্রোধের উপশম হয় নাই!

আমরা ফিরিয়া আসিবার দুইদিন পরে মহাধুমধাম করিয়া বহু আত্মীয় কুটুম্বের সহিত আমার স্বামীকে নিমন্ত্রণ করা হইল। সকলেই স্বামীকে চিনিতেন। যূপকাষ্ঠে লইয়া যাইবার সময় পশুকে যখন সিন্দুর চন্দন-চর্চ্চিত করে, আত্মীয়ারা যখন আমার বেণীরচনা করিয়া পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিতেছিলেন, আমারও মনের অবস্থা বুঝি তখন ঠিক সেইরূপ!

সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইলে, সকলেই নিজ নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। শিরঃপীড়ার অছিলায় আমি সমস্ত অপরাহ্ণ একটা নির্জ্জনঘরে, যেন মৃতের ন্যায় নির্জ্জীব ভাবে শয়ন করিয়া ছিলাম।

রাত্রি প্রায় ১২টার সময় মা নিজে আসিয়া আমায় ডাকিয়া তুলিলেন, বলিলেন, তাঁহার জামাতা সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া ফিরিয়াছেন, ইংরাজীতেও লাহোর কলেজে থাকিয়া এম্‌এ পর্য্যন্ত পাশ দিয়াছেন। সেদিন রাত্রে ট্রেণে উঠিয়া প্রথমে এলাহাবাদে গমন করেন, ট্রেণে একজন ধনী মাড়োয়ারী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত সংবাদ জানিয়া তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন ও উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তাহার পর তাঁহার প্রতিপালক পিতার মৃত্যু হইলে দেশে ফিরিতেছেন।

আমার সে সঙ্কুচিত ভীত ভাবের অর্থ মা সম্পূর্ণ বিপরীত বুঝিলেন, মাতা মনে করিলেন প্রথম স্বামিসন্দর্শন-জনিত লজ্জা। কি করিয়া মাতাকে ভাষায় বুঝাইব, আমি স্বামীর অনুরক্তা নহি—অন্যানুরক্তা।

আমাদেরও ধনি-গৃহোচিত কলিকাতার বাটী বৈদ্যুতিক আলো ও পাখাতে পরিপূর্ণ। হলঘরে আমার শয়নস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হলঘরে ১৬টা আলোর ফুল আছে। আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, স্বামী উঠানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বাতায়নপার্শ্বে দণ্ডায়মান। তাঁহারই হাতের কাছে আলো নিভাইবার সুইচ্ ছিল, যেন অন্যমনস্কভাবেই তিনি আলোগুলা নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন। অন্ধকারে আমিও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। শুনিয়াছিলাম স্বামী রূপবান্। একেইত পুরুষজাতি মাত্রেই স্ত্রীসৌন্দর্য্যের উপাসক, তাহার উপরে যে আপনি সুন্দর, সে ত সুন্দরী খুঁজিবেই! সুতরাং আমার মস্তক ভক্ষণেরও বিলম্ব হইবে না।

স্বামী অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতক্ষণ তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। আমার ত মনে হইতেছিল, বুঝি একযুগ কাটিতেছে। কি রকম একটা অস্থির চঞ্চলভাবে আমার সমস্ত হৃদয় যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এ বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকাপতন দর্শনের জন্য আমার প্রাণ যেন অতি ব্যাকুল ও চঞ্চল।

এ হল ঘরের বড় ঘড়িতে ১২॥টা বাজিয়া গেল। বুঝিলাম অর্দ্ধঘণ্টা এরূপ নিস্তব্ধ নির্ব্বাকৃভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল।

আমি দেখিলাম, স্বামী তখনও একভাবে দণ্ডায়মান, কোন কথা কহিতেছেন না। নিতান্ত নির্লজ্জার ন্যায় বলিয়া উঠিলাম, "আপনি বসিবেন না?" অত্যন্ত নিম্নস্বরে স্বামী উত্তর করিলেন, "বসিতেছি, কিন্তু তুমি মাটীতে উপবেশন করিলে কেন, বিছানায় আসিবে না?" বলিয়া অনুভবে বুঝিলাম নিকটে আমার

অগ্রসর হইতেছেন। হাতের উপরে হাত রাখিয়া আমায় শয্যায় উঠিয়া বসিতে বলিলেন।

স্বামীর হস্তস্পর্শে আমার সমস্ত হৃদয়টা যেন সহসা অতিবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াই থামিয়া গেল। নিজ মনের প্রকৃত অবস্থা নিজেই অনুভব করিতে পারিলাম না। যখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, (আপনার স্বর যেন আপনারই কর্ণে অপরিচিতের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল) মন তখন এতদূর চঞ্চল যে কি বলিতেছি, তাহা কিছুই স্মরণ নাই, পরে শুনিয়াছি তখন কি বলিয়াছিলাম। স্বামীর হস্তত্যাগ করিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া পড়িলাম; বলিলাম—"আমি আপনার অযোগ্যা আমায় ত্যাগ করুন, আমি অন্যের প্রতি আসক্ত। আমার শরীর যদিও অপবিত্র নহে, আমার মন অপবিত্র। শরীর আমার নবপ্রসূত শিশুরই মত নির্ম্মল, সমাজ চক্ষে, লোক চক্ষে আমি পবিত্র, কিন্তু ভগবানের চক্ষে আমি দোষী। আমি এতদিন আত্মহত্যা করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কিন্তু আপনাকে না বলিয়া আপনার অনুমতি না লইয়া মরণেও আমার অধিকার নাই।"

কতক্ষণ যে এরূপ ভাবে আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বকিয়া গিয়াছি, এবং কি যে বকিয়া গিয়াছি, তাহা এখনও স্মরণ নাই। শুনিলাম স্বামী বলিতেছেন "তবু, আমি যদি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে ও দ্বিধাশূন্য মনে গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতে ত তোমার কিছু আপত্তি থাকিতে পারে না?"

আমি বলিয়া উঠিলাম—"না না তা কখনও সম্ভব হইতে পারে না, মনে মনে একজন অপর পুরুষকে ভালবাসিয়া, দেহ আপনাকে বিক্রীত করিয়া এ মহা-পাপের বৃদ্ধি করিতে চাহি না, আপনি আমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলেন জানিয়া মরণে শান্তি পাইব।"

এই সময়ে স্বামী সহসা উঠিয়া গিয়া ইলেকট্রিকের সুইচ টানিয়া দিলেন। গাঢ় অন্ধকারের পরে সহসা উজ্জ্বল আলোক চক্ষে লাগিয়া চক্ষু যেন ঝলসিয়া উঠিল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলাম—উজ্জ্বল আলোকে যেন সে উজ্জ্বল রূপের উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি করিয়া দণ্ডায়মান—সিমলার সন্ন্যাসী"

কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে দুইহস্তে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলাম। কথা কহিবার শক্তি তখন ছিল না। মনের মধ্যে একত্রে নানাভাবের উদয় হইল। ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে অপমানে আমার যেন জনকদুহিতা জানকীরই মত মনে হইতেছিল, বসুমতী দ্বিধা হউন আমি প্রবেশ করি। এ ঘটনার

পরে কেমন করিয়া স্বামীর সহিত কথা কহিব? কি করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিব? অথবা স্ত্রীর অধিকার মত গৃহিণীপদ অধিকার করিব! স্বামীই বা কি মনে করিলেন, তিনি কতদূর তরলমতি উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তির স্ত্রীলোক আমায় ভাবিলেন জানি না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিলাম, মরিতেই হইবে, মৃত্যু ভিন্ন অন্য উপায় আমার নাই। ছিঃ এ মুখ দেখান আর চলে না!

নীরবে স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নানারূপ বিষাক্ত ঔষধের ব্যবহারে আমি অভিজ্ঞ, সুতরাং মরণের জন্য আমায় অধিক আয়াস করিতে হইবে না।

স্বামী আমার মনোভাব যেন বুঝিয়াই ত্বরিত-গতিতে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন।—সুতরাং বিয়োগান্ত নাটকটী এইরূপে মিলনান্তে পরিণত হইল।

তোমার শরীর এক্ষণে কেমন আছে জানাইবে। শুনিলাম তোমার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল নহে তুমিও আমার মত না হয় চেপে যাইও।

আর আমার নিবেদন—পাঠিকাগণের নিকটে। বলুন দেখি, আমার মত সন্ন্যাসী পাইলে কেহ প্রেমে পড়েন কিনা? ইতি শ্রীমতী ভক্তবালা দেবী।

শ্রীমতী মণি মৃণালিনী সেন।

ভালবাসি।

—তবু যদি যাবে চলে' একবার যাও বলে'—
"আমি ভালবাসি—
তোমায় হে দীন কবি, হৃদয়ে তোমার ছবি—
—তবে প্রিয় আসি।"
—যখন পরাণ মোর কাঁদিয়া উঠিবে ঘোর,
অধীরে মিলায়ে যাবে হাসি—
তখন পড়িবে মনে বিদায়ের সেই খনে—
"আমি ভালবাসি—"।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ
কবিগুণাকর

বুঝে পাওয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২

কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট বস্তুর প্রতীক্ষায় হাজারি বসিয়াছিল। নীলাম্বরী পরিয়া যখন সন্ধ্যা-বাণী সাজের বাতি লইয়া জোনাকী পোকার দীপ জ্বালিয়া দিল, হাজারি তখনও তাহার অপ্রীতিকর মনোভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া সুধীরের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দেখিল, সুধীর নাই। এমন সময় সুধীর ঘরে বসিয়া প্রায়ই কোন একটা কিছু করিয়া থাকে। হাজারির ঘর সুধীরের ঘর পাশাপাশি, মাঝে ভিত, ভিতের মাঝে দুয়ার। শয্যার শূন্যতায় সুধীরের দর্শনলালসা হাজারির হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য স্থান পাইতেছিল। অথচ সেটা কি বলিয়া কাহাকে জানাইবে এবং জানাইয়া আপনাকে কেমন করিয়া ছোট করিবে, এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাত্রিতে আহারে অনিচ্ছা করিয়া শয়ন করিল। সুধীরের শূন্য শয্যা—আজ দুয়ারের অন্তরাল ঘুচাইয়া হাজারি অশান্ত লইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রাতে সদ্যঃস্নাতা হাজারি তাহার সুদীর্ঘ কেশরাশি গামছা দিয়া মুছিতেছিল। মঙ্গলা জল খাবারের রেকাবি হাতে করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। ইতিমধ্যে সুধীর আসিয়া উপস্থিত। হাজারি তাহার চুলের রাশি গামছা দিয়া ঢাকিয়া দিল। সুধীরের হাস্যময় মুখশ্রী আজ গম্ভীর। সুধীরকে দেখিয়া নিজের নির্ভীকভাবের উপর যে সঙ্কীর্ণতা আসিয়াছে, তাহা নিরাকরণ করার জন্য হাজারির চেষ্টা বিফল হইতেছিল। সুধীর তাহা বুঝিয়াই সত্বর বিদায় হইবার উদ্দেশ্যে একটা ঘর দেখাইয়া বলিল—ঐ ঘরের চাবি কি তোমার কাছে?

বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীতে সম্মুখীন হইয়া এমনভাবে কোন দিনই কথা হয় নাই। সুধীরের আজ্ঞাটি আজ হাজারি বিনীত চাকরের মত পালন করিল।

সুধীর শিকল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হাজারি চাবি আনিয়া তালা খুলিতে গেলে সুধীর সরিয়া দাঁড়াইল—এইখানে হাজারির প্রাণে একটা দারুণ আঘাত-

বেদনা লাগিল। সে নিজে এ আঘাতের জন্য দায়ী মনে করিয়া নীরবে আঘাতের বেদনা সহ্য করিয়া চাবি খুলিয়া দিলে, সুধীর গৃহ প্রবেশ করিয়া হাজারিকে ঘরের মধ্যে যাইতে ইঙ্গিত করিল। হাজারি মন্ত্রমুগ্ধের মত সুধীরের আদেশ পালন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

অযত্নরক্ষিত একটা লোহার সিন্দুকের চাবি হাজারির হাতে দিয়া সুধীর বলিল "চাবিটা খোল" হাজারী সিন্দুকের চাবি খুলিয়া মরিচাধরা সিন্দুকের ডালা খুলিতে অসমর্থ হইয়া সুধীরের মুখের দিকে চাহিল। জলখাবারের রেকাবী হাতে করিয়া তখনও মঙ্গলা দুয়ারের কাছে অপেক্ষা করিতেছিল। সুধীর বলিল, "তুমি জল খেয়ে এস, আমি ততক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করচি। কথাটা দুদিক দিয়াই হাজারীর প্রাণে বড় বাজিল। মঙ্গলাকে খাবার লইয়া সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া হাজারী এক পাও নড়িল না। সুধীর অবস্থা বুঝিয়া বাঁ হাতে সিন্দুকের ডালা খুলিয়া সিন্দুক হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া হাজারির হাতে দিয়া বলিল "তোমার দাদা মশায় মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার হাতে এর চাবি দিয়ে বলে দিয়েছিলেন—এতে যা আছে তোমার। দাদামশায়ের হাতের ফর্দ্দির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।" হাজারীর হাতে কাগজের তাড়া দিয়া, সুধীর দেখিল হাজারী দুয়ারের আঁখখানে। সুধীর অতি যত্নে হাজারির বাহুযুগলে বিচ্ছিন্ন চুলের রাশির সহিত তাহার উভয় হস্ত স্পর্শ করিয়া আদরে সরাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। নাটকীয় দৃশ্যের মত ঘটনাটা ঘটিল—সুধীরের স্পর্শানুভূতির সাড়া বৈদ্যুতিক তারের মত তাহার স্নায়ুর রক্তকণিকায় সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে কেমন অবসন্ন করিয়া ফেলিল, সুধীরের এমন করিয়া যাওয়াটাও আজ তাহার সন্দেহের কারণ হওয়াতে সুধীরের প্রদত্ত কাগজগুলি খুলিয়া দেখিবার কৌতূহল তাহাকে কাগজ খুলিয়া দেখাইতে বাধ্য করিল। কাগজের তাড়া খুলিয়া দেখিল, তাহার দাদা মশায়ের রক্ষিত কুড়ি হাজার টাকার কুড়িখানা নোট। হাজারি নোট পাইয়া শিহরিয়া উঠিল। প্রবল ভূকম্পনে যেমন জীর্ণ অট্টালিকার সমস্ত অংশ মর্ম্মে মর্ম্মে শিথিল করিয়া দেয়, হাজারীর জীর্ণ মন ঘটনাপরম্পরায় আজ ততোধিক হইল। হাজারির আবল্য কঠোরতার বাঁধ আজ প্রবল স্রোতের বেগে ভাসিয়া গেল। সুধীরের স্পর্শানুভূতি তাহার মুক্ত হস্তের দান, তাহার অসাধারণ বিশ্বাস,—হাজারীর-কর্ত্তৃত্বাভিমান সমস্ত গর্ব্বকে দলিত মথিত করিয়া চলিয়া গেল—এমন করিয়া চলিয়া যাওয়া তাহার অশান্ত মনকে নিতান্ত

ব্যাকুলিত করিয়া তুলিল। উন্মুক্ত জানালার দিকে চাহিয়া দেখিল, রাস্তার বাঁকের মুখে সুধীরের চাদরের অংশ বাতাসে উড়িয়া, যেন নিষেধ করিতেছে,—ওদিকে চাহিও না।

তাহার অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষাকে নির্ম্মূলিত করিয়া চারবের শেষ দৃশ্যটী তাহার চখের কাছ হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। ইচ্ছা—ছুটিয়া গিয়া বলে—"ওগো যেও না এমন করে নীরব তিরস্কারের আঘাত করিয়া যেওনা।" মঙ্গলা আসিয়া বলিল—"জল খাবে এস"—উত্তর না করিয়া ছুটিয়া সুধীরের বিছানায় শুইয়া বলিল "এখন যাও।" সুধীরের একটা পরিত্যক্ত জামা খাটের বাজুতে ছিল, হাজারী সেটা বুকে লইয়া আরাম অনুভব করিল।

হাজারির কোমল বৃত্তিগুলি তার দাদামশায়ের যত্নে শিক্ষায় পরুষ ভাবাপন্ন হইয়াছিল। রাক্ষস-অপহৃতা রাজকন্যাকে জিয়ন কাটীতে জাগাবার মত সুধীর তাহার স্পর্শে হাজারিকে জাগাইয়া গেল—জাগরণের মধ্যে তার জলযোগের সুযোগ তারপক্ষে অত যন্ত্রণাদায়ক হইল। সেত একদিনের জন্য কাউকে খাইতে অনুরোধ করে নাই। যাকে লইয়া সে এমন হৃদয়হীন ব্যবহার করিয়াছে, সে আজ সম্পূর্ণ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়া গেল। মঙ্গলা সেইখানেই অপেক্ষা করিতেছিল, হাজারি শান্ত কোমল স্বরে বলিল "মঙ্গলা এমন করে গেল কেন?"

মঙ্গলা এমনতর সোহাগ সম্ভাষণ একদিনও শুনিতে পায় নাই। বিনিময়ে সহানুভূতির সুরে মঙ্গলা বলিল "এমন গিয়ে থাকে আবার আসবে।"

মঙ্গলার "এমন যাওয়া আর ফিরে আসার মধ্যে" দৃঢ় প্রত্যয়ের যে একটা সঙ্কেত ছিল, হাজারি তাহা বুঝিয়া হতাশ কাতরকণ্ঠে বলিল—"আসবে?"

মঙ্গলা বলিল "আসবে না যাবে কোথায়?"

এতবড় জবরদস্ত নীতি "না আসিয়া কোথায় যাবার যো নাই।"—এতবড় অধিকার এতবড় জবর দখলের কথা এখানে আস্‌তে হবে?—কেন—কিসের জন্য?—তেম্‌নি সে সমস্বরে বলিল, মঙ্গলা—"আসবে তো এমন করে গেল কেন?"

মঙ্গলা তেমনিভাবে "তা যায়।"—উত্তর দিল। মঙ্গলা জানে এম্‌নি করে যায় —আবার আসে। সত্যি কি সেই সম্বন্ধ? গিয়ে থাকতে পারে না, আবার আসে—কঠিন পাথরের বুক চিরিয়া নিঝরের বারিধারা ছুটিয়া চলিল—মঙ্গলার আশ্বাসের দৃঢ়তায় বিশ্বাস করিয়া হাজারি ভাবিল—এমনি করে যায় আবার আসে। সমস্ত দিন গেল—সন্ধ্যার নীলশাড়ির ওপর চুম্‌কির কাজের

মত সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া মঙ্গলা যখন ঘরে আসিল, হাজারি দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় আবল্যভাবে উদাসনেত্রে বসিয়া ছিল—মঙ্গলাকে তার আশ্বস্ত বাক্যের নিষ্ফলতার জন্য মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না—রাত্রির নৈরাশ্য তাহার ক্ষিপ্ত মনকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া শুনিল, সুধীর তাহার মাকে লইয়া রাত্রিতে পশ্চিম চলিয়া গিয়াছে। মঙ্গলার আশ্বাস তাহাকে অভিসম্পাতের মত পাষাণ করিয়া দিল।

সুধীরের এই পাওয়ার মধ্যে অপরাধের একটা গুরুতর কারণ রহিয়াছে, এটা হাজারি নিরপেক্ষ বিচারে নিজেই বুঝিয়া তাহার দণ্ড গ্রহণ করার সামর্থ্য তাহার ছিল, কিন্তু একটা কথা তাহার সমস্ত প্রতীক্ষা সাহসকে চূর্ণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠানকে নষ্ট করিয়া দিতেছিল। সুধীরের মা জোর করিয়া বলিয়াছে "ছেলের বিয়ে দেব" এই অসীম ক্ষমতা রুদ্ধ করার শক্তি হাজারির নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া ঐ কথাই তাহার মনে হইতেছিল। যদি তাহা ঘটে, তবে তাহার আত্মকৃত অপরাধের ফলেই ঘটিবে—কথাটায় তাহার সমস্ত ধৈর্য্য, সান্ত্বনা যখন নষ্ট হইতেছিল, সেই সময় শিবরাণীকে পাওয়াই তাহার নিকট অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল; কিন্তু সেটা বড় সহজ নয়। শিবরাণী একটা বড় ঘরের অন্দরের বউ—হাজারির কথায় তাহার আসা অসম্ভব। তথাপি হাজারি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিল। শিবরাণী হাজারীকে তাহার না আসার কারণ একটী মাত্র কথায় জানাইয়াছে, তাহার স্বামী কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছে, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত সে হাজারির নিকট আসিতে পারে না। তাহার আসা অপেক্ষা কথাটার কাজ অধিক হইল।

কোন্ সময়ে কিরূপে ধৈর্য্যের সহিত কাজ করিতে হয়, হাজারি সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল।

শিবরাণীর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত না আসা হাজারিকে আরও সজাগ করিয়া দিল। হাজারি বুঝিল, স্বামীর নিকট এমনি করিয়া আপনাকে বিলাইয়া দিতে হয়।

বিষয় কাজের কতক ভার নসিরামের উপর অর্পণ করিয়া সুধীরের অভিপ্রায় অনুরূপ ডাক্তারখানা তৈয়ারীতে মন দিল। কাজটা নিতান্ত সময়ক্ষেপণ বা খেয়ালের জন্য নয়, শিবরাণীর উপদেশ তাহার আরব্ধকার্য্যের আন্তরিকতা বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল। কাজ শেষ করিয়া বেশ ধুমধামের সহিত তাহার

দাদামহাশয়ের নামে উৎসর্গ করা হইল। দীর্ঘ ছমাস নানাতীর্থে ঘুরিয়া সুধীর নিজে পশ্চিম থাকিয়া মাকে দেশে পাঠাইয়া দিল।

সুধীরের মায়ের আগমনে দেবতার প্রসাদ বাড়ী বাড়ী পাঠান হইতেছে। হাজারীও প্রসাদের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছিল; কিন্তু দিনের পর দিন গেল, যখন প্রসাদ প্রাপ্তির আশা তাহার ঘুচিয়া গেল, তখন তাহার পুরাতন ব্যবহারের কথাটা নূতন করিয়া মনে হওয়ায় তাহার সেদিনের সেই অপ্রীতিকর কাজটার উপর তাহার লক্ষ্য পড়িল, আর সেই সূত্র হইতেই আজ সে গ্রামে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয়ের নিকট তাহার প্রাপ্য বস্তু হইতে বঞ্চিত হইল। যে কাজটা তখন আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য সে করিয়াছিল, এখন তাহা আত্মগ্লানিতে পরিণত হইল। হাজারী নিজের নিরপেক্ষ বিচারে নিজেকে দোষী করিয়া নিজেই তাহার দণ্ডগ্রহণে প্রস্তুত হইল। নসীরামকে ডাকাইয়া বলিল,—"আর দু'জন বিশ্বাসী দরোয়ান নিযুক্ত করিয়া বাড়ীর পাহারার বন্দোবস্ত কর নসুকাকা।"

নসীরাম জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন মা হঠাৎ এ অনর্থক ব্যয় করার প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন আছে কাকা—আমাকে আমার বাড়ী যেতে হবে।"

নসীরাম কোন কথা না বলিয়া উদ্বেগবিহ্বলদৃষ্টিতে হাজারীর মুখের দিকে চাহিল।

হাজারী নসীরামের অবস্থা দেখিয়া বলিল,—"কথাটা বিশ্বাস ক'রচ না কাকা, আমাকে সত্যিই বাড়ী যেতে হবে—আমার কাজে আমিই দায়ী, এ বাড়ীর ভার তোমার ওপর।"

নসীরাম হাজারীর কথার উত্তর দিতে পারিল না, তাহার চক্ষের জল বুক বহিয়া পড়িতেছিল,—নসীরামের স্নেহাপ্লুত ভাবে হাজারীর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। স্নেহ-কোমল স্বরে নসীরাম বলিল,—"যাও মা যাও ঠিক ব্যবস্থাই ক'রেচ।"

সেদিন সুধীরের মায়ের উপবাস, পিঁড়েতে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। পাড়াটা একটু দূরে, একা গমনে অনভ্যস্তা হইলেও হাজারি আজ সাহস করিয়া একাকিনী চলিয়া আসিয়াছে,—হাজারীকে দেখিয়া সুধীরের মা মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। পরীক্ষা করাই তাঁর অভিপ্রায়; কথা কহিলেন না, মালাগাছটী মাথার কাছে রাখিয়া আঁচল পাতিয়া হাজারিকে পিছু করিয়া শয়ন করিলেন। হাজারী

বিরক্ত হইল না। সেও আপনার ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য শাশুড়ীর পাদমূলে শয়ন করিল। উভয়ের মধ্যে এই নীরব অভিনয় হইয়া গেল। হাজারীর নিজকৃত অপরাধের দণ্ড এইখানেই শেষ হইল। তন্দ্রাঘোরে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে সুধীরের মায়ের পা হাজারির অঙ্গস্পর্শ করাতে 'ষাট্‌ষাট্' বলিয়া সুধীরের মা ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল। হাজারী প্রস্তুত ছিল, হাজারী মা বলিয়া সুধীরের মায়ের পদযুগল ধরিয়া বলিল মা, "আমার ভুলের বোঝা নামিয়ে ফেলে তোমার কাছে এসেছি, দাও মা আমাকে চাট্টি খেতে দাও"! হাজারী কাঁদিয়া ফেলিল।

আঁচল দিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিয়া হাজারীর মুখচুম্বন করতঃ সুধীরের মা বলিল,—"আমি যে সুধীরের সঙ্গে ঝকড়া ক'রে তোমাকে বউমা ক'রেছি মা।"

হাজারী উত্তর দিতে পারিল না, তাহার কোমল ভাব তাহার অশ্রুপাতে প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুধীরের মা হাজারীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "আয় মা, মুখখানি শুকিয়ে গ্যাচে খেতে দিইগে।"

হাজারী ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—"আমি তোমার পাতের প্রসাদ খাবো"—"আজ আমার উপোস" বলিয়া হাজারীর মা ঘরে গিয়া, তীর্থের দেবতার প্রসাদ আনিয়া হাজারীর মস্তক স্পর্শ করাইয়া তাহার মুখে দিলেন, হাজারী বলিল,—মা এই প্রসাদের প্রত্যাশায় আপনার কাছে ছুটে এসেছি। সুধীরের মা স্নেহজড়িত স্বরে বলিলেন,—"দেবতার প্রসাদ—দেবতার আশীর্ব্বাদ।"

শিবরাণী তার স্বামীর কাছে বিদায় লইয়া চার দিনের জন্য বাড়ী আসিয়া হাজারীর পরিবর্ত্তনে আনন্দিত হইয়াছিল।

হাজারী ঝাঁটা হাতে করিয়া উঠান ঝাঁট দিতে ছিল, শিবরাণী দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "খুড়ি মা, বেটার বিয়ে দিয়ে নূতন বউ ঘরে আন্‌লে নাকি?"

হাজারী ছুটিয়া গিয়া শিবরাণীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"চুপ কর, আমার মরণের কথা আর তুলিসনে।"

শিবরাণী বলিল,—"হাজুদিদি, ঝড়তুফানে কেমন ক'রে হাল ধরে পাড়ি জমাতে হয়, তুমি তা বেশ জান, তোমার কাছে শিখবার অনেক আছে!"

"পাগলামী করিসনে ব'স।"

সুধীরের মা ঘরের ভিতর ছিলেন, বাহির হইয়া বলিলেন,—"শিবু, বৌমা একলা থাকে, তুই এক আধবার আসিস্।"

শিবরাণী বলিল,—"এখন ত যাই—বড় তাড়াতাড়ি আছে।" দু'দিন শিবরাণীর দেখা নাই। সুধীরের মা সুধীরের চিঠী না পাওয়াতে পিঁড়েয় বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, হাজারি ঘরের ভিতরে কাজে ব্যস্ত, এই সময় মা বলিয়া সুধীর বাড়ী প্রবেশ করিয়া সটান মায়ের পায়ের উপর মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল,—মা সারা পথ কাঁদতে কাঁদতে এসেছি, এই দেখ তোমার ব্যারাম বলে কে টেলিগ্রাফ ক'রেছে, মা মনে করিলেন শিবির—কাজ।

মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মা বলিলেন, হারে মাকে কি চিরকাল ধরে বাধবি, মা কি মরবে না ?

"মরার কথা বলো না মা, বেঁচে থাকতে মা ছাড়া হতে পারবো না !"

"তা পারিসনে" বলিয়া সুধীরের মস্তক তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,"যা ঘরে যা—আমি শিবিকে ধরে আজ তার শ্বশুরকে দিয়ে ঐ আবর্জ্জনার রাশ ফেলিয়ে তবে ছাড়ব।"

সুধীর বলিল "শিবির শ্বশুর এসেছে নাকি মা ? "তুই যেমন পাগল" বলিয়া মৃদু হাসিয়া "যা ঘরে যা" বলিয়া মা বাড়ীর বাহির হইলেন, সুধীর বাড়ীর পরিবর্ত্তন দেখিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিল না। মা চলিয়া গেলে বাড়ীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গৃহমধ্যে মৃদু চুড়ির আঘাত হইল, সুধীর সন্তর্পণে গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিল—হাজারির শয়নের মূল্যবান্ খাটে সাদা ধপধপে বিছানা, খাটের পার্শ্বে হাজারী নিঃসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া আছে, সুধীর হাজারীকে দেখিয়া বলিল "তুমি এত রোগা হ'য়ে গেলে কেন ?"

হাজারী সে কথার উত্তর না দিয়া নতজানু হইয়া চাবির থলে আঁচল হইতে খুলিয়া বলিল—আমার আসন্ন মৃত্যু হ'তে আমি মুক্ত হ'তে পেরেচি, এখন এ ভার থেকে আমাকে অব্যাহতি দাও বলিয়া সমস্ত চাবি সুধীরের পায়ের উপর রাখিল। সুধীর হাজারীর পরিবর্ত্তনে যুগপৎ মুগ্ধ হইয়া হাজারীর হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া সযত্নে হাজারীর আঁচলে চাবি বাঁধিয়া দিয়া বলিল,—"দেবতার প্রসাদে আমি আমার বুঝে পেলাম। আমার চাইতে ও-জিনিস রক্ষার শক্তি তোমার অধিক" বলিয়া হাজারীর চিবুক স্পর্শ করিল। হাজারী সুধীরের বক্ষে মাথা লোটাইয়া দিয়া মনে করিল, তাহার সিন্দুক ভরা টাকায় এমন আনন্দ কোন দিন দিতে পারে নাই।

শ্রীদ্বিজরাজ ঘোষ।

আমরা।

(১)

আমরা মানুষ রাণি, দেবতা ত নই!
দূর হ'তে পূজা দিব, দূর হ'তে পূজা নিব,
দূরে দূরে থেকে শুধু মেটে আশা কই?
দূরে দূরে থাকি বটে কামনা আপনা রটে—
একটু সুযোগ পেলে কাছাকাছি হই—
আমরা মানুষ রাণি, দেবতা ত নই!

(২)

আমরা মানুষ রাণি, দেবতা ত নই!
দূরে ফুল ফুটে থাকে— দূর হ'তে দেখি তাকে,
কে পারে থাকিতে স্থির বাস নাহি লই?
আমরা সকাম জাতি— ফুল লয়ে মালা গাঁথি—
মালা গেঁথে গলে পরি, বুকে ধরি লই!
অথবা নিঙাড়ি' রস লভি গন্ধ, লভি যশ—
কামনা পিনাকী আর—মৃত্যুঞ্জয়-ভাই—
আমরা মানুষ রাণি, দেবতা ত নই!

(৩)

আমরা মানুষ রাণি, দেবতা ত নই!
পড়িয়া কামনা ফাঁদে হায় রে রাজর্ষি কাঁদে—
সম্মুখে দাঁড়ায়ে মেনা শিশু কোলে লই—
রাধা অভিমান করে, নারায়ণ পায়ে ধরে
কহি "পদ পল্লব দেহি" মানময়ী—
আমরা মানুষ রাণি, দেবতা ত নই!

(৪)

আমরা মানুষ রাণি, দেবতা ত নই!
তুমি মোর দেববালা, লয়ে হৃদয়ের আশা
যখন যাইব কাছে—দুটী কথা কই—
কহি শুধু দুটী কথা মুছিয়া লইও ব্যথা—
আমার তাপিত প্রাণ জুড়াইও সই।
কি বল চাহিব আর? আমার কি অধিকার?
ভালবেসে কাছে এসে বসো প্রেমময়ী—
আমরা মানুষ রাণি, দেবতা ত নই!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, কবি ওয়াকর।

"ডুলিয়া"

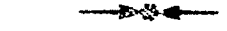

(ছোট গল্প)

দেরাদূনের নির্জ্জন পাহাড়ের নির্জ্জন উপত্যকায় একখানা ক্ষুদ্র কুড়ে বাঁধিয়া ডুলিয়া তাহার সঙ্গিহীন জীবনটা কোন রকমে কাটাইতেছিল। তুষারধবল হিমাদ্রির অভ্রভেদী উন্নত শৃঙ্গে, পার্ব্বত্যপাখী, স্বর্গীয় সঙ্গীতে কলরব করিয়া যাইত। ডুলিয়ার ডুলালী ধরণের শরীরখানা পুলকে শিহরিয়া উঠিত। ডুলিয়ার বাপ সহরের বাজারে যাইয়া ভুট্টা বেচিয়া আসিত, আর ডুলিয়ার মা ছিল দুঃখী মানুষ; সে, তার সেই ছয়মাসের ডুলিয়াকে ক্রোড়ে লইয়া ভবিষ্যতের কল্পনার স্বর্গ গড়িত। সেদিন দেরাদূনের পার্ব্বত্যপথে প্রচুর বরফ জমিয়াছিল। জহর সেদিন আসিতে বড়ই বিলম্ব করিতে লাগিল, লখিয়ার মনটা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। ক্রমে রাত্রের অর্দ্ধপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন কতকগুলা পাহাড়ীয়া লোক বরফের স্তূপ হইতে জহরের নির্জ্জীব শুভ্র দেহটা ধরাধরি করিয়া লখিয়ার কুটীরে লইয়া আসিল। তারপর ডুলিয়ার গোলাপী গণ্ডস্থলের দিকে চাহিয়া লখিয়া অনেকদিন বাঁচিয়াছিল। কিন্তু ডুলিয়ার যখন ঘরকন্নার বয়স হইয়া আসিল, তখন লখিয়ার আর ত্বর সহিল না। সে, তার ক্ষুদ্র কুড়েখানা আর ভুট্টাযবের ক্ষেত কয়খানা ডুলিয়ার হাতে সঁপিয়া দিয়া সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। পাড়ার লোক আসিয়া "ডুলিয়াকে" অনেক স্নেহ মমতা দেখাইল। সরলপ্রাণ পার্ব্বত্যজাতির মধ্যেও দুই একটা নরকের কীট ছিল, যাহারা ডুলিয়ার জমিটুকু লইবার আশায় অনেক ফিকির করিয়াছিল। কিন্তু সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে ডুলিয়ার বুদ্ধির থলিটা বোঝাই হইয়াছিল খুব বেশী। তাই সে পাড়া প্রতিবেশীর আদর অনাদর সমভাবেই অবহেলা করিতে শিখিয়াছিল। গায়ে পড়িয়া যাহারা বুদ্ধি দিতে আসিত, ডুলিয়া তাহাদের উপেক্ষা করিয়া সংসারের কাজে চলিয়া যাইত। দুঃখীর মেয়ে ডুলিয়া, সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে কাজ করিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে, শূন্য কুটীরের পানে চাহিয়া যখন তার মায়ের কথা মনে পড়িত, তখন কিন্তু তার চোখের জল কিছুতেই বাঁধা মানিত না। মাঝে মাঝে সখিয়া আসিয়া তার অজ্ঞাতসারে তার চোখের

জলটুকু মুছাইয়া দিয়া যাইত। সখিয়ার সঙ্গে ডুলিয়ার খুবই ভাব ছিল। কিন্তু বড় লোকের ছেলে বলিয়া "সখিয়ার" সব সময় গরীবের মেয়ের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ হইয়া উঠিত না। মাঝে মাঝে "ডুলিয়া" অনেকক্ষণ আপন মনে বসিয়া ভাবিত, সখিয়ার প্রতি অভিমানটা যখন খুবই পাকিয়া উঠিত, তখন হয়ত সখিয়া হঠাৎ আসিয়া তাহার হাত দুখানা ধরিয়া ফেলিয়া ডুলিয়ার গোলাপী গণ্ডের দিকে গদ্ গদ্ ভাবে চাহিয়া থাকিত। পাহাড়ের উপর যদি তখন কেহ থাকিত, তবে সে দেখিতে পাইত—দুইটী দেবশিশুর স্বর্গীয় প্রেমের অনাবিল উৎস। যদি ভাবুক থাকিত তবে সে মুগ্ধ হইত; যদি কবি থাকিত, তবে সে পাগল হইয়া যাইত; যদি বৃদ্ধ থাকিত তবে সে যুবক হইয়া যাইত। সে কিশোর-কিশোরীর প্রেম বড় পবিত্র, বড় স্নিগ্ধ। ঝরণার জল স্থির হইয়া তাহাদের প্রেমের করুণ কাহিনী শুনিত। পাহাড়ের পাখী আত্মহারা হইয়া যাইত, আর মানুষ ত কোন্ছার্। একদিন সখিয়া আসিয়া বলিল "ডুলালী! আমি আর এদেশে থাক্‌ব না"। ডুলিয়ার রক্ত-গণ্ড-স্থলে দু'কোটা প্রেমের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, সে তার সখিয়ার হাত দুখানা নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল। সখিয়া ডুলিয়ার মুখের কাছে মুখখানা লইয়া কত সোহাগ করিল।

(২)

সখিয়ার বাপ ছিল সহরের বড় দারোগা। তার ছেলের সঙ্গে কি ভুট্টা-ওয়ালীর মেয়ের বিবাহ হইতে পারে? সখিয়া বাটীর ভিতর আটক্ পড়িল। মনটাত আর দারোগার বশ নয়। একদিন সত্যি সত্যিই সখিয়া প্রাচীর টপ্‌কাইল। ধনীর একমাত্র দুলাল মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল, কেহই জানিল না। দুপুর রাতে সে একবার ডুলিয়াকে বলিয়া গেল "ডুলালী! তোকে না পেলে আর দেশে ফির্‌ব না। তার পরদিন ডুলিয়ার ঘরে থানা তল্লাসী হইল। মালপত্র রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইল,। ভুট্টা যবের ক্ষেত যাহার খুসী সেই লইল। ডুলিয়া কেবলই বসিয়া বসিয়া সখিয়ার কথা ভাবিত। একবুড়ী আসিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে রোজই ডুলিয়ার খাবার যোগাইত, আর সখিয়ার খবর বলিয়া যাইত। যখন তিনদিনেও সখিয়ার কোন খবরই পাওয়া গেল না, তখন নির্ম্মম দারোগার পাষাণ প্রাণেও জল আসিল। সখিয়ার মা পাগলিনীর ন্যায় হইল। সখিয়ার মা শেষটা ডুলিয়াকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিল,। কি করিবে? ঘরেত আর ছেলে পুলে নাই। গরীবের ঘরের সুন্দরী মেয়ে ধনীর অট্টালিকায় আসিয়া সৌন্দর্য্যের রাণী হইল।

সখিয়ার কাছে সব খবরই যাইত। ক্রমে ভাবিতে ভাবিতে সখিয়ার বাপের অসুখ হইয়া পড়িল। সে অসুখ আর কিছুতেই সারে না,—কত ডাক্তার, কবিরাজ বাটিয়া খাওয়ান হইল। শেষে ফকির, সাধুতে দারোগা সাহেবের কুঠীভর্ত্তি হইল। একদিন সত্যি সত্যিই এক সাধু দারোগার উৎকট ব্যাধি আরোগ্য করিল। দারোগা মোহরের থলি লইয়া সাধুর পায়ের কাছে রাখিল, সাধু নাথি মারিয়া মোহরের থলি দূরে ফেলিল। আর যাইবার সময় বলিয়া গেল—"সখিয়ার সাথে দুলিয়ার বিয়ে দে।"

(৩)

দারোগা সাহেবের বাটীতে সন্ধ্যা হইতেই লোক ভার হইতেছিল। সহরের পেস্‌কার, মুন্সি থেকে সুরু করে, দেওয়ান পর্য্যন্ত কেহই বাদ পড়ে নাই। সকলেরই কৌতুক হইয়াছিল—ভুট্টাওয়ালীর নোংরা মেয়ের সঙ্গে দারোগার অমন সোণার চাঁদ ছেলের কি করিয়া বিবাহ হইতে পারে দেখিবার জন্য। দক্ষিণের পাহাড়টার জ্যোৎস্নার ঢেউ লুটিপুটি খাইতেছিল। সহরতের সানাইতে মিলনের তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। নীল ওরনাখানার ভিতর দিয়া দুলিয়ার গোলাপী রংটা ফুটিয়া উঠিতেছিল। পাহাড়ের দেশে সকলকেই আগে মেয়ের মুখ দেখান হইত। ভুট্টাওয়ালীর মেয়ের রূপ দেখিয়া—সকলের তাক্ লাগিয়া গেল। তখন সখিয়া ছুটিয়া আসিয়া "দুলিয়াকে" বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "দুলালী! আজ সত্যি সত্যিই তুই আমার"। পাহাড়ের কচি মেয়েরা হলুদে ঘাঘেরি পরিয়া বরকনের গায় ফাগ ছিটাইয়া দিল। দূর পাহাড়ে, ঝোপের আড়ালে দয়েল, শ্যামা মঙ্গল গীতির তান ধরিল।

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,

নিবেদন। *

শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মিলন-সভায় নেতৃত্ব করিবার জন্য আমাকে আহ্বান করা হইয়াছে। অন্যকার সভাতেই আমার অপেক্ষা বহুবিষয়ে বহুতর যোগ্য ব্যক্তি থাকিলেও, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ও অক্ষমের শিরে এত গুরুভার অর্পিত হইল কেন, তাহার কোন বিশিষ্ট কারণ দেখিতেছি না। আমি ভাষ ও ভাষার দীন-তায় নিজেকে নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা করিলেও, শান্তিপুরবাসীর স্নেহের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারি নাই। তাই আজ এই সুধীমণ্ডলীর উদ্যোগিগণের অনুরোধ রক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। ভরসা সুধীবৃন্দের সহানুভূতি এবং জননী বাগ্দেবীর আশীর্ব্বাদ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যে সকল মহাত্মা সভা-নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বনামধ্যাত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক। তাঁহাদের প্রদত্ত গবেষণা-পূর্ণ অভিভাষণ-সদৃশ প্রবন্ধরচনা আমার দ্বারা সম্ভাবিত না হইলেও, যথাশক্তি বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধেই দুইচারিটি কথার অবতারণা করিব।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, এই বাঙ্গালা সাহিত্যের বয়স খুব অধিক নহে; সুতরাং ইহা আধুনিক সাহিত্য। ইহার পূর্ব্বে যে সাহিত্য ছিল, তাহা পদ্যযুগের প্রাচীন সাহিত্য। এই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বয়স কত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন কথা। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের বয়স সহস্র বৎসরের অধিক হইবে না। সাহিত্যের ভাণ্ডারে এমন কোন বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না, যাহাদ্বারা ইহাকে সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রচার করা যাইতে পারে। বাস্তবিকই অতি পুরাতন কোন নিদর্শন বাঙ্গলা সাহিত্যে না পাইলেও, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেও যে বাঙ্গলা সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, তাহার স্বপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি "ললিত বিস্তর" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাত্মা বুদ্ধদেবের সময়েও যে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, সে সংবাদ "ললিত বিস্তর" গ্রন্থে বর্ণিত বুদ্ধদেবের লিপিশিক্ষায় আমরা জানিতে

* শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীর ৩য় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

পারিতেছি। সে ত' আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা! তখনও "বঙ্গলিপি" বা বাঙ্গলা অক্ষর ছিল। বুদ্ধদেব বাল্যকালে বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অন্যান্য লিপিমালার সহিত সেই "বঙ্গলিপি"ও অর্থাৎ বাঙ্গলা অক্ষরও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন এই যে, যদি তৎসময়ে সাহিত্য সৃষ্টি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অক্ষর সৃষ্টি সম্ভব কি না?

ধ্বনি নিরাকার। সেই নিরাকার ধ্বনির কল্পিত আকারের নামই "লিপি" বা "অক্ষর"। নিরাকার ধ্বনির আকার প্রদানের আয়োজন হয় তখনই, যখন সেই ধ্বনিকে লিখিয়া রক্ষা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেই বুঝিতে হইবে, তখন সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে।

বেদের নাম "শ্রুতি" এবং বেদমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম "স্মৃতি"। এই "শ্রুতি" ও "স্মৃতি" রূপ সংজ্ঞা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তখন এই সকল শাস্ত্র, গুরু শিষ্যকে মৌখিক উপদেশ দিতেন, শিষ্যও তাহা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। এই সকল শাস্ত্র তৎকালে লিপিবদ্ধ করা হইত না। ইহা হইতে অনুমান হয়, বৈদিক যুগের আদিম অবস্থায় লিপি বা অক্ষর সৃষ্টি হয় নাই। তারপর যখন এই সমস্ত শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন উপলব্ধি হইল, তখনই লিপিমালার সৃষ্টি হইয়া গেল। সুতরাং আগে সাহিত্য বা লিখিতব্য বিষয়, তারপর তাহা লিখিয়া রক্ষা করিবার জন্য লিপি বা অক্ষর। এখনও দেখা যায়, যে সকল অসভ্য জাতির ভাষা আছে, কিন্তু সাহিত্য নাই; তাহাদের অক্ষরও নাই। সুতরাং "লিপি" বা অক্ষর থাকিলেই সাহিত্য থাকার প্রমাণ স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমার বোধ হয়, সেই প্রাচীন কালেও বাঙ্গলা সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু কিরূপ ছিল, তাহা আজ আর জানিবার উপায় নাই। বহু বিপ্লব-বন্যার প্রবলস্রোতে সে সাহিত্যের স্মৃতি চিহ্ন পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে।

সকল সময়েই লিখিত ভাষার সহিত কথিত ভাষার কিছু পার্থক্য থাকে। এ পার্থক্য এখনও আছে; সুতরাং তখনও ছিল। তখন বাঙ্গলার সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, তাহাই তখনকার বাঙ্গলা ভাষা। সে ভাষার মূল কোথা? অনেকে বলেন, সংস্কৃত ভাষাই বাঙ্গলা ভাষার জননী—বাঙ্গলা সংস্কৃত হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমার অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গলা ভাষার ভগিনী; তাও জ্যেষ্ঠা-নহে, কনিষ্ঠা। অর্থাৎ যে আদিম ভাষা হইতে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি, সেই

আদিম ভাষাকে সংস্কার করিয়া সংস্কৃতের জন্ম। সে আদিম ভাষা সমস্ত মনুষ্য একত্র হইয়া পরামর্শপূর্ব্বক সৃষ্টি করে নাই। তাহা প্রকৃতি হইতে জাত, তাই তাহার নাম "প্রাকৃত"। আর সেই প্রাকৃতকে বৈয়াকরণিকের নিয়ম নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া সংস্কারের ছাঁচে ফেলিয়া গঠন করা হইয়াছে বলিয়াই, সে নবগঠিত ভাষার নাম "সংস্কৃত।"

সেই অতীত যুগের প্রাকৃত-জাত বাঙ্গলা ভাষা, যাহা কেবল কথোপকথনেই ব্যবহৃত হইত, সেই ভাষায় যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। বুদ্ধদেব সাধারণ লোকশিক্ষার জন্য সেই সময়ের অন্যতম কথিত ভাষা পালির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, পালিভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তৎসময়ের অন্যতম কথিত ভাষা বাঙ্গলার প্রতি ঐরূপ কোন মহাত্মার কৃপাদৃষ্টি না হওয়ায়, হয়ত তাহাতে উপযুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু একেবারেই যে হয় নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। সাধারণ মানবের সুখ দুঃখ, আনন্দ উল্লাস প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক গান, ছড়া, দোঁহা প্রভৃতি নিশ্চয়ই তৎসময়ে প্রচলিত ছিল এবং সে সকল লিপিবদ্ধ করিবার জন্য "বঙ্গলিপি"ও কল্পিত হইয়াছিল। এই লিপিকল্পনাই সাহিত্য সৃষ্টির বিশিষ্ট প্রমাণ। বিশেষতঃ যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন—মহাত্মা বুদ্ধদেবের জীবিত প্রাকার সময়ে, বাঙ্গলা দেশের খুব উন্নত অবস্থা ছিল। তখন বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করিয়া শিল্পে বাণিজ্যে আপনাকে বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল। কথিত আছে, যে বৎসর বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর সিংহ-বাহু নামে একজন বাঙ্গালী রাজার পুত্র বিজয় সিংহ বাঙ্গালীর প্রস্তুত পোতা-রোহণপূর্ব্বক বাঙ্গালী সৈন্য লইয়া বর্ত্তমান সিংহলদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন এবং সিংহলের লোকদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার এইরূপ উন্নত অবস্থার যুগেও কি বাঙ্গলায় সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই? আজ এই আড়াই হাজার বৎসর পরে, কোনরূপ স্মৃতি-নিদর্শন না দেখিয়া, একথার উত্তর দেওয়া কঠিন হইলেও, "বঙ্গলিপি"র অস্তিত্বের কথায় বোধ হয় স্বাধীন বাঙ্গালার সেই সুখ-সম্পদ-সৌভাগ্য-গর্ব্বোন্নত সময়ে নিশ্চয়ই বাঙ্গলা সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু বহু বিপ্লব-বন্যার প্রবল স্রোতে বাঙ্গলা সাহিত্যের সে আদিমরূপ একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক সে লুপ্ত সাহিত্যের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

তারপর আমরা যে সময় হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হই, সে

সময়ের বাঙ্গলাসাহিত্যও কেবল পদ্যে লিখিত। পদ্যই তখনকার সাহিত্যের ভাষা। কিন্তু গদ্যও কি তখন ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কেন-না সাহিত্যে পদ্য ব্যবহৃত হইলেও, কথোপকথনে গদ্যই প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখনকার গদ্য অপেক্ষা পদ্যই ছিল সরল ও সৌন্দর্য্যময়—কোমল ও কল্পনাময়—মধুর ও মোহময়! আর তখনকার সাহিত্যও ছিল কাব্যপ্রধান, তাই তখন গদ্য অপেক্ষা পদ্যের আদর ছিল, গৌরব ছিল। কিছু লিখিতে হইলেই লোকে পদ্যে লিখিত। এইরূপ ব্যবহারের ফলে তখনকার সংসার গদ্যকে নিতান্ত নীরসভাবে কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রেই রাখিয়াছিল, শোভাময় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন।—

"আনন্দ আকাস, ক্ষীরোদ সায়র,
প্রেম-বিন্দু উপজিল।
গত পদ্য হ'য়ে কামের সহিতে,
বেগেতে ধাইয়া গেল॥"

এই গদ্যের স্বরূপ কি তাহা জানা যায় না। কেননা তাহার কোন নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। সম্ভবতঃ এই পদ্যযুগে গদ্য থাকিলেও তাহার আদর ছিল না। সে কেবল ঘর সংসার—লেনা পাওনা—বাদ বিচার, ইহাতেই নিয়োজিত ছিল; আর পদ্যই ছিল তখনকার সাহিত্যের ভাষা।

এই পদ্য যুগের বাঙ্গলা সাহিত্য প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক। শূন্য পুরাণ, ডাক ও খণার বচন গুলির পরবর্ত্তী সকল গ্রন্থেই হিন্দু দেব-দেবীর লীলা প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই লীলাপ্রসঙ্গ মানবসমাজের সাংসারিক আচারপদ্ধতিরই অনুরূপ; তাই মনে হয়, তৎসময়ের অনেক তথ্য আমাদের এই কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত প্রাচীন কাব্যের কবিগণ সকলেই পণ্ডিত এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই আমাদিগের প্রাচীন কাব্যগুলির সহিত সংস্কৃত পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। মনে হয়, তখনকার কাব্যের উদ্দেশ্যই ছিল, ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা লোকশিক্ষা। তাই তখন ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন, রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যগুলি গীত হইত, এবং সহস্র সহস্র শ্রোতা ভক্তিপূর্ব্বক সে সকল কাব্যসুধা পান করিয়া আত্মার নৈতিক বল বৃদ্ধি করিত। তখনকার কাব্যে ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া কবি জনসাধারণকে

ধর্ম্মপথেই আকর্ষণ করিতেন। বর্ণজ্ঞানহীন নিতান্ত অশিক্ষিত লোকও মন্ত্রের স্থূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তাহার ফলে বর্ত্তমানের মত তখন এত অল্পেই "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" না হইয়া, লোকে "সোণার সংসার" পাতিত। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রাখিয়াই গোপনে উত্তমর্ণ অধমর্ণের মধ্যে দেনা পাওনার আদান প্রদান হইত। অসভ্য ও অশিক্ষিত (?) ব্যাধের ছেলেও যুবতী পরনারীর সম্ভ্রম রক্ষার্থ হিতোপদেশ প্রদান করিত। তখনকার শিক্ষাই ছিল ধর্ম্মমূলক শিক্ষা। বিবিধ বর্ণের মধ্যে বর্ণ যোজনা পদ্ধতির বিহিত ব্যবস্থা না থাকিলেও, মানুষকে মানুষ করিতে যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার অনুষ্ঠানের অসদ্ভাব ছিল না। এই সকল কাব্যই সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিত। তবে তখনকার রুচি, এখনকার রুচি হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিল। সেটা সময়ের দোষ, কবিদিগের দোষ নহে। তবে প্রবীণ ও নবীন রুচি সম্বন্ধে ইহাও বলা অসঙ্গত নহে যে, তখনকার "প্রেম" সঙ্গীতের মধ্যেই "প্রার্থনা" সঙ্গীতের সুর শ্রবণ করা যাইত, আর এখন "প্রার্থনা" সঙ্গীতের মধ্যেও, তথাকথিত "প্রেম" অর্থাৎ "কাম" সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হইতেছে!

পদ্যযুগের পর গদ্যযুগের আরম্ভ হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে। তা'র পূর্ব্বে সাহিত্যে যে গদ্য ছিল না এমন নহে; কিন্তু ব্যবহার খুব কমই ছিল। ব্যবহারে যখন আসিল, তখনকার গদ্যের রূপ সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালাই করা। বড় বড় সমাস, দীর্ঘ দীর্ঘ সন্ধি আর সংস্কৃত শব্দের ওষ্ঠ-ফাটা উচ্চারণ লইয়াই, এই সময়ের গদ্য সাহিত্য আবির্ভূত হইয়াছিল। তখনকার সেই গদ্যের ভাষা "সাধু ভাষা" নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, এ সাধু ভাষাও অধিকদিন তিষ্ঠিতে পারিল না। টেকচাঁদ ঠাকুরের প্রাকৃত বাঙ্গলা, এই "সাধু ভাষা"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যেদিন সাহিত্য ক্ষেত্রে সেই রণভেরী নিনাদিত হইয়াছিল, সাহিত্য-সেবকের সে এক স্মরণীয় দিন। তা'রপর যখন উভয় পক্ষের সন্ধি হইয়া গেল, তখন সেই টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে বিদ্যাসাগরী ভাষার মিলনে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র এক শক্তিশালী অথচ সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাষার সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টির যুগটাকে আমরা বঙ্গদর্শনের যুগ বলিতে পারি।

এখন সে বঙ্গদর্শনের যুগও অতীত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের এটা এখন কোন্ যুগ উপস্থিত, তাহার নাম করণের চেষ্টা করিব না। তবে এটাকেই এখন বাঙ্গলা-সাহিত্যের "নবযুগ" বলিয়াই গ্রহণ করিব। এ নবযুগের সাহিত্য

এখন নানা বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ! ভাবা ও ভাবের উচ্ছৃঙ্খলতাই যেন ইহার বিশেষত্ব! আমরা সাতশত বৎসরের পরাধীন বাঙ্গালী, হঠাৎ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া খেয়ালের বশে আগে ভাবাটাকেই স্বাধীন করিয়া দিয়াছি! না রাখিয়াছি—তাহার ব্যাকরণের নিয়ম, না রাখিয়াছি তাহার শব্দ যোজনার বন্ধন, না রাখিয়াছি তাহার বানানের প্রাচীন পদ্ধতি! তা'রপর এই স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ ভাষার মধ্যে যে ভাবের আমদানী করিয়া সাহিত্যের দপ্তর পূরণ করিতেছি, তাহাও অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত! কথা একটু খুলিয়া বলাই ভাল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন একদিন গিয়াছে, যেদিন পাঠক-অভাবে শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রগুলিও স্থায়ী হইত না। যে গুলি থাকিত, সে গুলিকেও ঋণের বোঝা বহন করিয়া অনিয়মিত ভাবে দিন কাটাইতে হইত। একদিন—সে খুব অধিক দিনের কথাও নহে, বাঙ্গালী-পাঠক আড়াই টাকা মূল্য দিতে কাতর হইতেন বলিয়া "প্রচার" মাসিক পত্র উঠিয়া গিয়াছিল। তিন টাকা মূল্যের জন্য "নবজীবন"কেও বিগতজীবন হইতে হইয়াছিল। আর আজ চারি টাকা ছয় টাকা মূল্য দিয়া অনেক পাঠকই আগ্রহসহকারে বাঙ্গালা মাসিকের গ্রাহক হইতেছেন। হঠাৎ দেখিলে এটাকে খুব আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয় বটে; কিন্তু বুঝিতে হইবে হঠাৎ বাঙ্গালা-পাঠকের এ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন হইল কেন? আমার বোধ হয় কেবল গল্প ও উপন্যাসের জন্যই মাসিক পত্রগুলির এই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। চিত্রের চটকও চমকপ্রদ! এই কারণেই বোধহয় আজ কাল পাঠকের অনুপাতে পাঠিকার সংখ্যাই অধিক এবং ক্রমেই যেন তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কৈশোর ও যৌবনপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েরাই আজ-কা'লকার বাঙ্গালা মাসিকগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই সকল চঞ্চল-চিত্ত পাঠকপাঠিকার মনোরঞ্জনের জন্যই মাসিকের পৃষ্ঠাগুলি কেবল উপন্যাস, ছোট গল্প ও কবিতা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকে। এই সকল উপন্যাস, গল্পের প্রকৃতি একটু ভিন্ন প্রকারের। সে প্রকৃতি আমাদের দেশের আদর্শের অনুরূপ নহে। এ আদর্শ য়ুরোপ হইতে গ্রহণ করা। তাই ইহাতে চুম্বনের ছড়াছড়ি, আলিঙ্গনের বাড়াবাড়ি, যুবক যুবতীর নির্লজ্জ জড়াজড়ি! আমাদের অনভ্যস্ত চক্ষু এ দৃশ্যে নিতান্তই কাতর হইয়া পড়ে! আমাদের দেশের সাহিত্যের আদর্শ কিরূপ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে! ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা লোকশিক্ষাকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া কাব্যাদি রচিত হইত এবং ঐ আদর্শকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে যেরূপ সৌন্দর্য্যসমাবেশের প্রয়োজন, কবিগণ শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে তদ্রূপ

রচনাই করিতেন, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য কুশিক্ষার প্রচার করিতেন না, এখনকার মাপকাটিতে মাপিতে গেলে, তখনকার অনেক কার্য্যই অশ্লীল হইয়া পড়ে। কিন্তু সে খোলা অশ্লীলতা তত ভয়ঙ্কর ছিল না, যত ভয়ঙ্কর আজ-কা'লকার চাপা অশ্লীলতা! তখনকার ভাষাই অশ্লীল ছিল, এখনকার ভাষা ও ভাবভঙ্গী সবই অশ্লীল!

এই সকল উপন্যাস ও গল্প লৌকিক ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে লেখা হয় না। ইহার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা লোকরঞ্জন করা। শুনিতে পাই ইহারই নাম "আর্ট" কলা-কৌশল। সাহিত্যের এই নবযুগে, তথাকথিত "আর্টের" দোহাই দিয়া সাহিত্যের বাজারে অনেক অকার্য্য কুকার্য্য অবাধে চলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে "আর্টের" দোহাই দিয়া অধর্ম্মেরই জয় গান করা হইয়া থাকে। অনেক "আর্টিষ্ট" কুৎসিতকে নিপুণতার সহিত এমন সুন্দর করিয়া অঙ্কিত করেন, যাহাকে কুৎসিত বলিয়া বর্জ্জন করা যায় না, গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষাই মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে। তথাকথিত এই সকল আর্টিষ্টের কল্যাণে, আমাদের শাস্ত্রশাসিত সমাজের সংযমপূত শুদ্ধান্তঃপুরে বিলাসিতা ও স্বেচ্ছা-চারিতার বিষাক্ত বায়ু অবাধে প্রবেশ করিতেছে, ফলে পবিত্রতারূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ অনিবার্য্য। স্বামী স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসাকেই আমাদের দেশে "প্রেম" বলিত, এই প্রেমের ব্যভিচারী ভাব জনসাধারণের মধ্যে "পিরীত" আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই "পিরীত" স্বকীয়া-পরকীয়ার বিচার করে না, আত্মপর ভেদ মানে না, উচ্চ নীচের পার্থক্য রাখে না! এই "পিরীত" প্রাচীন সাহিত্যের কোণে কানাচে স্থান পাইলেও, কোন দিনই তাহা মনোজ্ঞবর্ণে রঞ্জিত হয় নাই। অবশ্য বৈষ্ণব সাহিত্যের যে "প্রেম" বা "পিরীতি" তাহা ইতর-জন-প্রচলিত "পিরীত" নহে, তাহা কামগন্ধ-শূন্য; সুতরাং পবিত্র। কিন্তু পূর্ব্বের প্রাকৃত জনের "পিরীত" এবং বর্ত্তমান "আর্টিষ্টের" প্রেম, কামনাপূর্ণ—আসক্তিতে ভরা। তাই বলিতে হয়, তখনকার বৈষ্ণব-কবি বর্ণিত—

"সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তা'র ঠাঁই।"

এবং

"পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা।"

এই যে কামনাশূন্য, স্বার্থশূন্য "পিরীতি" ইহার সঙ্গে বর্ত্তমান কথা-সাহিত্য-ধৃত স্বার্থমূলক কামনাপূর্ণ যে প্রেম, তাহার তুলনাই হয় না! আমাদের নবীন "আর্টিষ্ট"গণ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে, বিলাসব্যসনের নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারের ন্যায় প্রেমের ব্যভিচারিভাব কামকলুষিত পিরীত-মাখা "লভ" (Love) নামক অপূর্ব্ব পদার্থের আমদানী করিয়াছেন। এই "লভ" এখন প্রেমের পবিত্র আসন গ্রহণ করিয়া, পরকীয়া সধবার প্রেম, বিধবার প্রেম, কুমারীর প্রেম, বালিকার প্রেম প্রভৃতি পিরীতের নানা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। এই সকল পিরীতের চিত্র এদেশবাসীর চক্ষে নিতান্তই নগ্ন ও অস্বাভাবিক। এই চিত্র দর্শন করিতে করিতে চিত্ত চঞ্চল হইতে পারে, কলুষিত হইতে পারে। কারণ এই সকল চিত্র উত্তেজক ও উন্মাদকর উপাদানে চিত্রিত এবং কামনার মনোজ্ঞবর্ণে রঞ্জিত। ইহা আর্টিষ্টের কৃতিত্বের পরিচায়ক হইতে পারে, গৌরবের পরিচায়ক নহে। পাপ-চিত্রের ততক্ষণ প্রয়োজন হইতে পারে, যতক্ষণ পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু কলা-কৌশলী কবির অঙ্কন-কৌশলে পাপের প্রতি আসক্তির উদ্রেক হইলেই সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া পড়ে। অনেকেই এখন এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে সমাজধ্বংসের আয়োজন করিতেছেন। কলাকৌশলের বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া কাম-কলুষিত প্রেম-লালসা জাগাইয়া,—অগঠিত চরিত্র যুবক-যুবতী, এমন কি বালকবালিকার পর্য্যন্ত কোমল হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টিকরাকে, কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

একেত আমাদিগের শিক্ষাপদ্ধতির মূলে ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ ধর্ম্মভাব না থাকায়, নাস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট স্বেচ্ছাচারিতাই যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরী প্রভৃতিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে; তাহার উপর যদি তথাকথিত আর্টিষ্টগণের এইরূপ অত্যাচার অবাধে চলিতে থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সাহিত্যের এই "নবযুগে" সমাজের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত! এ দুর্দ্দিনে কি কর্ত্তব্য তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। মহাকবি ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতির দেশে, সদাচার, সংযম, দয়া, দাক্ষিণ্যের সহায়তায় ভগবদ্ভক্তি অর্জ্জনের এবং আত্মশক্তিবর্দ্ধনের উপায়ই কাব্যের মূলসূত্র হওয়া উচিত। এখানে বিলাসের আসক্তি, লালসার পিপাসা একেবারেই বর্জ্জনীয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যক্ষেত্র নিরঙ্কুশ! এখন গল্প ও উপন্যাসের তথাকথিত আর্টিষ্টগণ একজন মহাকবির সুরে সুর মিলাইয়া যেন গাহিতেছেন—

"বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
স'বাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে!"

গোটা কবি হেম-বাবুর এই স্বাধীনতার শিক্ষা কিন্তু তাঁহার ভাষাকে স্বাধীনতা দান করে নাই। আজ এই সকল ছুটুমে কবি নবীন আর্টিষ্টগণের উৎকট স্বাধীনতার বিকট পটহধ্বনি আমার মত স্খলিতদন্ত, পলিতকেশ অনেকেরই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে।

সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র সার্থকতা কি কেবলই লোকরঞ্জনের নামে—আর্টের অনুরোধে মনুষ্যত্বকে কল্পিত মোহে মুগ্ধ করিয়া রাখা! ইহাই কি তথাকথিত আর্টিষ্টের একমাত্র লক্ষ্য? তা' যদি হয় তাহা হইলে বলিতে পারি সে সাহিত্য সাহিত্য নামের নিতান্তই অযোগ্য। সাহিত্যের সার্থকতা সেইখানে, যেখানে সে নিজের শিক্ষার ভিতর হইতে মানবতাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারে,—যেখানে সে জড়ে চৈতন্য সঞ্চার করিতে পারে,—মৃতদেহে প্রাণের স্পন্দন আনয়ন করিতে পারে। ভোগলালসার মোহ-মদিরায় অভিভূত করিয়া, মানুষকে কেবল কল্পনা-কুশলী করিয়া তোলা সৎসাহিত্যের উপযুক্ত কর্ম্ম নহে। যদি সাহিত্যের ভিতর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া, জাতিকে জাগাইয়া তুলিতে না পার, তবে আর বৃথা লেখনী ধরিয়া ফল কি? মনে কর দেখি, আমরা—

"এসেছি, কি হেতা যশের কাঙ্গালী,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি!"

না-না; তা' নয়! তা' নয়! এ সাহিত্য সাধনায় "প্রশংসা যশের চেয়ে উচ্চ লক্ষ্য আছে! সে উচ্চ লক্ষ্য কি?

কবি গাহিতেছেন,—

"জাগাইয়া তোল এই নির্জ্জীব জনতা।
দাও নব বীজ মন্ত্র, মৃত সঞ্জীবনী—
এই লৌহময় দেশ চাহে স্পর্শমণি!"

এখন সাহিত্য সাধককে—কল্পনাকুশলী কবিকে, এই নির্জ্জীব ও নিদ্রাতুর জন-সঙ্ঘের মধ্যে জাগরণের গান গাহিয়া স্পন্দনপ্রদ সাড়া দিতে হইবে, পথভ্রান্ত সাধককে শক্তিশালী গুরুর মত মৃতসঞ্জীবনী বীজমন্ত্র দান করিতে হইবে, এখন এই লৌহময় দেশকে স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া সোণা করিতে হইবে! তবেই সাহিত্য-সাধনার সিদ্ধিলাভের সঙ্গে কবিজীবনের চরম সার্থকতা! ঐ আমার দেশ-মাতৃকার আহ্বানবাণী, আকাশে, বাতাসে,—জলে, স্থলে,—ঊর্দ্ধে, অধরে

অবিরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে আহ্বানবাণী শ্রবণ করিয়া নিজে জাগো, দেশকে জাগরে দাও! এখন—

"অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন;
স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর তাহে নাহি প্রয়োজন!"

এখন—

"পিছায়ে যে আছে, তা'রে ডেকে নাও,
নিয়ে যাও সাথে ক'রে;
কেহ নাহি আসে, একা চ'লে যাও,
মহত্ত্বের পথ ধ'রে!"

এখন সাহিত্যসাধনার পবিত্র পীঠে উপবেশন করিয়া "স্বর্গাদপি গরীয়সী মোদের জননী" এই পবিত্র মন্ত্রে আচমন করিতে হইবে। তা'রপর তন্ময়চিত্তে মাতৃচরণে আত্মনিবেদন করিয়া মাতৃ আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বাচার্য্যগণের "ধর্ম্মমঙ্গল" "চণ্ডীমঙ্গল" প্রভৃতি মঙ্গল কাব্যের ন্যায় "মাতৃ-মঙ্গল", "ভারতমঙ্গল" প্রভৃতি জাতীয় মঙ্গল কাব্য রচনা করিতে হইবে এবং সেই মঙ্গলগীতি পূর্ব্বের অনুকরণে দ্বারে দ্বারে গান করিয়া নিদ্রাতুর সন্তান-সঙ্ঘের প্রাণে জাগরণের সাড়া দিতে হইবে—নির্জ্জীব জনতার মধ্যে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। গল্প ও উপন্যাসাদি কথা-সাহিত্যের মধ্যে পবিত্রতার ভাব-প্রবাহ ছুটাইয়া দিতে হইবে; আর সত্যের সম্মান, ন্যায়ের সম্মান, পুণ্যের সম্মান রক্ষা করিয়া, মহিমার অধিকারে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই বাঙ্গলা-সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের উপন্যাস, গল্প ও কবিতা লেখকগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন আর তথাকথিত উদ্ভট প্রেমের কাঁদুনী বাঁধুনীতে সাহিত্যের পবিত্র মজলিসে খেম্‌টিওয়ালীর আমদানী না করেন। শক্তি থাকে—ধ্রুপদের গুরুগম্ভীর তালে, দীপ্ত দীপকের বিরাট সুরে, কালভৈরবের মহাতাণ্ডব দর্শন করাও। আর সে শক্তি না থাকে, লেখনী সংযত কর। বিদেশের খেউড়-আমদানী করিয়া, জননী ভগিনী সকলের সমক্ষে নারীর নগ্নমূর্ত্তির বিকাশ করিয়া, দেশকে, জাতিকে, ভাষাকে কলঙ্কিত করিও না! ইহাই আমার অদ্যকার বিনীত নিবেদন।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ।

পতিত জগতে অতীত জেগেছে বাজিছে বিজয় শাঁক,
কোথা পুরোহিত কোথা পুরোহিত এসেছে সঘনে ডাক।
শৌর্য্য যখন তূর্য্য নিনাদে বাজাল বিজয় কাড়া,
ক্ষিপ্ত আগুন দীপ্ত যখন তখনো পড়েনি সাড়া,
আজিকে ক্ষাত্র মাগে সৌভ্রাত্র আবার চাহিছে ভক্তি,
থরবল পুনঃ পুরোহিত আজি দুরবল পশু শক্তি।
কামানে "বিমানে" শমন ডেকেছে যে জাতি গরব ভরে,
গরব অস্ত চাহে বেদান্ত তোমার চরণ' পরে।

* * * * *

জবালার সুতে শিখাইতে বেদ এসগো ব্রাহ্মণ আজ,
করিয়া স্বস্তি দাওগো অস্থি দানবে হানিতে বাজ।
করিতে শিষ্ট এসো বশিষ্ঠ, এসো দ্রোণ মহারথী
জাতীয়তা রথ চিনিয়াছে পথ কোথায় আজিকে রথী ?
আজি একলব্য সাজিয়া সভ্য মাগিছে গুরুর দীক্ষা,
এসো ব্রাহ্মণ লয়ে বিসর্জ্জন জগতে দানিতে শিক্ষা।
এসো চাণক্য করিতে ঐক্য জগতের ভেদ যত,
রক্ত অসুরে তক্ত শিশুরে শিখাও তেয়াগ ব্রত।
অমৃত সব ডুবে যাক্ আজি অমৃত তব স্পর্শে,
ব্রহ্ম পাগল ভাঙুক আগল বিশ্ব বিপুল হর্ষে।
বিশ্বভবন হোক তপোবন উঠুক সামের গান,
জগতের হিতে এসো পুরোহিত করিতে জীবন দান।
পার্থিব মত স্বার্থ শতেক দলিয়া চরণতলে,
জাগো ব্রাহ্মণ ভুলিয়া আপন উঠহ তুরীর বলে।
নর-মর তব দাও বলিদান নরমেধ যাগ করি,
চূর্ণ জগত হউক পূর্ণ ব্রাহ্মণ শিরে ধারি।

* * * * *

ছিল সেই দিন যেদিন ভারতে দেখালে তোমার জ্ঞান,
নন্দন আলা মন্দার মালা হেলায় করিলে দান।
পূতকান্ত সৌম্য শান্ত ঠিকরে নয়নে জ্ঞানের আলো,
বিষধর ফণী আকাশ অশনি নিভে যায় দেখি নয়ন কালো।
ব্রহ্ম-জ্ঞান লিখা জ্বলে রাজটীকা জ্বলজ্বল তব ললাটে,
রাজ-মুকুটের মণির ময়ূখ পড়িছে চরণে সাপটে।
কহিছে নৃপতি ওগো কুলপতি লহ দয়া কবি মান,
এ মর বিভব দিয়াছ ফেলিয়া, করিয়াছ বর দান।
এক বিংশবার করেছ নিধন ভারতের পশু শক্তি,
চেয়েছ ভারতে জাগাইয়া দিতে অনাবিল অনুরক্তি।
শুনেনি তখন ভারত জগত,—সময় এসেছে এবে,
টুটিয়ে গরব তুলহ প্রণব আজি এ বিপুল ভবে।
দেখাও ভারতে শিখাও জগতে খুলিয়া মরম তল,
মানুষে পশুতে কতখানি ভেদ, আছে কার কত বল।
উঠহ ব্রাহ্মণ ভুলিয়া আপন চেয়ে আছে আজি বিশ্ব,
কাঁপাইয়া ব্যোম তোল তোল "ওম্" নিখিল তোমার শিষ্য।

শ্রীবরদা দত্তঃ।

একাগ্রতা।

তোমায় ডাক্‌লে পরে পাইনা সাড়া
ওগো আমার দয়াল প্রভু
তোমায় ডাক্‌তে ডাক্‌তে মরি যদি—
ডাক্‌তে ছাড়ব নাক কভু!
তুমি যত কাঁদাও মোরে
আমি তত আঁকড়ে ধরি
তোমার রাঙা চরণ দুটি—
ততই ডাকি "হরি হরি"।—
তুমি যদি মেয়ে ফেল'
আমার পায়ে দলে 'দলে'—
জানি তবু জীবনান্তে
আমায় টেনে নিবে কোলে!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ, কবি গুণাকর।

আর্টে দুর্গামূর্ত্তি। (শিল্প)

দুর্গামূর্ত্তি চিরকালই আমাদের দেশে খ্যাত। পূজা ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে এই দেবমূর্ত্তির উপকারিতা বা গুণদোষ বিচারে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, ক্ষমতাও নাই। বহু মনীষী বহু গবেষণা করিয়াছেন, সে সকল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত—'অবাঙ্মনসগোচরম্' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু একটী কথা মনে হয়,—দুর্গামূর্ত্তি আমাদের বঙ্গদেশীয় আর্টের একটী অতিমনোরম দৃষ্টান্ত। মানবের সাত্ত্বিক ও তামসিক ভাবের সংগ্রাম, সে প্রবল বিপ্লব ও ঝঞ্ঝা, তমসার ক্ষণিকজয় ও প্রভাব, পরিশেষে নিভৃত মানব-হৃদয় কন্দরস্থিত দেবভাব দ্বারা তাহার নিধন এ অতি সুন্দর চিত্র। সুকবির হস্তে সুরঞ্জিত হইয়া সুললিত কাব্যে পরিণত হইয়াছে। শিল্পী সে প্রলয় হইতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ধরিয়া ফেলিয়াছেন, এক অপূর্ব্ব মাধুরীময়ী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন।

শিল্পী সংগ্রামের শেষ মুহূর্ত্তই চিত্রিত করিয়াছেন, ইহাই আর্টের অভাবনীয় শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত। চিত্রবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা ও তদনুযায়ী শিল্পে, কখনও কবিতায় তার ঘটনাপরম্পরার সংঘটন ব্যক্ত করা যায় না। তাহাতে সমগ্র ঘটনা-কালের মধ্য হইতে একটী মুহূর্ত্ত বাছিয়া লইতে হয়, যেটীতে সমুদয় ভাবের শ্রেষ্ঠ ভাগটীই ব্যক্ত হয়। এই শেষ মুহূর্ত্তে মানবের শ্রেষ্ঠ জয়, তমসা দূর করিয়া সত্ত্বগুণের প্রভাব, তাহাই বিবৃত হইয়াছে! শিল্পী তাহাই গঠন করিয়াছেন। ইহা অতি উচ্চ কলা-বিদ্যার পরিচয় প্রদান করে।

কুৎসিত কখনই মনোরম হয় না, চক্ষুকে তৃপ্তিদান করে না, সে বাস্তবেই হউক, চিত্রেই হউক আর ভাস্করেই হউক। বাস্তবে কুৎসিত অপ্রীতিকর, শিল্পে কলায় তদধিক। বাস্তবে অপরাপর বহুবিধ আনুষঙ্গিক সৌন্দর্য্যে কুৎসিতের কুৎসিতভাব হ্রাস পাইতে পারে, চিত্রে বা মূর্ত্তিতে তাহা হয় না। চিত্রে কুৎসিতের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ দর্শনে ক্ষণিক বিস্ময় উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রীতি জন্মে না; তাহাও স্থায়ী নহে, নূতনত্ব চলিয়া গেলে কেবল কুৎসিতই পড়িয়া থাকে, অপ্রীতিই থাকে।

শিল্পী এই রচনায় অপ্রীতিজনক ভাবের বিকাশ করিয়াছেন, যাহাকে আর্টে

কুৎসিত বলা চলে। কিন্তু এই স্থলে শিল্পীর অসাধারণ কলা-কৌশল যে ভাবে সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তথাপি কুৎসিত নাই। দেবীর সংহারমূর্ত্তি আছে, কিন্তু তাহাতে তীব্র ভ্রূকুঞ্চন বা রোষকষায়িত লোচন নাই। তামসিক অসুর মূর্ত্তি রহিয়াছে, কিন্তু সে মূর্ত্তি বিকট, যন্ত্রণাক্লিষ্ট নহে, সুগঠনবলিষ্ঠ অজ্ঞানতাব্যঞ্জক। কাব্যে সে সকল বর্ণনা চলে, কারণ তাহা না হইলে ভাবের পরিব্যক্তি ঘটে না। শব্দ দ্বারা চক্ষুর সম্মুখে চিত্র উপস্থিত হয় না, কল্পনাকে তাহা আঁকিয়া লইতে হয়। সুতরাং প্রতিবারই মনশ্চক্ষে নূতন আকার দেখা যায়। কল্পনাও বিরক্ত হয় না, তৃপ্তিলাভ করে। দ্বিতীয়তঃ একটীর অধিক মুখের ভাব বর্ণনা একই শব্দ দ্বারা ঘটে না। সুতরাং কবিতায় কুৎসিতত্ব বহুশব্দে বিভক্ত হয় এবং তৎফলে তাহার কুৎসিতভাব বহু পরিমাণে হ্রাস পায় ও অপ্রীতি জন্মে না।

সেজন্যই স্বাভাবিক আর্টজ্ঞানী আমাদের শিল্পী দেবীমূর্ত্তিকে ঈষৎ বিষণ্ণ ও অল্প রোষ-করুণা-মাখা করিয়াছেন। সে মোহে আমরা অন্যায়ের প্রতি ন্যায়ের বিরাগ দেখি, সে করুণার অজ্ঞানতা দর্শনে জ্ঞানীর করুণা প্রকাশ পায়, সে বিষাদে আমরা সংহারমাত্রেই মানব-দেবহৃদয়ের বেদনা অনুভব করি। ভাবের এ মনোরম বিকাশ যে অজানা শিল্পী করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুকরণে সুরচিত মূর্ত্তিই এত সুন্দর আর্টের, জগতে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ।

দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পরিমাণ সম্বন্ধে অনেকে বলিতে পারেন, শিল্পী ভ্রমক্রমে দেবীমূর্ত্তির চক্ষু দুইটী অতিশয় আয়ত করিয়াছেন, সেরূপ চক্ষু স্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাহাতে কি ভাববিকাশে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে? আমার বোধ হয়, পরন্তু এই আপাতদৃষ্ট দোষ শিল্পীর স্বেচ্ছাকৃত ও কলাকৌশলেরই পরিচায়ক। দেবীমূর্ত্তির অক্ষিযুগল সাধারণ মানবীর ন্যায় হইলে বিশেষত্ব থাকিত না; দেবভাব ব্যাহত হইত। কিন্তু চক্ষু সামান্য অধিক দীর্ঘ করায় মূর্ত্তিদর্শনে একটী অমানুষিকভাব আমাদের মনে জাগরূক হয়, কোনরূপ সৌন্দর্য্যনাশ হয় না, পরন্তু ভাবপ্রস্ফুটন অধিকতর রমণীয়ই হইয়া থাকে। এই কৌশলের উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখাইতে পারি, জনৈক প্রসিদ্ধ গ্রীক শিল্পী দেব ও মানবের বিশেষত্ব সাধনের নিমিত্ত বিখ্যাত এপলো দেবমূর্ত্তির (Apollo Belvedere) পাদ্বয় ও জঙ্ঘাযুগল অমানুষভাবে দীর্ঘ করিয়াছেন; কিন্তু মানব এটিলুণমূর্ত্তির অবয়বাদি অতি সুরচিতই হইয়াছে। আমাদের শিল্পীও অসুরমূর্ত্তি মানবসদৃশই করিয়াছেন, ইহাতে কোনরূপ অমানুষভাব পরিস্ফুট করেন নাই।

শিল্পীর বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ আনা যাইতে পারে, তিনি কবির রাজত্বে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু সে সমালোচনা এ ভাবুক শিল্পীর উপর চলে না; যাঁহারা স্বয়ং শিল্পী না হইলেও চিত্র ও ভাস্কর্যের ভাববিকাশ ক্ষমতার সীমা জানিয়াও, "বাসনার অনলে মানব পতঙ্গের পতন" প্রভৃতি রূপক চিত্রিত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এ ভৎর্সনার যোগ্যপাত্র। তাঁহাদের হস্তেই ভাবময়ী ভাষা ভাবহীন না হউক, স্বল্পভাবপ্রবণ চিত্রে অবনীত হইয়া থাকে।

শ্রীকিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ষ্টেসন মাষ্টার।

(ছোট গল্প)

গৌরহরি বাবু যেদিন তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী "সুভা"কে লইয়া কণ্টাইরোড জংসনে বদলী হইয়া গেলেন, সেদিন সকলেই তাঁহার ভাগ্যের তারিফ করিয়াছিল। কিন্তু লোকে ভাবে এক, হয় আর।

"সুভা" কোন্নগরের রামশঙ্কর ঘোষালের কন্যা। নিখুঁত সুন্দরী বলিতে যাহা বুঝায় "সুভা" তাহাই ছিল। রামশঙ্কর বাবু মেয়েকে মিশনারী মেম রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। ভীষনাগের সন্দেশ এবং নবীন ময়রার রসগোল্লা প্রচুর পরিমাণে কন্যাকুমারীর পূজায় ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু লোকের অবস্থা চিরদিন সমান যায় না। যাহারা ভবিষ্যদ্দর্শী নহেন, তাঁহারা এই অবস্থা বিপর্য্যয়ের পাকে জড়াইয়া শেষ বয়সটা বড়ই কষ্টে কাটান।

ইউরোপ খণ্ডে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত জার্ম্মণ কার্ম্মগুলিই হাত গুটাইল। রামশঙ্করের কিন্তু হাত, পা একসঙ্গেই গুটাইতে হইল। কারণ জার্ম্মণ ফার্ম্মের বড় বাবুকে এ ইংরেজমুলুকের কেহই চাকুরী দিতে সাহসী হইল না। অবশ্য রামশঙ্কর কার্য্যদক্ষতা হিসাবে খুবই উপযুক্ত ছিল। অগত্যা বড় বাবুকে বনিয়াদি চাল ছাড়িতে হইল। এদিকে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—"সদ্যঃসমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্র কন্যার মুখমণ্ডল হিমানীসিক্ত পদ্মবৎ দিন দিন ম্লান দেখিয়া, গৃহিণী অগ্রেই নদীসৈকতশয্যায়

শয়ন করিলেন।" সুভা তখন চতুর্দ্দশ বৎসরের শেষ সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে! অবশ্য মিশনারি মেয়ের ছাত্রী বলিয়াই এতদিন রাখা গিয়াছে। হিন্দুর সামাজিক হিসাবে "সুভাকে" আর কিছুতেই অবিবাহিতা অবস্থায় রাখা চলে না। রামশঙ্করের সম্বলের মধ্যে তখন কেবলমাত্র লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের হাজার দুই টাকা।

মেয়ে মহাসুন্দরী হউক, আর মিশনারি মেমের ছাত্রীই হউক, ছেলের বাজার সেই একই প্রকার; অনন্যোপায় হইয়া রামশঙ্কর শেষটা গৌরহরি বাবুর হস্তেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তৃতীয় পক্ষ বলিয়া গৌরহরি বাবুর বয়স খুব বেশী ছিল না। তৎকালীন সমাজে বত্রিশ ত দূরের কথা ৭২ বৎসর বয়সেও বিবাহ করাটা অন্যায় বলিয়া ধরা হইত না। সুভার সরল হাসিটী গৌরহরির শোকসন্তপ্ত হৃদয়টাকে অনেকটা আশ্বস্ত করিল। তবুও যেন আফিসের অনন্ত কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে, কাহার করুণ স্মৃতি আসিয়া গৌরহরির হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ারে মৃদু আঘাত করিত।

(২)

নৈশ অন্ধকারে ষ্টেসনের গাছ পালাগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের ন্যায় বোধ হইতেছিল। অন্ধকারের কালো আবরণের ভিতর দিয়া দুই একটা নক্ষত্রের আলো যাত্রীদের লোটার উপর পড়িয়াছিল। এমন সময়ে অদূরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইল। তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার—"এ—জমাদার হো গাড়ী ছোড়া।" ষ্টেসন মাষ্টারের বুকের উপর তখনও "সুভার" দেহলতাখানা স্থির হইয়াছিল। পরের চাকুরী করিতে গেলে অনেক সময় ভাল মানুষকেও নির্ম্মম হইতে হয়। গৌরহরি বাবু ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। নিঃশব্দে ধরাচূড়া লইয়া, দরজার শিকলে চাবি বন্ধ করিয়া, একেবারে আফিস ঘরে যাইয়া হাজির হইলেন। পাঠক যেন মনে না করেন, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বলিয়াই ঘরে কুলুপ পড়িল। ঝি বারান্দায় শুইয়াছিল। এরূপ প্রায়ই দু'প্রহর রাত্রে "ষ্টেসন মাষ্টারকে" তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ছাড়িয়া যাইতে হইত। তাই স্বামী, স্ত্রী পরামর্শ করিয়া কুলুপের ব্যবস্থাই করিয়াছিল। গৃহে, অপর একটী দরজা ছিল, প্রয়োজন হইলে "সুভা" সেই দ্বার দিয়াই বাহির হইত। দ্বিপ্রহর রাত্রের নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পুরীর গাড়ীখানা ষ্টেসনে আসিয়া হাজির হইল, ষ্টেসনের সবগুলা আলোই একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে মিনিট দশের মধ্যেই আবার নৈশ অন্ধকারের ভীষণ নিস্তব্ধতা আসিয়া বিরাট ষ্টেসনটার

আপাদ মস্তক ঘেরিয়া ফেলিল। ষ্টেসন মাষ্টারের তখনও হিসাব নিকাশ শেষ হয় নাই। সুভা কিন্তু এদিকে এক স্বপ্ন দেখিয়া ফেলিল—"একটা প্রকাণ্ড দৈত্য, তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, একটী কন্দর্প কান্তি পুরুষ আসিয়া তাহাকে যাইতে বলিল, 'সুভা' স্বামী ছাড়িয়া কিছুতেই যাইবে না।" তখন বুটের মস্ মস্ শব্দে সুভার ঘুম ভাঙ্গিল। গৌরহরি গৃহে প্রবেশ করিয়াই "সুভার" ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া একবার হরি স্মরণ করিয়া লইল। স্বপ্ন জিজ্ঞাসা করিবারও সাহস হইল না। কি জানি—"কেঁচো খুড়তে যদি সাপ বাহির হয়।"

(৩)

লাল সিং জমাদার দেখতে একটা বিরাট জোয়ান পুরুষ। তার বুদ্ধি বিবেচনা বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকটা উন্নত হইয়াছিল। বিশবৎসর কাল লাল সিং জমাদারী পাইয়াছিল। যখন ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম রেল-লাইন হয়, তখনকার প্রথম জমদার ছিল লাল সিং। সেদিন লাল সিংএর কি কাল নিদ্রা আসিয়াছিল। মেলট্রেণ আসিবার পাঁচ মিনিট বাকি আছে, সিগ্‌নাল ঘরে একটী লোক নাই। গৌরহরি বাবু, চাদর কাঁধে, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া যাইয়া সিগনাল নামাইয়া দিলেন, ট্রেণ খানা বাঁচিয়া গেল। সেই দিনই লাল সিংএর জবাব হইল। বৃদ্ধের বুকের উপর দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। লাল সিং বাটীর ভিতর যাইয়া প্রবেশ করিল, "সুভা" তখন তরকারী কুটিতেছিল। "সুভা" জিজ্ঞাসা করিল—"কি জমাদার সাহেব! তোমার চেহারা এরকম কেন? কোন অসুখ করেনি ত?" লাল সিং প্রত্যুত্তরে বলি "মাই হামারা জবাব হো গিয়া।" "সুভা" অনেক কাকুতি মিনতি করিল। গৌরহরি অটল, অচল। লাল সিং চলিয়া গেল। সেই রাত্রেই সুভার জ্বর হইল। সুভা প্রলাপের ঘোরে কত অভিমানের কথা বলিল। গৌরহরির হৃদয়টা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার উপক্রম হইল। গৌরহরি ক্রমাগত রাত্র জাগিয়া প্রাণপণ শুশ্রূষা করিল। কিন্তু "সুভা" যে পথে চলিয়াছে, সেই পথেই চলিয়া গেল। লাল সিং খবর পাইয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। গৌরহরি বাবু তখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, মেলট্রেণ তখন ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া। লাল সিং বরখাস্ত হইলেও, বুড়া জমাদার বলিয়া সকলেই তাহাকে একটু সম্মান করিত, আর জবাবের খবর তখনও বেশী দূর পৌছায় নাই। সে গার্ডের নিকট হইতে সব বুঝিয়া লইয়া এ্যাসিষ্টেণ্ট বাবুকে দিয়া কাজ করাইল। লাল সিংএর অনেক

শুশ্রূষার পর গৌরহরি চৈতন্য পাইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর গৌরহরি লাল সিংকে বহাল করিয়া, নিজে কার্য্যে ইস্তফা দিয়া কাশী চলিয়া গেল।

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

সেখ সাদী।

পারস্য কবি সেখ মশ্‌রুফ্‌ উদ্দিন মসলিহ বিন্‌ আবদুল্লাহ্‌ সাদী (রহঃ) হিজরী ৫৮০সনে (ইং১১৪৪) শিরাজ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ্‌ ফারের রাজা সা'দবিন্‌ জঙ্গীর অধীনে কার্য্য করিতেন। সা'দের নামানুসারে মসলিহ্‌ উদ্দিন 'সাদী' উপাধি গ্রহণ করেন। উক্ত রাজা বালক মসলিহ্‌ উদ্দিনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তজ্জন্য কবির পিতার মৃত্যুর পর কবির ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে কবিকে বোগদাদের নিজমিয়াহ মাদ্রাসায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন, তথায় আবুল ফরজ বিন্‌ জুজীর অধীনে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। উত্তমরূপে দর্শন ও ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া সুফী ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তিনি বিখ্যাত সাধু পুরুষ সেখ শহিরুদ্দিন ওমর সুহরওয়ার্দীর শিষ্য হইলেন। পাঠ সমাপন করিয়া তিনি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন্‌। কথিত আছে তিনি ভারতেও আসিয়াছিলেন, তাঁহার বোস্তা নামক পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন তিনি ভারতে আসিতে পারেন নাই। সেখ সাদী ১৪বার হজ করিয়াছিলেন, কথিত আছে তিনি অনেক দিন জেরুজালেমে জল বহনের কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং মরিয়াতে ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রিগণকে জল দিতেন। কবিবর গোলানা অর্থাৎ শিরাজের "বুলবুল্‌" জামী:(রহঃ) তাঁহাকে The nightingale of the groves of shiraz এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মহাত্মা সেখ সাদী গুলিস্তাঁ, বোস্তা ও পন্দনামা ইত্যাদি গ্রন্থ লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় উপদেশ-মালা আজিও পৃথিবীর নানা স্থানে বিশেষতঃ। ভারতবর্ষ, পারস্য ও আফ্‌গানিস্থান প্রভৃতি দেশে এখনও আদরের সহিত পঠিত হইতেছে। জীবনের শেষ ভাগ কবি জন্মভূমি শিরাজ নগরেই অতিবাহিত করেন। এই শিরাজ নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোরম। তজ্জন্য ইহা পারস্য কবিদিগের অতি প্রিয়স্থান। হিজরি ৬৯১ অব্দে (ইং১২৯২) সাদী মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আলি বখ্‌তে ওয়ায়।

আমার আত্মীয় তুমি।

(১)

গভীর নিশায় নীলাকাশ মাঝে
হাসিতেছে শশধর ;
কৌমুদী মণ্ডিত যুগ্মন্থিত শাখে,
উঠিতেছে ফুল্লস্বর ;
বহে মৃদু মৃদু মলয় পবন,
নব-কিশলয় দোলে ;
সৌরভ ছুটায়ে ফুটিয়াছে ফুল,
শ্যাম পত্রপুঞ্জ কোলে।
হে শিব সুন্দর সুমঙ্গল-করে,
সাজায়েছ ব্যোম ভূমি ;
অনন্ত জগত তোমার আত্মীয়
আমার আত্মীয় তুমি।

(২)

চতুর্দ্দিকে দেখি তোমারি মহিমা,
তোমারি করুণা কত,
তব প্রেমনীরে স্নেহোচ্ছ্বাসে বিশ্ব
ভাসিতেছে অবিরত !
তুমি শ্রেষ্ঠতম, আমি ক্ষুদ্র হেয়,
মধ্যে ব্যবধান মায়া ;
ক্ষুদ্রতম জ্ঞানে কি বুঝিব প্রভু
তোমার যে কত দয়া !
সাধু-ভক্ত-আদি শ্রেষ্ঠ নর হ'তে
নরকের ক্ষুদ্র কৃমি,
অনন্ত জগত তোমার আত্মীয়
আমার আত্মীয় তুমি।

(৩)

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র, সখা,
কে যা'বে আমার সাথে ;
যবে এসংসার করি পরিহার
পড়িব কালের হাতে।
ধন-রত্ন-আদি, রহিবে পড়িয়া,
যা'ব নিঃসম্বল একা ;
সেদিনে সেপথে হে সত্য সুন্দর
পাইবেন প্রাণে দেখা।
তোমারি উদ্দেশে এরূপে এ ভবে
যুগ যুগান্তর ভ্রমি ;
অনন্ত জগত তোমার আত্মীয়
আমার আত্মীয় তুমি।

(৪)

হৃদয়ের মাঝে জাগিছে বাসনা,
বিজড়িত কত আশা ;
কি বলিব বল হে চিরবাঞ্ছিত
প্রকাশের নাহি ভাষা।
অন্তরের কথা ভাসিতেছ সব,
কি বলিব আর তবে ;
করুণা করিয়া হৃদয় মন্দিরে
স্বরূপ দেখাতে হ'বে।
দিবস রজনী এ মানস ভৃঙ্গ
রবে পাদপদ্ম চুমি ;
অনন্ত জগত তোমার আত্মীয়
আমার আত্মীয় তুমি।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"স্নেহের জয়।"

চারুবালা বলিলেন—"বাপের বাড়ীতেই পয়সো হ'তে চল্ল তা'হলে কি বল ?"

হরেন বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ, তা না গিয়ে আর উপায় কি বল ?—তুমি ত আর ওদের ঘেঁস দিলে না।"

হ্যাঁ আবার ওদের এ বাড়ীতে আন্‌বো—মরে গেলে নয়, আর তা ছাড়া আমি এখন ছ'মাস পরে কোথায় যাব'—কে আমার সব দেখবে শুন্‌বে তার ঠিক নেই। আর তুমি ত সব খবরই রাখ'—মেজা বৌ কি বলেচে শুনেচ ?"

"কৈ আর শুন্‌লুম।"

"বলেচে—দিদি রাজী হয় নি ভালই হ'য়েচে, কি জানি যদি ছেলেকে খুন খাইয়ে কিম্বা গলা টিপে দিয়ে মেরেই ফেল্‌ত, তা হ'লে আমি আর কি কর্‌তে পার্‌তুম।"

"এঁ্যা, কে বল্‌লে,—এ কথাও ব'লেচে ?"

"কেন ক্ষ্যান্ত আমাকে এসে সব ব'লে দিলে। হয় না হয় ওকে জিজ্ঞেস্ কর না ?"

বাড়ীর ঝি ক্ষ্যান্ত নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। এখন চারুবালার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিল—"হ্যাঁ বাবু, এত বড় কথাটা বল্‌তে ছোট মায়ের মুখে আট্‌কায়নি। ওদের ঝিয়ের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ কিনা, সেই আমাকে সব কথা ব'লে দিয়েচে।"

হরেন বাবু ঝিয়ের মুখপানে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে "হুঁ" বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * * *

ঘটনাটি খুলিয়া বলি। বিবাহের পর হইতে মেজ-বৌ অমলা যে কি কষ্টে বড়-বৌ চারুবালার সহিত সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল একান্নবর্ত্তী হইয়া ঘর করিয়াছিল, তাহা সেই জানে আর জানেন তিনি যিনি বিশ্বের সকল বিষয়েরই সংবাদ রাখেন,—সামান্য ত্রুটী হইলে ত কথাই ছিল না, এমন কি বিনাদোষেও

তাহাকে এমন সব লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত, যাহাতে তাহার হৃদয় দিবানিশি দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইতে থাকিত ; তত্রাচ মুখ ফুটিয়া সে স্বামীকে সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। কারণ আর অন্য কিছু নয়, কেবল কি জানি কেমন একটা সঙ্কোচ—স্বামিকে সে কেমন করিয়া বলিবে—ওগো দিদির বিষমাখান' কথাগুলো আর যে আমি সইতে পারিনে গো', তুমি আমায় এখান থেকে—ছিঃ ছিঃ স্বামী তাহা হইলে মনে করিবেন কি ? বড়ঠাকুর (হরেন বাবু) এদিকে যেমন মানুষই হউন না কেন, স্বামি তাঁহাকে দেবতার মত মানিয়া চলেন—আর তিনিও ত ভাইকে কম ভাল বাসেন না। সুতরাং এমন সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া কোন মুখে সে স্বামীর সাহায্য প্রার্থনা করিব ? তিনি হয় ত বুঝিয়াও বুঝেন না যে, গঞ্জনার জ্বালায় কতটা দুঃসহ হওয়ায় তবে সে এমন কথাও মুখে আনিতেছে। কেননা, স্বামী যে এ বিষয় আদতেই জানিতেন না, এমনত নহে—তাঁহার অসাক্ষাতে তাহার যে সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হইত সে না হয়, শুনিয়া স্বামী মনে ব্যথা পাইবে জানিয়া—সেইগুলিই স্বামীকে গোপন করিত, কিন্তু দিদি যখন তাঁহার সাক্ষাতেই তাহাকে কর্কশভাবে কিছু বলিয়া ফেলিতেন, তখন ত তিনি শুনিতে পাইতেন, আর তাহার ফলে ত কেবল তাহাকেই গোপনে উপদেশ দিতেন,—বৌদি, ঐ রকম তুমি ওর কথায় রাগ অভিমান করবে না বুঝলে ?"

যাহা হউক, চিরদিন কিছু মানুষের সমান যায় না,—অমলারই যাইবে কেন ? তাই একদিন চারুবালা বাড়ী ছিল না—ছয়মাসের পোকা লইয়া কি একটা সামান্য কার্য্যোপলক্ষে দুই দিনের জন্য বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে কোন্ এক হতভাগিনী বৃদ্ধার করুণ কাহিনী শুনিয়া সহানুভূতিতে অমলার হৃদয় গলিয়া যাওয়ায় সে নাকি নিজের হাত-খরচের পয়সা হইতে বার আনা পয়সা দিয়াছিল। ক্ষান্তর নিকট এই সংবাদ পাইয়া, ইহারই অপরাধে দিদি শেষ মাসের দোহাই দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। একটা নিশ্চিত ভাবী গঞ্জনার আশঙ্কা পূর্ব্ব হইতেই অমলাকে দগ্ধ করিতেছিল বলিয়াই বোধ করি সে "অল্পে কাতরের" পর "বিস্তবে পাথর" হইয়া গিয়াছিল। তথাপি সাধ্যমত নরম সুরে বলিল—"তা' দু'দিন তাদের হাঁড়ি চড়েনি [illegible] বারগণ্ডা পয়সা দিয়েচি, তাতে আর এমন কি [illegible] জন্যে——"

কথাটা শেষ না হইতেই বড় বৌ গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"তোমার [illegible]

কথা মেজ-বৌ,—আজ এই সন্দেহ সামান্য কথাটীও কেন সহ্য করিতে পারি, না। অল্প উষ্ণভাবে বলিল,—"এতে আর বড় মানুষী কি দেখলে দিদি—দু'দিন খেতে পাইনি শুনেই ত দিয়েচি—এমন কি আর দিতে নেই?"

বড়-বৌ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দূর হ আমার সমুখ থেকে, বেরো—আ-মর, আবার মুখের ওপর চোপা করে দেখ না; এই বলিয়া একটী কথা মনে পড়ায় ছিটকাইয়া উঠিলেন—"জানি লো জানি, তুই মস্তদাতার মাগ—তোকে আবার 'দিতে' নেই, এমন কথা বলে কার সাধ্যি—কিন্তু আমরা ভেন্ন হ'লে কাল যাদের হাঁড়ি চ'ড়বে না, তা'দের আবার এত "দান" করার সাধ কেন শুনি?"

এই কথা শুনিয়া অমলার চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। বলিল—"দেখ দিদি ও কথাগুলো একটু আস্তে আস্তে বল। উনি যদি শুনতে পান ত কি মনে করবেন বল দেখি? সত্যিই কি উনি, আমাদের দুজনকার পেট চলবার মতনও রোজগার করেন না?

জানি না অমলার পক্ষে এ কথা মুখে আনা উচিত হইল কিনা, তবে কথাটী যে নিতান্ত সত্য তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। হরেন বাবু ছোট আদালতে মোক্তারী করিয়া, বিশেষতঃ আজ কালকার দিনে, যত টাকাই উপার্জ্জন করুন না কেন, তাহার স্বামী সুরেন বাবুও নিজ চেষ্টায় এল্, এম্, এস্, পাশ করিয়া চীৎপুর রোড়ে ডিস্‌পেন্‌সারী খুলিয়া, আজ কাল দাদার অপেক্ষা বেশী উপার্জ্জন না করুন, কমও করেন না। অথচ, যখন যাহা আনেন, তাহাইত দাদার হাতে দেন—নিতান্ত আবশ্যক হইলে দাদার নিকট যৎকিঞ্চিৎ চাহিয়া লন মাত্র।

যাহা হউক, কথাটী বোধ করি শুভক্ষণেই অমলার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। সেদিন রবিবার ছিল। বাড়ীর কর্ত্তারা বাহির বাড়ীতে ছিলেন। বড়-বৌয়ের গলা ক্রমেই চড়িতেছে দেখিয়া তাঁহারা ভিতরে আসিলেন। তখন চারুবালা কথাটী তাঁহাদের সম্মুখে যে ভাবে সাজাইয়া দাঁড় করাইলেন তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ—

—অমলার ধারণা, তাহার স্বামীর রোজগারেই বড় বৌয়ের সংসার চলিয়া যায়, কেন না, তাহার ত ছেলে পিলে নাই, তাহাদের আবার খরচ কি? বড়-বৌয়ের ছেলে আছে, যত খরচ তাহাদেরই হয়—তা'ছাড়া বড় বাবু উপায়ও করেন কম। যাহা হউক, এই সামান্য উচিত কথা বলার জন্য যে মেজ-বৌ

অমন কৌশলে তাঁহার "ছেলে কাটিতে" পারে, এমন লোকের সহিত বড়-বৌ আর একান্নে থাকিবেন না, ফলে যদি দেবরের অর্থ বাহাযা অভাবে, বড়-বৌকে স্বামী পুত্র লইয়া না খাইতে পাইয়া মরিতেও হয় তাহাও স্বীকার তথাপি তিনি আর এই "কালসাপিনী'কে লইয়া ঘর ত করিবেনই না, তা'হাড়া এক ভিটা-তেও আর থাকা চলিবে না। স্বামী যদি বাধা দেন, তবে তিনি ছেলে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবেন।

ফলে হইলও তাহাই। সুরেন বাবুর সকল অনুরোধই ব্যর্থ হইল। বৌদি এবার আর কিছুতেই মেজ-বৌকে ক্ষমা করিলেন না। অগত্যা সুরেন বাবু ভিন্ন হইতেই বাধ্য হইলেন।

এখন দশ মাস কাটিয়া গিয়াছে। সুরেন বাবু ভিন্ন হইয়াই বাস করিতে-ছেন। হ'রেন বাবু পৈতৃক ভিটাতেই আছেন। কনিষ্ঠ যোগেন্দ্র বাবুর সংসারেই আছে। সে ইস্কুলে পড়ে। এখন তাহার বয়স মাত্র দশ বৎসর।

অমলা গর্ভবতী হইয়াছে। কিছু দিন হইল তাহার সাধ" হইয়া গিয়াছে। সাধের সময় বড়-বৌকে নিমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু অসুখের দোহাই দিয়া—তিনি এবাড়ী আসেন নাই—তা'ছাড়া তিনিও তখন তিন মাস পোয়াতী, কাজেই তাঁহাকে আনিবার জন্য বিশেষ পীড়াপিড়ী করা হয় নাই। এখন বলা বাহুল্য যে, ইতঃপূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীতে যেসকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা এই সাধ সম্বন্ধে।

(২)

অমলার ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ চারুবালা সুরেন বাবুর বাসা বাড়ীতে আসিলেন। মেজ-বৌয়ের কোলে এই ফুট নাদুস্ নুদুস্ ছেলেটীকে দেখিয়াই ঈর্ষায় তাঁহার বুক চড়্ চড়্ করিয়া উঠিল।

[illegible] পায়ে আল্‌তা দিতে দিতে খোকাকে তাহার দিদিমার কোলে দিয়া দিদি পায়ে পড় হইয়া প্রণাম [illegible] "থাক্-থাক্" বলিয়া তাঁহার চিবুকে হাত [illegible] লেন। তৎপর তিনি অমলার মাতাকে [illegible] "এস' মা এস—স্বামী পুত্র নিয়ে [illegible] তারপর বলিলেন—"তোমার বুঝি এই দ[illegible] করিলেন। তারপর খোকাকে কোলে [illegible] বলিলেন—"বেশ ছেলে"—

অমলার মা বলিলেন—"দেখ মা, তোমরা সব আশীর্ব্বাদ কর,—বাছা আমার মায়ের কোল জোড়া হয়ে বেঁচে থাক।" এই কথায় চারুবালা মনে মনে কি বলিলেন জানি না।' মুখে কিন্তু খন্ খন্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"সে কি কথা মা, থাক্‌বে বৈ কি।"

তাঁহার কথার ধরণটা শুনিয়া অমলার মা ক্যাল্ ক্যাল্ দৃষ্টিতে একবার তাঁহার মুখ পানে চাহিতেই চারুবালা অপ্রতিভ হইলেন। ভাবিলেন, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলেন ;—কোন কথা না বলিলেই ভাল হইত।

* * * * *

বারো দিনের দিন ক্ষ্যান্ত আঁতুড় ঘরে ঢুকিয়া, ধবধবে খোকাটীকে কোলে করিয়া চারুবালার মুখপানে চাহিয়া বলিল—"এ সোণার চাঁদের কাছে কি আর তার ছেলে লাগে মা ?" এমন সময় চারুবালার পিসী দরজার সাম্‌নে আসিয়া বলিলেন—"কি বল্‌চ গা ?" ঝি বলিল—"না বলিনি কিছু, বল্‌চি বড়মীর নাম চাঁদের কণা; এটীকে সোণার চাঁদ ব'লে ডাকা হ'বে।"

"বলিস্ মা, তোদের যার যা ইচ্ছে সে তাই বলে ডাকিস্', হ্যাঁ মেজ-বৌয়ের ছেলের কি নাম রাখা হ'য়েচে ?"

ঝি মুখ ভঙ্গি করিয়া বলিল—"কে জানে, আমরা ত সে খবর রাখবার জন্যে মরচি ?

এই ঝিকে বা নিজের ভাইঝী চারুকে জানিতে পিসীর কিছু মাত্র বাকি ছিল না। এখন ঝিয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ওমা, সে কি কথা গো ! মেজ-বৌ ছেলে মানুষ, নয় ত দু'টো শক্ত কথা ব'লেই ছিল ; তার জন্যেই ত ভিন্ন হ'য়েই রয়েচে, তবু তোদের তার ওপর এত রাগ্ কেন গো, ছিঃ ওতে যে অধর্ম্ম হয়, ওত তবু মা—এই যে আমি চির কালটা সতীনের সঙ্গে—

চারুর মা নিকটেই ছিলেন। ঠাকুর ঝির কথা তাঁহার গায়ে ছড়াইল। হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি ত শুধু আমার মেয়েরই দোষ দেখ, সে বেটীর মুখ ত জান না ?"

উচিত কথা বলার জন্য এই পিসীর প্রতি কাহারও প্রীতি ছিল না। তিনি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোন মতেই তাহা পারেন নাই। এখন বৌয়ের কথার উত্তরে তিনি বলিলেন "আর তোমার মেয়ের মুখটাই বড় কম কি না। বাগ্‌গে আমার এ সব কথায় দরকার কি ? আর আমি এখানে বছরে ক'দিনই বা থাকি !"

ফস্ করিয়া চারুর নিন্দা করিয়া ফেলিবার পর এতগুলি কথা বলিয়াও তিনি নিস্তার পাইলেন না। চারুবালা পঞ্চমে সুর চড়াইয়া তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ সময় ক্ষান্তর মুখটীও বন্ধ রহিল না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া পিসী যখন কালই এ বাড়ী ছাড়িয়া নিজের বাড়ী যাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন চারুর মা'রও ক্ষান্তর গলা ক্রমে নামিয়া আসিতে লাগিল।

* * * * *

তিন মাস পূর্ব্বে দশ মাসের গর্ভ লইয়া চারুবালা যে দিন বাপের বাড়ী যাইবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হন, সেই বা কি দিন; তার পর দেড় মাসের কোলজোড়া ছেলেটীকে বাপের বাড়ীতেই মায়ের হাতে দিয়া আসিয়া আজ যখন এ বাড়ী ঢুকিলেন,—এই বা কি দিন!

আজ বাড়ীতে পা দিয়াই তাঁহার চোখে সমস্তই শ্মশানের মত বোধ হইতে লাগিল। কোথায় বাড়ী আসিয়াই কোলের ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইবেন, তাহা না হইয়া কাহ কিসে যে কোলশূন্য! উঃ—দেড় মাসের ছেলে মরিলেও মায়ের প্রাণে যে এত আঘাত লাগে, আগে ত তিনি ইহা জানিতেন না—বুঝিতেনও না! হায়! আজ পর্য্যন্ত ত এমন কোন ঔষধের সৃষ্টি হয় নাই, যাহাতে এ জ্বালার কিছুমাত্রও উপশম করিতে পারে। আচ্ছা, ছেলে মরিলে কি সকল মায়ের প্রাণই এম্নি করে, না কি কেবল তাঁহারই করিতেছে।

(৩)

আজ সুবেন বাবু এ বাড়ী আসিলে চারুবালা তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া বলিলেন—"কি ভাই, সেই কালের সময় ছেলেটাকে একবার দেখেছিলুম, তারপর এ বাড়ী এসে পর্য্যন্ত ত আর ভুগ্‌চি—এর ভেতর একদিন সেই মেজ বৌ ছেলে নিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু তখন আমি নিজের জ্বালায় অস্থির ও ছেলে নেব কি? তার পর তুমিও ত আর একদিনও তাকে এ বাড়ী এনে দেখালে না; আজ একবার বেণ্টিতে বেড়া ও গিয়ে নিয়ে এস না। ছোঁড়ার বাসাত আর এখন থেকে দুপাঁচ কোশ নয়।"

"তার জন্যে আর কি—"আনচি" এই বলিয়া সুবেন বাবু চলিয়া গেলেন; তার পর অল্পক্ষণ পরেই খোকাকে আনিয়া বৌদির কোলে বসাইয়া দিয়া বার বাড়ীতে যাইয়া দাদার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

দেবরের কোলে ধবধবে ছেলে দেখিয়া প্রথমটা ঈর্ষ্যায় চারুবালার বুক চড় চড় করিয়া উঠিল।—বিধাতার কি অন্যায় বিচার! তাঁহার ছেলেটী যমিল, কিন্তু অমলার ছেলেটী ত দিন দিন বেশ বড় হইতেছে। যাক্, ঐ বিষয় তিনি হিংসা করিয়া আর কি করিতে পারেন। ঈশ্বরই যে অমলার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে এ অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়া মনে করিলেন যে, পরের ছেলেকে কোলে লইয়া ফল কি?—তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু তাহা হইল না। এই সময় সুরেন বাবু খোকাকে তাঁহার কোলের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"এই নাও বৌদি" কাজেই তিনি আর কিছু ভাবিবারও অবসর পাইলেন না। অবশেষে তিনি মনে মনে বলিলেন—ছেলে নারায়ণ, ছেলে-সবই সমান—

খোকাকে কোলে লইয়া দালানে বসিয়া খোকার মুখপানে চাহিতেই, সে তাঁহার চোখের উপর আপনার ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী রাখিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তুই কাদের ছেলে রে—কি কত্তে এসিচিস্ আমাদের বাড়ী" এখন খোকা আহ্লাদে খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। আহা! কি হৃদয়স্পর্শী এ খোকার মুখের হাসি! এ হাসিতে পাষাণও গলিয়া যায়, তিনিত ছেলের মা!

চারুবালার ছেলে দু'বছরের 'চাঁদের কণা' অদূরে আপন মনে খেলা করিতেছিল। এখন সে খোকার হাসি শুনিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে এদিকে আসিয়া মা'র মুখপানে চাহিয়া বলিল—"এতে মা—বাই?" মা বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা ভাই।" তার পর সে তাহার গাল দু'টী টিপিয়া ধরিয়া মুখে মুখ দিয়া—"বাই—বাই" বলিয়া চুমু খাইয়া যেমন আদর করিতে গেল, অমনি খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে শশব্যস্তে তাহার গাল ছাড়িয়া দিয়া মার মুখপানে চাহিয়া বলিল—"মা মা, এ কান্‌তে।" মা কি ভাবিতেছিলেন,—বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা কাঁদ্‌চে।" এই বলিয়া তিনি খোকার মুখে মাই দিলেন। খোকার কান্না থামিল। সে চুক্ চুক্ করিয়া মাই খাইতে লাগিল। এই সময় কি জানি কেন, তাঁহার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্রুর ঈর্ষ্যাগ্নির উত্তাপে উত্তাপিত হৃদয়; মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধকর অমৃত প্রলেপে দ্রবীভূত হইয়া গেল।

সুরেন বাবু খোকাকে লইতে আসিলেন। প্রথমটা তাঁহাকে সুমুখে

দেখিয়াই চারুবালা লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"বেশ ছেলে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় বেঁচে থাক, পরে তোমাদের সুখী কর্‌তে পার্‌বে।" টপ্ করিয়া কথাটী বলিয়া ফেলিয়া তিনি মনে মনে লজ্জিত হইলেন। তাঁহার মুখে নিজেদের মঙ্গল কামনা শুনিয়া সুরেন বাবু না জানি মনে মনে কতই ব্যঙ্গ করিতেছেন। ছিঃ—এ কথা না বলিলেই ভাল হইত।

বৌদি'র কোল হইতে খোকাকে লইয়া সুরেন বাবু চলিয়া গেলেন।

(৪)

আজ বেলা দশটার সময় সুরেন বাবু আপনার কাজে বাহির হইয়া যাইবার পর যোগেন্দ্র আহারান্তে ইস্কুল যাইবার জন্য জামা কাপড় পরিবর্ত্তন করিতেছে, এমন সময় চারুবালা সেই ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার মুখপানে একটীবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "ওরে, আজ তোর ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই—আজ বাড়ীতে থাক্।"

হঠাৎ ইস্কুল যাইতে বারণ করায় সে বলিল—"কেন?"

অপর দিবসে সে যদি এই ভাবে 'কেন' জিজ্ঞাসা করিত তাহা হইলে বৌদি' বোধ হয় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিতেন—"তোর সে খবরে কাজ কি? কেন! আমার ইচ্ছে—" আজ কিন্তু তাহার এই প্রশ্নে অল্প লজ্জিত অথচ উদাস ভাবে নম্রকণ্ঠে বলিলেন—"একটু দরকার আছে—থাকনা আজ বাড়ীতে!"

যোগেন আর কিছু বলিল না। তাহার পক্ষে আজ বৌদি'র চোখ মুখের ভাব ও তাঁহার কথাটী যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল।

বৌদি' ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া খানিকক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢুকিয়া কি যেন ভাবিয়া তাহার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা যা, তুই ইস্কুলে যা—"

"সে কি বৌদি'! এখন ইস্কুলে যাব কি, এগারটা যে বাজে।"

"যাবিনে তা' হলে?"

"আর কি যাওয়া যায় এত বেলায় ইস্কুলে গেলে মাষ্টার বল্‌বে কি?"

"তবে থাক।" এই বলিয়া তিনি আবার অকারণ বাহিরে গেলেন।

মিনিট পাঁচ ছয় পরে বৌদি বলিলেন—"হ্যাঁরে চলে গেলি—আজকাল বুঝি তুই ওদের বাড়ী যাস্‌নে? এর মধ্যে কবে গেছ্‌লি?"

সর্ব্বনাশ! হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? তবে কি সত্য সত্যই বৌদি জানিতে

পারিয়াছেন, সেদিন সে ওবাড়ী গিয়াছিল? ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। সে শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল "না বৌদি' সেই যেদিন থেকে তুমি বলে দিয়েচ," এবার যেদিন শুন্‌ব' তুই ওবাড়ী গেচিস্, সেই দিনই তোকে বাড়ী থেকে বার কর্‌বো,—আমি সেই দিন থেকে আর ওবাড়ীর ধার দিয়েও যাইনে।"

"এঁ্যা যাস্‌নে আবার!"

"না বৌদি' তোমার দিব্যি বল্‌ছি, আমি আর যাইনে।"

তাহার এই কথায় উচ্চহাস্য করিয়া চারুবালা বলিলেন—"আহা!—আমি ম'লে ওঁয়ার ত বড্ডই ক্ষেতি, তাই আমার দিব্যি ক'রে বল্‌চেন। বরং আমি ম'লেই তোর ত ভাল হয়।

যাক্ এখন, ভাল চাস্ ত সত্যি কথা বল্, কিছু বল্‌ব না—এর মধ্যে কবে গিছলি।"

যোগেনের বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। কাঁদ' কাঁদ" সুরে বলিল—"না বৌদি' সত্যি বল্‌চি, আমি আর যাইনে।"

চারুবালা চোখ মুখ লাল করিয়া বলিলেন—"আবার মিথ্যা কথা! এখনো বল্‌চি বল্, কবে গিছলি।"

সে ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করিল" আর কক্ষণ যাব না বৌদি—গেল সোমবারে ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম মেজ বৌদি' আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে ডাক্‌লে ব'লে, একটীবার ওদের বাড়ী ঢুকেছিলুম—কিছু ব'ল না বৌদি; আমি আর কক্ষণ—"

"গিয়ে কি কর্‌লি?"

সন্দেশ খাওয়ার কথাটা বাদ দিয়া সে বলিল—"বৌদি আমাকে জিজ্ঞাস্ করলে, তুমি কেমন আছ, খোকা কেমন আছে, বড় দা ভাল আছেন কি না, এই সব—"

"আর কিছু বল্‌লে না?"

"না" বলিয়া যোগেন চুপ করিল।

বৌদি' ধমক দিয়া বলিলেন "আবার লুকোয়, ভাল চাস্ ত সব সত্যি ক'য়ে বল্—আমার নিন্দে করছিল নয়?"

বৌদি'র কথা শুনিয়া তাহার ইচ্ছা হইল যে বৌদি'র মুখের উপর বলিয়া দেয়: "হ্যাঁ মেজ-বৌদি' তোমার মতন কি না?" কিন্তু অতটা সাহসে কুলাইল না।

সে বলিল—"আচ্ছা—বল্‌ছি—তারপর বল্‌লে"—এই বলিয়া সে তাঁহার কানের কাছে আপনার মুখ লইয়া গিয়া চুপ চুপ বলিল—"দিদি আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস্ টিজ্ঞেস্ করে রে ?"

চারুবালার মন আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। সাগ্রহে বলিলেন—"সত্যি এ কথা ও বল্‌চে ?" তারপর নিজেই ভাবিয়া দেখিলেন, সে না বলিলেই বা ও কেমন করিয়া এ কথাটা খাটাইয়া বলিবে। সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ, তুই আমায় একথা একদিনও ত বলিস্ নি।"

"হ্যাঁ, শেষ কালে আচ্ছা ক'রে মার লাগাও।"

চারুবালা মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে বাহিরে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে আবার ঘরে আসিয়া বলিলেন—"আজ এখন একবার গিয়ে খোকাকে নিয়ে আস্‌তে পারিস্ ?"

"না তুমি বক্‌বে।"

"না রে না বোক্‌ব না—তুই যা, নিয়ে আয়।"

সে বাহির হইতেছে ; এমন সময় তিনি বলিলেন "ছাতাটা নিয়ে যা না রে।"

তখন সে ছাতাটী লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া ক্রমে যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল তখন পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া বৌদি' তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে শোন্—শোন্—"

সে আসিয়া বলিল "কি ?"

"আয় বাড়ী আয়। থাক্‌গে গিয়ে আর কাজ নেই।"

বালকের মনটা খারাপ হইয়া গেল। "কেন, না আমি যাই।"

"না-রে-না, থাক্‌গে—তুই আমা খোক্।"

সে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "তবে পয়সা কিন্তু ফিরিয়ে দোবো না"

এই বলিয়া সে ক্ষুণ্ণমনে জামাটী খুলিতে লাগিল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া চারুবালার মনে ব্যথা লাগিল। বলিলেন "আচ্ছা তুই যা'—কিন্তু মেজবৌ কিছু মনে কর্‌বে না ত রে ?"

"না গো না,—মনে আবার কর্‌বে কি ?"

"যাই হোক—তুই কিন্তু আমি পাঠিয়েছি, বলিস্‌নে, তুই বল্‌বি, তুই নিজে গেচিস্।"

"সে আর আমায় বল্‌তে হ'বে না" এই বলিয়া সে মুহূর্ত্ত মধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

(৫)

খোকাকে কোলে করিয়া যোগেন বাড়ী ঢুকিতেই চারুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন "কিগো, কি বল্‌লে ?"

যোগেন বলিল—"বল্লে—"কি মনে করে এলে ?"

"তুই কি বল্‌লি ?"

"তুমি যা বলেছিলে, তাই বল্‌লুম।"

"এ্যা আমি পাঠিয়েচি বলিচিস ?"

"না তা বলিনি বটে ; কিন্তু কায়দা ক'রে বলিচি।"

"কি বলিচিস্ কায়দা করে ?"

"বলিচি খোকাকে একবার দাও, বড় বৌদি'র কাছে নিয়ে যাই।"

"শুনে কি বল্‌লে ?"

"বল্‌লে-না, 'তোমায় তা হলে দিদি মারবে'। আমি বললুম—না গো মারবে না, তুমি দাও না ; তখন খোকাকে দুধ খাইয়ে আমার কোলে দিলে, আমি নিয়ে চলে এলুম।"

তাহার বলার ভঙ্গীতে বোধ হইল যে, শেষটা যেন কিছু বাদ দিল। চারুবালা কৃত্রিম রাগান্বিত হইয়া বলিলেন দেখ্, তুই বড় মিথ্যেবাদী হ'য়েচিস্—সত্যি ক'রে বল্, একে নিয়ে আস্‌বার আগে আরো কি হলো ?"

এই সময় খোকা তাহার কোল হইতে জেঠাইমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া—"ওঃ ওঃ" করিয়া জানাইল, আমাকে কোলে কর।

চারুবালা দুই হাত প্রসারণ করিয়া "এস বাবা এস" বলিয়া, কোলে করিয়া তাহার মুখে মুখ দিয়া চুম্বন করিলেন।

বৌদির শেষ কথা শুনিবার পর যোগেনের আর কোন্ কিছু গোপন করিতে সাহস হইল না। বলিল—"তবে বলি, আমার কিন্তু কোন দোষ নেই, হ্যাঁ।"

তিনি চুমু খাওয়া বন্ধ না করিয়াই বলিলেন "না, তুই বল্।"

যোগেন মাথা নাড়িয়া বলিল "মেজ বৌদি" একে ইচ্ছে করে পাঠিয়েচে কি ; আমি একে জোর করে নিয়ে পালিয়ে এসেচি ত—

"বলিস কি, পাঠাতে চায়নি—তুই আমার নাম করেছিলি তবুও পাঠাতে চায়নি ?"

"হ্যাঁ আগেত পাঠাচ্ছিল, তুমি ইচ্ছে ক'রে এক দেখতে চেয়েছ শুনেই ত পাঠাতে চাইলে না। বল্লে—"

এই "বল্লে" বলিয়াই সে চুপ করিল। চারুবালা "তুই কোন বল্‌লি, আমি দেখ্‌তে চেয়েচি' এ কথা না বলিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল্লে?"

"বল্লে ও রকম দিদির কাছ ছেলে পাঠিয়ে লাভ কি? আমি সেদিন পাঠিয়েছিলুম তা কেবল ওর কথায়, আমি পাঠাবোনা ছেলে।"

রাগে, অভিমানে, চারুর চোখে সমস্ত অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, কোল হইতে খোকাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলেন। রাগ ভরে বলিলেন "তারপর কি হ'ল, শীগগির বল।"

"আমি যখন গেলুম, ও তখন খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল কি না, তাই দুধ খাওয়ান শেষ হ'লে, একে বাইরে শুইয়ে রেখে, যেমন ঘরে কি করতে গেল,— আমিও অমনি একে কোলে ক'রে 'আমি একে নিয়ে চল্লুম' ব'লে মার টেনে ছুট।"

"তুই যখন পালিয়ে এলি, ও তখন তোর পেছু পেছু এল না?"

সে ঘাড়টী নোয়াইয়া বলিল, হাঁ এসেছিল।"

"বল্ না, আমি জিজ্ঞেস্ করব, তবে বুঝি তুই সব বল্‌বি?"

"বল্‌চি ত একটা একটা ক'রে বল্‌ব ত! অত তাড়াতাড়ি করছ কেন?"

তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "বল্।"

"আমি যখন খোকাকে কোলে ক'রে দৌড়িচি, মেজ-বৌদি' ও আমার পেছু পেছু এসে বল্‌লে—'নিয়ে যাচ্ছ যাও, কিন্তু দিদিকে বল্‌বে যে আমি বলচি শুধু খোকাকেই আদর কর্‌লে চল্‌বে না, খোকার—মা বুঝি কেউ নয়—ওর মা যদি এদিকে কষ্ট সয়ে সয়ে যমের বাড়ী যায়, তা হ'লে ওর আদর থাকবে কোথা? ব'লো ভুলোনা যেন।"

বালকের মুখে, মেজ-বৌয়ের কায়দার কথা শুনিয়া, তিনি আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া কোন মতেই চোখের জল আর মৃদু হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। বলিলেন "বলিস্ তোমার দিদি বলেচে,—মরেই যা খোকার মা— তা ব'লে কি খোকা—মা অভাবে কষ্ট পাবে নাকি? মরেই একবার দেখুক না।"

এই সময় ছাতে একটী বুড়ি কাটনা আসিয়া পড়ায়, যোগেন দৌড়িয়া ঘুড়ি ধরিতে গেল।

বেলা ৩ টার সময় ঝি কাজ করিতে আসিয়া, খোকাকে তাঁহার কোলে

দেখিয়া, "আয় আয়" বলিয়া তাহাকে কোলে লইতে গেল। [illegible] ছেলেকে তাহার কোলে দিতে সাহস করিলেন না—কি জানি ঔষধির [illegible] কারবার জন্য যে লোক এতদিন দিনে সহস্রবার এই ছেলেকে ঘরের বাড়ী পাঠাইয়া আসিয়াছে, সে যে আজ সেই খোকাকে হাতে পাইলে একটা জোর করিয়া চিমটীও কাটিয়া দিবে না, এ কথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

তিনি মনের কথা মনে রাখিয়া মুখে বলিলেন "নে, নে, এখন কাজ কর্‌গে যা,—ছেলে আদর করবার ঢের সময় আছে।"

ঝি ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, তিনি এখন আর সে মানুষ নাই, বাক্যেই কোন কিছু না বলিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

এতক্ষণ যোগেন ছাতে কি করিতেছিল। এখন বৌদি' তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে এই নে, রেখে আয়, কর্ত্তা যদি এসে পড়ে ত বল্‌বে কি?"

যোগেন তাহাকে কোলে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন—"তখন যা" বলিচি সে কথা বল্‌তে যেন ভুলিস্‌নে, দুই ঘরে এলে আমি কিন্তু কি বল্লে জিজ্ঞাস কর্‌ব।"

সে "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল।

(৬)

"হ্যাগা, আজ ক'দিন হ'ল ঠাকুর পো ত এ বাড়ী আসিনি, একবার খবর নাও না—অসুক বিসুক করেনি ত?"

হরেন বাবু আজ প্রায় ১২ দিন হইতে স্ত্রীর কেমন ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। এখন সুযোগ পাইয়া বলিলেন "কেন বল দেখি? আজ তুমি যে বড় যেচে ওদের খবর এমন ভাবে শুন্‌তে চাচ্ছ, ব্যাপার কি?"

স্বামীর কথায় তিনি জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন "কেন আবার কি? হাজার হোক্ আপনার লোক ত? কেমন আছে না আছে জিজ্ঞাসা করিচি, তা আবার "কেন" কি?"

হরেন বাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "তুমি যে অবাক কর্‌লে গিন্নী। এতদিন তুমি ওদের কেবল সর্ব্বনাশই শুন্‌তে চেয়েছ, তা আজ যে তুমি ওদের ওপর এত সদয় তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব বল?"

"তখন চেয়েছি, বেশ চেয়েছি, তাই ব'লে যে, আজ ও তাই চাইতে হ'বে তার ত কোন মানে নেই! দেখ এতদিন এত যে কাণ্ড হয়েছে, সব তোমার

দোষ, আমার দোষ একটুও নয়—লোক কিন্তু আমার নামেই গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ ক'রে!"

"আমার দোষ। কি রকম? ওদের তাড়ালে কে?"

"তুমি তাড়িয়েচ।"

"বাঃ বাঃ বেশ, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। আমি কি নিজের ইচ্ছেয় তাড়িয়েছিলুম, না তোমার ইচ্ছেয়?"

"না আমার ইচ্ছেয় তাড়িয়েছিলে বটে, কিন্তু আমার কথা কে তোমায় শুনতে ব'লেছিলো? আমি যা বল্'ব তুমি তাই কর্'বে?—আমি পর, আমি না হয়, ওদের তাড়াতে ব'লেছিলুম, তুমি ত ওর মায়ের পেটের ভাই। তুমি আমার কথা শুনে, ওদের তাড়ালে কি ব'লে? তোমার মতন, মেয়ে মানুষের কথা শুনে কাজ কত্তে আর কোন পুরুষমানুষকে দেখিনি। মেয়ে মানুষ কত কি ব'লে, তাই বলে ক'টা পুরুষ তোমার মতন তা'দের হুকুম মত কাজ করে বেড়াচ্চে?"

হরেন বাবু অবাক-বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখ পানে চাহিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। এখন জোড় হাত করিয়া বলিলেন "গিন্নী, আমার মাট হ'য়েছে—ক্ষমা কর। বলি হুজুরের কথা না শুনলেও যে ঝগড়ার চোটে বাড়ীতে কাক্ চিল বস্তে পারে না। সেটাও কি আমার দোষ?"

"নিশ্চয়ই তোমার দোষ। আগে আমায় আস্কারা দিয়েছিলে ব'লেই ত আমি এমন হ'য়েচি—কেন তুমি আস্কারা দাও, কেন তুমি এত দিন আমায় শাসন করনি—দোষ তোমার নয় ত কার?"

"আচ্ছা বেশ, আজ থেকে আরেল হ'ল। এবার থেকে একটু কিছু কল্লেই ঠেঙাতে হবে তা হ'লে?"

"তা হ'বে, কেন, চোখ রাঙালে কি ভয়ে কাঁটা হয়ে যাবে না—তবে আর শাসন কি?"

"আমার মতন সকলের স্ত্রী যদি চোখ রাঙালে ভয় না করে?"

"যে স্ত্রী স্বামীর চোখ রাঙানিতে ভয় করে না—তাকে হাতার ঠেঙালেও কিছু হ'বে না।"

কর্ত্তা বলিলেন "থাক্ থাক্, অত বাজে তর্কে দরকার কি? তোমার আসল কথাটা হ'চ্ছে ওদের নিয়ে আসা কেমন?—তা বল্লেই ত হয়। আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে তামাসা করছিলাম।"

চারুবালা উজ্জ্বল কটাক্ষে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "কে তোমায় বল্লে—আমি ওদের আন্‌তে চাই।"

"বল্লে—তোমার রান্না; তরকারিতে নুন দেওয়া; বুঝ্‌লে? আমি আজ সাত আট দিন ধরে বুঝে আস্‌ছি। কাল রাত্রে মেজ বৌমাকে এ বাড়ী এনেছিলে কিনা বল দেখি?—বাবা! কি কান্নার চোট।"

চারুবালার গত রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন।

কর্ত্তা আর কোন বাজে কথা না বলিয়া, সহজ ভাবে "আচ্ছা, আজ আমি সুরেনকে ডেকে দোবো, যা' বল্‌তে হয়, বোলো এখন তুমি" বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথায় কর্ত্তা যে সত্য সত্যই অল্প লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়াছেন, চারুবালা নিজের মনে মনে ইহা বেশ স্পষ্ট অনুভব করিলেন।

(৭)

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে কর্ত্তা আবার আসিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "সুরেন এসেছে, এইবার আমি ওকে পাঠিয়ে দিই, যা বল্‌তে হয় ব'লো।"

চারুবালা "না আমি বল্‌তে পার্‌ব না তুমি বল" বলিয়াই কি ভাবিয়া বলিলেন "আচ্ছা আচ্ছা তুমি তাকে পাঠিয়ে দাওগে।"

তিনি যাইতেছেন, এমন সময় স্ত্রী পশ্চাতে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে বলিলেন "হ্যাগা, তুমি আমার ওপর রাগ করনি ত? যদি ক'রে থাক ত ক্ষমা কর; আজ এই নাক কান মল্‌চি, আর কক্ষণও তোমার অত করে বল্‌ব না।"

হরেন বাবু তামাসা করিয়া বলিলেন "রাগ করিনি আবার নাক কান মোলো, শুধু মুখে বল্লেই ত হবে না।

"আচ্ছা এই মলচি," বলিয়া সত্য সত্যই মলিলেন। স্বামী হাসিতে হাসিতে "এবার কিছু ক'লে কিন্তু নাকে খত্ দিতে হবে" কিন্তু বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

* * * * *

সুরেন বাবু আসিয়া বলিলেন "কি বল্‌ছ বৌদি'—"

"বল্‌ব আর কি? আজ কাল আর দেখা দাও না কেন? যাও একবার খোকাকে নিয়ে এস তারপর অন্য কথা কোয় এখন।"

সুরেন বাবু বাড়ী যাইয়া খোকাকে আনিয়া বৌদি'র কোলে বসাইয়া দিলেন।

তাহাকে কোলে লইয়া তিনি যেন এক মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বলিলেন "সত্যি মেজ ঠাকুর পো, মেজ-বৌয়ের কি অন্যায় বল ত? তার ঘর দোর সবই পড়ে রৈল, আর সে কিনা পরের বাড়ীতে বাস করিতে গেল। এসব আমাকে জব্দ করা নয়?'

সুরেন বাবু অত্যন্ত আশ্চার্য্য হইয়া বলিলেন "সে কি বৌদি' তুমিই'ত আমাদের তাড়ালে।"

"যাও—যাও; বেশী বোকো না, তোমরা গেলে কেন?"

* * * * *

"বৌদি দাও ওকে নিয়ে যাই। আমাকে আবার এক্ষুনি রোগী দেখ্‌তে যেতে হবে।"

সে গুড়ে বালি, মেজ ঠাকুর-পো! যতক্ষণ না মেজ-বৌ আস্‌বে ততক্ষণ খোকাকে আমার কোল থেকে কে নিয়ে যাবে, যাক দিকিনি দেখি। প্রাণ গেলেও একে ছাড়্‌ব না। সত্যি ভাই, এমন ক'রে আর পারিনে। তুমি তাকে আমার নাম করে বলগে, যে, আমি যতদূর জব্দ হবার তা হ'য়েছি। এমন ছেলেকে দূরে রেখে, আমি যে এখানে বাস্ করব, তা আমি পার্‌ব না। আজই তাকে নিয়ে এস—তার পর তখন জিনিষ পত্তর গুলো নিয়ে এলেই চল্‌বে।" সুরেনবাবু অবাক-বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বৌদি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া খোকাকে বুকে তুলিতে নাচাইয়া নাচাইয়া তাহার মুখে মুখ দিয়া একটী চুম্বন করিলেন। তাহার পর তাহার পিঠে একটী ক্ষুদ্র চপটাঘাত করিয়া এক একটী কথায় জোর দিয়া দিয়া, ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন "তোকে—যেতে দোবো না; আমাদের বাড়ী তোকে রেখে দোবো; কেমন?—এঁ্যা?"

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

হারাণো কথা।

অগ্রহায়ণ মাস, সামান্য শীত পড়িয়াছে। ধানক্ষেতে ধানগুলি প্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্ব হইতেই চাষারদল ধানক্ষেত পাহাড়া দেওয়ার জন্য হাতে হুকা, তামাক টিকা ও আগুনের বেনানিয়া নিজ নিজ টাঙ্গিতে চলিয়াছে। আমিও আমার চিরঅভ্যাসানুযায়ী ছড়ি নিয়া বেড়াইতে হইয়াছি।

আমি তখন আমলীঘাটে চাকরী করি। আমলীঘাট পাহাড়ে জায়গা, ত্রিপুরা পাহাড়ের নিম্নভাগে ফেণীনদীর পশ্চিম কুলে অবস্থিত। আমার বাসার দক্ষিণ দিকে ফরেষ্টআফিস এবং উত্তরে প্রায়পোয়া মাইলের মধ্যে ত্রিপুরা মহারাজের থানা। আমার বাসা হইতে উত্তর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত একটী ছোট সরক। বাসা ও থানার মধ্যে মাঝে মাঝে বটগাছ। সরকের পশ্চিম দিকে একটী ক্ষুদ্র মাঠ ও তৎপর লোকালয়। সরকের একটু পূর্ব্বদিকেই ফেণীনদী। নদী হইতে সরক পর্য্যন্ত ছোট ছোট জঙ্গল। ফেণীর পূর্ব্ব পাড় হইতে ত্রিপুরা পাহাড় স্তরে স্তরে আরম্ভ হইয়াছে।

সে সময়ে আমার সন্ধ্যায় বেড়াইবার একটা রোগ ছিল। আফিসের কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই হাতে ছোট একটী ছড়ি নিয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম। কোনদিন সন্ধ্যার সময়ে, আর কোনদিন বা দুইচারি দণ্ড রাত্রে বাসায় ফিরিতাম যেদিন সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিতাম, সেদিন বাবা আমাকে এরূপভাবে, এমন পাহাড়ে যায়গায় রাত্রে একা বেড়াইতে নিষেধ করিতেন। কখন বলিতেন এসব জঙ্গলী জায়গাতে সন্ধ্যার আঁধারে প্রায়ই বন্যশূকর ও অপদেবতা বাহির হয়। বাবার আমার এরূপ মিঠাকড়া শাসন সত্ত্বেও আমার সেই সাধের সন্ধ্যা-বেড়ানের ঝোক থামিল না, বরঞ্চ শীতারম্ভে আরও বাড়িতে লাগিল। তবে এইমাত্র পরিবর্ত্তন হইল যে, বাবার ভয়ে প্রায়ই সন্ধ্যাবাতির সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরিতাম, আর যেদিন বিলম্ব হইত সেদিন থানা হইতে একজন লোক নিয়া খুব চুপি চুপি চোরের মত সাড়াশব্দ না করিয়া বাসায় ঢুকিয়া পড়িতাম।

সেদিন আমি প্রাকৃতিক সান্ধ্যশোভা, এবং অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যালোক-প্রতিফলিত শস্যশ্যামল মাঠের প্রাণমাতান রূপমাধুরী অবলোকন করিতে করিতে কি এক অজানা অচেনাভাবে তন্ময় হইয়া অবিরাম গতিতে চলিয়াছি, কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, তাহার নির্দ্দেশ নাই, স্থিরতা নাই, নিশ্চয় নাই। এদিকে যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই। হঠাৎ "বাবু" ডাকে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখি আমলীঘাট থানার হেডকনষ্টেবল আমার পাছে পাছে আসিতেছে। সে বলিল "রাত হইয়া আসিল আপনি "একা এমন সময়ে এই অন্ধকারে জঙ্গলী রাস্তার কোথায় যাইতেছেন, ফিরে আসুন, শীঘ্রই বন্যশূকর বাহির হইবে।" তাহার কথায় আমি যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কতক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম।

থানার নিকট আসিয়া তাহাকে থানায় যাইতে বলিলে সে বলিল "না আপনাকে একা যাইতে দিব না, চলুন আমি আপনাকে বাসায় দিয়া আসি।" তাহার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি অগ্রে অগ্রে চলিলাম, সে আমার পাছে পাছে আসিতে লাগিল।

কতদূর আসিয়াই পূর্ব্বদিকে মর্ম্মর্ শব্দ শুনিয়া আমরা উভয়ই বন্যশূকর অনুমান করিয়া ঠিক একসময়ে ঐদিকে দৃষ্টি করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে উভয়েরই বক্ষস্থল ঘনঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, হৃদ্‌ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। উভয়েই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় কিয়ৎক্ষণ স্থানুবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন প্রায় নির্ব্বাকের ন্যায় আড়ষ্ট অথচ ভয়মিশ্রিত দুর্ব্বোধ স্বরে হেডকনষ্টেবল ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সজোরে আমার হাত ধরিয়া বলিল "বাবু সেদিকে চাওয়ায় দরকার নাই, চলুন শীঘ্র প্রাণে বাঁচাই" আমি নিজেও যে কতক ভয় না পাইয়াছিলাম, এমন নয়, তবে সঙ্গীটির অবস্থা দেখিয়া তাহাকে সাহস দেওয়ার জন্য বলিলাম, 'ভয় নাই পুলিসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিও না', চল, দেখিয়া যাই এটা কি? বন্যশূকর নহে তা সুনিশ্চয়।"

সে বলিল, "এটা নিশ্চয়ই ডাকিনী কি প্রেতিনী হইবে আর একটু অগ্রসর হইলেই আমাদের রক্ত চুষিতে আরম্ভ করিবে।"

আমার প্রেতিনী ও ডাকিনী সম্বন্ধে তেমন একটা বিশ্বাস না থাকিলেও একেবারে অবিশ্বাসী ছিলাম না। বিষয়টা কি জানিবার কৌতূহল হওয়াতে এবং ভীরুভাব অপবাদ হইতে রক্ষা পাওয়া উদ্দেশ্যে সে দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, একটা স্থবিরমূর্ত্তি আমাদিগের দিকে অনেকটা অগ্রসর হই-

তেছে। তখন তাহার বেশ দেখিয়া বাস্তবিকই আমারও অনেকটা ভীতির সঞ্চার হইল। খুব মনোযোগের সহিত—তাহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম মূর্ত্তিটী স্ত্রীলোক। পরিধানে শতশীর্ণ বস্ত্র—শরীর কঙ্কালসার, দেখিলেই এই পৃথিবীর লোক বলিয়া মনে হয়। সে সময়ে হেড-কনেষ্টবল একবার তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়াই আমাকে অতিশয় মৃদু অথচ ভীতস্বরে বলিল, "বাবু আর পরীক্ষা বা অপেক্ষার দরকার নাই, চলুন, প্রাণ নিয়া পালাই, এটা নিশ্চয়ই অপদেবতা নতুবা পাহাড় বা নদী হইতে এ সময়ে মনুষ্য অথচ এরূপ কঙ্কালসার মনুষ্য মূর্ত্তি আসা সম্ভব নহে।" আমি তাহাকে চুপ্ করিতে বলিয়া ঐ মূর্ত্তিটী লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল "তুমি কে গা"?

মূর্ত্তি লঘু অথচ বাতাসের মত অস্পষ্ট স্বরে উত্তর—করিল, "আমি বিদেশিনী, পথ হারাইয়াছি।" আমি বলিলাম, "আর ভয় নাই, আমার সঙ্গে এস, আমি পথ দেখাইয়া দিব।" মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতেই স্ত্রীলোকটী আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অতি ক্ষীণস্বরে বলিল যে, সে মুসলমান, বোজা রহিয়াছে, তাহার বাড়ী যশোহর, দেশীয় সঙ্গীগণের সঙ্গে মক্কা যাইবার উদ্দেশ্যে ট্রেণে চাঁট-গা যাইতেছিল, বিশেষ কোন কার্য্যে সে হিজুলী ষ্টেশনে নামিয়াছিল, তখন তাহার সঙ্গীগণ তাহার বস্ত্রাদি ও টাকা সহ ট্রেণে চলিয়া গিয়াছে। সে ট্রেণ ধরিতে না পারিয়া পথে পথে ঘুরিতেছে। এখন কোন মুসলমান বাড়ী পাইলে সে কিছু আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে পারে"।

এ কথা শুনিবা-মাত্র হেড কনেষ্টবলের লুপ্ত সাহস ফিরিয়া আসিল এবং সে ঐ দুঃখিনীকে পশ্চিমদিকের মাঠের অপর পার্শ্বস্থিত প্রদীপ লক্ষ্য করিয়া মুসলমান বাটীতে যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে ঐ দিকে রওয়ানা হইল, হেড-কনেষ্টবল আমাকে বাসায় যাইতে বলিয়া দিয়া থানার দিকে দ্রুতপদে রওয়ানা হইল। ঐ স্ত্রীলোকটী কতদূর গিয়াই "বাড়ী কোথায়" জিজ্ঞাসা করিল। হেড-কনেষ্টবল যাইতে যাইতে উত্তর দিল,—"আরো অগ্রসর হও, বাড়ী পাইবে।' এদিকে আমি বাসার দিকে অগ্রসর না হইয়া স্ত্রীলোকটীর গতি কি হয় জানিবার জন্য স্থিরভাবে পথে দাঁড়াইয়াই হেড্-কনেষ্টবলও স্ত্রীলোকটীর উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে লাগিলাম। হেড্-কনেষ্টবল চলিয়া যাইবার কতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটী আবার বলিল, "বাবু, বাড়ীযে পাইনা" তখন হেড কনেষ্টবল কিম্বা অন্য কাহাকে তাহার কথার উত্তর দিতে না শুনিয়া আমি তাহাকে বলিলাম,

"বাছা ফিরিয়া আমার সঙ্গে এস, এত রাত্রে তুমি বাড়ী পাইবে না" সে বলিল, "বাবু, তুমি অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

ইহার কতক্ষণ পরেই সে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, আমি তাহাকে আমার বাসার প্রদীপ দেখাইয়া আগে আগে যাইতে বলিলাম, কারণ আমিও একেবারে ভয়শূন্য ছিলাম না।—বাসার নিকটে গিয়াই আমার একজন কর্ম্মচারী দ্বারা "সে সারাদিনের অভুক্ত" এই কথা বলিয়া দিয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিলাম।

আমি কতক্ষণ বিশ্রাম করার পরে বাসার ভিতর আসিয়া জানিলাম যে সে খাইয়া সারাদিনের অনাহার, পথভ্রমণ ও দুশ্চিন্তার পর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ও পৃথক ঘরে শুইয়াছে।

আমি সে রাত্রে তাহার কোন খোঁজ নিলাম না, পরদিন অতি প্রত্যূষে খবর নিয়া জানিলাম তাহার জন্য রচিত শয্যা শূন্য। তার পর তাহার অনেক খোঁজ করিয়াছি, কিন্তু কোন সন্ধানই পাই নাই। আজ জীবনের একপ্রান্তে আসিয়াও যৌবনের সেই টুক্‌রো কথাটা মনের মাঝে খট্‌কা আনিয়া দেয়, সে কি মানুষ না আর কিছু?

শ্রীশরদাচরণ দত্ত।

মাসিকপত্র সমালোচনা।

ভারতী—আষাঢ়। প্রথমেই নূরজাহানের ছবি। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত ছবির বিশেষত্ব ইহাতে মোটেই নাই। ছবিখানি দেখিলেই মনে হয় যেন নূরজাহান বেগম অনেক দিন ধরিয়া সাগু পথ্য করিতেছেন। তাঁহার সে ভুবন-ভুলান জ্যোতিতে কি যেন কি একটা বিষাদ মলিনতা আসিয়া আসন পাতিয়া বসিয়াছে। এই ছবির অধিষ্ঠাত্রী যদি এই ছবিরই অনুরূপ হইতেন, তাহা হইলে হয়ত জেহাঙ্গীর বাদশাহকে আর কষ্ট করিয়া বর্দ্ধমান আসিতে হইত না। তার পরই বাবীন ঘোষের 'নারী কেন দেবী' প্রবন্ধ। প্রবন্ধখানির আলোচ্য বিষয় মহান্ সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাষাতে যেন কি রকম একটা আঁস্‌টে গন্ধ পাওয়া যায়। "ঐ কাণা চোখের কাণা বাণে আমাদের মধ্যে যা'রা ম'রে পতি হই, তারা হরিণ-সেঁড়া হই বেমালুম শব্দভেদী বাণে" এতদিন ধরিয়া অনেক চটুল চোখের চপল চাহনীর চোখা বাণ খাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু কাণা চোখের কাণা বানত আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয় এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের শচীন্দ্রনাথ রজনীর কাণা চোখের কাণা বাণ খাইয়া একবারে মস্‌গুল হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্যে প্রেমের কিশোর দেবতাটীকে কাণা বলিয়া কল্পনা করা আছে সত্য, কিন্তু তাহার বাণটীকে এতদিন কাণা বলিয়া জানা যায় নাই। এইত গেল কাণা বাণের কথা, তার পর যে আর এক প্রকার বাণের আমদানী হইয়াছে, তাহার নাম "শব্দভেদী বাণ"। আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি যে, এই বাণ একবারে খাটী ঠাকুর বাড়ীর আমদানী। কলিকাতায় আর কোন যায়গায় এই বাণ তৈয়ার হয় না। যে দ্বীপান্তরের বাঁশীর লেখকের হাত দিয়া

"প্রতি অঙ্গ মোর কাঁদে ক্ষুধাতুর
সে কাঙ্গু কেনরে দূর এত দূর" বাহির হয়,

তাহার হাত দিয়া আমরা এই প্রকার ভাষা আশা করিতে পারি না। 'ভালো অপরাধ' গল্পটী অনুবাদ। সিদ্ধাচল—কাহিনী, জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। সৌরীন বাবুর "দুই দিক্" গল্পের কোন দিকেরই খোঁজ পাইলাম না। তবে লেখকের

লিখিবার শক্তি আছে—একটু পরিশ্রম করিলেই তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিত। "প্রত্যাবর্ত্তন" সবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কবে যে ফিরিয়া আসিবেন জানি না। 'বিনি তারের সুর' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। এই রকম প্রবন্ধ দেশে যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল। 'টবের গাছ' কবিতা। সুকবি কালিদাস রায়ের কবিতা বলিলে যাহা বুঝায় এই কবিতাখানি তাহাই। কবি জাতির বুকভরা দুঃখিতা আজ প্রাণ দিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন তাই কবি জাতিকে আজ টবের গাছের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন,

"বন্দী আমি বারান্দাতে টবের চারা গাছ,
খাচায় পোষা ময়না পাখী, চৌবাচ্ছার মাছ।"

কিন্তু জাতি'ত তা চায় না, জাতি চায় স্বাধীনতা, সব দুঃখও সমস্ত দৈন্যের ভয়কেও পেছনে রাখিয়া বিংশশতাব্দীর উজান হওয়ায় আজ আমাদের এই জাতিটা উজান বাহিয়া যাইতে চায়, তাই কবি বলিয়াছেন,

জানি আমি, করকাঘাত, গ্রীষ্মদাহ ঝড়,
শ্রাবণধারা সহ্য করা কঠিন জানি বড়,
জানি আমি ঝড়ের দাপে
ভাঙ্গে শাখা পরাণ কাঁপে,

তবুও সকল দুঃখেও স্বাধীন জীবন প্রিয়তর। কেন? কারণ, কবি সেই ভীমপ্রভঞ্জন মথিত উত্তালতরঙ্গ-বিক্ষোভিত সমুদ্রের বুকে মরণ-কালিয়ের শিরে অমৃতের পুত্রের নৃত্য দেখিয়াছেন, তাই কবি বলিতেছেন,

ছিঁড়িত পাতা, ভাঙ্গত শাখা; নিশ্বাসে, প্রশ্বাসে,
দপ্‌দপিয়ে ছুটত শোণিত আনন্দ উচ্ছ্বাসে।
ভেঙ্গে-চুরে দ্বিগুণ জোড়ে,
অটুট জীবন উঠ্‌ত গড়ে,
সকল করি ডুবিয়ে দিতাম প্রচণ্ড উল্লাসে।

কবির লেখনী অমর হউক, ইহাই আমাদের কামনা। "ভুল ভাঙা" গানে লেখক যে ভুলটা অত শীঘ্র ভাঙিয়া দিয়াছেন তাহাতেই সুখী হইলাম। এই সমস্ত ভুল যত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় ততই মঙ্গল। না, হইলে এই ম্যালেরিয়াজীর্ণ বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালীর [illegible] হাপাইয়া উঠিবে; উকীল আদালত হইতে

আসিয়া জলখাবার পাইবে না, মাষ্টার কল্কে পাইবে না, লেখক চা পাইবে না আর মুখচোরা গরীব স্বামী অনাহারে অনিদ্রায়, অচেনায়, অজানায় একদিন অজানা লোকে চলিয়া যাইবে—তবু তা'র পত্নীর ভুল ভাঙ্গিবে না। সর্ব্বনাশ, এই বিলাতী আদর্শ কি দেশে আন্‌তে আছে? 'পরের ছেলে' ঘরের দিকে চলিয়াছে। 'গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ' ছবিখানি দেখিলে মনে হয় যেন পরীক্ষায় ফেল-করা কোন ছেলে পিতামাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য সমুদ্রতীরে উপস্থিত। প্রেমময় গৌরাঙ্গদেবের মুখশ্রী অঙ্কয়িতার হাতের তারিফ আছে বটে। ভারতী-সম্পাদক ভারতীর সৌকর্য্য সাধনার্থ বহু অর্থব্যয় করিতেছেন জানি, কিন্তু যা তা ছবি ছাপিয়ে অর্থ নষ্ট করে কি লাভ, তা আমরা বুঝি না। "বারোয়ারী" পূজা এইমাসে শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বৈশাখ" ও বৈশাখীঝড় সমালোচনার অনেক ঊর্দ্ধে। কবির পরিণত বয়সে কবিতারাণী যেন কবির যশোমণ্ডিত শুভ্রললাটে মায়ের মমতা-মাখা আঁচলখানি বুলিয়ে দিচ্ছেন। 'চল্‌তি কাণ্ডার মধ্যে অনেক ভাববার কথা আছে। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "জ্যৈষ্ঠীমধু" পড়িলেই তাঁর সেই চিরমধুর স্মৃতি মনে জাগিয়ে দেয়, আর মনে হয়,

আহা, ঠুক্‌রিয়ে মধু ফুলকুলি,
পালিয়ে গিয়েছে বুল্‌বুলি—
টুল্‌টুলে তাজা ফলের নিটোল
টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুল্‌ঘুলি।

"বেতাল।"

চিরদুঃখী।

দুখের কারণ আমার জনম
নাইক সুখের লেশ,
কষ্ট সহিয়ে দিবস কাটায়ে
হইবে জীবন শেষ।
সুখের লাগিয়া বিশ্ব খুঁজিয়া
কোথাও না পাই সুখ,

দুঃখ রয়েছে জীবন ভরিয়ে
কেমনে পাইব সুখ ?
জানি এ নিশ্চয় সুখ লাভ হয়
ভগবানে দিলে মন।
আমি দীন হীন পাব কি সেদিন
সঁপিতে জীবন-ধন ?

শ্রীবিবেকানন্দ পাল বি-এ।

মূঢ়।

আমি মূঢ়—সংসার মায়াতে মুগ্ধ,
মোহের আঁধারে ঘুরিয়া বেড়াই—
আমি যে বিষম অন্ধ।
(আমি) সংসার মায়াতে মুগ্ধ।
কর্ম্মময় বিশ্বমাঝারে
সকল মানব ব্যস্ত ;
(সেথা) আমিই কেবল সুপ্ত।
(আমি) সংসার মায়াতে মুগ্ধ।
ধর্ম্মকর্ম্ম প্রীতি পুণ্যে
মানব জীবন ধন্য
(শুধু) আমার হৃদয় শূন্য।
সংসার মায়াতে মুগ্ধ।
বিদ্যাযশমণ্ডিত সবে
সবেই জ্ঞানেতে বৃদ্ধ
(আমি) অজ্ঞান তিমিরে বদ্ধ।
আমি যে সংসার মায়াতে মুগ্ধ।

শ্রীবিবেকানন্দ পাল বি-এ।

বৈঠকী।

যে ভাষা মাতৃস্তন্যধারার সহিত শিক্ষা করা যায় তাহাই মাতৃভাষা। সহসা আতঙ্কিত হইলে, অতিমাত্রায় শোকার্ত্ত হইলে, তীব্র বেদনা পাইলে, নৈরাশ্যে পীড়িত হইলে, ক্ষুব্ধ-লুব্ধ-কামার্ত্ত হইলে যে ভাষা আতঙ্কিতভাবে মুখ দিয়া বাহির হইয়া তাহাই মাতৃভাষা। যাহা সহজাত, প্রকৃতির সহিত চিত্ত-পটে অলক্ষনের লেখায় লিখিত, তাহাই মাতৃভাষা। এভাষা ভুলিতে পারা যায় না—ভুলা যায় না।

* * * * *

একটা গল্প বলিব। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে কৃষ্ণনগরে একজন বহুভাষাবিদ্ ব্যক্তি আসেন। তিনি তখনকার প্রচলিত ভারতবর্ষের বহু-ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন, যখন যে ভাষায় কথা কহিতেন তখন মনে হইত যেন সেই ভাষাই তাঁহার মাতৃভাষা! পণ্ডিত আত্মপরিচয় কাহাকেও দিতেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ পণ্ডিতগণ বহুচেষ্টা করিয়াও তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিলেন না। সকলেই যেন তাঁহার সম্মুখে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া রহিলেন।

* * * * *

শেষে গোপালভাঁড়ের আশ্রয় লওয়া হইল। গোপালকে বলা হইল, তুমি যদি এই পণ্ডিতের মাতৃভাষা কোনটা, বা, ইনি কোনদেশের মানুষ, বাহির করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে বখশিস্ দেওয়া হইবে। উত্তরে গোপাল বলিল, এত সোজা কথা, কি বখশিস দিবে তাহা অঙ্গীকার কর তাহা হইলে আমি আজই সন্ধ্যার পরে উহার মাতৃভাষা বাহির করিয়া দিব, সঙ্গে সঙ্গে উহার জাতি এবং কুলেরপরিচয় বলিয়া দিব। মহারাজ বলিলেন, তোমাকে পঁচিশবিঘা জমী নিষ্কর দান করিব। গোপাল হাসিয়া উত্তর করিল, তবে আমি যাহা বলি তাহা কর।

* * * * *

বিদেশী পণ্ডিত রাজদর্শনের পরে সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিবার উদ্দেশ্যে নদীর দিকে (খড়িয়া) যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মহারাজার একটা হাতী মদমত্ত হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। পণ্ডিত পশ্চাৎ ফিরিয়া পালাইবে, এমন সময় দেখে একটা বন্যশূকর তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার পিছনে বহুলোক, পাইক, মল্ল, লাঠি সড়কী বন্দুক লইয়া ধাবমান হইয়াছে। পণ্ডিতের প্রাণ যায়; সে কাতরভাবে দুইদিকে তাকাইতে লাগিল, যখন একদিকে হাতী অন্যদিকে বন্যশূকর প্রায় তাহার সন্মুখে ও পশ্চাতে আসিয়া পড়িল, তখন সেই বিদেশী পণ্ডিত তেলেগু ভাষায় কি একটা কথা চিৎকার করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

* * * * *

গোপালভাঁড় কাছেই প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, হাসিয়া পণ্ডিতকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়া বলিল, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার কুল পরিচয় দেও, নহিলে খড়িয়ার খরস্রোতে তোমাকে ঠেলিয়া দিব। প্রাণভয়ে ভীত ব্রাহ্মণ তখন আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করিল। ইহাই মাতৃভাষার লক্ষণ। মৌলভী ফজলল হক্ সাহেব এমন বিপদে পড়িলে কোন ভাষায় ত্রাস বা বেদনা জ্ঞাপন করেন? তাঁহার বরিশালের বাঙ্গালাভাষাই সহজে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবেই, কেন না উহা তাঁহার মাতৃভাষা। মাতৃভা কেবল যাঁহার উদরে জন্মিয়াছে তাঁহারই ভাষা নহে। মাতৃভাষা দেশমাতৃকার ভাষা, যে দেশে জন্ম আমার সেইদেশেরভাষা, আমার স্বজন-পরিজনের ভাষা, আমার মাতৃকুলের ভাষা। যাঁহারা বিলাতে যাইয়া ইংরেজ বিবি বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাদের পুত্র-কন্যাদিগের ভাষা তাহাদের পিতৃ-পৈতামহ স্বজন-পরিজনের এবং দেশের প্রচলিতভাষাই হইবে। পরলোকগত মিঃ এ, রসুল বিবি বিবাহ করিয়াছিলেন; সেইবিবির গর্ভজাত পুত্রকন্যাদিগের ভাষা কি ইংরেজী হইবে? অথবা উর্দ্দু হইবে? তাহাদেরও মাতৃভাষা ঐ চট্টগ্রামের বাঙ্গালা ভাষাই হইবে। মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত বিলাতীবিবি বিবাহ করিয়াছেন, বিবির গর্ভজাত পুত্রকন্যার কি ইংরেজি মাতৃভাষা হইবে? তাহারাও ত বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবে। মাতৃভাষা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ইহাই হইল সভ্য-জগৎগ্রাহ্য নিয়ম, ইহাই সকল দেশে গ্রাহ্য এবং মান্য।

* * * * *

তাহার পর আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। কোম্পানীর আমলে যখন পারস্য ভাষাকে বাতিল করিয়া বাঙলা ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া ইংরেজের মফস্বলের বিচারালয়ে গ্রাহ্য হইয়াছিল, যখন সদর দেওয়ানী আদালতে বাঙ্গালায় লিখিত নথী পত্র গ্রাহ্য হইল, উপরন্তু সকলকে বাঙ্গালার দলিল দস্তাবেজ লিখিতে বলা হইল, তখন বাঙ্গালার কোন মুসলমান প্রধান সে ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন নাই। বিহারে কাইথী ও হিন্দী, প্রচলনের সময়ে বিহারের মুসলমানগণ খুব আপত্তি করিয়াছিল; যুক্তপ্রদেশে স্যর এণ্টনি ম্যাকডনেলের শাসন কালে দেবনাগর অক্ষর প্রচলন কালে যুক্তপ্রদেশের মুসলমানগণ ঘোরতর আন্দোলন তুলিয়াছিল। তাহার ফলে স্যর এণ্টনি ম্যাকডনেল মুসলমানদিগের সহিত আপোষ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য উর্দ্দু ভাষাও আদালতের ভাষা বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় এমন কোন আন্দোলনের সমাচার আমাদের জানা নাই। প্রায় পঞ্চাশী বৎসরকাল বাঙ্গালার আদালত সমূহে বাঙলা ভাষা প্রচলিত আছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই বাঙ্গালায় দরখাস্ত পেশ করিতেছে, এমন কি এখনও বাঙলায় বক্তৃতা করিয়া, স্বপক্ষ অবলম্বন করা হয়। এতদিন কোন আপত্তি বাঙ্গালায় কোন মুসলমান করিল না, আর আজ Pan Islamismএর চোটে মুসলমান-বিশেষের মাতৃভাষা উর্দ্দু বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে? গবরমেণ্ট কি এই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিবেন? অথবা এমন পরিবর্ত্তন ঘটান গবরমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর হইবে? লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের স্থায়ী প্রবাসী বাঙ্গালা সকল যেমন উর্দ্দু বলিতে পারেন বা বলিয়া থাকেন, তেমন কায়দা-দুরস্ত উর্দ্দু বাঙ্গালার কয়জন মুসলমান বলিতে পারেন? তেমন উর্দ্দু বলিলে বাঙ্গালার কয়জন হিন্দু বা মুসলমান হাকিম বুঝিতে পারিবেন? এতদিন পরে আর কি বাঁটি বাঙ্গালী উর্দ্দু শিখিতে পারে?

* * * * *

যে ভাষা যত ব্যাপ্ত এবং পুষ্ট, সে ভাষা তত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজীযুগে নবজীবনে সমৃদ্ধ, একটা নূতন সাহিত্য ইংরেজিযুগে বাঙ্গালায় গজাইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা এতটা পুষ্ট নহে। মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যে সকল শক্তিশালী লেখক জন্মিয়া গিয়াছেন, তেমন প্রতিভাশালী কবি ও সন্দর্ভকার ভারতবর্ষের অন্য

প্রয়োজন হয় নাই। এবং সাধু ভাষা এখন জগতের কবি বলিয়া গ্রাহ্য এবং মান্য। তাহার উপর মোগল-পাঠানের সাময়ের যে বাঙ্গালা সাহিত্য তাহাও অপূর্ব্ব এবং অতুল্য। এমন সাহিত্য নষ্ট করিতে মানুষে পারিবে না। তোমরা জন-কয়েক মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী মুসলমান ভেদনীতির প্রেরণায় উর্দ্দু শিখিতে পার মাতৃ-ভাষাকে বলিয়া বগল বাজাইতে পার; পরন্তু আসলে তোমরা উর্দ্দুও শিখিবে না; বাঙ্গলাও শিখিবে না। একটা বিষম জগা খিচুড়ির উৎপত্তি বিষয়ে সহায়তা করিবে। কলিকাতা ইউনিভারসিটি যখন বাঙ্গলার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন ভাল অধ্যাপক পাইলেই বাছিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে অধ্যাপকের পদে বসাইলেই বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি ছাড়া ক্ষতি হইবে না। শেষ কথা এই, বাঙ্গালার আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন, অনেকে বাঙ্গালা গদ্য ভাল লিখিতেছেন, অনেকের রচিত [illegible] গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের [illegible] প্রবেশ করিয়াছে; তখন উর্দ্দুই চালাও আর পারস্য ভাষা ই মাতৃভাষা বা বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য পরিবার নহে, কেহ মারিতেও পারিবে না। তবে এই বিতণ্ডার ফলে অনেকের মুসল-মানের সহিত হিন্দুদিগের একটা আড়াআড়ি ভাব প্রকট হইয়া উঠিবে। মিলনক্ষেত্রের জন্য একটা বাদ-বিতণ্ডা ও দলাদলি প্রবল হইয়া উঠিবে। ইহা যদি মহাত্মা গান্ধির হিন্দু-মুসলমানের আতাঁতের পরিণতি হয়, তবে আমরা বলি—বাঁচুন।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

গুণগান।

("সুরা ফাতেহার" বঙ্গানুবাদ)

কোরাণশরিফের ছন্দ অনুকরণে ঃ—

সব্ গুণ গান্ তোমা—রি, বিশ্বময় স্বামি—ন্,
হে রহ্মানুর্‌রহিম,—হে বিচা—রক শেষ-দি—ন্,
তুমিই হে উপাস্য, তোমারি বল্ চায় এ দী—ন ;
দেখাও হে সে-বল পথ স-লীম্—
তাদের পথ যাদের পর আশীর্-বর দাও অসী—ন্।
নয় তাদের সে ভ্রান্ত কু-পথ—
যারা তোমার শাপ-মলি—ন্।

আমিন।

গোলাম মোস্তফা।

---

*এই রকম প্রাঞ্জল অনুবাদ আমাদের দেশে অতি অল্পই দেখা যায়। আমরা মুসলমান ভ্রাতাদিগকে বঙ্গ কোরাণশরিফের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ঃ ঃ

ভারত-শিল্পতত্ত্ব।

শিল্প কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে মতভেদের অভাব নাই। তজ্জন্য, অতিঅল্প দিন পূর্ব্বেও, পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রাচ্য-শিল্পের কোনও নিদর্শনই প্রকৃত শিল্প-নিদর্শন বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিত না। তাঁহারা পাশ্চাত্য ভূমণ্ডলেই শিল্পের একমাত্র লীলাভূমি বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

সে সঙ্কীর্ণ ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে;—এখন প্রাচ্য শিল্পও এক শ্রেণীর শিল্প বলিয়াই সমাদর লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানব-শিল্পের মূলপ্রকৃতি যতই আলোচিত হইতেছে; পাশ্চাত্য পূর্ব্বসংস্কার ততই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। এমন কি সৌন্দর্য্যবিকাশ-লালসায় শিল্পের মধ্যে মানবপ্রকৃতির যেরূপ একপ্রাণতা দেদীপ্যমান, তাহা ধরিয়া, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের রাগানুগা মিলন-ভূমির তথ্যানুসন্ধানেরও সূত্রপাত হইতেছে।

শিল্প-যাহাই হউক, তাহা মানব-চিত্তবৃত্তির ভাব-সম্পদের বাহ্যবিকাশ;—মানবপ্রতিভাপ্রসূত এক অলৌকিক সৃষ্টি-কৌশল। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে শিল্প-শব্দের ব্যুৎপত্তি যেভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ইহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"শিল্পং কৌশলং শীঙ্ সমাধৌ।"

"শীঙ্ সমাধৌ"—(উণাদি-সূত্রানুসারে ত-প্রত্যয়ে,) নিপাতনে শিল্পশব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছিল। তাহাতে সমাধির,—চিত্তবৃত্তির একাগ্রতার,—উল্লেখ করিয়া, শিল্পকে একাগ্রতা-সমুদ্ভাবিত কৌশলোৎপন্ন বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। এই ব্যুৎপত্তি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে,—সকল শিল্পই কৌশলোৎপন্ন,—সে কৌশল মানব-চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা সমুদ্ভাবিত। তাহা অনুকৃতি নহে,—সৃষ্টি।

সকল শিল্পের উৎপত্তি-রহস্য এক; কিন্তু সকল শিল্প একরূপ নহে,—লক্ষ্যের তারতম্যে দুই ভাগে বিভক্ত। যাহার মুখ্যলক্ষ্য যেন তেন প্রকারেণ অভীষ্টসাধন, তাহা এক শ্রেণীর শিল্প। যাহার মুখ্য লক্ষ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, তাহা আর এক শ্রেণীর শিল্প। যাহার মুখ্য লক্ষ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, তাহা অধিক প্রতিভা ব্যঞ্জক বলিয়া, অধিক সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। তাহা যে পরিমাণে

চিরসুন্দরের অসীম সৌন্দর্য্যের আভাষ প্রদান করে, সেই পরিমাণে তাহা শিল্পনীয়;—সেই পরিমাণে সকল দেশে, সকল যুগে, সকল সমাজের নিকট, তাহার সমাদরের অধিকারী। পাশ্চাত্য-সাহিত্যে এই শ্রেণীর শিল্প "ফাইন আর্ট" নামে অভিহিত। কাহারও কাহারও মতে ইহাই কেবল শিল্পপদবাচ্য; এতদ্ব্যতিরিক্ত শিল্প শিল্প নহে;—পণ্যদ্রব্য! যতই বিস্ময়োৎপাদক হউক না কেন, তাহা কেবল কল্পনা-কৌতুক;—যতই মূল্যবান্ হউক না কেন, তাহা কেবল মানব-প্রতিভার অকিঞ্চিৎকর রচনা-বিলাস!

শিল্প-স্রষ্টার সাধারণ নাম—শিল্পী। কিন্তু শিল্প যেমন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, শিল্পীও সেইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাচীন ভারতে দুই শ্রেণীর শিল্পী দুই প্রকার সামাজিক অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। একশ্রেণী "কারু" বা "কারুক" নামে,—আর এক শ্রেণী "শিল্পী" নামে অভীহিত হইত। "কারুকের" তুলনায় "শিল্পী" অধিক মর্য্যাদা লাভ করিত। একালের "কারিকর"-শব্দ সেকালের "কারুক"-শব্দের অপভ্রংশ। "কারুক" বা "কারিকর" শ্রমজীবী মাত্র;—উদ্ভাবক নহে। সে কেবল অগরের উদ্ভাবিত কৌশল-শিক্ষায় এবং দ্রব্য-নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্ত। "কারুকের" এবং "শিল্পীর" মধ্যে এইরূপ পার্থক্য থাকায়, স্মৃতিশাস্ত্রে উভয়ের নামই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"যন্ত্রাকরে কারুক-শিল্পিহস্তে।"

বিষ্ণুসংহিতার এই বচনাংশের "কারুক" এবং "শিল্পী" সেই পার্থক্য সূচিত করিতেছে। আপদ্ধর্ম্মকালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ব্যক্তির পক্ষে জীবনোপায় নির্দ্দেশ করিবার সময়ে, মনুসংহিতায় (১০।১১৬) "শিল্প" একটি উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবন-হেতবঃ॥"

এই বচনোক্ত "শিল্প" কারু নহে, ইহা ইঙ্গিতমাত্রে ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায় ইহার ব্যাখ্যায়, কুল্লুকভট্ট লিখন প্রভৃতি কর্ম্মকেই "শিল্প" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানে "প্রভৃতি"-শব্দ তুল্যশ্রেণীর কর্ম্ম সূচিত করিয়া রহিতেছে,—আপদ্ধর্ম্মকালে যাহা দ্বিজাতির অবলম্বনীয়, তাহা কারুশিল্প নহে, কলা-শিল্প। অমরকোষের টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া, দেখাইয়া গিয়াছেন,—যাহারা "কারু" নামে পরিচিত, তাহাদের মধ্যে পাঁচটি জাতির লোক "শিল্পী" বলিয়াও কথিত। যথা,—

"তক্ষা চ তন্তুবায়শ্চ নাপিতো রজকস্তথা।
পঞ্চমশ্চর্ম্মকারশ্চ কারবঃ শিল্পিনো মতাঃ॥"

এই বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—সকল "কারু" সেকালে "শিল্পী" নামে পরিচিত ছিল, এই বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—সকল "সকল" সেকালে "শিল্পী" নামেও কথিত হইত। এই পাঁচটী জাতির লোক কেবল শ্রমজীবী ছিল না; স্ব স্ব শিল্পকর্ম্মে উদ্ভাবনপ্রতিভারও পরিচয় দান করিত। তজ্জন্য ইহারা গৌরবসম্পদ "শিল্পী" নামও প্রাপ্ত হইয়াছিল। জাতিভেদ সে প্রতিভার অনাদরের কারণ হইত না, ইহাতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোষশাস্ত্রে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য উল্লিখিত হয় নাই। তাহাতে "শিল্পং কলাদিকং কর্ম্ম" বলিয়া সাধারণ ভাবে শিল্পশব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং অমরসিংহ কারু এবং শিল্পিকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র কাকশব্দে শিল্প ও শিল্পিকে তুল্যভাবে সূচিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্থলে শিল্পশব্দ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল শিল্পদ্রব্যই সাধারণ ভাবে শিল্প নামে কথিত হইতে পারে। কিন্তু মর্য্যাদার তারতম্যে একশ্রেণী কারুশিল্প, আর এক শ্রেণী কলাশিল্প। স্মৃতিশাস্ত্রে সেই পার্থক্য সূচিত হইয়াছে।

শুক্রনীতিসারে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে প্রাসাদ প্রতিমাদির নির্ম্মাণ-পদ্ধতির শাস্ত্রকে "শিল্পশাস্ত্র," এবং কাচাদির নির্ম্মাণপদ্ধতির শাস্ত্রকে "কলাশাস্ত্র" বলা হইয়াছে। ইহাতে কৌশল-বিকাশ কলা-নামে, এবং সৌন্দর্য্যবিকাশ শিল্পনামে অভিহিত হইয়াছে। ভরত-নাট্যশাস্ত্রেও এইরূপ পার্থক্য-সূচনার্থ উক্ত হইয়াছে,—"এমন কলা নাই, এমন শিল্প নাই, যাহা নাট্যে প্রকাশিত হয় না।" যথা,—

"ন সা কলা ন তচ্ছিল্পং যন্নাট্যে ন প্রকাশিতম্।"

প্রধান প্রধান বিদ্যার সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ। এবং কলার সংখ্যা চতুঃষষ্টি বলিয়া শুক্রনীতিসারে উল্লিখিত আছে। তাহাতে বিদ্যার এবং কলার পার্থক্য সূচনার্থ লিখিত হইয়াছে যে,—যাহা কেবল বাগ্‌ব্যাপারসাধ্য তাহাই "বিদ্যা"; যাহা মূর্খব্যক্তিও সম্পাদন করিতে পারে, তাহাই "কলা।" যথা,—

"যৎ যৎ স্যাৎ বাচিকং সম্যক্ কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞিতং।
শক্তো মূকোঽপি যৎ কর্ত্তুং কলাসংজ্ঞন্তু তৎস্মৃতম্॥"

এই লক্ষণানুসারে সংগীত একটি "বিদ্যা";—বাদ্য "বিদ্যা" নহে, "কলা"। সুতরাং "কলা" কেবল কৌশল; "শিল্প" তাহা হইতে পৃথক্;—তাহা কৌশল

নহে, "বিদ্যা"। এরূপ শ্রেণীর বিভাগ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বামন-কৃত "কাব্যালঙ্কার সূত্র-বৃত্তিতে" গীত কলা-নামে উল্লিখিত থাকায়, শুক্রনীতির সহিত পার্থক্যই সূচিত হয়। গোপেন্দ্র-ত্রিপুরহর বামনের গ্রন্থের "কাব্যালঙ্কার-কামধেনু" টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে নৃত্যগীতাদি কলা নামে উল্লিখিত এবং কলার সংখ্যা চতুঃষষ্টি, উপকলার সংখ্যা চারি শত বলিয়া উল্লিখিত। তিনি ভামহের গ্রন্থ হইতে চতুঃষষ্টিকলার যে নামাবলী উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বাৎস্যায়নের কামসূত্রোক্ত অথবা শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকায় (১০।৪৫।৩৫) উদ্ধৃত নামাবলীর সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীধর স্বামী যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাকে "শৈবতন্ত্রোক্ত" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চত্য পণ্ডিতবর্গ যাহাকে অবজ্ঞাবশতঃ কৌশলোৎপন্ন "পণ্য" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, যাহাকে "কারু-শিল্প", এবং "সুকুমার শিল্প" নামে যাহার সমাদর করিয়া থাকেন, তাহাকে "চারু-শিল্প" নামে নামকরণ করিয়া লইলে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিল্প-বিভাগ কল্পনা বুঝিবার এবং বুঝাইবার সুবিধা হইতে পারে।

কারু-শিল্পই হউক, আর চারু-শিল্পই হউক, সভ্যতার ইতিহাসের নিকট উভয়েই তুল্য সমাদর লাভ করিবার যোগ্য। যে জাতির সৌন্দর্য্য-বোধ যে পরিমাণে বিকাশ লাভ করে, সেই জাতি সেই পরিমাণে জীবন-যাপনের উপকরণগুলিকেও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে;—কেবল যেন তেন প্রকারেণ কার্য্য সাধন করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। এই কারণে, পুরাতন মৃদ্ভাণ্ডটি পর্য্যন্ত,—পুরাতন মানব-সভ্যতার স্তোতক বলিয়া,—ইতিহাস-লেখকের নিকট অশ্রদ্ধেয় হয় না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান আছে বলিয়া, তাহার ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত প্রাচীন শিল্পনিদর্শনের সংগ্রহালয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সকল দেশে, সকল যুগে, সকল মানবের নিকটেই, শিল্পের লক্ষ্য এক;—তাহা সৌন্দর্য্য-বিকাশ চেষ্টা। কিন্তু সৌন্দর্য্যানুভূতির তারতম্যে,—সৌন্দর্য্য-বিকাশক শিল্প-প্রতিভার তারতম্যে,—রচনা-সহায়ক উপাদানবস্তুর তারতম্যে,—শিল্প-সুষমার তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রতিভার তারতম্যে যুগভেদে এবং স্থানভেদে একই দেশে বিবিধ রচনা রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যুগভেদে, দেশভেদে, অথবা উদ্ভাবয়িতাভেদে শিল্প নানা নামে পরিচিত হয়।

মূল লক্ষ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও, সৌন্দর্য্যানুভূতির তারতম্যে পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে। প্রাচ্য যেখানে সৌন্দর্য্যকে আকার দানের চেষ্টা করিয়াছে, প্রতীচ্য সেখানে আকারকেই সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। ইহা হইতে দুইটি পৃথক্ শিল্পাদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে ;—একটি ভাব-সর্ব্বস্ব, অপরটি আকার-সর্ব্বস্ব। একটিতে নর নর নহে, দেবতা ;—অপরটিতে দেবতা দেবতা নহে, নর।

চারু-শিল্পের ন্যায় কারু-শিল্পেও এইরূপ মজ্জাগত পার্থক্য দেদীপ্যমান। তাহাও যুগভেদে, দেশভেদে, এবং দেশ-কাল-পাত্রের রুচিভেদে, বিবিধ রচনা-রীতির পরিচয় প্রদান করে। চারু-শিল্পই হউক, কিম্বা কারু-শিল্পই হউক, সকল শিল্পই, তাহার উদ্ভব-স্থানের বাহিরেও প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে। কোন্ দেশের কোন্ শিল্প কিরূপভাবে কতদূর পর্য্যন্ত ভারত-শিল্পের উপর প্রধান বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহার চিন্তাই এ পর্য্যন্ত তথ্যানুসন্ধানকে অবসরশূন্য করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতশিল্প কোন্ কোন্ দেশের শিল্পের উপর কিরূপ ভাবে কতদূর পর্য্যন্ত প্রভাববিস্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা অতি অল্পদিন হইতে আরব্ধ হইয়াছে ; এবং অল্পদিনের মধ্যেই অনেক বিস্ময়কর বিবরণ প্রচারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষই যে সমগ্র প্রাচ্য শিল্পের "ভাবের মাতৃভূমি", ওকাকুরা তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিবার পর সভ্যসমাজে ভারত-শিল্প এক নূতন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় লাভ করিতে হইলে, প্রাচীন শিল্প-পরিচয় আবশ্যক। তজ্জন্য তথ্যানুসন্ধান অপরিহার্য্য। কিন্তু তাহা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। স্থায়িত্বের তারতম্যে প্রাচীন শিল্প দুই ভাগে বিভক্ত,—বিনশ্বর এবং অবিনশ্বর। উপকরণের পার্থক্যে এই পার্থক্য অনিবার্য্য। অল্পক্ষণের সাময়িক সৌন্দর্য্যসম্ভোগ লালসা যে সকল সাজসজ্জায় আত্মপ্রকাশ করে, তাহা অল্পক্ষণের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। জনসমাজের রুচি-পরিবর্ত্তনে, তাহার রচনা-প্রয়োজন তিরোহিত হইয়া গেলে, তাহার নিদর্শন-দর্শনের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়। যে সকল কারুশিল্প বা চারুশিল্প অপেক্ষাকৃত অধিক স্থায়িত্বলাভের প্রয়াস প্রকাশে দৃঢ়তর উপাদানে রচিত হয়, তাহাও দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারে না,; এবং রুচিপরিবর্ত্তনে তাহার নির্ম্মাণ-প্রয়োজন তিরোহিত হইয়া গেলে, তাহার নিদর্শনও বিলুপ্ত হইয়া পরে। যাহা সুদৃঢ় উপাদানে গঠিত বলিয়া, অবিনশ্বর শিল্প নিদর্শনরূপে [illegible]

প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাও আততায়ীর আক্রমণে ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়া যায়;—তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট অসম্যক্ নিদর্শন পূর্ব্বসৌন্দর্য্যের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। এই সকল কারণে, প্রাচীন শিল্প-পরিচয় প্রাচীন সাহিত্যের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যাহার নিদর্শন লুপ্ত অথবা অসম্পূর্ণ, সাহিত্যের মধ্যেই তাহার পরিচয় লাভের চেষ্টা করিতে হয়।

প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনের ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যেও অসম্যক্ নিদর্শন;—তাহাও অক্ষতকলেবরে কালসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় নাই। যাহা নাই, তাহার তুলনায়, যাহা আছে, তাহা যৎসামান্য;—কেবল তাহাই নহে,—লিপিকর-প্রমাদে, প্রক্ষিপ্তদোষে, সংক্ষিপ্তানুরাগে, বিপর্য্যস্ত! যাহা এইরূপে কোনও ক্রমে ছিন্ন ভিন্ন কলেবরে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারও অধিকাংশ এখনও অমুদ্রিত। তাহা হস্তলিখিত পুঁথীর আকারে নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পরিয়া রহিয়াছে। অসীম অধ্যবসায়ে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, অপরিসীম অর্থব্যয়ে, তাহা একত্র সংগৃহীত হইতে পারিলেও, সকল সময়ে পাঠোদ্ধার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না; অর্থবোধেও বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। তথাপি এই পথই প্রধান পথ, তজ্জন্য এই পথেই সভ্যসমাজ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

যে সকল শিল্প-নিদর্শন এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহারও অধিকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া, মোক্ষলাভের জন্য অপেক্ষায় অবস্থিতি করিতেছে! যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য ভাবে অনুসন্ধানের ব্যবস্থার অভাবে, অতি অল্পসংখ্যক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাহিত্য-নিহিত বিবরণ এবং এই সকল নিদর্শন প্রাচীন শিল্পপরিচয় উদ্ধার করিবার অসম্পূর্ণ উপায়। তথাপি তাহার সাহায্যে যাহা কিছু শিল্পতত্ত্ব উদ্ধার করা হওয়া যায়, তাহাই একমাত্র সম্বল।

এই সম্বল, লিখিত ইতিহাসের তুলনায় নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া কথিত হইলেও উপেক্ষিত হইবার অযোগ্য। এক হিসাবে লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা অলিখিত শিল্প-নিদর্শন অধিক অভ্রান্ত পরিচয় প্রদান করিবার। লিখিত ইতিহাসে ব্যক্তি-বিশেষের, সম্প্রদায়-বিশেষের অথবা জনজাতি-বিশেষের পক্ষপাত-দুষ্ট একদেশ-দর্শী সিদ্ধান্ত-সংস্থাপন চেষ্টা প্রকৃত তত্ত্বকে বিকৃতি দান করিতে পারে। শিল্প-নিদর্শন সেরূপ নহে। তাহাও পরোক্ষ শ্রেণীর ভাষা; কিন্তু তাহাতে ব্যক্তি-বিশেষের প্রভাব অপেক্ষা সমসাময়িক জনসমাজের প্রভাবই অধিক সুব্যক্ত;—তাহাদের যাহা আশা আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান ধারণা, মত ও বিশ্বাস, তাহাই অকপটে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়ের প্রয়োজন যতই অনুভূত হইতেছে, তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা সভ্যসমাজে ততই আন্তরিকতা লাভ করিতেছে। ইহার আলোচনায় যে দেশ যত অধিক অগ্রসর হইতেছে, সেই দেশ ততই মানব-তত্ত্ব অধ্যয়নের উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিয়া দিয়া, মানসিক সজীবতায় পরিচয় প্রদান করিতেছে। শিল্পতত্ত্বের আলোচনা এইরূপে উচ্চশিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া, সভ্যসমাজের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়কে অল্পদিনের মধ্যে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে; ইতিহাসকেও আখ্যায়িকার সংকীর্ণক্ষেত্র হইতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে।

শিল্পতত্ত্ব নৃতত্ত্বের অঙ্গ-বিদ্যা। তাহাতে কল্পনার অধিকার নাই। সমুচিত বিচার পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিলে, সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বিচার-পদ্ধতি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে, শিল্প-পরিচয় সেই প্রমাণ। শিল্পপরিচয় সঙ্কল্প করিবার প্রয়োজন উত্তরোত্তর অধিক অনুভূত হইতেছে।

অনেকে শিল্পকেই শিল্প পরিচয়ের একমাত্র নিদান মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা অধ্যয়ন-নিপুণতা দর্শন-নিপুণতার অধিক পক্ষপাতী। কিন্তু দর্শন নিপুণতার অভাব না থাকিলেও,—অধ্যয়ননিপুণতার অভাব,—অনেক শিল্পের মর্ম্মকথা সম্যক্ উদ্ঘাটিত হইতে পারে না।

শিল্প সকলকেই আনন্দ দান করে, কিন্তু সকলকে এক শ্রেণীর আনন্দ দান করিতে পারে না। অধিকারী ভেদে, চিত্রের এক এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য এক এক শ্রেণীর দর্শকের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে। ইহা বুঝাইবার জন্য বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে (৩।৪১।১১) লিখিত হইয়াছে,—রেখাবিন্যাস আচার্য্যগণের নিকট, বর্ণনাবিন্যাস অভিজ্ঞগণের নিকট, অলঙ্কারবিন্যাস রমণীগণের নিকট, এবং বর্ণবিন্যাস জনসাধারণের নিকট প্রশংসালাভ করিয়া থাকে। যথা,—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি, বর্ণাঢ্যং হি নরা জনাঃ॥"

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

"বন্ধু"।

শীতলচন্দ্র নববিবাহিত যুবক। আশা ও আকাঙ্ক্ষার উৎস একেবারে কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। নবোঢ়া পত্নী প্রিয়ম্বদা সুন্দরী ও সুচতুরা, বয়স ষোড়শবর্ষ, ইহার পিতা কন্যাকে একটু সুশিক্ষিতা করিয়াই পাত্রস্থা করিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা পিতামাতার বিশেষ আদরের দুহিতা, তজ্জন্য কথায় কথায় অভিমান বা কোন কার্য্যে তাচ্ছিল্য অথবা ব্যবহারে অশিষ্টতা অভ্যাস করে নাই। সে দুইদিনেই স্বামীর ঘর নিজের ও নিজকে সকলের চেয়ে ছোট কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। ইহাতে শীতলচন্দ্রকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে। শীতলচন্দ্রের পিতা স্বর্গগত, মাতা ও দুই ভগ্নী বর্ত্তমান, বড়ভগ্নী বিধবা পিত্রালয়েই থাকে, ছোটটি স্বামীর ঘর করে। শীতলচন্দ্রের পারিবারিক অবস্থা মন্দ নয়, বৎসরের খাবার ধান ক্ষেত থেকে হয়, তা ছাড়া তিনি একজন সবএসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, ক্যাম্বেল পাশ ডাক্তার, ডাক্তারীতে বেশ পসার প্রতিপত্তি আছে। গ্রামখানি নাতিবৃহৎ, ভদ্রইতর উভয়বিধ লোকের বাস। পার্শ্ববর্ত্তী ১০।১২ ক্রোশের মধ্যে ডাক্তার শীতলচন্দ্রের বিশেষ ডাক। শীতলচন্দ্রের চরিত্র নির্ম্মল, ব্যবহার অতি শিষ্ট, দয়াদাক্ষিণ্য বিলক্ষণ আছে, বিশেষ দরিদ্রের নিকট হইতে ভিজিট লন না, প্রয়োজন মত ঔষধ পথ্যাদিও সাহায্য করেন, অবশ্য তাহা গোপনে জানাইয়া নাম জাহির করা তাঁহার ঈপ্সিত নহে।

(২)

শীতলচন্দ্রের পরম বন্ধু অনাথ নিকটেই দুইখানি বাড়ীর ব্যবধানে বাস করে। দুই বন্ধুতে একই সময় গ্রামের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতা পড়াশুনা করিতে যায়, শীতলচন্দ্র ক্যাম্বেল স্কুলে ভর্ত্তি হয়, অনাথ আই-এ তিনবার ফেল করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে, পৈত্রিক অবস্থা স্বচ্ছল, কাজেই ভাবনা নাই, দিন রাত্রি পরনিন্দা পরচর্চ্চা প্রভৃতি পারলৌকিক ইষ্টসাধনে ও গ্রামের থিয়েটার-পার্টীর উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছে। কিন্তু শীতলচন্দ্রের সহিত তাহার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণই আছে, যখন শীতলচন্দ্র স্থায়ীভাবে ডাক্তার হইয়া বাড়ী [illegible] অধিকাংশ সময় অনাথ তাঁহার ডাক্তারখানায় বিরাজ করিত।

শীতলচন্দ্রও বন্ধুকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন, প্রায়ই আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন, অবশ্য সেটা উভয়তঃ। শীতলের স্ত্রী প্রিয়ম্বদা অনাথের সঙ্গে প্রথমতঃ কথা বলে নাই, তজ্জন্য অনাথ বিশেষ দুঃখিত হইবে ভাবিয়া শীতলচন্দ্র স্ত্রীকে কথা বলাইয়াছেন, শীতল ও অনাথ ভিন্ন নয় তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। এইরূপে হাস্যে গল্পে আনন্দে দিন বেশ যাইতেছিল, যদিও প্রিয়ম্বদা স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য স্বামীর বন্ধুর সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা, হাস্য পরিহাস করিত, কিন্তু কোন দিন তাহার মধ্যে লজ্জাহীনতার আভাস পাওয়া যায় নাই, এক-একদিন অনাথের বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখিলে প্রিয়ম্বদা নিজকে সামলাইয়া লইত, কোন স্থানেই অত্যধিক চাপল্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দিত না। এই গেল এদিককার কথা, ওদিকে শীতলচন্দ্র সদাশিব, তাঁহার এমন ভাব, তিনি প্রয়োজন হইলে স্ত্রীত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু বন্ধুকে উচু কথাটি বলিতে পারেন না।

(৩)

দিন দিন অনাথের প্রাধান্য বাড়িয়াই চলিল, এত দিন উহা শীতলের মাতার বা ভগ্নীর কোন সন্দেহের কারণ হয় নাই, কিন্তু বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখিয়া মায়ে ঝিয়ে কাণাকাণি আরম্ভ করিল। অথচ কিছু প্রকাশ করিতে পারে না। একদিন একটি বিশেষ ব্যবহারে বিশেষ বিরক্ত হইয়া ভগ্নী সুরমা নিভৃতে ডাকিয়া বধূকে বলিল "বৌ এতটা তো ভাল নয়, লোকে দেখ্‌লে কি বল্‌বে"—সুচতুরা বধূ সব বুঝিয়া লইয়া বলিল, "ঠাকুরঝি! কি করি—বল তো, উনি তো মহাদেব, চোখ বুজে থাকে, আমিও কিছু বল্‌তে পারি না" সুরমা ঝঙ্কার দিয়া বলিল "কেন পার্ব্বেনা,—পার্ত্তে হবে, কাচের জিনিষ কি একবার ভা'ঙ্গলে আর জোড়া লাগ্‌বে, তোমাদের যেমন বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি, কেলেঙ্কারি না করে ছাড়্‌বে না, ছি-ছি-ছি, কি ঘেন্নার কথা, বন্ধুর কর্ব্বি-বাইরে বসে বন্ধুর সঙ্গে কর—বাড়ীর ভেতর অতটা কেন? বধূ বলিল "আমি কি করি বলতো?" সুরমা বলিল, "কি আবার কর্ব্বে, স্পষ্ট তাকে বল্‌বে যে তুমি এস না, একি অন্যায়, হ্যাঁ, যখন দাদা ঘরে থাকে, তখন আসে সে কথা কথা—আর বৌ—তুমিই বা কোন্ সাহসে একলা ঘরে ঐ ছোড়াকে নিয়ে থাক?—বৌ বলিল "আমার কি সাধ! এমন করে—আমাকে আবদ্ধ করে, এমন করে অনুনয়বিনয় করে, আমার পা জড়িয়ে ধরে—আমি সব ভুলে যাই" সুরমা বলিল "বিলক্ষণ!—নাঃ ওসব কোন কাজের কথা নয়, তোমাকে সতর্ক হতে হবে, দাদা যদি সেরকম

হতো কোন কথা ছিল না, সে তো বন্ধু বল্‌তে অজ্ঞান, না ভাই, আমাদের অত উদার হলে চল্‌বে না, এরকমভাবে প্রশ্রয় দিলে কোন্‌দিন কি ঘটে বসে, কোন্‌দিন কলঙ্ক গ্রামে রাষ্ট্র হয়, দশ জনের মুখ তো আর ধরে রাখা যাবে না,—বিশেষ তুমিও যুবতী সেও যুবক"।

(৪)

এইরূপে আরো কিছুদিন গেল, প্রিয়ম্বদা তাহার স্বামীর কাছে সব কথা বলিত বটে, কিন্তু তাহার স্বামী স্বাভাবিক উদার্য্যগুণে সব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, বলিতেন, "তুমিও পাগল, অনাথ কি সে রকম ছেলে, সে যে আমার প্রাণের বন্ধু, আমাকে সে যেরূপ ভালবাসে তোমাকেও সেইরূপ বাসে, এর মধ্যে কি অন্য কিছু থাক্‌তে পারে, তুমি তাকে সন্দেহ করো না" ফলে কিছুই হইল না, অনাথের স্পর্দ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন অনাথ একেবারে বাড়াবাড়ির চরম করিয়া বসিল, হঠাৎ একেবারে প্রিয়ম্বদার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া ফেলিল এবং কাতরভাবে বলিল, "সুন্দরি, আমাকে আর কতদিন আশায় আশায় রাখবে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও আর যে পারি না!" প্রিয়ম্বদা সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা করিতেছিল, সে মুখে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখাইল না, বা হাত ছাড়াইবার প্রয়াস পাইল না, এ অবস্থায় অন্য রমণী কি করিত বলা যায় না কিন্তু সে স্থিরভাবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "অনাথ বাবু, তোমার মনের ভাব আমি অনেক দিন থেকে বুঝেছি,—তুমি ব্যস্ত হয়ো না, এখন তো আর নয়, যেদিন আমার স্বামী দূরে কোন রোগীর বাড়ী যাবে সেই দিন সুযোগমত তোমায় আমি স্মরণ কর্ব্ব, পেছন দিক্‌কার দ্বার খুলে রাখবো তুমি এস"—অনাথ আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, পাষণ্ডেরা যখন কামনার বিষে জরজর হয়—ঐরূপই হয়,—প্রণয়িনীর কথা বেদবাক্য মনে করে,—অনাথ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। প্রিয়ম্বদা বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, স্বামীকে জানাইলে কোন ফল হবে না। তাহা সে জানে, তবু স্বামীকে জানাইতে হইবে, কারণ সেটা কর্ত্তব্য। তার পর কি ভাবিয়া যেন প্রিয়ম্বদা একটু আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল, দোয়াত কলম কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিল, অনেক লিখিল, পত্র লিখিয়া বার বার সেটাকে পড়িয়া ভাজ করিল, উপরে ঠিকানা লিখিল "শ্রীমতী নয়নতারা দেবী," এই নয়নতারা অনাথের পত্নী। পত্রখানা সযত্নে বালিশের নীচে রাখিয়া দিল।

(৫)

শীতলচন্দ্র অদ্য রাত্রিতে আসিবেন না, দূরে রোগীবাড়ী যাইবেন, পাল্কী প্রস্তুত। যোগ্য অবসর বুঝিয়া প্রিয়ম্বদা অনাথকে রাত্রিতে আসিতে বলিয়াছে। এ দিকে অনাথ সন্ধ্যার পরই আসিয়া বসিয়া আছে, ভাবিতেছে শীতল কতক্ষণে যাইবে, কিছুক্ষণ পর শীতলচন্দ্র চলিয়া গেলেন। অনাথ ভাবিতে লাগিল "আমার এ লুকোচুরি খেলা কি শীতল জানে না, না-না জানিবে কেমন করিয়া, আমি যেমন ওকে দেখে মজেছি, প্রিয়ম্বদাও যে সেইরূপ মজেছে, নইলে আস্‌তে বল্‌বে কেন, এস্থলে জানাজানি হবার কোনই সম্ভাবনা নাই" এইরূপ কিয়ৎকাল ভাবিবার পর,—কথা মত প্রিয়ম্বদার ঘর হইতে সাঙ্কেতিক শব্দ অনাথের কর্ণে পৌছিল, অনাথ একেবারে লাফাইয়া উঠিল, সে ইহারই প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে পশ্চাদ্দিক্‌কার দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল,—প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুন্দরী আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শুইয়া আছে, ঘরে এক কোণে একটি কেরোসিন ল্যাম্প মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। অনাথ একেবারে সিংহের ন্যায় তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে যে দ্বার দিয়া অনাথ গৃহ প্রবেশ করিয়াছিল তাহার শিকল বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেল। অনাথ তাহা জানিতে পারিল না, সম্মুখের দ্বার পূর্ব্ব হইতেই শিকলবন্ধ ছিল। অনাথের ঝাপাইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী দলিতা কালসর্পীর মত ফোঁস করিয়া উঠিল,—একি!—অনাথ সবিস্ময়ে দেখিল, এতো তাহার হৃদয়ানন্দদায়িনী সুহাস্যহাসিনী প্রিয়ম্বদা নয়—এ যে সাহারা মরুভূমির মত দীপ্তা ক্ষিপ্তা তাহার পত্নী নয়নতারা। অনাথ একেবারে পাঁচ হাত পিছাইয়া গেল,—নয়নতারা ক্রোধে একেবারে দিশাহারা হইয়া বলিল,—"কেন এস না, প্রেম করনা, পিছিয়ে যাচ্ছ কেন"—নয়নতারা আরো কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় সশব্দে সম্মুখের দ্বারের শিকল পড়িয়া গেল, শীতলচন্দ্র ও প্রিয়ম্বদা মৃদুহাস্যে প্রবেশ করিলেন, শীতলচন্দ্রকে দেখিয়া অনাথ একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িল,—শীতলচন্দ্র বলিলেন,—"অনাথ কি হয়েছে অমন কচ্ছো কেন, প্রিয়ম্বদাকে দেখে তুমি মজেছিলে ওটা স্বাভাবিক, সে জন্য আমি কিছু মনে করিনি, আমি সব জানি,—মেয়েরা সব মিলে এই কাণ্ডটা বাধিয়েছে, মেয়েদের সব কাণ্ড!—তা তুমি কিছু মনে করো না, তুমি আমার যেমন বন্ধু তেম্নিই আছ, আমার স্ত্রীর উপর তোমার দাবী পূর্ব্বের মতই রইল, কেবল মাঝে একটা চিহ্ন করে রাখা গেল, ওটা তোমার প্রবৃত্তিকে কুপথ হইতে সংযত কর্ব্বে.—এখন

ঠাঁই হয়েছে, খেতে বসিগে চল" এই বলিয়া শীতলচন্দ্র একেবারে অনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া লইয়া চলিল, অনাথ নির্ব্বাক অসাড় জড় পদার্থের মত তাঁহার অনুশরণ করিল। প্রিয়ম্বদা আবেগভরে নয়নতারাকে একটি চুম্বন করিয়া সস্মিতবদনে তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী।

প্রতিমা।

কি জানি কি দিয়ে গড়া,
কি যেন কি দিয়ে ভরা—
পরাণ আকুল করা—
ওই মুখ খানি,—
কিবা পূর্ণ মধুরতা,—
আবেশজড়িতা যথা
বাসন্তী সমীরাহতা
লতার দোলানি!
সরসী-উরসোপরি
বালরশ্মি-রশ্মি পড়ি'
খেলে কত ভঙ্গী করি'
স্বপ্ন-সুষমায়;—
তোমার লাবণ্য জলে
রূপের কিরণ ছলে,
বিভাসিয়া কুতূহলে
প্রেম-গরিমায়!
সন্ধ্যার তমসা-তলে
গগনের মেঘাঞ্চলে
তড়িত ঝটিতি ছলে
সচকিত হাসি'—

অন্ধকার রাশি আগে
শত ইন্দ্রধনু-রাগে
ওই চারুমুখে জাগে
পুণ্য জ্যোতি রাশি!
নিরুদ্বেগ অচঞ্চল
কি চাহনি নিরমল!
কি প্রশান্ত—কি কোমল,
স্থির শুভ্র আঁখি,—
প্রবল বাসনা-টানে
কি যে সাধকতা আনে,
অব্যক্ত প্রণয় প্রাণে
বিথারিয়া রাখি!
মরমের ভাষা যত
উদ্বেলিত, উথলিত,
নেত্রপুটে বিকাশিত
বিনম্র হেলায়,—
সাগর-লহরী মত
প্রসারিত, উচ্ছলিত,
প্রীতিভরে প্রতিহত
রক্তিম বেলায়!
ও কম স্বপের পাছে,
জীবন জাগিয়া আছে,—
অসীমে কে বাঁধিয়াছে,—
প্রতিমায় আনি',—
ভরে যায় শূন্য হিয়ে
কি তৃপ্ত আনন্দ দিয়ে,
হেরি সারা প্রাণ দিয়ে
ওই মুখ খানি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

"বাংলার টলষ্টয়।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

মহেন্দ্রচন্দ্রের পিতামহ দেওয়ান রামদুলাল মুখার্জীর মতন তাঁহার পিতা আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয় একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন। প্রথম যৌবনে আনন্দচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। বোধ হয় পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ই আনন্দচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজে টানিয়া আনেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। আনন্দচন্দ্র যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তখনই সকল প্রকারের বৈষয়িক ফলাফল-বিচার বিরহিত হইয়া তাহাকে প্রাণদিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেন। এসম্বন্ধে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে আনন্দচন্দ্রের অত্যন্ত সাদৃশ্য ছিল। দেওয়ান রামদুলালের সময় হইতেই বাড়ীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইত। একেশ্বরবাদী ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে প্রতিমা-পূজা কিছুতেই বিহিত হয় না। দুর্গোৎসবের সময় মহাষ্টমীর দিনে আনন্দচন্দ্রের অন্তরে এই কথাটা জাগিয়া উঠিল। আর অমনি সেইদিনই পূজার মাঝখানে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে দেবী-প্রতিমা বাহির করিয়া দিয়া আনন্দচন্দ্র সেই মণ্ডপেই ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কালীকচ্ছ একটা গণ্ডগ্রাম; অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যের বাস। চারিদিকে অনেকগুলি বড় বড় গ্রাম আছে। সেখানেও বহুতর ভদ্রলোকের ভদ্রাসন। এই সমুদয় গ্রাম লইয়াই কালীকচ্ছের সমাজ। এতবড় একটা বিরাট প্রবল পরাক্রান্ত সমাজের বুকের উপরে বসিয়া এরূপ ধর্ম্মদ্রোহিতাচরণ সোজা কথা ছিল না। গ্রামের লোকও দেশেরলোক ক্ষেপিয়া উঠিল। শোনা যায় আনন্দচন্দ্রকে না কি কেহ কেহ এই মহাপাপের শাস্তি দিবার জন্য প্রাণে বধ করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু আনন্দচন্দ্র সে সকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। প্রাণ বড় না সত্য বড়, এই ভাবিয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাকেই ধরিয়া রহিলেন। সাধুমুখে শুনিয়াছি সত্য-রক্ষা ও বীর্য্যধারণ প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদের উপরেই আনন্দচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন গড়িয়া

উঠে। মতবাদের দ্বারা সত্য ধর্ম্মজীবনের বিচার হয় না। মতবাদ ধর্ম্মের অত্যন্ত বাহিরের খোসা। মতবাদ মনোময় কোষের আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আত্মার মণিকোটায় সর্ব্বদা পৌঁছায় না। আনন্দচন্দ্রের প্রথম যৌবনের মতবাদ সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় শেষ বয়সে অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ করিবার পরে তাঁহার ধর্ম্মমত ব্রহ্মসমাজের প্রচলিত মতবাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। শেষ বয়সে তিনি সকল ধর্ম্মকেই সত্য বলিয়া মনে করিতেন। যে যে নামেই বা যে ভাবেই ইষ্টদেবতার ভজনা করুক না কেন, সে ভজনা যদি সরল এবং আন্তরিক হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারাই সে মুক্তি এবং সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিরোধের দ্বারা সত্য ধর্ম্মজীবনের আলোচনা হয় না। এসকল ভেদ-বিরোধকে যে ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারে এবং জগতের প্রত্যেক উপাসকের উপাস্যের মধ্যেই আপনার অন্তরের দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, সেই সত্যধর্ম্ম লাভ করে। আনন্দচন্দ্র শেষজীবনে পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়ের মতন এই উদার ও সার্ব্বজীবন আধ্যাত্মিক আদর্শই প্রচার করিয়াছিলেন। এই অবস্থালাভের পরে তিনি আনন্দস্বামী নামে পরিচিত হয়েন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জীবন ও চরিত্র পিতা এবং পিতামহের সাধনের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্রচন্দ্র ঢাকা হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। সে আজ পঞ্চাশ বৎসরের কথা। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা শেষ করিতে পারেন নাই। ১৮৭২ কি ৭৩ ইংয়াজীতে তিনি কলেজ হইতে বিতাড়িত হয়েন। সে সময়ে মেডিক্যাল কলেজে মিলিটারী ক্লাসে ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি ছাত্রদের অত্যাচারে নিরীহ বাঙ্গালী ছাত্রেরা জড়সড় হইয়া থাকিত। মেডিক্যাল কলেজের থিয়েটারে অধ্যাপকেরা আসিয়া বক্তৃতা দিতেন। ক্লাসের সময় ফিরিঙ্গি ছাত্রদের মধ্যে দু'চার জন আসিয়া সামনের বেঞ্চগুলি দখল করিয়া রাখিত। নিজেদের সগোত্রদিগকেই সেই বেঞ্চে বসিতে দিত। বাঙ্গালী ছাত্রেরা বসিতে গেলে তাহাদিগকে ধমক দিয়া সরাইয়া দিত। ধমকে না হইলে অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একদিন মহেন্দ্রচন্দ্র ক্লাসে ঢুকিয়া দেখিলেন যে পিছনের বেঞ্চগুলি ভরিয়া গিয়াছে; কেবল সামনের বেঞ্চেই ফিরিঙ্গি ছাত্রদের বসিবার জায়গা আছে। তিনি সেখানে বসিতে গেলেন। ফিরিঙ্গি ছাত্রদুটী হাঁটু ছড়াইয়া দিয়া তাঁহার বসিবার স্থানটা

অধিকার করিল। তিনি তখন তাঁহাদিগকে সরাইয়া নিজের জন্য একটু জায়গা করিয়া লইলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত মহেন্দ্রচন্দ্রের বাঙ্গালী সতীর্থেরা অসাধারণ কুতুহলপরবশ হইয়া তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। মহেন্দ্রচন্দ্র সেই জোর করিয়া ফিরিঙ্গিদিগের মাঝখানে বসিয়া পড়িলেন, অমনি তাহারা হাততালি দিয়া ফিরিঙ্গির উপরে বাঙ্গালীর জয়ঘোষণা করিয়া উঠিল। এই নিদারুণ অপমানের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া ফিরিঙ্গিরা আস্তিন গুটাইয়া মহেন্দ্রচন্দ্রকে আক্রমণ করিতে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই অধ্যাপক ক্লাসের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই সমরও থামিয়া গেল। ক্লাস ভাঙ্গিবামাত্রই ফিরিঙ্গিরা বাঙ্গালীদের উপরে চড়াও করিল। তখন দুইদলে একটা তুমুল লড়াই বাধিয়া গেল। যাহারা পারিল, ঘুষাঘুষি করিল। যাহারা এবিদ্যা শেখে নাই, তাহারা বেঞ্চের পায়া ও গ্যালারীর কাঠ খুলিয়া শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমে লড়াইটা গোলদীঘি পর্য্যন্ত গড়াইল। ফিরিঙ্গিরা মহেন্দ্রচন্দ্রকে জলে ফেলিয়া ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার পরে সাত-আটদিন পর্য্যন্ত কলিকাতার কোন টোলার ভিতর দিয়া এ ফিরিঙ্গিদের এবং ফিরিঙ্গিটোলার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীদের যাওয়া অসাধ্য ছিল। অসহায় বাঙ্গালী দেখিলেই ফিরিঙ্গিরা তাহাকে মারিত, অসহায় ফিরিঙ্গি দেখিলেই বাঙ্গালীরা তাহার উপরে এই বৈরীতার শোধ তুলিত। মহেন্দ্রচন্দ্র এই মারামারির মূল বলিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে দণ্ডিত করেন। মহেন্দ্রচন্দ্র তখন বোধহয় চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন। একবৎসর পরেই কলেজ হইতে পাশ করিয়া ডাক্তারের সনদ লইয়া বাহির হইবার কথা। কিন্তু বিধাতার তাহা ইচ্ছা ছিল না। মহেন্দ্রচন্দ্র পাশ না দিয়াই কলেজ ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু চার বৎসরের শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। পাশ না করিলেও তিনি অল্পদিনের মধ্যেই দেশে যাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া একজন অতি সুনিপুণ চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন।

১৮৭৫ ইংরাজীতে আমি কলিকাতায় আসি। সেই সময়েই মহেন্দ্রচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্য-সাধনের দিকে আমাদের ইংরাজী-নবীশদের চোখ পড়িয়াছিল। ৺নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু-মেলার প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালী যুবকদিগকে ব্যায়াম-শিক্ষাতে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ৺ডাক্তার হরিশচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয়ও পুস্তক প্রচার করিয়া নির্ব্বীর্য্য বাঙ্গালীদিগকে বীর্য্যবান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

মহেন্দ্রচন্দ্রও কলেজ ছাড়িয়াই স্বদেশের হিতকল্পে এবিষয়ে মনোনিবেশ করেন, এবং কবিবর রামপ্রসাদের জীবনীলেখক ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ এবং ৺ডাক্তার তারানাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গে মিলিয়া "যৌবন-সুহৃদ" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কলিকাতায় আসিয়াই এই "যৌবনসুহৃদে"র ভিতর দিয়াই আমি প্রথমে মহেন্দ্রচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হই। গ্রন্থখানি এখন লোপ পাইয়াছে; হরিশচন্দ্রের "জীবনরক্ষক" বোধহয় এখন খুঁজিয়া পাওয়া না। কিন্তু সেকালে এই দুইখানি পুস্তকে শিক্ষার্থী বাঙ্গালী যুবকদিগের অশেষ উপকার-সাধন করিয়াছিল। সেই সময় হইতেই মহেন্দ্রচন্দ্রের অন্তরে স্বাদেশিকতার প্রেরণা জাগিয়া উঠে। সে সময়ে মনোমোহন বসুর

"দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন"

এই গানটা আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল। আমরা পথেঘাটে সর্ব্বদাই গাহিয়া বেড়াইতাম—

"তাঁতী কর্ম্মকার করে হাহাকার
সূতা জোটা বৈলে অন্ন মেলা ভার
হায়রে দেশের কি দুর্দ্দিন!

সব গানটা মনে নাই। আর একটা পদে ছিল—

ছুঁচ সূতা পর্য্যন্ত আসে তুল হ'তে
দিয়াশালাই কাটি তা'ও আসে পোতে
খেতে শুতে যেতে প্রদীপটী জ্বালিতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

শেষ পদটী ছিল—

আজ যদি এরাজ্য ছাড়ে ভূসরাজ
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ?
ধরিবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ?
বাকল, চেনা, ডোর কৌপীন?

কলেজ ছাড়িয়া মহেন্দ্রচন্দ্র দেশের এই পরাধীনতা কি করিয়া দূর হয়, তাহার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার বাজারে রায় ব্রাদার্সের কালি বলিয়া যাহা প্রচলিত, তাহা মহেন্দ্রচন্দ্রের ব্যবস্থাতেই প্রস্তুত হয়। ইহার পূর্ব্বে আমাদের দেশে ময়রা হরিতকী প্রভৃতি দিয়া কালি প্রস্তুত হইত না। বিলাতী কালি অর্থাৎ রাসায়নিক বা কেমিক্যাল কালি বিলাত হইতেই আসিত।

পটুয়াটোলা লেনে মহেন্দ্রচন্দ্র একটা পোড়ো বাড়ীতে থাকিতেন। সাড়ম্বরে মুদ্রণে ঐ বাড়ীতেই রায় ব্রাদার্সের কালির কারখানা প্রথম খোলা হয়। এই কালি যখন প্রথম কলিকাতার বাজারে বাহির হয় তখন স্বদেশাভিমানী ছাত্রমণ্ডলে কি যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়াছিল, তাহা এখনও মনে আছে। ষ্টিফেনের কালির সঙ্গে রায় ব্রাদার্সের কালি মিলাইয়া আমরা ক্রমে ইংরাজের সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছি ভাবিয়া গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম।

তখনও বিলাতী কাপড়ের বিরুদ্ধে কোনও তীব্রভাব জাগে নাই। কিন্তু এসম্বন্ধেও ইংরাজের পরাধীনতা হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষা অল্পে অল্পে উদ্রিক্ত হইতেছিল। মহেন্দ্রবাবু কলেজ ছাড়িয়া এইদিকেও মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁতের উন্নতি না করিতে পারিলে বিলাতী কলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতা অসম্ভব ভাবিয়া তিনি কলের তাঁত তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে চেষ্টা কতটা ফলবতী হইয়াছিল ঠিক মনে নাই। কিন্তু সেই সময় হইতেই তিনি শিল্পজাতসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার সাধনায় প্রবৃত্ত হন। সে সাধনা চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরকাল নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে মহেন্দ্রচন্দ্র দেশে যাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে প্রচুর উপার্জ্জন হইলেও কেবল ডাক্তারি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই। চাষবাসের উন্নতি করিবার জন্য নিজের তত্ত্বাবধানে লোক রাখিয়া চাষ করিতে আরম্ভ করেন। ছুরী কাঁচি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিলাত হইতে আমদানী হইতেছে এবং ইহার ফলে দেশের কামারেরা ও তাঁতীদিগের মতন নিজেদের ব্যবসায় ছাড়িয়া নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে দেখিয়া তিনি নিজের বাড়ীতে একটা লোহার কারখানা খুলিয়া উৎকৃষ্ট ছুরী কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এসকল কর্ম্মে নিজে ধনবান হইবেন, এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার কখনও ছিল না। অর্থলোভে নহে, কিন্তু বিশুদ্ধ স্বদেশ প্রেমের প্রেরণায় গ্রামের চাষী ও কর্ম্মকারদিগের শিক্ষার উন্নতিসাধনের জন্যই তিনি এসকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। লোহার কারখানা বাড়ীতে এখনও আছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে যারা কামারের কাজ শিখিয়াছিল, তারা এখন নিজেরা অতি উৎকৃষ্ট ছুরী কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গেল বছর কুমিল্লা যাইয়া ইহাদের হাতে গড়া দা, ছোট বটী, ছুরী ও কাঁচি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। শীড্‌স্ বা শেফিল্ডে কলেতে যে সকল ছুরী কাঁচি প্রস্তুত হয়, আমাদের দেশের হাতে গড়া এসকল ছুরী কাঁচি অপেক্ষা তাহা কিছুতেই শ্রেষ্ঠ

নহে। অতএব আমরা যদি আমাদের নিজের হাতে এসকল গড়িয়া স্রষ্টার যে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করে, বিলাতের কারখানার মজুরদিগের কল্পনাতেও তাহা আসিতে পারে না আমাদের চিত্তের সত্য প্রাণটাকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে য়ুরোপ ও আমেরিকার অনুবর্ত্তন করিয়া কলকারখানা খুলিলে চলিবে না। মহেন্দ্রবাবু ইহা বহুদিন হইতে বুঝিয়াছেন। এইজন্য কোনও প্রকারেই তিনি কল-কারখানার সমর্থন করেন না। কিন্তু আধুনিক জড়বিজ্ঞানাদির সাহায্যে যাহাতে হাতে গড়া শিল্পের উন্নতি হয়, তাহারই পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

মহেন্দ্রচন্দ্র একদিকে একজন অতি নিষ্ঠাবান সাধক। অন্যদিকে আবার একজন অক্লান্ত শ্রমশীল কর্ম্মী। আমাদের দেশে সচরাচর যাঁহারা পরমার্থসাধনে নিযুক্ত হন, তাঁহারা বৈষয়িক বা ব্যবহারিক কর্ম্মসাধনে অত্যন্ত উদাসীন হইয়া পড়েন, ধর্ম্মসাধন এবং কর্ম্ম সাধনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যস্থাপন করিতে পারেন না। এই সামঞ্জস্যই মহেন্দ্রচন্দ্রের জীবনের বিশেষত্ব। সাধন-ভজনে যেমন তিনি কখনও অবহেলা করেন না, ব্যবহারিক কর্ত্তব্যপালনেও সেইরূপ বিন্দু পরিমাণে ক্লান্ত বা শিথিল হয়েন না। ভোর রাত্রে উঠিয়া নিজের নিত্যকর্ম্মসাধন করেন। বাড়ীর ভিতরেই তাঁহার পিতৃদেব ও মাতাঠাকুরাণীর সমাধি আছে। এবারে যাইয়া দেখিলাম এই সমাধির একটা সুন্দর মন্দির গড়িয়াছেন। এই মন্দিরের চারিদিকের বারান্দায় তাঁহার পিতাঠাকুরের অনেক মন্ত্রশিষ্য ও অন্যান্য অতিথি-অভ্যাগত সর্ব্বদাই আশ্রয় লইয়া থাকেন। এই মন্দিরে তিন-বেলা সঙ্কীর্ত্তন ও আরতি হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই মহেন্দ্রবাবু মন্দিরের ভোরের আরতি শেষ করিয়া দৈনন্দিন কর্ম্মসাধনে বাহির হন। প্রথমে রোগী দেখা। তার পর কারখানায় ও তাঁতঘরে যাইয়া সকল কাজের তত্ত্বাবধান করা। এই সকল কাজে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া যায়। তখন ঘণ্টাখানেকের জন্য তিনি নিদ্রা যান। তাহার পরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বাড়ীর ব্রহ্মমন্দিরে যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা হয়। এই দৈনিক উপাসনা ৺আনন্দস্বামী মহাশয়ের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্রচন্দ্রের এই ব্রহ্মোপাসনার একটু বিশেষত্ব আছে। এই উপাসনার সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সমুদয় খাদ্যদ্রব্য আচার্য্যের সম্মুখে সাজান থাকে। উপাসনা শেষ হইয়া গেলে মহেন্দ্রচন্দ্র বলেন যে, ভজন আর ভোজন উভয়ই ব্রহ্মপূজার অঙ্গস্বরূপ। সাধক নিজে ভোজন করিতেছেন এ অভিমান পরি-

ত্যাগ করিবেন। এই দেহপুরের মধ্যেই ইষ্টদেবতা বসিয়াছেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই তৃপ্তির জন্য যে ভোজন করে, তার ভোজনই সার্থক হয়। সেই ভোজনের সঙ্গে ভজনের কোনওই পার্থক্য থাকে না। গীতায় ভগবান কহিয়াছেন যে জীবনে যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, তাহাই আমাকে অর্পণ করিবে। এই উপদেশ অনুযায়ী প্রতিদিনের ভোজনও তাঁহাকেই অর্পণ করিতে হয়। এই ভাবে উপাসনার শেষে উপাসকগণকে তিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করেন। তখন সকলে সেইখানে বসিয়াই কলাপাতা পাতিয়া আহারে প্রবৃত্ত হয়েন। এই প্রতিদিনের ভোগ আরতি দেখিবার জিনিষ। এ সময় মহেন্দ্রচন্দ্রের বাড়ীর ব্রহ্মমন্দির এবং তাহার প্রাঙ্গন শ্রীক্ষেত্রে পরিণত হয়। এখানে এসময়ে কোনও জাতিবিচার থাকে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ এমন কি যাহাদিগকে অন্ত্যজ বর্ণ বলে তাহারা পর্য্যন্ত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করেন। উৎসবাদি উপলক্ষে মন্দিরের ভিতরে সকলের স্থান হয়। তখন উঠানে পর্য্যন্ত সারি সারি লোক বসিয়া যান। আনন্দ স্বামী মহাশয়ের অনেক মুসলমান মন্ত্রশিষ্য আছেন তাঁহারাও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া ভজন ও ভোজন করিয়া থাকেন। একটা গণ্ডগ্রামের মাঝখানে হিন্দু-সমাজের বুকের উপরে গোঁড়া-ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যদিগের দৃষ্টিগোচরে প্রতিদিন এইরূপ ভজন এবং ভোজন চলিতেছে। কিন্তু ইহার ভিতরে এমন একটা ধর্ম্মের প্রভাব রহিয়াছে যে সকলেই এই অসামাজিক ব্যাপারকে যে কেবল নীরবে সহিয়া যান তাহা নহে, কিন্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। এখানে আমরা বাংলার প্রাণ-বস্তুর একটা বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হই।

মহেন্দ্রচন্দ্র গ্রামের পঞ্চায়তের প্রেসিডেণ্ট; এ কথা শুনিলে অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন। যখন স্বদেশী আন্দোলনের বাণচাল ডাকিয়া উঠিয়াছিল, আর আমরা দেশের লোককে বর্ত্তমান সরকারের সঙ্গে সকল প্রকারের সংস্রব বর্জ্জন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিলাম, সেই সময়েই নূতন পঞ্চায়ত সভার প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। সেই সময়েই পঞ্চায়তের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়েন। আমাদের ইহা ভাল লাগে নাই। মহেন্দ্রচন্দ্রের স্বদেশিকতা আমাদের কাহারও স্বাদেশিকতা হইতে কম ছিল না। বরঞ্চ আমরা প্রায় কেহই তাঁহার মতন আজীবনব্যাপী এই স্বাদেশিকতার সাধনা করিয়া আসি নাই। তাঁহাকে এ সময়ে ইংরাজের এই নূতন চাকরী লইতে দেখিয়া মনে মনে আমরা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম।—ঠিক মনে পড়ে না, এ বিষয়ে তাঁহার

সঙ্গে কোনও কথা হইয়াছিল কিনা। কিন্তু এ কথা বেশ বুঝিয়াছিলাম যে মহেন্দ্রচন্দ্র বহুদিন হইতে নিজের ইচ্ছাকে তাঁহার ইষ্টদেবতার চরণে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছেন। কোনও বিষয়ে তাঁহার নিজের সংকল্প-বিকল্প নাই। কোনও কর্ম্মে আমাদের মতন তাঁর অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই। ভগবান তাঁহার হাতের নিকটে যখন যে কর্ম্ম আনিয়া দেন, তিনি অন্তরের দাস্যভাবের প্রেরণায় যথাসাধ্য সেই কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি পঞ্চায়তের প্রেসিডেণ্ট হইতে কোনও দিন চাহেন নাই, কল্পনাও করেন নাই। অপ্রার্থিত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে যখন এই কর্ম্মভার তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি ইষ্টদেবতার আদেশ বলিয়া তাহা মাথা পাতিয়া লইলেন। জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহাকেই তিনি বিধাতার বিধান বলিয়া বরণ করিয়া লয়েন। ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই সংকল্পবিকল্পাদির দ্বারা বিচলিত হয়েন না। প্রতি মুহূর্ত্তের কর্ম্ম প্রতি মুহূর্ত্তে সাধন করিয়া যান; পর মুহূর্ত্তে কি আসিবে, তাহার জন্য আকুলি বিকুলি করেন না।

সতের বছর পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময় মহেন্দ্রবাবু একটা দিয়াশিলাইয়ের কল প্রস্তুত করেন। ১৯০৬ কলিকাতার কংগ্রেসের সময় এই কলের নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। এই কলে কাঠিকাটা, বাক্স তৈয়ার, এ সকল কাজই করিবার ব্যবস্থা ছিল। এই সতের বৎসর কাল তিনি ক্রমে এই কলের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে তাঁহার কলে একটা দিয়াশিলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ডাঃ নন্দীর নারায়ণগঞ্জের কলের দিয়াশিলাই কোনও অংশে বিদেশের আমদানী দিয়াশিলাই অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। কুমিল্লায় হাওড়ায় এবং অন্যান্য স্থানেও এই কল এখন চলিতেছে। কলিকাতায়ও মহেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহুর বাগানে একটা দিয়াশিলাইয়ের কারখানা খুলিয়াছেন। এই কারখানায় মহেন্দ্রবাবুর দিয়াশিলাইয়ের কলও প্রস্তুত হয়। এই কলের জন্য চারিদিক হইতে এত গ্রাহক জুটিতেছে যে সকলকে সময়মত এই কল যোগান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যাঁরা ডাঃ নন্দীর [illegible] করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁরা যদি নির্লোভ হইয়া সামান্যলাভে এই কারবার চালাইতে পারেন, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই অন্ততঃ এই বাংলা দেশ হইতে বিদেশী দিয়াশালাইয়ের ব্যবসা একেবারে উঠিয়া যাইবে। মহেন্দ্রবাবুর কারখানা হইয়া যাঁহারা এই কল কিনিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে এরূপ মতও আছে যে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই

বিদেশের আমদানী দিয়াশলাইয়ের অপেক্ষা সস্তায় নিজেদের দিয়াশলাই তৈরী করিতে হইবে। কাজে ইহা কতটা হইয়া উঠিবে বলা যায় না। ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভের লোভ ছাড়া বড়ই কঠিন। মহেন্দ্রচন্দ্র স্বার্থবোধে এই কলের উদ্ভাবন করেন নাই। স্বদেশের সেবাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্য তিনি তাঁহার দিয়াশলাইয়ের কল পেটেণ্ট করিতে রাজী হন নাই। তিনি বলেন কলের স্রষ্টা ত আমি নই। ভগবদ্ প্রেরণাতেই এই কল উদ্ভাবিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার উপরে আমার কোনও স্বত্ব-স্বামীত্ব নাই, ভগবানের সৃষ্টির উপরে সকল মানুষের সমান অধিকার। এই কলের উপরেও তাহাই। যিনি পারেন তিনি এই কল নিজে প্রস্তুত করুন; যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি এই কল নিয়া দিয়াশলাইয়ের ব্যবসা করুন। যত বেশী কল প্রস্তুত হয়, ততই মঙ্গল।

গেল বছর, বহুদিন পরে কালীকচ্ছে গিয়াছিলাম। সেই ষোল বছর আগে অরবিন্দ বাবুর একসঙ্গে যে মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী গিয়াছিলাম, তাহার পরে এই প্রথম আবার সেখানে যাইলাম। এবারে গিয়া দেখিলাম যে মহেন্দ্রবাবু লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য নিজের বাড়ীতেই কারখানা তাঁতে দিয়াশলাইকাঠি; নিজের বাড়ীর কারখানায় চরকা প্রস্তুত হইতেছে। গ্রামে গরীব লোকদিগের মধ্যে এ সকল চরকা বিলাইয়া দেওয়া হয়। যাহারা পারে, তাহারা নিজে তুলা কিনিয়া সূতা কাটে। যাহাদের সে সম্বল নাই, তাহাদিগকে মহেন্দ্রবাবু তুলা পর্য্যন্ত জুগাইয়া থাকেন। এই সকল চরকায় যে সূতা কাটা হয়, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া তাঁহার তাঁতে কাটিয়া লইবার জন্য সেই সকল সূতা কিনিয়া লওয়া হয়। এইভাবে গ্রামের বস্ত্র-সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বহুদিন হইতে এই চেষ্টা চলিতেছে। কংগ্রেস যখন চরকার দিকে দৃকপাতও করেন নাই, হাতে কাটা সূতায় তাঁতের কাপড় বুনিয়া বর্ত্তমান বস্ত্র-সমস্যার মীমাংসা সম্ভব কি না, এ প্রশ্নটা যখন কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মনের কোণেও উদিত হয় নাই, তখন হইতে মহেন্দ্রচন্দ্র এইভাবে ইহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এখনও করিতেছেন। তবে তাঁহার এই অধ্যবসায়ের অন্তরালে কোনও প্রকারের বিদ্বেষ-মূলক স্বদেশপ্রেম লুকাইয়া নাই। মহেন্দ্রবাবু হাতে কলমে কাজ করিয়া দেখিতেছেন যে আজি কালি চরকায় যে সূতা কাটা হয়, তাহার তাঁতে টেকসই কাপড় প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। এ সূতা তাঁতের টান সহিতে পারে না। টানা এবং পড়েন, দুই দিকেই চরকার সূতা দিয়া কাপড় বুনিতে গেলে অবধা সূতা নষ্ট হয়, এবং সময়েরও অপব্যয়

হইয়া থাকে। সে কাপড়ও ভাল হয় না। সুতরাং একটা জেদ বজায় রাখিবার জন্য তিনি কলের সূতা এখন ও একেবারেই বর্জ্জন করিতে চাহেন না। চরকায় সূতা কাটিবার নিপুণতা যদি পাইবে ক্রমে কলের সূতা একেবারেই বর্জ্জন করা যাইতে পারিবে। এখন তাহা অসম্ভব। এবারে গিয়া দেখিলাম যে মহেন্দ্রবাবু পাট হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার একটা কল বা চরকা তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা ফলবতী হইলে পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে পাটের ব্যবসায় একটা যুগান্তর আনিয়া দিতে পারিবে। পাটের সূতা তৈয়ার করিবার কুশলতালাভ করিতে পারিলে সেই সূতা তাঁতে ফেলিয়া চট-প্রভৃতি প্রস্তুত করা কঠিন হইবে না। যারা পাটের চাষ করে, তারা নিজেরাই অন্ততঃ কতকটা পরিমাণে সেই পাট দিয়া চট প্রস্তুত করিতে পারিবে। পাটের চরকাটা এখনও পাকাপাকিরকমে তৈয়ার হইয়াছে কিনা জানি। কিন্তু এই বয়সের মহেন্দ্রচন্দ্র যে এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদাই মাথা খাটাইয়া থাকেন, ইহাদ্বারা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

ষোল বছর পূর্ব্বে অরবিন্দ বাবুর সঙ্গে যখন কালীকচ্ছে যাই, তখনকার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বরিশাল হইতে মৈমনসিংহ এবং মৈমনসিংহ হইতে যখন কুমিল্লার দিকে যাত্রা করি, তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সব ডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লশঙ্কর সেন মহাশয় কালীকচ্ছের প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েত মহেন্দ্রচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে সম্ভবতঃ আমি কালীকচ্ছে যাইব। যাহাতে কালীকচ্ছে কোনও স্বদেশী-সভা না হয়, তিনি যেন সেদিকে দৃষ্টি রাখেন। মহেন্দ্রচন্দ্র উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন :—'ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কোনও সভাই হইবে না—সাব-ডিভিসনাল অফিসার মহাশয়কে এই কথা যাইয়া বলিও।' ইহার উপরে আর কথা চলে কি? আমাদের প্রথম-যৌবনে একটী ব্রহ্মসঙ্গীত খুবই প্রচলিত ছিল। তাহার প্রথম পদটী—

যিনি রাজার রাজা বিশ্ব যাঁর প্রজা, জান না কে যদি তুমি পুত্র তাঁর।

মহেন্দ্রচন্দ্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল শঙ্করকে সেই রাজার রাজার আদেশের প্রতীক্ষায় থাকিতে বলিলেন। সে আদেশ প্রতিরোধ করেন, [illegible] এমন সাধ্য নাই, সব-ডিভিসনাল অফিসারেরও নাই, [illegible]। আমরা কালীকচ্ছে গেলাম; সভাও হইল। মহেন্দ্রচন্দ্র [illegible] বলিয়াই সব-ডিভিসনাল অফিসারের আদেশের উল্লেখ করিলেন। ভগবানের ইচ্ছাতেই ঐ সভা হইতেছে। সে ইচ্ছার প্রতিরোধ [illegible] কে?

মহেন্দ্রচন্দ্র "সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী সাধক।" সুতরাং তিনি কো-অপারেটর বা সহযোগীও নহেন, নন্-কো-অপারেটর বা অসহযোগীও নহেন। তিনি জানেন যে এই বিশ্বে এক ভিন্ন দুই নাই। এক শক্তি, এক জ্ঞান, এক ইচ্ছা, এক প্রেম এই বিশ্বে বিচিত্রভাবে খেলা করিতেছে। তিনি জানেন,

হরি হে তুমি আপনি নাচ,
আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে।
মানুষ ত সাক্ষী-গোপাল
মিছে আমার আমার বলে।

এই সর্ব্বভূতে-ব্রহ্মদৃষ্টি যে সাধন করিতে যাইবে, সে সহযোগী বা অসহযোগী এক ব্রহ্মযোগী ভিন্ন কোনও যোগীই হইতে পারে না।

বৈশাখের "সাহিত্যে" সাম্যের কথা লিখিতে যাইয়া মতবাদের সাম্য ও সাধনের সাম্য এই দুইয়ের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম মহেন্দ্রচন্দ্র আজীবনই ঘোরতর সাম্যবাদী। কিন্তু আমরা এই সাম্যবাদকে কেবল একটা মতবাদেই আটকাইয়া রাখিলাম; মহেন্দ্রচন্দ্র জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা ইহাকে প্রতি-দিনের আচার-আচরণের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছেন। একদিন তাঁহাকে আমার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করি তখন কলিকাতায় আসিয়া তিনি শিবপুরে ডাক্তার পতি শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁর একজন সঙ্গী ছিলেন; তিনি ভৃত্য-শ্রেণীর লোক। আমার বাড়ীর লোকেরা মহেন্দ্রচন্দ্রের আমার, আমার এক মাসাতো ভাইয়ের জন্য তিনখানা পাত পাতিয়া আমাদিগকে আহার করিতে ডাকিলেন। মহেন্দ্রচন্দ্র নিজের আসনে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"আর একখানা আসন ত চাই। আমার সঙ্গের লোকটীর জায়গা ত করেন নাই।" কথাটায় লজ্জায় আমার মাথা যেন কাটিয়া গেল। বুঝিলাম আমার সাম্যবাদে ও মহেন্দ্রচন্দ্রের সাম্যবাদে কি প্রভেদ। তাঁর চক্ষে যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য উঠিয়া গিয়াছে; এ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অরবিন্দ মহেন্দ্রচন্দ্রকে বাংলার টলষ্টয় কহিয়াছেন। কিন্তু বাংলার জমীতে টলষ্টয় জন্মাইতে পারে না। রুষেই কেবল টলষ্টয়ের জন্ম সম্ভব। বাংলায় বা ভারতবর্ষে টলষ্টয়ের সাম্য মৈত্রী যে সাধন করিতে যাইবে, তাহার জীবন ও চরিত্র অন্তরূপ ফুটিয়া উঠে। মহেন্দ্রচন্দ্রের জীবনে ও চরিত্রে এই কথাটারই প্রমাণ পাইয়াছি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বাঙ্গালীর কীর্ত্তি।

বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব-নবরূপে নব-নবভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মেকর্ম্মে জ্ঞানে ও স্বাধীনতায় সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাণ, বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল সেই প্রাণেরই বাহিরাবরণ। বাঙ্গালার ঢেউ-খেলান শ্যামল শস্য ক্ষেত্র মধু-গন্ধ-বহ বাতাস, বাঙ্গালার নদ-নদী, খাল-বিল, বাঙ্গালার মাঠ, তালগাছ ঘেরা বাঙ্গালার পুষ্করিণী, ফুলভরা ফুলবাগান, বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গালার বাতাস, বাঙ্গালার গঙ্গাজল, বাঙ্গালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাঙ্গালীর আচার বাঙ্গালার সমগ্র ইতিহাসের ধারা সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র স্রোতে ভাসিতেছে—দুলিতেছে।

বাঙ্গালার গগন পবন মুখরিত করিয়া যে আনন্দধ্বনি উঠিয়াছে তাহা সত্যই উপলব্ধি করিবার বিষয়। কে জানিত বাঙ্গালার যুবকের দলের মধ্যে এমন ভাবের প্রেরণার সঞ্চার হইবে। কে জানিত তাহাদের মধ্যে এমনি একদিন মুক্তির শুভাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে। কে জানিত যে তাহারা গোলামখানার লৌহ-নিগড় ভাঙ্গিয়া বাহিরের মুক্ত আলোয় মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইবে। ধন্য বাঙ্গালার যুবকবৃন্দ! ধন্য তোমাদের ধৈর্য্য-সাহস! ধন্য তোমাদের আশাভরসা! আজ তোমাদিগকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব?

আশা নিরাশার মাঝখানে দাঁড়াইয়া যখন ভাবিতেছিলাম বুঝি আর বাঙ্গালার মুখরক্ষা হ'ল না, বুঝি বাঙ্গালা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পশ্চাতেই পড়িয়া থাকিবে, এই আশঙ্কায় ও উদ্বেগে যখন হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল ঠিক সেই সময়ই বাঙ্গালার যুবকদলের নবজীবনের সঞ্চার হইল তাহারা এক-যোগে স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মানুষের মত বাহিরে মুক্তিরপথে আসিয়া দাঁড়াইল। কে বলে বাঙ্গালা মরিয়াছে, কে বলে বাঙ্গালা প্রাণহীন হইয়াছে কে বলে বাঙ্গালার প্রাণ নাই? বাঙ্গালা মরে নাই—মরিতে পারে

না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে বাঙ্গালা একদিন সকলের অগ্রণী হইয়াছিল, সে বাঙ্গালা এত শীঘ্র মরিতে পারে না!

কঠোর পরিশ্রমের পর যেমন একটা ক্লান্তি একটা অবসাদ আসা স্বাভাবিক, তেমনি স্বদেশীযুগের কঠোর সাধনার পর বাঙ্গালার কর্ম্মক্লান্ত দেহে একটা অবসাদ আসিয়াছিল, তাই বাঙ্গালা কিছুদিনের জন্য অসাড় নিস্পন্দ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে শুধু বাঙ্গালা কেন সমগ্র ভারতটাই সুপ্তিমগ্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল। নিজের পার্শ্বে ভারতের আবশ্যকতা আছে, তাই এমনি সময় বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষটাকে জাগাইবার জন্য একটা পাশবিক শক্তির দ্বারা ভারতকে মর্ম্মস্থানে আঘাত করাইলেন। তাই সেই কৌশলী-ধাতা পঞ্জাবের ব্যাপারে সমগ্র ভারতকে জানাইলেন, আর সেই সঙ্গে খেলাফৎ ব্যাপারে বিশ্বের সমুদয় মুসলমানের চৈতন্যোৎপাদন করিবার জন্য আঘাত করিলেন, আঘাত না পাইলে কেহ জাগে না; তাইত জাগিল সুপ্ত ভারতের লুপ্তচেতনা ফিরিয়া আসিল, ভারতবাসী বুঝিতে পারিল তাহারা কি অবস্থায় "নিজ বাসভূমে পরবাসীরূপে" কালের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছে। আঘাতে আঘাত হইবামাত্র সে বেদনা ভারতের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অনুভূত হইতে লাগিল। অমঙ্গলের মধ্য দিয়াই ভারতবাসী দিব্যচক্ষে বিধাতার মঙ্গল ইঙ্গিত দেখিতে পাইল। তাই নবীন সাধনায় তাহারা আজ ব্রতী হইয়াছে। সে সাধনার দীক্ষাগুরু ঋষীকল্প ত্যাগী মহাত্মা গান্ধী, তিনি ভারতের মঙ্গল কামনায় যে মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশ সে মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া আমরা আজ নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

মহাত্মা গান্ধীর এক কথায় তখন, বিহারের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যারিষ্টার মিঃ মজহারুল হক প্রাসাদতুল্য সুবন্য বাসস্থান ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন নদীতীরে কুটিরবাসী হইলেন, ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন বিলাসব্যসন অতুল ঐশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিলেন, তখন মনে করিলাম হায়! বিশাল বাঙ্গালায় এমন কোন মহানুভব নাই যাহার জন্য আমরা বিহারবাসীর ন্যায় গৌরব অনুভব করিতে পারি? আজ বাঙ্গালায় চিত্তরঞ্জন ত্যাগের মহিমা দেখাইয়া আমাদিগকে সে গৌরব দান করিয়াছেন। আজ চিত্তরঞ্জন ধনী হইয়াও কাঙ্গাল সাজিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ টাকার পসার প্রতিপত্তি পায় ঠেলিয়া দিয়াছেন। তাই তাহার আকুল আহ্বানে বাঙ্গালার যুবকদল সাড়া দিয়াছে। যতদিন তিনি ত্যাগের দৃষ্টান্ত না দেখাইয়াছিলেন, ততদিন তাহার আহ্বানে একটি

প্রাণেও স্পন্দন আইসে নাই। আজ চিত্তরঞ্জন ত্যাগী সন্ন্যাসী, আজ তিনি ভোগবিলাস হইতে বিরত ও মুক্ত তাই তাঁহার সামান্য ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ প্রাণে ভাবের অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাজার হাজার যুবক তাহাদের চির অভ্যস্ত গোলামখানার বিষাক্ত বায়ু হইতে প্রকৃত মানুষের মত বাহিরের নির্ম্মল বায়ুতে মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুক্তির আহ্বানে আজ তাহারা সাড়া দিয়াছে। সাড়া যদি প্রাণের সাড়া হয় এ স্পন্দন যদি সত্যের স্পন্দন হয়, তবে জাতির সৌভাগ্যসূর্য্য উদয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিত। আর তাহা যদি না হয় ইহা যদি ক্ষণিক উত্তেজনার বিলাসমাত্র হয়, দুদিন পরে যদি এ স্পন্দন, এ উৎসাহ উদ্যম-সমস্তই অন্ধকারের হাহাকারে মিশাইয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে আমাদের ভাগ্যগগন চিরদিন এমনি অন্ধকারেই সমাচ্ছন্ন থাকিবে।

তাই বলি বাঙ্গালার যুবকদল! যে আহ্বানে আজ সকলে ছুটিয়া আসিয়াছ, সে আহ্বান ভুলিয়া গেলে চলিবে না। বহুদিনের পতিত ও পরপদদলিত ভারত তোমাদেরই মুখের দিকে সাগ্রহ নয়নে তাকাইয়া আছে। যদি হৃদয়ে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, যদি মনে কর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষ বলিয়া তোমাদেরও দাবী করিবার একটা অধিকার আছে তবে ঐ গোলামখানায় বিষাক্ত বায়ুতে আর ফিরিয়া গিয়া নিজেকে কলঙ্কিত করিও না। সেখানে মানুষ জন্মে না, সেখানে স্বভাবের বিকাশ হয় না; ওখানে শুধু মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিবার ফন্দি, শুধু অধীনতার পাশপাশে আবদ্ধ করিবার কৌশল জাল বিস্তার করিয়া রাখা হইয়াছে। যদি এ জগতের সমক্ষে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা থাকিলে পথ ভুলিয়া আর সেখানে যাইও না। যে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছ—যে পথ বাহিয়া আসিয়াছ, সেই পথেই চলিতে থাক, সে পথে বাধাবিঘ্ন অনেক আছে,—জানি ভয়ানক নির্য্যাতন উৎপীড়ন আছে—তাহাও জানি। তথাপি পথভ্রষ্ট হইলে চলিবে না. পর্ব্বতের ন্যায় অটল অচলভাবে থাকিতে হইবে। যত বিপদ আসে আসুক, মাথা বোঝা মাথা পাতিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হও—এই পথেই কৃত কার্য্যতার স্বর্ণমন্দিরে পৌঁছিতে পারিবে, ইহাই একমাত্র মুক্তির পথ। তবে চাই বিপদে ধৈর্য্য,—চাই আঘাত সহ্য করিবার মত শক্তি অর্জ্জন করা। সকলে এ পথের সন্ধান পায় নাই, সকলে বাহিরের নির্ম্মল বায়ুর আস্বাদ পায় নাই কিন্তু তাই বলিয়া সাহস হারাইও না। আজ যে তোমার আহ্বানে কান দেয় নাই, কাল সে আহ্বানে প্রাণে ছুটিয়া

আসিবে,জগতের সৌভাগ্য তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। যখন স্বদেশের ডাক আইসে সে আহ্বানকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। ভাই সত্যিকার আহ্বান আসিয়াছে তাই লক্ষ লক্ষ প্রাণ সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। তোমরা এতকালে যে ভারতের আশা ভরসা বলিয়া আঘাত সহিয়া আসিতেছ সে আজ তাহার যথার্থ পরিচয় দিতে বসিয়াছ। বাস্তবিক আজ তোমরা আশার আলো জ্বালিয়াছ, সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া যুবা, বৃদ্ধ নরনারী সকলে ছুটিয়া আসিবে।

মনে করিও না যে, ইহাতেই তোমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, বরং সম্মুখে তোমাদের অনন্ত কর্ত্তব্য প্রসারিত রহিয়াছে, সেই কর্ত্তব্যময় কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বারে সবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনও যাহারা জাগে নাই, তাহাদিগকে জাগাইতে হইবে। তাই বলি হে বঙ্গের যুবকবৃন্দ! যাও ছুটিয়া যাও বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে, মুক্তির বারতা নিয়ে সেখানে গিয়ে তোমাদের সাহায্যার্থে তোমার ভাই বোনদিগকে টানিয়া আন; তাহা হইলেই তোমাদের আশা-বাসনা পূরণ করা হইবে।

মীরজা।

মনের কথা।

(ছোট গল্প)

আজ আমি তোমাদের কাছে যা বলব তা গল্প নয়, উপাখ্যানও নয়, এ আমার এই অর্দ্ধদগ্ধ মনের নিভৃত কোণের নিহিত একটি গোপন কথা। জীবনে কোনদিন একথা কারো কাছে প্রকাশ করিনি, এবং এমন কাউকে বলে কখনও ভাবিওনি;—কিন্তু না জানি কোন্ অজ্ঞাত নিয়মের বলে সেই অতি গোপনীয় মনের কথাটি আজ তোমাদের সাম্নে প্রকাশ হ'য়ে প'ড়েছে, তাকে আর এ বুক্ষ অন্তরের আবহাওয়ার মধ্যে বন্ধ রাখ্‌তে পাচ্ছিনা; অবাধ্য শিশুর মত সে আজ আমার সমস্ত বাধা,

বিপত্তি, নিবারণ অগ্রাহ্য ক'রে নিজের মতে নিজের ঈপ্সিত গন্তব্য পথে ছুটে চ'লেছে।

বাল্যেই মাতৃপিতৃহীন হওয়ায় আমি এক অতিদূর আত্মীয়ের কাছে মানুষ হই। যৌবনের প্রারম্ভেই দুঃখের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'য়েছিল ব'লে আজ পর্য্যন্ত সে আমার অন্তরের পটে কোনও দাগ বসাতে পারেনি। ভালবাসার যে কিসুন,—তা'র স্বাদ জীবনে কখনও পাইনি। কিছুকাল পূর্ব্বে যা'ওবা একটু পেয়েছিলাম—আমার এ পোড়া অদৃষ্টে তা'ও সইল না।

আমার যখন ন' বছর বয়স, তখন আমার সেই পালক-পিসে মশাই আমার জীবনকে কোন্ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে দেন। তাঁর কথা শুধু আমি কানেই শুনেছি,—আর বিবাহের রাত্রে, সকলের পীড়াপীড়িতে শুভদৃষ্টির শুভ মুহূর্ত্তে মুখিবা একবার চোখেও দেখেছিলাম—কিন্তু তখন বুঝি নাই যে সেই দেখা জন্মের শেষ দেখা। বিবাহের ছমাস পরেই আবার শুনলাম, যা'র সঙ্গে আমার বিবাহ হ'য়েছিল,—সেই লোকটী নাকি ম'রে গেছে। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম আমার চেয়ে বড় পাড়ায় অনেক মেয়ে তাদের স্বামী মারা গেলে খুব চীৎকার ক'রে কেঁদেছিল, কিন্তু আমি শপথ ক'রে ব'লতে পারি আমার চোখ দিয়ে সেদিন এক ফোঁটাও অশ্রু পড়েনি; বরং আমার পিসীমা একটু কেঁদেছিলেন—বোধ হয় বা তিনি আমার চেয়ে তখন তাঁরই বেশী আপনার ছিলেন।

তার পর প্রায় এক বছর পরে যখন আমার এক ভাসুর এসে আমায় নিয়ে গেলেন তখন বরং একটু দুঃখ হ'য়েছিল; কিন্তু সে দুঃখ স্বামীহারা নারীর অন্তর্দাহ নয়—সখি বিরহিণী অজানা ব্যক্তির মানসিক বিচ্ছেদ যন্ত্রণা।

তা'রপর পিসীমা একদিনের জন্যও আর আমার খবর পর্য্যন্তও করেন নি; প্রথম প্রথম পিসেমশাই দু'একখানা চিঠি দিতেন, তা'র পর তা'ও বন্ধ হ'য়ে গেল।

শ্বশুরবাড়ী এসে ক্রমে ক্রমে দু'একজন পাড়ার মেয়ে ও বৌদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাদের সঙ্গে গল্প গুজব ক'রে ও শাশুড়ীর ফাই ফরমাস খেটে প্রায় তিন বছর কাটল।

ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও হ'ল, ক্রমে বুঝতে পারলাম, শ্বশুরবাড়ী কি, স্বামী কি? আজ আমি কতদূর হতভাগিনী! তিন বছর আগে যে জিনিষ হারিয়ে আজ পর্য্যন্ত আমি একবার তিনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি সে

জিনিষ নারীর কত আদরের,—তা' যে নারীর জীবন-মরণ, ইহকাল-পরকাল।

সেদিনের কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। একদিন আমাদের পাড়ায় একটি মেয়েদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছি; তাদের বাড়ী আমি প্রায়ই যেতাম। সেদিন দুপুরবেলা আমি, সে আর তা'র ছোট বৌদি ব'সে কত গল্প ক'চ্ছি এমন সময় 'পিয়ন' সবুজ খামে মোড়া সেই মেয়েটির নামে একখানি চিঠি দিয়ে গেল।

চিঠিখানা আস্‌তেই দুই নন্দে ভাজে কাড়াকাড়ি লেগে গেল—অবশেষে ছোট বৌদিরই জয় হল। মেয়েটি যখন দেখ্‌লে তা'র আর অধিক চেষ্টা বৃথা তখন সে বৌদির কাছে আত্মসমর্পণ ক'লে। বৌদি আস্তে আস্তে হাসিমুখে চিঠিখানা খুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প'ড়তে লাগ্‌লেন, আর মাঝে মাঝে নন্দিনীকে ঠাট্টার বাণে বিদ্ধ ক'রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌লেন। আমি নীরবে ব'সে ব'সে সেই চিঠি শুন্‌ছিলাম আর তাদের সেই ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ কচ্ছি'লাম। তখন আমার যে একটী মস্ত বড় দীর্ঘশ্বাস প'ড়েছিল, অত বড় দীর্ঘশ্বাস বোধ হয় জীবনে আমার আর কখনও পড়েনি। শকুনের ডানার শোঁ শোঁ শব্দের ন্যায় সে নিঃশ্বাসের শব্দ যেন এখনও আমার কাণের কাছে প্রতিধ্বনি তুল্‌ছে। হায়! সেদিন খুব ভাল ক'রেই বুঝেছিলাম আমি আজ পৃথিবীর মধ্যে কত বড় মূল্যবান জিনিষ হারিয়েছি;—আজ যে আমি পথের ভিখারিনী!

তার পর আর একদিনের কথা। সেদিন সেই মেয়েটির বর এসেছিল। সেই দিনের তার সাজসজ্জা, তা'র প্রফুল্ল মুখের হর্ষোজ্জ্বল ছবিখানি এখনও মনে পড়ে। এখনও মনে পড়ে—সেই মৌন সাঁঝের পূর্ব্বে রাস্তার ধারের ছাদের কোণে দাড়িয়ে স্বামীর আগমনের জন্য তা'র সেই ব্যগ্র প্রতীক্ষা। সেদিন সত্যিই আমি চোখের জল রোধ ক'র্ত্তে পারিনি। এতদিনের সঞ্চিত অন্তরের জমাট বেদনা আজ বরফ-গলা জলের মত আমার দুচোখ দিয়ে হুড়: হুড় ক'রে বন্যার মত ছুটে এসে নৈশ উপাধানটী সিক্ত ক'রে ফেলেছিল।

ঈশ্বর আমাকে সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত ক'র্‌লেও রূপ দিয়েছিলেন ষোল আনার উপর আঠার আনা,—বোধ হয় তার অভাবে আমার দুর্ভাগ্যের, দুঃখের ষোল আনা পূর্ণ হবেনা ব'লে!

সারা জীবনটী দুঃখের পসরা মাথায় ব'য়ে বিশ্বের দ্বারে কেবল জ্বালা আর যন্ত্রণা কুড়িয়ে অশ্রু ফেলে কাটিয়েছি;—সেই ভালবাসা কারো কাছ থেকে পাইওনি কোন ব্যক্তিকে কখনও দেবারও অবসর হয়নি। আঠার বছর

বয়স পর্য্যন্ত লোকের কাছে কেবল অনাদর আর অবহেলাই পেয়ে এসেছি। শুধু মাঝে মাঝে কেউ আমার রূপের তারিপটা ক'তো বটে,—আর তাই শুনে আমার হাসি চেপে রাখা ভার হ'য়ে উঠ্‌তো। মনে হ'ত এত' প্রশংসা করা নয়, নির্ম্মম উপহাস;—বিশ্বের সমস্ত সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য যে চির জীবনের জন্য বঞ্চিতা, তার মত অভাগিনীর আবার রূপ, সৌন্দর্য্য! মাঝে মাঝে মনে হ'ত যে যদি কোনও রকমে রূপটাকে নষ্ট ক'রে কুৎসিত কদাকার হবার উপায় থাক্‌তো তবে নিশ্চয় তাই ক'ত্তাম।

কিন্তু সেইরূপই একদিন আমার মস্ত কাজে লাগ্‌লো। আমার ভাসুর বাড়ীতে ক'টি ছেলে পড়াতেন তারা রোজ বাড়ী এসে প'ড়ে যেতো। জানি না—সলিলকে আমি প্রথম দিন কি অশুভক্ষণেই দেখেছিলাম, নইলে আমার এ পোড়া মনের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা এমন তীব্র হ'য়ে উঠ্‌চে কেন? তাইত' আজ আমার এ দুর্দ্দশা।

ব'ল্‌তে লজ্জা ক'রে—কিন্তু তবু আজ উপায় নেই। আসরে নাচ্‌তে নেমে আর ঘোম্‌টা টানা চলে না,—তাই আজ নির্লজ্জের মত সব কথাই ব'ল্‌তে হ'চ্ছে—অপরাধ ক্ষমা ক'রো।

সলিলের রূপ ছিলনা মোটেই;—রং তা'র শ্যামবর্ণ, চোখদুটি বেশ বড় বড়,—ভ্রূ দুটি কাজল পরা চোখের মত বেশ কাল;—মুখশ্রীও নেহাৎ মন্দ নয়। ওগো—তাই দেখেই ত' আমার অবাধ্য পোড়া চোখ সেদিন ম'জেছিল।

ব'ল্‌তে লজ্জা করে—তা'কে প্রথম দেখেই কি জানি কেন আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। তখন জান্‌তে পারিনি যে ভালবাস্‌লে মেয়েদের জাতি-কুল-মান সব যায়। ব'ল্‌তে পার তোমরা নারী পুরুষকে ভালবাস্‌লে তা'র এত বড় শাস্তি কেন হয়? পুরুষ ত' লক্ষ নারীকে ভালবাসুক,—কিম্বা তা'র ত' কিছু হবে না,—আর নারীরই কি বত দোষ!—

আর একটী কথা তোমরা আমায় ব'লে দাও—ভালবাসা পাপ কি? আমার অপরাধ শুধু আমি তাকে ভাল বেসেছিলাম; সে আমায় ভালবাস্‌বে কিনা না জেনেই কিন্তু বেসেছিলাম, আর কোনওদিন সে তাকে জিজ্ঞাসা ক'ত্তে সাহস হয়নি। আগে ত' বুঝিনি যে তার হৃদয় [illegible] উপর নখের দুর্ব্বল আচড় শত সহস্র চেষ্টা ক'ল্লেও বসান যায়।

রোজই তাকে জান্‌লা থেকে দেখ্‌তাম—আর যাকে যা [illegible] ভয় ক'রে তাকে দু'এক দিন আড়াল থেকে ডাক্ দিতাম,—কি সে তা'

বুঝতোনা। হায়রে পুরুষের পাষাণ মন! এত ক'রে ডাকতাম তাকে'—মনে-প্রাণে, ভিতরে—বাহিরে; শুধু একটিবার দুটো মুখের কথা বলবার জন্যে; ওগো, শপথ ক'রে ব'লতে পারি আর কোন অভিপ্রায় আমার ছিল না—তবু তাকে কোনদিন বোঝাতে পারতাম না।

একদিন শাশুড়ী আর ভাসুর কোনো কাজে কোথায় গিয়েছিলেন এমন সময় সলিল এলো। বাড়ীতে আর কেউ নেই;—বাইরের ঘরে সে একা ব'সে। জানি না কেন তখন আমার সে দুর্ম্মতি হ'ল, তখন বুঝি আমার ঘাড়ে শয়তান চেপেছিল তাই তখন বাইরের সমস্ত জগৎ আমার কাছে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল;—ক্ষুধিত ও শূন্য অন্তরের মধ্যে জেগেছিল শুধু ভালবাসা আর যা'র জন্যে আমার হৃদয়ভরা সেই পবিত্র অঞ্জলি প্রস্তুত সেই মহান্ দেবতার সুন্দর শ্যামল মূর্ত্তিখানি।

আস্তে আস্তে বাইরের ঘরের দিকে অগ্রসর হ'লাম; দ্বারের কাছে গিয়ে পা দু'খানা থর থর করে কেঁপে উঠ্‌লো। কিন্তু না,—শয়তান ঘাড়ে চেপেছে—এখন ত ভয় ক'রলে চলবে না।

জোর ক'রে নির্লজ্জের মত ঘরে ঢুক্‌লাম। আমাকে সাম্‌নে দেখেই সলিল একটু থতমত খেয়ে গেল;—সে যেন প্রথমটা ভাল বুঝতেই পারল না আমি কে, এবং কেন এসেছি। তাড়াতাড়ি কম্পিত চরণে শঙ্কিত অন্তরে আমি তা'র পাশে গিয়ে ব'সলাম। সে লজ্জায় ও ভয়ে জড় সড় হ'য়ে একটু সরে ব'সল। আমি উদ্বেগাকুলিত হৃদয়ে সহসা তা'র হাত দুখানা আমার হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছি এমন সময় বাইরে কার গলা শুনতে পেলাম, "দিদি বাড়ী আছ?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি ছুটে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দেখ্‌লাম, সাম্‌নেই পাড়ার এক বৃদ্ধা তিনি আমায় হঠাৎ অমন অস্বাভাবিকভাবে বাইরের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বরাবর বাইরের ঘরের দিকে গেলেন। আমি তখন লজ্জায় ভয়ে ও শঙ্কায় বিছানার উপর মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে রইলাম। আর আমার বুকের ভিতর একটা উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য চ'লতে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যাবেলা শাশুড়ী আর ভাসুর আসতেই শুন্‌লেন,—আমি সলিলের সঙ্গে মজে গেছি;—আমার জাত গেছে,—আমি কুলটা, অসচ্চরিত্রা; আমি কলঙ্কিনী, সমাজচ্যুতা। পাড়ার একজনই সেই বৃদ্ধার কাছ থেকে ইতিপূর্ব্বেই সে শুভ সংবাদ পেয়েছিল।

তার পরদিনেই পাড়ার সকলে আমার ভাসুরের কাছে এসে ব'ল্লেন,—আমি পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ ক'রেছি,—আমি অসতী, অর্থাৎ বেশ্যার সামিল; কারণ আমি একজন পুরুষকে ভালবেসেছি। অতএব আমার যদি বাড়ী থেকে না বিদেয় করেন তবে তিনি 'এক ঘরে' হবেন।

ভাসুরের কাছে জাত ও সমাজের চেয়ে আমার মূল্য কখনই বেশী হ'তে পারে না। তিনি সেই দিনই মত প্রকাশ ক'ল্লেন—তিনি আমাকে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবেন। পাড়ার সমাজেই তাঁহার বীরত্বে ও ন্যায়পরতা দেখে প্রশংসা ক'ত্তে লাগ্‌লো, আর আমি ন'বছর বয়সে বিধবা হ'য়েছি ব'লে আমার যে পরিণামে এই দশা হবে এটা সবাই বহুপূর্ব্বেই ধ্রুব জান্তে পেরেছিল এই কথা গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় প্রচার ক'ত্তে লাগ্‌লো।

ওগো, ন'বছর বয়সে আমি বিধবা হ'য়ে হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর খুইয়েছি, সে দোষ কি আমার? স্বামীর প্রেম, যত্ন, ভালবাসা আমি যে জীবনে একদিনের তরেও পাই নাই, আমার নারীত্বের বিরাট ক্ষুধাকে যে আমি জীবনে একদিনও পরিতৃপ্ত ক'ত্তে পাই নাই—সে দোষও কি আমারই? তোমাদের বুদ্ধিমান সমাজের এই কি সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার? বাইবের দিকে চেয়ে তোমরা শুধু বিচারের রায় প্রকাশ কর, কিন্তু ভিতরের বিশ্বগ্রাসী বিরাট ফাঁসটার পানে ত' তোমাদের বিচারপটু চক্ষু একবারও চেয়ে দেখে না!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ধর্ম্মরক্ষার্থে ভাসুর আমায় বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দিলেন,—আর ব'লে দিলেন,—'আজ থেকে তুমি আর তুমি আমার ভাইয়ের বউ নও-তুমি আমার কেউ নও,—তুমি অসতী, কলঙ্কিনী; আমার এ বাড়ীতে আর তোমার স্থান হবে না।

গ্রামের সব লোকই তখন আমার দিকে চেয়ে হাসাহাসি ও ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'ত্তে লাগ্‌লো; ওগো, এই বুঝি তাদের কর্ত্তব্য!

অসহায়া, অনাথিনী, অবলানারী [illegible] সমাজের আক্রমণে বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'য়ে পথে বেরুলো, তাই দে[illegible] লোকের মুখে কেমন ক'রে হাসি আস্‌তে পারে—তা' আমি ভেবেই পাইনে। হ্যাঁগা,—শুনেছি নাকি মানুষের হৃদয় বড় কোমল—কিন্তু এই কি সেই নিবিড় কোমলতার প্রকৃষ্ট পরিচয়?

তার পর থেকে ক'লকাতার এই বাসাতেই বাসা ক'রে আছি;—উদরের জ্বালায় বাধ্য হ'য়ে অন্যান্য স্ত্রীলোকের মত পথে বেড়িয়ে যে পথ অবলম্বন করে—

আনিও তাই ক'রেছি। বোধ হয় এখন ঈশ্বরের আর আমার প্রাণের সেই অতি ধর্ম্মপরায়ণ ন্যায়বান্ লোকগুলির মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে।

আজ আমার এ দুর্দ্দশা শুধু আমি এক পুরুষকে ভালবেসেছিলাম ব'লে জীবনে তা'র পূর্ব্বে কখনও কাহাকেও ভালবাসিনি,—নারী স্বামীর কাছ থেকেই সব পায়—তা'র সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা পূর্ণ হয়; কিন্তু আমার ভাগ্যে তা'ও জুটেনি! তাই আমার ক্ষুব্ধিত অন্তর যে দিন আমার সঙ্গিনীকে ভালবেসেছিল, তখন সে আত্মহারা হ'য়েছিল;—তা'ই জগতের লোককে চিনে পারেনি, জগতের পবিত্র হিন্দু সমাজকে চিন্তে পারেনি, জগতের হিন্দু শাস্ত্রের ও সমাজের নিয়ম ও রীতিনীতির গূঢ় মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেনি—এই তা'র অপরাধ! আর সামান্য এই অপরাধের জন্যই তা'কে সারা জীবন এ পঙ্কের মধ্যে ডুবে তা'র দুর্গন্ধ সহ্য ক'রে সমস্ত জীবনটী জ্বলে পুড়ে দগ্ধে দগ্ধে কাটাতে হবে! আরো কিছু আছে কি না কে জানে?

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

কবির আঁখি।

(১)

যে কথা ফোটেনাকো ভাষার গুঞ্জনে
হৃদয়ে জাগে ভাল-বাসার মুঞ্জনে,
সেখানে কবি শুধু রাখেক আঁখি-ঠারে,
যা কিছু বলিবার চাহে না' বলিবারে।

(২)

সে শুধু চোখে চোখে কেবলি চেয়ে থাকা,
হৃদয় টেনে আনি আঁখিতে পেতে রাখা,
না বলি' কোন কথা বচনে বার বার,
হিয়াটি তুলে ধরা নয়নে আপনার।

(৩)

সদ্য-স্নাত-বাসে কলসী ল'য়ে কাঁখে
তরুণী থেমে যায় সহসা পথ-বাঁকে,
আঁখিতে আঁখি মিলি' শিহরি উঠে দেহ,
নিমেষে প্রীতি-প্রেম জানায়ে দেয় সেই!

(৪)

কি যে কি চাহনি সে বলিতে পারা ভার,
চপলা-চঞ্চলা-আলোক-কারাগার,
আঁখির ফাঁদ পাতি' নিখিল ধরামাঝে
কবির মনচোর বাঁধের মত সাজে।

(৫)

ভুলিতে পারে কবি বুকের চাপা ব্যথা
বদনে যত থাক মৌন-নীরবতা,
কবির কবি সেই আঁকে নেয় আঁখি তার,
নয়নে রচে আসে মুরতি সোনার।

(৬)

প্রণয়-ভীতি-ভরা বাসর-ফুলসাজে
আধেক-মুকুলিত প্রিয়ার হৃদিমাঝে
কি কথা জেগেছিল—কেহ কি বলে তাই ?
কবির চোখে তা'ও ধরিতে বাকী নাই !

(৭)

তীক্ষ্ণ সূচীভেদী কবির আঁখি-ভাবা,
কোথা'ও বাধা নাই, হয় না দিশেহারা,
যেখানে যতটুকু মাধুরী পড়ে' রয়
মরাল সম সে যে আঁখিতে ধরে লয়।

(৮)

সাগর-তটিনীতে, গহনে, ফুলবনে
গোপনে কোন্ বাণী বলে কে মনে মনে,
আকাশে ধরামাঝে নিতি যে গীতি বাজে,
সবারি ছায়া পড়ে কবির আঁখি-মাঝে।

(৯)

পারে সে দেখিবারে [illegible] কত দেশ,
গগণ-সীমা-রেখা নহেক তার শেষ,
অসীম নীলিমার ওপারে পলে পলে
কবির কুতুহলী আঁখির খেয়া চলে।

(১০)

কবির আঁখি দুটী যাহারে ভালবাসে,
মরতে তার কাছে স্বরগ নেমে আসে,
অমন চাওয়া দিয়ে—মধুর ক'রে নিয়ে
কেহ কি বাসে ভাল বলত', বল' প্রিয়ে ?

[illegible] মোস্তফা।

পুণ্যতীর্থে গুরুপূজা।

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

দেখিতে দেখিতে একটী বছর কত ঝড়-তুফান ও কত অশান্তি বক্ষে লইয়া কাল-সাগরে মিশিয়া গেল। সারা বছরটি ধরিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্যভূমি দেশ-জননীর বিশাল বক্ষের উপর কতশত মর্ম্মভেদী দুর্ঘটনা অবিরাম সংঘটিত হইয়াছে—দেশ-মাতৃকার কত সুসন্তান এবং জগতের কল্যাণকামী কত বিশুদ্ধাত্মা উদার-হৃদয় সাধু-সন্ন্যাসী, দেশ-জননীর পরিচর্য্যায় কত পীড়ন, কত যাতনা ও কত নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। ঐ সকল শোচনীয় দুর্ঘটনায় আমাদের মধ্যে অনেকের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেও আমরা উহার কঠোর স্মৃতি এবং সংসারের অন্যান্য অসার কোলাহল ও দুর্ভাবনা ভুলিয়া আজি শুভদিনে শুভক্ষণে এই পুণ্যতীর্থে প্রাণারাম সুপবিত্র উৎসবে সম্মিলিত হইয়াছি। আজি আমাদের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা নাই। যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত মঙ্গলময় ও অপার করুণাময় যিনি সকল সুখ-শান্তির আকর, আমাদের জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তরতম সখা, সকল দেবতার পরম দেবতা—যিনি নিরাকার নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপ অবস্থায় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদর্শী সকল হৃদয়-বিহারী ও সর্ব্বান্তর্য্যামী—যিনি সকল জ্ঞানের অনন্ত প্রস্রবণ, সকল বল-বুদ্ধির নিদান বিভূতি-ভূষণ—আমরা যাঁহাকে দেখিতে পাই না, অথচ যাঁহার অদৃশ্য সহস্র চক্ষু আমাদের এবং জগতের সমগ্র প্রাণিগণের উপর নিয়ত নিপতিত রহিয়াছে—যাঁহার মঙ্গল হস্ত সর্ব্বক্ষণ অমিত ভাবে আমাদের ও সকল জীবের যাবতীয় অত্যাবশ্যক কল্যাণকর বস্তু দানে নিযুক্ত, সেই পরম মঙ্গলময় পরমাত্মাদেবের সহিত তাঁহার জ্ঞান-গরিমায় উদ্ভাসিত, তাঁহার ধ্যান-ধারণা ও স্বরূপ চিন্তায় সমাহিত, তাঁহার অহেতু প্রেম ও সৌন্দর্য্যের মাধুরীতে পূর্ণ-বিকাশিত, তাঁহার বিগলিত করুণা ও অফুরন্ত স্নেহের জীবন্ত মূর্ত্তি, আমাদের জীবন মরণের চিরশান্তি, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের পূজায় আজি আমরা

সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া এই পুণ্য-তীর্থে ছুটিয়া আসিয়াছি। আজি আমাদের সেই শুভদিন, যেদিন আমরা আমাদের পরমপূজ্য গুরুদেবের পবিত্র চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জগৎগুরুর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানে আমাদের হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে একাগ্রচিত্তে, প্রগাঢ় ভক্তিভরে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব। তাই আজিকার সুবিমল প্রভাতে নানা স্থান হইতে আমরা এতগুলি ভক্ত-সন্তান কত আশায় উৎফুল্ল হইয়া এই পবিত্র স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি। আজি ভক্ত-সন্তানগণের বিপুল আনন্দে সাধনার প্রাণারাম নিকেতন এই পুণ্যময় আশ্রম আনন্দময় উৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বাহিরের প্রকৃতিও এই আনন্দোৎসবের অনুকূল। রাশি রাশি প্রফুল্ল কুসুমের সৌরভে, ধূপের সুগন্ধে এই সুবিস্তৃত মণ্ডপের চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে। প্রভাত-বায়ু অরুণ-রবির সুস্নিগ্ধ কিরণস্পর্শে বিবিধ পুষ্প, চন্দন ও ধূপ ধুনা প্রভৃতির সুবাস বহন করিয়া ভক্ত মণ্ডলীর মনঃপ্রাণ বিমোহিত করিতেছে। এই শুভক্ষণে কত নর-নারী ও কত বালক-বালিকা হৃদয় ভরিয়া গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি, সম্মান ও কৃতজ্ঞতার পবিত্র অর্ঘ্য লইয়া এই পবিত্র মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেরই অন্তর এক সঙ্কল্প ও এক আশায় উদ্বুদ্ধ ও উৎফুল্ল। কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দোচ্ছ্বাসে সকলের হৃদয় উদ্বেলিত।

অনন্ত গৌরবময়ী ভারত ভূমির প্রকৃত অভ্যুদয় ও শ্রীবৃদ্ধির দিনে এদেশে গুরু-পূজার মহিমা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছিল। তৎকালে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতিথিতে সনাতন বেদ-বিহিত বিশুদ্ধ প্রণালীতে গৃহে গৃহে মহোৎসাহে গুরু-পূজার অনুষ্ঠান হইত। কালবশে যুগধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দু-ধর্ম্মের ঘোর অবনতির সহিত হিন্দু-সমাজের শোচনীয় অধঃপতন জন্য উহা সমুন্নত প্রথা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে অধঃপতিত অন্তঃসার-শূন্য হিন্দুসমাজের নানা স্থানে তামসিকভাবে বিস্তর দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত থাকিলেও সকল পূজার শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যত্বের উন্মেষক, প্রভূত কল্যাণকর গুরু-পূজার প্রতি শিক্ষিত ভারতবাসীর অনাস্থা ও অনুৎসাহ, মর্ম্মের কোন্ কথা অনুরাগী ও সহৃদয় ব্যক্তির অন্তর গভীর বিষাদ ও বিষম ক্ষোভে পরিপূর্ণ না হইয়া থাকে? অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে গুরু-পূজার মহত্ত্ব বিঘোষিত হইয়াছিল। ইয়োরোপীয় প্রাচীন সভ্যতার জননী, রোম, গ্রীস ও মিসর প্রভৃতি দেশেও এক সময় গুরুর প্রতি সম্যক্ ভক্তি প্রদর্শন এবং গুরুর অর্চ্চনা ও উপাসনা প্রকৃষ্ট প্রণালীতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সকল ভূখণ্ডের

শ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অতুল মহিমা-মণ্ডিত গুরু-পূজার প্রথা যেরূপ মনোজ্ঞ প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেরূপ প্রথার পরিচয় আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। প্রাতঃস্মরণীয় ও পরমারাধ্য আর্য্যঋষিগণের মহাসাধনা-প্রসূত অভ্রান্ত বিধান এবং যোগ-রত ধর্ম্ম-প্রাণ পবিত্রাত্মা সাধু-সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ের পূর্ণ অনুভূতি অনুসারে দীক্ষা-গুরু ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তিরূপে পরিকল্পিত ও সম্পূজ্য হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে :—

"গুরোমনুষ্যবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রচাক্ষরবুদ্ধিকং।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

এই জন্যই প্রাচীন ভারতে বাল্যকাল হইতে দীর্ঘকাল গুরু-গৃহে বাস ও শ্রীগুরুদেবের চরণে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভের সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কালবশে উক্ত সুন্দর প্রথার কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন কালের হিন্দু সমাজের কুল-গুরু কুল এক্ষণে একবারে নির্ম্মূল হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কুল-গুরুর নিকট হইতে সংযম, শুদ্ধাচার ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ এক অতীত কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। এখনকার গৃহস্থ গুরুগণ যেমন গুরুর প্রকৃতলক্ষণ, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিহীন হইয়াছেন, সাধারণতঃ আচার-ভ্রষ্ট, অবিবেচক শিষ্য-সম্প্রদায় ও তেমনই গুরুদেবের স্বরূপ ও প্রকৃত মহত্ত্ব ও মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছেন। এক সময় সদাচার-সম্পন্ন ও ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হিন্দু-সমাজে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু উভয়েই মহোচ্চসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে হিন্দুধর্ম্মের অবনতির সহিত হিন্দুসমাজের ঘোর অধঃপতন জন্য আর্য্যজাতির প্রাচীন কল্যাণকর প্রথানিচয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেও এখনও কোন কোন স্থানে বিস্তর স্বধর্ম্মানুরাগী শুদ্ধাচারবিশিষ্ট বিচারবান্ হিন্দু-সন্তান প্রাচীন প্রথানুসারে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থা ও বিধান মানিয়া চলেন। তাঁহাদের অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান আছে যে, কুল-গুরুর অভাব হইলেও তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু, বিশ্বাসী সাধকের চিত্তের একাগ্রতা ও ইচ্ছা-শক্তির প্রখরতা প্রভাবে ঐশী শক্তি-সম্পন্ন সদ্‌গুরু লাভ ঘটিয়া থাকে। ভক্তের আগ্রহ ও চিত্তশুদ্ধি বুঝিয়া শ্রীভগবান্ জগদ্‌গুরুরূপে প্রকৃত জ্ঞানী নিষ্ঠাবান ও মঙ্গল-কামী দীক্ষ-গুরুর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী রূপে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। সাধক-শিষ্যের আত্ম-জ্ঞান-পিপাসা যতই প্রবল এবং তদনুসারে বৈরাগ্য ও একাগ্রতা পূর্ণ

সাধনা যতই প্রখর হইবে, ততই সত্বর ঈশ্বরভাবাপন্ন সদ্‌গুরু লাভে তাহার প্রাণের আকুল পিপাসা পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সন্তানের অন্তর্নিহিত অবিচলিত বিশ্বাস এই যে, গুরুর কৃপা ভিন্ন সাধনমার্গে সম্যক্‌রূপে অগ্রসর হইবার প্রকৃষ্ট উপায় আর দ্বিতীয় নাই। প্রকৃত জ্ঞানী গুরুর সহায়তা ভিন্ন কোন উচ্চসাধনায় সফলতা লাভের আশা বিড়ম্বনামাত্র। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ ভারত সন্তান আজি স্বধর্ম্ম ভুলিয়া পরধর্ম্মপরায়ণ ও ও পরের জঘন্য অনুকরণে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। যে উদার ধর্ম্মভাব এক সময় এদেশে বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় বিপুল তরঙ্গরাজি বিস্তার পূর্ব্বক তরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য নর-নারীর অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছে, দীর্ঘকালের পরাধীনতা, পাশ্চাত্য শিক্ষাও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহময় সংস্পর্শে এক্ষণে সেই স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে। আর্য্য ঋষি ও সাধু সন্ন্যাসিগণের সাধনার ক্ষেত্র পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের চারিদিকে এক্ষণে অত্যধিক পরিমাণে নাস্তিকতাও জড়বাদ বিস্তৃত হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধনে সহায়তা করিতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত সহস্র সহস্র বিদ্যালয়ের প্রচলিত কদর্য্য ধর্ম্মহীন শিক্ষা ও সংযম-বিহীন অনাচারপূর্ণ ব্যবহারে দ্রুতবেগে দেশের শোচনীয় অবনতি সংঘটিত হইতেছে। স্বাধীনতায় বঞ্চিত ভারতসন্তানগণ যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় পরিপুষ্ট হইয়া প্রকৃত সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা লাভে জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিত এবং আপাত-মধুর মোহময় চাকচিক্যশালী অন্তঃসারশূন্য বিজাতীয় সভ্যতার বিষময় সুতীব্র প্রভাব যদি বিচার পূর্ব্বক দমন করিতে পারিত, তাহা হইলে দেশ-জননী এরূপ অধঃপতনও তাহাদের এরূপ শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইত না। প্রকৃত সদ্‌গুরুর অবিদ্যমানতায় উপযুক্ত শিক্ষা, সংযম, সদাচার ও ধর্ম্মানুরাগ অভাবে ভারত সন্তানগণের হৃদয়ের বল, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও একপ্রাণতা না থাকায় তাহাদের বর্ত্তমান অবনতি ও সামাজিক ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বর্ত্তমান অধঃপতন ও অবনতির যুগে নিষ্ঠা ও বিচারবান হিন্দুসন্তানের অন্তরে আজিও এই বিশ্বাস সুদৃঢ়রূপে বিদ্যমান আছে যে, দেব-পূজায় যেমন চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে, পরম মঙ্গলময় জগদ্‌গুরুর প্রতিনিধি স্বরূপ মূর্ত্তিমান পার্থিব দীক্ষাগুরুরজাপ্রয় ও সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। এই

বিশ্বাস চিরদিন শাস্ত্রের অকাট্য প্রমান দ্বারা পরিপুষ্ট এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা যে সকল দেবতাকে দেখিতে পাই না, যাঁহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা অক্ষম, যাঁহাদের পূজার সাধন-প্রণালীও আমাদের সহজ-সাধ্য নহে, আমাদের নিজ নিজ চেষ্টা ও সাধনায় সেই সকল দেবতার উপাসনা ও ও অর্চ্চনায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি প্রকার ফল লাভ যে কত কঠিন, তাহা অনুভব ভিন্ন প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অধিকারী ভেদে দেব-পূজার উৎকর্ষ, অপকর্ষ ও ফলাফল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহার কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণ অধিকার, এবং কাহার হৃদয়ে কতটুকু সাধন-শক্তি সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক উক্ত নিদ্রিত শক্তিকে জাগরিত ও সাধনার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিবার ক্ষমতা অনভিজ্ঞ নবীন সাধকের নাই। অধিকারী নির্ণয় এবং অন্তর্নিহিত নিদ্রিত শক্তিকে জাগরিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসু ভক্ত-সাধক-সন্তানকে সহজ প্রণালী প্রদর্শনে সাধনমার্গে অগ্রসর করিবার জন্য প্রকৃত জ্ঞানী সদ্‌গুরুর প্রয়োজন—যিনি পরম মঙ্গলময় জগদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতিনিধিস্বরূপ। এই জন্যইত তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠতা, ও গৌরব এত অধিক। যেরূপ স্নেহময়ী জননীর সুকোমল ক্রোড়ে বসিয়া যেমন তাঁহার স্নেহের দুলাল পিতাকে চিনিয়া লইয়া তাঁহাকে জন্মদাতা ও প্রতিপালনকর্ত্তা জ্ঞানে গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, ভক্ত সাধক-সন্তানও তেমনই স্বীয় স্নেহময় দীক্ষা-গুরুর পবিত্র চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কৃপায় তাহার দুর্লভ মানব-জীবনের সৃষ্টিকর্ত্তা পরম করুণাময় জগদীশ্বরকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে চিনিতে ও জানিতে পারে এবং সেই পরম দেবতার ধ্যান-ধারণা ও পূজা-অর্চ্চনায় বিভোর হইয়া তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় ও সাযুজ্য লাভে বিপুল আনন্দ ও পরম শান্তি উপভোগ পূর্ব্বক তাহার দুর্লভ মানব জীবন সার্থক জ্ঞান করিয়া থাকে।

যাহারা অবিবেচক ও অদূরদর্শী এবং জড়বাদের পরিপোষক, তাহারা হিন্দু-সন্তানকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যদি একবার ধীর মনে ভাবিয়া দেখে যে, হিন্দুমাত্রেই মূর্ত্তি-পূজার মধ্য দিয়া সেই বিরাট সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অরিতীয় পরম দেবতারই পূজা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত ও লজ্জায় অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। হিন্দুর উপাস্য-দেবতা তেত্রিশকোটি অথবা অগণ্য,

অসংখ্য ও অনন্ত বলিয়া বিজ্ঞস্ত পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার নিমিত্ত উপাসনা-তত্ত্বের আলোচনা অনাবশ্যক। হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ উপনিষৎ এই বলিয়া অতি সহজে ও সংক্ষেপে উহার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন :—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই পরম দেবতা অদ্বিতীয়, তিনি সর্ব্বথাবে লোক-লোচনের অগোচরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান আছেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় এবং সকল জীবের অন্তরাত্মা ও প্রাণের প্রাণ, তিনি সকল পদার্থের স্রষ্টা এবং সকল জীব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; তিনি নির্ব্বিকার নিষ্কলঙ্ক; তিনি একমাত্র সৎ অথচ উদাসীন ও সকল প্রকার প্রাকৃতিক গুণরহিত।

উল্লিখিত বাক্যনিচয় হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিন্দুসন্তান যে ভাবে, যে প্রণালীতে যে কোন দেবদেবীর উপাসনা করুন না কেন, সমস্তই সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, সকলের প্রাণের প্রাণ অদ্বিতীয় নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময় জগতের পিতা-মাতা পরম দেবতারই পূজায় পরিণত ও পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সেই পরমদেব ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর সংস্কার, রুচি, প্রবৃত্তি ও ধারণা অনুসারে বিভিন্নভাবে ও আকারে আপনাকে বিভক্ত করিয়া নানা দেবদেবীরূপে পরিকল্পিত ও সম্পূজিত হইয়া থাকেন, উপনিষদে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে; এস্থলে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

হিন্দুশাস্ত্র সেই পরমাত্মাদেবকেই বিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সংসারে সকল পদার্থই তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার সত্তায় উদ্ভাসিত ও তাঁহার চৈতন্য-জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া থাকে। তিনি নিজ অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও অতুলনীয় শক্তি-প্রভাবে সুবিধি কার্য্যসমূহের একমাত্র নিয়ন্তা। তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্, তাঁহার প্রেরণাবলে পূর্ণ-বিকশিত, তাঁহার ধ্যান ধারণার অনুপ্রাণিত এবং তাঁহারই প্রেমে বিভোর মহাপুরুষকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিলে যে তাঁহারই পূজা করা হইবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের পরম ভক্তিভাজন শ্রীগুরুদেব সেইরূপ অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষ! জানি না পূর্ব্বজন্মের কোন্ সুকৃতিবলে আমরা এমন মহাশক্তি-

শালী সাক্ষাৎ মহাদেবতুল্য মহাপুরুষকে আমাদের দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আজি আমরা শুভক্ষণে সেই মহাপুরুষের পূজার জন্য স্ব স্ব হৃদয়-থালি ভরিয়া গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি, সম্মান ও কৃতজ্ঞতার পবিত্র অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পবিত্র চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি। সেই চারুচরণে আসুন সকলে, আমরা আমাদের হৃদয়, মন, ও প্রাণ লুণ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হই।

আমাদের প্রাণের জীবন্ত দেবতা, আপনি আমাদের প্রাণগত গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম ও প্রীতি গ্রহণ করুন। বৎসরান্তে আজি আমরা প্রফুল্লমনে কত আশা হৃদয়ে লইয়া আপনার পবিত্র চরণ যুগল ঘিরিয়া বসিয়াছি। আপনি আমাদের হৃদয়ের পরমারাধ্য দেবতারূপে আমাদের সকলের হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন। আমাদের মনের অতি নিভৃত স্থানও আপনার অন্তর্দৃষ্টির অগোচর নহে। আপনি এক্ষণকালের জন্য আমাদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আমরা আপনার উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া আপনার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে সাধন-ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে কতদূর পিছাইয়া পড়িয়াছি। আমাদের প্রাণে গত একবৎসর মধ্যে কতটুকু জড়তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত ত্রুটি ও সমস্ত দীনতা মার্জ্জনা করুন। হে শান্ত, সৌম্য, শিবায়, সর্ব্বসুন্দর ভগবান্! আমরা যে বড় দুর্ব্বল, বড় অসহায় ও বড়ই বিপন্ন। সংসারের নানাবিধ উৎকট ভাবনা-জনিত বিষম অশান্তিতে আমরা যে দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি, পদে পদে আমাদের পদস্খলন হইতেছে, আমরা যে কর্ত্তব্য-পথে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমাদের হৃদয়ের মলিনতা যে এখনও দূরীভূত হয় নাই—আমরা যে এখনও চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করিতে পারি নাই। আপনি দয়া করিয়া আমাদের হৃদয় বিমল ও অন্তর বিশুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাউন। আপনি আমাদের সংসার সাগরের ধ্রুব তারা; আশীর্ব্বাদ করুন পিতঃ, যেন আমরা আপনার ধ্রুব জ্যোতির প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সংসারের সকল ঝড়-তুফান, সকল বিঘ্ন বিপত্তি, সকল অভাব অশান্তি সকল অধঃপতন ও অবনতি হইতে মুক্ত হইয়া উৎসাহের সহিত আপনার প্রদর্শিত পুণ্যপথ অবলম্বনে শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি। আপনার কৃপা ভিন্ন আমাদের গতি নাই। বিপুল অর্থ ও ক্ষমতাশালী হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-গৌরব লাভের জন্য আমাদের অন্তর

ব্যাকুল নহে ; জন সমাজে অতুল প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার পূর্ব্বক বিশেষভাবে গণ্য মান্য হইবার জন্যও আমরা উৎসুক নহি। আমরা চাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট, হৃদয়বান্, চরিত্রবান্, স্বধর্ম্মানুরাগী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া একনিষ্ঠভাবে পরম দেবতার প্রিয়কার্য্য সাধনে আমাদের প্রত্যেকের জীবন ফুটাইয়া তুলিতে। প্রভো ! গন্তব্যপথে কত বাধা ও কত বিঘ্ন ; আপনি দয়া করিয়া আমাদের পথ সুগম করিয়া তুলুন। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের প্রাণের অপূর্ণ পবিত্র বাসনা পূর্ণ হইবার পক্ষে সদুপদেশ দান পূর্ব্বক আমাদের জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ও পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে আমাদিগকে সহায়তা দান করুন। আপনার পুণ্য ও মহিমা প্রভাবে আমাদের সকল প্রকার উন্নতির পথের সমস্ত বিঘ্ন বাধা অপসারিত হউক। আমরা অমৃতের সন্তান হইয়া আপনি আমাদের সহায় থাকিতে কেন এ সংসারে দিশেহারা হইয়া বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিব ? মৃত্যু-ভয়কে আমরা কিরূপে জয়লাভ করিতে পারিব, আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিন। আমরা বুঝিয়াছি সুকৃতিশালী নরনারী তাহাদের অপূর্ণ উন্নত বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুকালে যদি একবার ক্ষণকালের জন্য সেই—সকল আত্মার আত্মা, সকল জ্যোতির পরম জ্যোতি, সকল সৌন্দর্য্য ও সকল মাধুর্য্যের নিকেতন সচ্চিদানন্দ পরম দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া হাসিতে হাসিতে এই মাটির ধরণী হইতে বিদায় লইতে পারে—"প্রভো ! দীন আমি, দুর্ব্বল আমি, আপনি আমার অন্তরে কৃপা করিয়া যে আলোক দিয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সতত চেষ্টা করিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আমার সমস্ত ত্রুটী ও দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা পূর্ব্বক এখন আমাকে আপনার পবিত্র চরণে স্থান দিন, তাহা হইলে তাহাদের দুর্লভ মানব-জীবন সার্থক হইয়া থাকে। শুধু তাহাদের নয়, তাহাদের পুণ্য প্রভাবে তাহাদের—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।"

অর্থাৎ তাহারা যে কুলে জন্মে সেই কুল পবিত্র, তাহাদের জননী কৃতার্থা এবং পৃথিবীও পুণ্যবতী হন। করুণাময় পিতঃ, আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা জীবনের পরপারে মহাযাত্রার পূর্ব্বে উপযুক্ত পাথেয় লইয়া শেষ মুহূর্ত্তে ঐরূপ সাধের মরণকে বরণ করিতে পারি। ভগবন্ ! দীন আমরা, ক্ষুদ্র আমরা, অতি দুর্ব্বল ও অধম আমরা ; আপনার [illegible]

উপযুক্ত অর্ঘ্য আমরা কোথায় পাইব [illegible] ভা। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়-নিহিত ফুলগুলি আপনি কৃপা করিয়া তুলিয়া লইয়া [illegible] ও মধুময় করিয়া তুলুন; আমরা আপনার ঐ চারু চরণতলে আমাদের সমস্ত কর্ম্ম, প্রাণ ও মন লুটাইয়া গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেমভরে [illegible] সেই পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি দানে আপনার শ্রীচরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। আমাদের প্রাণের আশা পূর্ণ হউক।

এই শুভদিনে স্বর্গীয় ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীচরণ [illegible] মহাত্মার নাম বিশেষভাবে আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। এই পবিত্র আশ্রমের সহিত তাঁহার পুণ্যময় স্মৃতি ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। এই সুযোগে আমরা তাঁহার পুণ্যময় স্মৃতির তর্পণ এবং তাঁহার অমর পবিত্র আত্মার উদ্দেশে আমাদিগের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান না করিলে আজিকার এই উৎসব অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। আজি তিনি পরলোকে অবস্থান করিলেও তাঁহার সুকৃতি তাঁহাকে এই পুণ্যভূমিতে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। পুরাকালে ভগীরথ যেমন পতিতজীবের উদ্ধার জন্য মহাসাধনা দ্বারা [illegible] ভূমিতে [illegible] পাবনী দ্রবময়ী গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া ভারতের [illegible] অমর হইয়াছেন, পরলোকগত মহাত্মা রামচরণও [illegible] পুণ্যবলে এই পুণ্যতীর্থে জ্ঞান-গরিমা-বিভূষিত এই অসাধারণ শক্তিশালী [illegible] মহাপুরুষকে আনয়ন পূর্ব্বক এই পবিত্র আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া [illegible] জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণের আত্মার উন্নতি ও সর্ব্ববিধ কল্যাণের পথ প্রসারণে অমরতা লাভ করিয়াছেন। তিনি যত্নপূর্ব্বক প্রগাঢ় ভক্তিভরে ত্রিশূলধারী মহাদেবকে এই পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত না করিলে সংসারের তাপ-জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইবার জন্য এখানে অমৃতের সন্ধান কে পাইত?

এই শুভক্ষণে আমরা শ্রীভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মার অমর আত্মাকে চিরশান্তিদান করুন এবং তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী, যিনি দিব্যধামে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য কাল-প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার এবং তাঁহার স্নেহের পরিবারবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন। আর তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার ন্যায় উদারতা, সাধুতা, সৎপ্রবৃত্তি সামর্থ্য দান করুন—যেন আমরা তাঁহার পরিত্যক্ত পুণ্য পথ অবলম্বনে এই পবিত্র আশ্রমের গৌরব ও সম্মান অক্ষুণ্ণ ও সমুজ্জ্বলভাবে রক্ষা করিতে পারি।

ছায়া

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত চন্দ্রগুপ্ত নাটকের ছায়া চরিত্র নিষ্কাম প্রেমের একটী জীবন্ত মূর্ত্তি। এই ছায়া চরিত্রের ভিতর দিয়া নাট্যকার সকাম প্রেম ও নিষ্কাম প্রেমের যে বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন তাহা এই চরিত্র পাঠেই অতি সহজে উপলব্ধি হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছায়ার চরিত্রে দেখাইয়াছেন যে নারী-পুরুষের ভালবাসা দুই প্রকারের—(১) ভোগের ও লালসার জন্য প্রেম এবং ইহারই প্রকৃত নাম 'কাম'; (২)—ত্যাগী প্রেম এবং এই প্রেমই প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেম। ছায়া ছায়া চন্দ্রগুপ্তকে যেরূপ ভাল বাসিয়াছিলেন—সে ভালবাসা দ্বিতীয় [illegible] কেননা তিনি পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়াছিলেন যে তিনি যদিও চন্দ্রগুপ্তকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে কিছুতেই ভালবাসিতে পারিবেন না, কেন না, ছায়া ছিলেন "কাল" এবং চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন "সুন্দর ও সুপুরুষ।" তিনি পূর্ব্বে জানিতেন যে পুরুষ বুঝি নারীকে ভালবাসে তার বাহিরের রূপের জন্য। নারীর বাহিরের সেই উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য আবরণ ভেদ করিয়া পুরুষের দৃষ্টি নারীর অন্তরের ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। আর যদি ও বা পৌঁছায় ঐ সে কিছুদিন তাহার সহিত মিশিতে পারে। কিন্তু ছায়া যে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা এবং বিধির নির্ম্মম নিয়মে সেটুকু হইতেও বঞ্চিত। তাহার হৃদয়ের মহত্ত্ব থাকিলেও তাহা চন্দ্রগুপ্তের নিকট প্রকাশ করিবারই উপযুক্ত সুযোগ সে পাইবে না। তাহার বাহিরের কুৎসিত রূপান্ধকার ভেদ করিয়া কি অন্তরের আলোকিত অন্তর পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের দৃষ্টি পৌঁছাইবে?

প্রথম দর্শনেই অবশ্য ছায়া চন্দ্রগুপ্তকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সে সময় ছায়া তার রূপের রূপে মুগ্ধা হইয়া তাহার নারীর যৌবন সুলভ চাঞ্চল্যের বশেই তিনি তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং সে ভালবাসা তখন রূপমুগ্ধা নারীর কাম প্রেমেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁহার মুখ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য কয়েকটী উচ্চারিত হইয়াছিল—"ইনি কি অবতীর্ণ দেবরাজ? এঁর দর্শন পূর্ণচন্দ্রের উদয়—এঁর স্পর্শ বর্ণন বসন্তবায়ু। চলে গেলেন যেন একটি মলয়োচ্ছ্বাস।" এবং এই কথা কয়টীর মধ্যেই চন্দ্রগুপ্তের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় প্রেম [illegible] হইয়াছে। ছায়া চন্দ্রগুপ্তকে

প্রথম দর্শনেই এত অধিক ভালবাসিয়াছিলেন, যে তিনি নিদ্রাতেও চন্দ্রগুপ্তকে স্বপ্ন দেখিতেন এবং এই স্বপ্নের অর্থ, এই যে তাঁহার সেই প্রেমের অতুলস্পর্শী গভীরতার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ ডুবিয়া গিয়াছে—জাগিয়া আছে শুদ্ধ এক চন্দ্রগুপ্তের মধুর মূরতি।

তারপর ক্রমে ক্রমে ছায়ার প্রেম গভীরতর হইতে লাগিল; এবং সেই সঙ্গে তাহার প্রেমের গর্বটুকুও ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। যতই তিনি তাঁহার হৃদয়ের প্রেমের গভীরতা অনুভব করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল—তিনি চন্দ্রগুপ্তের বড়ই অযোগ্যা। চন্দ্রগুপ্ত সুন্দর—তিনি কুৎসিত। পুরুষ নারীর নিকট সর্ব প্রথম যাহা চায় সেই প্রধান মূল্য বস্তুটিই তাঁহার ভাণ্ডারে নাই। অতএব চন্দ্রগুপ্তকে পাওয়া তাঁহার একটী ঘোর দুরাশা মাত্র।

কিন্তু পরে তিনি মনে করিলেন সে রূপ না থাকিলেও নিজের বাহুবল ও হৃদয়ের পরিচয় দিয়াও ত' চন্দ্রগুপ্তকে বশ করিতে পারেন। তাই যখন তিনি সখিগণের সহিত চন্দ্রগুপ্তেরই আলোচনা করিতেছিলেন এবং কথায় কথায় তাহাদিগের নিকট মগধরাজের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের আকর্ষণ ব্যক্ত হইয়া পড়িল তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রকেতু আসিয়া যুদ্ধের সংবাদ ও যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের বিপদের কথা তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনিও চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এ সাহায্য করিবার ইচ্ছা শুধু চন্দ্রগুপ্তের প্রেম প্রাপ্তির জন্য; কারণ তখন তাঁহারও প্রেম সম্পূর্ণ স্বার্থ ও কাম বর্জ্জিত পবিত্র হইয়া উঠে নাই। তাই তিনি তখন নিজের মনে ঈশ্বরের কাছে শক্তি ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভগবান! যখন সুযোগ পেয়েছি—যেন কৃতকার্য্য হই—এই বর দাও। .....তিনি যদি তার বিনিময়ে একবার মুহূর্ত্তের জন্যও ভালবেসে একবার আমার পানে হেসে চান—তাহা হ'লেই আমার স্বার্থক মৃত্যু।" কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের উল্লেখ না থাকিলেও অন্ততঃ কতক মাত্রায়ও যে আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে; কেন না ছায়া চন্দ্রগুপ্তের প্রেম জীবিতাবস্থায় না পাইলেও অন্ততঃ বৈতরণী তীরে উপস্থিত হইয়া মৃত্যুকে পথের পথিক অবস্থায় পাইলেও তাঁহার এ মরণ তিনি মহাসুখের মরণ বলিয়া মনে করিবেন। এই যে মৃত্যু—এই [illegible] নিজের জীবনদান,—ইহাই নিষ্কাম পবিত্র ধর্ম্মের একটী জ্বলন্ত চিত্র।

কিন্তু তাঁহাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার পূর্ব্বে তাহার

বিপন্নপ্রাণকে নিজের প্রাণপাত করিয়া মুক্তি দিয়াও যখন দেখিলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে প্রেমের একবিন্দুও দিলেন না, তখন তাঁহার এ ইতিহাস একরূপ পূর্ণতায় পরিণত হইল, এবং তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ত্যাগেও প্রেমের একটা অপরিমেয় সুখ আছে; এবং সে সুখ নারীর আত্মাভিমানকে এক অপূর্ব্ব শান্তি ও তৃপ্তিতে ভরিয়া তুলে। তাই তিনি তাঁহার ব্যর্থ প্রেমের সমস্ত বেদনা, হৃদয়ের সমস্ত গভীর হতাশা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া করুণ ঝঙ্কারে গাহিলেন,—

"আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা
মিছে কেন তার ভাবনা—
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ
আমি ত' তাহারে পাবনা,—

এই গানটীর মধ্য দিয়াই ছায়ার তখনকার মানসিক অবস্থা সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি এই গানের শেষেও গাহিয়াছেন;—

"না-না, তবু সেই সুখ জাগিয়া থাকুক,
আমরণ মম স্মরণে—
আমি লভেছি যদি এ বিরস জীবন,
সরস করিব মরণে—"

অর্থাৎ যদিও তিনি চন্দ্রগুপ্তকে পাইলেন না, তথাপি তিনি তাঁহার পবিত্রমূর্ত্তি ইষ্ট দেবতার মত সারা জীবন হৃদয়ের মধ্যে ধ্যান করিয়া চরম সুখ লাভ করিতে পারিবেন এবং বিরস-জীবনকে সরস ও শান্তিময় করিয়া তুলিবেন।

কিন্তু তাহার পরই যখন চন্দ্রগুপ্ত আসিয়া ছায়াকে বলিলেন যে,—তিনি ছায়াকে ভালবাসেন এবং তাহার হৃদয়খানি অত্যন্ত মহৎ—তখন অভিমানের জ্বালায় অন্ধ হইয়া ছায়া তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রেম একরূপ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং স্পষ্ট করিয়াই চন্দ্রগুপ্তকে বেশ রূঢ় ভাবে অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বুঝাইয়াছিলেন, যে রূপ রূপ করিয়াই পাগল, সে নারীর উন্মত্ত-তার বশেই নারীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। পুরুষ যদি নিজে সুন্দর হয়, তবে সে কুৎসিতকে কেবল ঠাট্টাই করিয়া থাকে, এবং কুৎসিত যদি তাহাকে ভালবাসে তবে সে তাহার ভালবাসার প্রতিদান দিতে চায় না—তাহাকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া যায়—তাহার অশ্রুসিক্ত [illegible] ও জ্বালাপূর্ণ হৃদয়ের পানে সে ফিরিয়াও দেখে না। তাই সে জোর করিয়া নিজের মান

বজায় রাখিবার জন্যই শুদ্ধ বলিয়া গেল—"আমি আপনাকে ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন ?—না মহারাজ, আমি আপনাকে ঘৃণা করি।"

নারী যখন একজনকে ভালবাসে এবং পুনঃ পুনঃ তাহাকে পাইবার আশা করিয়াও হতাশ হয় তখন তাহার হৃদয় গভীর অভিমানপূর্ণ হইয়া উঠে ; এবং যখন অবশেষে তাহারই সেই ভালবাসার লোক তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার প্রেমের কথা জিজ্ঞাসা করে—তখন তাহার হৃদয় সহস্রধার হতাশার বাণে বিদ্ধ হইয়া এমনি উন্মাদ হয় যে সে যে তাহাকে ভালবাসে তাহা আর তখন বলিতে ইচ্ছা হয় না, তখন মনে হয় বুঝি তাহাকে উপহাস করিবার নিমিত্তই সে ব্যক্তি আজ তাহার দুয়ারে আসিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ে যে একটা জ্বালা মিশ্রিত প্রেমের ফল্গু নিরন্তর বহিয়া যায় তাহাই তাহাকে পুনরায় সজাগ করিয়া দেয়—তাহার অভিমানের বোধ ভাঙ্গাইয়া দেয়।

ছায়ারও এখানে সেই অবস্থা। সে অভিমান ভরে চন্দ্রগুপ্তকে উপরোক্ত প্রকারে রূঢ়ভাবে তিরস্কার করিয়া গেল বটে কিন্তু পরক্ষণেও সে যখন তাহার হৃদয়ের প্রেম পুনরায় উপলব্ধি করিল এবং তাহার প্রেমের পুরুষকে তিরস্কার করার জন্য মনে ক্ষোভ আসিল তখন সে আবার তৎক্ষণাৎ চন্দ্রগুপ্তের নিকট আসিয়া কহিল—"মহারাজ, ক্ষমা করুন, রুক্ষ হ'য়েছি—অপরাধ হয়েছে। মার্জ্জনা করুন, মার্জ্জনা না করেন, দণ্ড দিন।"

কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত যখন ছায়াকে বলিলেন যে বাস্তবিকই তিনিও তাহার প্রেমমুগ্ধ—এবং ধীরে ধীরে ছায়ার হস্ত ধারণ করিলেন—তখন আবার ছায়ার মনে অভিমান দেখা দিল—এবং সে সত্বর সেখান হইতে প্রস্থান করিল—তাহার সেই ক্ষণের সেই প্রেমের ক্ষণিক উত্তেজনা ও উন্মাদনাকে দমন করিবার জন্য !

জগতে যে যাহাকে বেশী ভালবাসে তাহার উপর সামান্য কারণেই অভিমান আসিয়া পড়ে। ইহাই মানবের প্রাকৃতিক নিয়ম।

তাহার পর হইতে ছায়া চন্দ্রগুপ্তের জন্যই তাহার জীবন একরূপ উৎসর্গ করিয়া দিলেন, চন্দ্রগুপ্ত [illegible] না জানুন, বুঝুন বা না বুঝুন, ছায়া ঠিক তেমনিই ভালবাসিতেন, তাঁহার সুখে আনন্দ অনুভব করিতেন, তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইতেন। [illegible] গ্রীক যুদ্ধে জয়ী হইলেন সেদিন তিনি (ছায়া) আনন্দোচ্ছ্বাসে [illegible] প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"আমার [illegible] তাঁর কি। আমার প্রেম আমার [illegible]

আমার প্রেম নিয়েই পূর্ণ। সেই প্রেমে আমি মগ্ন আছি। তাঁকে দেখবার অবকাশ পাই না।"

কথাগুলি পূর্ণ ত্যাগের পরিচায়ক,—ছায়া যে এখন হইতে চন্দ্রগুপ্তকে শুধু ত্যাগের মধ্য দিয়া ভালবাসিবাই চাহে, কিন্তু প্রতিদান চায় না—আশাও করেন না, এই কথাগুলির মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের অবস্থার এই পরিচয়টুকুই পাওয়া যায়।

এখানেও তিনি রূপহীনতার জন্য দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"যদি আমার রূপ থাকিত তিনি আমায় একবার চেয়েও দেখতেন।"

তার পর যখন সখিগণ চন্দ্রগুপ্তের বিষয় তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল, তখন তাঁহার ব্যর্থ-প্রেম-পূর্ণ কোমল হৃদয়খানি ব্যথিত হইয়া উঠিল; তাই এই ব্যথা চাপিবার জন্যই তিনি বলিলেন—"তোমরা আমায় কাঁদাবে?—না আজ মহোৎসব!—উৎসব কর——গাও।"

তাহার পর তাঁহার ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয় সখিগণের সঙ্গীতধ্বনির মধ্যে ডুবিয়া গেল; অবশেষে রাজমাতা মুরা আসিয়া তাঁহাকে সে স্বপ্ন হইতে জাগাইয়া ডাকিলেন "ছায়া!"

তাহার পর মুরা যখন তাঁহার নিজের নিজ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া তাহাকে জানাইলেন যে, মুরা ছায়াকে নিজ পুত্রবধূ পদে বরণ করিবেন, তখনও তিনি তাঁহার কথা উপহাস বলিয়া মনে করিলেন, তাই তিনি বলিলেন—"ছায়া চন্দ্রগুপ্তের পত্নীত্ব ও ভারতের সম্রাজ্ঞীর সম্মানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।" কিন্তু যখন মুরা পুনঃ পুনঃ বলিলেন যে তিনি সত্যই ইহা ইচ্ছা করিয়াছেন এবং স্থিরও করিয়াছেন, তখন ছায়া তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন এবং এত দুঃখের পর এত অধিক সহাতীত আনন্দে এতই অধীর হইয়া পড়িলেন যে নয়নের অশ্রু চাপিতে পারিলেন না,—অধিক দুঃখের পর অসহ্যতীত আনন্দের আবির্ভাবে মানুষের যে কি অবস্থা হয় তাহা ছায়ার তৎকালীন অবস্থা পাঠে আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

কিন্তু সে সত্য ও স্বপ্নে পরিণত হইল,—মুরা ও ছায়ার সে রচিত সুখের অট্টালিকা শিশুর ধূলোর ঘরের ন্যায় মুহূর্ত্তে তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ হইয়া গেল—যখন চন্দ্রগুপ্তের গুরু ও মন্ত্রী চানক্য আসিয়া সংবাদ দিলেন—"মুরা আমি সন্ধি করেছি, আর সে সন্ধি রক্ষার জামিন স্বরূপ—চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের কন্যার বিবাহ হবে।"

মুরা যখন নিজের অভিমত ও ছায়ার কথা চাণক্যের নিকট ব্যক্ত করিলেন তখন চানক্য বলিলেন—"রাজ্যের কল্যাণে ছায়া নিশ্চয় তুচ্ছ স্বার্থ বলি দিতে পারে।" মুরা ইহার উপর আর কিছু বলিতে পারিলেন না—তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ছায়ার হৃদয়ের দারুণ বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল শুধু তাহার হৃদয়ের দারুণ বেদনার উক্তি।

তাহার পর হইতে ছায়া চন্দ্রগুপ্তের যে ক্ষীণ আশাটুকু তাহার হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল, সেটুকুও সে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিলেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে—শুধু ভাল বাসিয়া এবং তাহার ভালবাসার জ্বালা সহ্য করিয়াই সুখী হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ছায়া একদিন মগধ হইতে পত্র আসিল—"ভারত সম্রাজ্ঞীর অনুরোধ তাহাকে মগধ যাইতে হইবে, তাহাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে। নারী স্বভাব জনিত একটা দারুণ ঈর্ষা তাঁহার মনে জ্বলিয়া উঠিল; তাই তিনি সে পত্র ক্রুদ্ধ হইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। নারী যাহাকে ভাল বাসে—অপর নারী যদি সেই পুরুষকে লাভ করে, তবে তাহার প্রাকৃতিক নিয়মের জন্যই তাহার হৃদয়ে ঈর্ষার আগুণ জ্বলিয়া উঠে। ইহা নারীর স্বভাবগত ধর্ম্ম। দ্বিজেন্দ্র লাল এখানে ইহাই দেখাইয়াছেন।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া স্থির করিলেন, মগধ যাইবেন এবং তৎক্ষণাৎ ভারত সম্রাজ্ঞীকে উপহার দিবার জন্য কর্ম্মচারীকে এক মূল্যবান রত্নহার গড়াইবার জন্য আদেশ করিলেন।

তারপর ভাবিতে লাগিলেন মোহার প্রেমের কথা এবং সেই ভাবনায় শেষে স্থির করিলেন চন্দ্রগুপ্তকে সুখী দেখিয়াই তিনি সুখী হইবেন এবং প্রিয়তমের সুখে তৃপ্তি পাওয়া যেন তাঁহার জীবনের সাধনা। তাই তিনি তখন হৃদয়ের সমস্ত বেদনা সঙ্গীতে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া গাহিয়াছেন—

"সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি সুখ সব সুখীর ভাগী"। তারপর যখন ছায়া তাঁহার রত্নহার হাতে ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন তখন তিনি চন্দ্রগুপ্তকে বলিলেন—"ভারত সম্রাজ্ঞীকে ভারত সম্রাজ্ঞীকে আমার সামান্য যৌতুক উপহার দিতে আসিয়াছি" এবং শেষে বলিলেন যে তিনি ইহার পর সন্ন্যাসিনী হইবেন। কিন্তু হেলেন তাঁহার উচ্চবংশ ও মহৎ হৃদয়ের গুণে ছায়াকে হৃদয়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—

"কিসের দুঃখ তোমার। এস বোন, আমরা দুই নদী একই সাগরে গিয়ে লীন হই—।" এখানে হেমেনের হৃদয়ের মহত্ত্বের চরম বিকাশ। দ্বিজেন্দ্র লাল হেমেনকেও খুব উচ্চাঙ্গের নারী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার নয় যখন ছায়া হেমেনের গলদেশে রত্নহার পরাইয়া দিতে গেল, তখন হেমেন বলিলেন "তুমি ভুল কচ্ছো ছায়া—এহার কাকে পরিয়ে দিতে হয় দেখিয়ে দি এসো।" এই বলিয়া হেমেন ছায়ার হাত দিয়া মালাটি চন্দ্রগুপ্তের গলদেশে পরাইয়া দিলেন এবং ছায়ার বাহু দুই খানি টানিয়া লইয়া নিজের গলদেশে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "তার চেয়ে এই মহামূল্যহার আমার গলায় পরিয়া দাও। ছায়া তুমি চন্দ্রগুপ্তের ভগ্নী নও—তুমি আমার ভগ্নী।" এই খানেই ছায়ার পবিত্র প্রেম শতবার হতাশায় পর্ব্বত গাত্রে আছাড় খাইয়া—শতবার ব্যর্থতার পঙ্ক মলিন হইবার মত হইয়াও অবশেষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।—

শ্রীসুকুমার [illegible]।

আত্ম পরিচয়।

বাজাও বিষাণ উড়াও নিশান আষার জোয়ার এসেছে;
আমার হৃদয়ে দেবতা আমার এবার জাগিয়ে উঠেছে।
লক্ষ যুগের লক্ষ বাসনা মোর দোরে আজি বাঁধা,
হারাণ দিনের বাসি স্মৃতিকণা বাঁশীতে আমার সাধা।
আমার মাঝারে পেয়েছি সবারে আমারে আবার চিনেছি,
নহি দীন আমি, নহি হীন আমি শোক দুঃখ তাপ ভুলেছি।
চারিদিকে মোর দুর্গ প্রাকারে বাঁধিয়াছি আট ঘাট,
বুঝেছি এবার ক্ষুদ্র নহি আমি বিশ্ব বিজয়ী সম্রাট।

* * *

লক্ষ জীবের বক্ষ কাঁপায়ে ছুটেছে কামান মোর,
আলোড়িত করি নিম্ন পুলিন উঠেছে গর্জ্জন ঘোর।
ফট্ ফট্ করে ফেটেছে বোমা, ছুট্ ছুট্ করে এসেছে সৈন্য,
উড়েছে দুর্গ, ভেঙ্গেছে প্রাসাদ ছিট্‌কে পড়েছে কতনাগন্য

আল্ পস্ মোর ছেড়ে দিছে পথ ভীম ভ্রূকুটি হেরি
ন্যায়ের চোর গো ব্যগ্র সদাই ভীতি-বিহ্বল আঁখি।
কখনও বিজয়ী, কভু পরাজিত, কখনও হয়েছি বন্দী,
সংগ্রাম ঘোর চিরদিন মোর, করি নিকো কভু সন্ধি।

* * * * *

কখনও আমার গদার ঘূর্ণনে ... পাতিয় ছুটে,
কখনও আমার বাহুর স্পন্দনে ... হিমালয় টুটে।
কভু গোবর্দ্ধন, অঙ্গ-বর্হন, ... কেশরীর মাথা,
হাইড্রারে কভু ধরি সাপটি, ... ভেলিলার ভ্রাতা।
লঙ্কে কখনও সাগর লঙ্ঘি, কম্পিত করি লঙ্কা,
তূর্য্য-নিনাদে বীর্য্য কখনও শুনায় বিজয় ডঙ্কা।
আজিকে যেন গো সে পুরুষ পুনঃ জেগেছে হৃদয় মাঝে,
ক্ষুব্ধ পবন শুব্ধ আজিকে হেরিয়ে আমারে লাজে।

* * * * *

ধর্ম্মের তরে মর্ম্ম বাঁধিয়া দূরেছি পাপের বোঝা,
অহিংস করিয়া বিশ্ব বাসীরে ... পথ সোজা;
কভু শবাসনে তন্ত্র-সাধনে দেখায়ু বিধির বধ,
হিরার গহ্বরে কাবার মর্ম্মরে দেখানু খোদার পথ।
প্রেমের বন্যায় করেছি ধন্য হিংসাময়ী এ ধরণী,
ক্রুশ বিদ্ধ হ'য়ে করেছ বিদ্ধ দুঃখ তিমির রজনী।
শোক দুঃখ যত কর্ম্মের ... রেখেছি ...
পুনঃ রবে নাকো শোক, রবে-নাকো দুঃখ পৃথিবী উঠিবে হেসে।

* * * * *

নন্দ বংশ করেছি ধ্বংস রাজনীতি নিয়ে হাতে,
জরাসন্ধরাজে বধিয়াছি আমি ... কলার পাতে।
প্রসিয়া গনিয়া রাখিল সৈনিক ভয় কিবা ... ,
... আমার ... রাখিয়া যাবে।
আমার ভেরী গর্জ্জাইছে আজি ... নব অরুণে,
... আমি মহাসমরের প্রাঙ্গনে,
ইতালীরে আজ ... চুমিয়া প্যারীর চরণ-রেণু,
... ।

লুপ্ত বীজ এবে উঠেছে ফুটিয়া সুপ্ত প্রাণের মাঝে,
আমার "আমিটী" উঠেছে জাগিয়া মানুষের নব সাজে।
বিশ্বের যত উন্নত মন নিহিত আমাতে আছে,
বিশ্বের যত শক্তি পুঞ্জ মুষ্টিত মোর কাছে।
আমি কাইসার, আমি হানিবল, আমি সে রাবণ বীর,
টলষ্টয় আমি, বিসমার্ক আমি, যীশু মুসা যুধিষ্ঠির।
আমি ভীম, আমি গান্ধী, আমি মিল্টন কালিদাস,
আমি সে খালিদ, আমি সে মেহেদী, আমি সেই কীর্ত্তিবাস।

* * * *

আমি হিমাচল সম অচল অটল, বসুধার মত স্থির,
গান্ধীর সম কর্ম্মী আমি, ভীষ্মের মত বীর।
হিংসার মত তিক্ত আমি, মুক্তির মত মিষ্টি,
উচিতের সম শক্ত আমি, উদার যেমন সৃষ্টি।
সলোমন সম জ্ঞানী আমি, চাণক্যের সম বুদ্ধি,
রবীন্দ্রের সম কবীন্দ্র আমি কর্ণেগীর মত ঋদ্ধি।
মরুভূর মত গম্ভীর আমি, সত্যের মত আলো,
সাগরের সম উদ্দাম আমি, মৃত্যুর মত কালো।

* * * *

পুরুষ আমার উঠেছে জাগিয়া ভেঙ্গেছে তাঁহার ধ্যান,
বুঝেছি এবার ক্ষুদ্র নহি আমি, আমারিও আছে প্রাণ!
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সমাজ বাঁধন মানুষের ভেদাভেদ,
উঠিতে হইবে বিশ্ব ভেদিয়া নাহি রাখি কোন ছেদ।
নাবালক আজি থাকিব না আর, এবার মানুষ হব,
আমিই গুরু, আমিই শিষ্য শিখাব শিখিব সব।
হয় ভগবান, নয় সয়তান এবার হইতে হবে,
সম্রাট আমি, বীরেন্দ্র আমি, ক্ষুদ্র আমি নাই ভবে।

শ্রীবরদা দত্ত।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(জীবনী-প্রসঙ্গ)

৩

কলিকাতায় আগমন ও ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পাঠ।

তারকনাথ পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া দশম বর্ষ বয়সে ইংরাজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তারকনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা (জেঠতুতো) অম্বিকাচরণ ভবানীপুরে বাস করিতেন। তিনি মিউনিসিপাল আপিশে কর্ম্ম করিতেন। অম্বিকাচরণ ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। তিনি চিরস্মরণীয় দেশহিতব্রত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহচর্য্য লাভ করিয়া ইংরাজী ভাষা ও রচনায় কৃতবিদ্য হন। গাঙ্গুলী বংশে ইনিই প্রথম ইংরাজী শিক্ষা করেন। তৎকালে অম্বিকাচরণের মত ভবানীপুরের অনেক যুবক হরিশ্চন্দ্রের নিকট ইংরাজী রচনা শিক্ষা করিতে যাইতেন। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র বসু, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, প্রভৃতি অনেক যুবক ইংরাজী ভাষা ও রচনার জন্য হরিশ্চন্দ্রের নিকট ঋণী। হরিশ্চন্দ্রের সাহচর্য্য লাভ করা তৎকালীন যুবক সম্প্রদায়ের নিকট সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। যাহাদের এ সৌভাগ্য লাভ ঘটিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই ইংরাজী রচনায় কৃতবিদ্য, রাজদ্বারে উচ্চ সম্মান ও উচ্চপদ লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র (পরে স্যর) হাইকোর্টের জজ, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার, গোবিন্দচন্দ্র বসু চব্বিশপরগণা আলিপুর কোর্টের হেডক্লার্ক, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের সরকারী উকীল, শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত রাজনীতিক ও ইংরাজী রচনা-কুশলী, "রেইস এণ্ড রায়ৎ" ও "মুখার্জ্জিস্ ম্যাগেজিন" সম্পাদন করেন. কৃষ্ণদাস পাল, রাজনীতিবিশারদ, ইংরাজী লেখক ও রাজদ্বারে সবিশেষ সম্মানিত ও বিখ্যাত হন।

অম্বিকাচরণ আপন অধ্যবসায় ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে সামান্য কর্ম্মচারী হইতে, সুবার্বণ মিউনিসিপালিটির (Subarbon Municipality) এসেসর (Aesessors) নিযুক্ত হন। এই উপলক্ষে তিনি ডিপুটী কালেক্টার গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত ও শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট Mc. Gregor সাহেবের অনুগ্রহে প্রাপ্ত হন। অম্বিকাচরণ মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রশংসার সহিত এই কর্ম্ম করেন। চাকুরীতে প্রবেশকালীন অম্বিকাচরণ ভবানীপুরনিবাসী বলরাম বসুর বাটীর একাংশ ভাড়া লইয়া বাস করিতেন। পরে চাকুরির উন্নতি, বেতনবৃদ্ধি ও বাটীর অন্যান্য ভ্রাতাগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাঁসারীপাড়ায় একটী বৃহৎ বাটী ভাড়া করিয়া বসবাস করেন। তারকনাথ এই সময় কলিকাতায় আগমন করেন; জ্যেষ্ঠতাত পুত্র অম্বিকাচরণের নিকট তিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন এবং তাঁহারি তত্ত্বাবধানে থাকিয়া লেখাপড়া আরম্ভ করেন।

বাঙ্গালায় নবযুগের অভ্যুদয়।

যে সময় তারকনাথ বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন করেন, সে সময় বঙ্গদেশের মহান যুগ-পরিবর্ত্তনের সময়। এই পরিবর্ত্তন-যুগেই বাঙ্গালীর মানসিক-প্রতিভার জাগরণ হয়। বিধাতার বিধানে বাঙ্গালার ভাবী শুভ-সূচনার জন্য এদেশে ইংরাজের আগমন হয়। ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে শুভ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই শুভ-সম্মিলনের ফলে বাঙ্গালীর সামাজিক, রাজনীতিক, পারিবারিক জীবনে নূতন চিন্তা, নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন আদর্শের স্রোত প্রবাহিত হয়। এই নবভাবের অভ্যুদয়ের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক-প্রতিভার স্ফুরণ হয়। দেশের অতীত ইতিহাসের সাক্ষী মনস্বী রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন, যদি উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক প্রতিভা বিকাশের কালনির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। যে যুগে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কারকগণ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রামগোপাল ঘোষ, প্রভৃতি রাজনীতিকগণ রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতি মনীষীগণ, [illegible] রাজা রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, [illegible] রাধানাথ মিত্র, রাধাগোপাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন

সিংহ, মধুসূদন দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সাহিত্যসেবীগণের আবির্ভাব হয়—সেই প্রতিভা-জাগরণ-যুগের ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই। প্রতিভা-জাগরণ-যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ও চিরস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র—বিরাট মহাপুরুষদ্বয় এই প্রতিভা—জাগরণ যুগে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর আত্মনিয়োগ করেন। চিরস্মরণীয় দেশহিতব্রত হরিশ্চন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলন, স্বদেশবাসীকে স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে, সিপাহী বিদ্রোহের অনলে জলসেচন পূর্ব্বক দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনে সহায়তা করিয়া ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে শুভ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। পৈশাচিক নীলকরদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার তেজোময়ী লেখনী চালনা করিতে বিরাট পুরুষ হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আজ যে বাঙ্গালা-সাহিত্য বিরাট ও বিপুলকায় ধারণ করিয়া সমস্ত জগতের মধ্যে সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহা বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের জনক প্রাতঃস্মরণীয় দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও মনীষার প্রভাবে; আজ যে রাজনৈতিক আন্দোলন ও চর্চ্চা বিশালকায় ধারণ করিয়াছে, এবং স্বদেশবাসী ধীরে ধীরে দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতেছে, ইহা চিরস্মরণীয় দেশহিতব্রত হরিশ্চন্দ্রের স্বদেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গের ফলে।

এই দুই বিরাট কর্ম্মবীরের নেতৃত্বে দেশের যে সমস্ত কার্য্য ও আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া দেশের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল, তাহার কথা সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইল। এই জাগরণ-যুগে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর হিন্দুবিধবার দুঃখে বিগলিত হৃদয় হইয়া তাহাদের পত্যান্তর গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহাত্মা কিশোরীচাঁদ মিত্র কুলিনদিগের মধ্যে বহু বিবাহ নিবারণকল্পে তৎসম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" পত্রে অমিত প্রভাবে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন। এই সময়েই হরিশ্চন্দ্রের ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার ও উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। এই যুগেই দেশের হিতসাধনের জন্য হরিশ্চন্দ্রের "হিন্দু পেট্রিয়টের" জন্ম হয়, এবং উহা রাজনৈতিক চর্চ্চা ও আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের যে তেজোময়ী লেখনী লর্ড ড্যাল-হৌসির অযোধ্যাধিকারের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করিয়াছিল, তাহাই আবার আমাদের সিপাহীবিদ্রোহকালীন লর্ড ক্যানিংএর পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্রোহী ও বিদেশীদের মধ্যে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে শুভ সম্বন্ধ ও শান্তি স্থাপনে সহায় হইয়াছিল।

এই সময়েই নীল বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। স্বদেশ-হিত-মন্ত্রে উৎসৃষ্ট-প্রাণ চিরস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্রের সেই তেজস্বিনী লেখনী পুনরায় নীলকর বিষধরের পৈশাচিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় অগ্নী উদ্গীরণ করিয়াছিল। নীলকর-অত্যাচার নিবারণ হরিশ্চন্দ্রের এক অবিনশ্বর কীর্ত্তি। এই যুগেই স্বদেশপ্রাণ হরিশ্চন্দ্র দধিচীর মত স্বদেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া জগৎবাসীকে বুঝাইলেন—বাঙ্গালী স্বদেশের হিতের জন্য নিজ প্রাণকে বীরের মতন বলিদান দিতে পারে। হরিশ্চন্দ্রই মাতৃযজ্ঞের প্রথম বলি। হরিশ্চন্দ্র যেমন ইংরাজি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সার্থকতা বুঝাইয়াছিলেন, সেইরূপ বিদ্যা-সাগর ও পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ একত্র মিলিত হইয়া "সোমপ্রকাশ" প্রকাশ করেন; বঙ্গভাষায় লিখিত সোমপ্রকাশ ভাষা, সাহিত্য, সমাজ ও দেশের মহাহিতসাধন করিয়াছিল। এই যুগেই সিপাই বিদ্রোহাবসানে পুণ্যশ্লোকা মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন-প্রতিজ্ঞা-ঘোষণা করেন। এই সময়েই মহাত্মা মতীলাল শীল ও রাজেন্দ্র দত্তের চেষ্টায় দেশের মধ্যে দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এই সময়েই দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়েই ওথুকবির তিরোভাব ও কবিকুলচূড়ামণি শ্রীমধুসূদনের আবির্ভাব হয়; এই সময়েই হিন্দুকলেজের খ্যাতনামা ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজী ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া তদানীন্তন ইংরাজ-সমাজকে চমৎকৃত করেন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর ও মহাত্মা বেথুন প্রভৃতির চেষ্টায় দেশের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হয়। জাতীয় মেলার অধিষ্ঠান হয়। এই সময়ে কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলালের চেষ্টায় প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা ও ইতিহাস-অনুশীলনের সূত্রপাত হয়; এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশিত হয়। এই সময়েই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাকল্পদ্রুম অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্যারি-চাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের 'মাসিকপত্র' প্রকাশিত হয়; বিদ্যাসাগরও অক্ষয় কুমার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য-সাগর মন্থন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য অমূল্যরত্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এই সময়ে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অনুবাদক সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়েই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সংস্কৃতবহুল ভাষার প্রতিবাদকল্পেই যেন টেকচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হয়। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়।

লণ্ডন মিশনরি স্কুলে প্রবেশ।

তারকনাথ যে সময় ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন, সে সময় যদিও দেশের মধ্যে ইংরাজী লেখাপড়ার প্রচলন হইয়াছে, তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; উহার অভাব, প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও কি ভাবে উহার পরিচালনা হইবে হরিশ্চন্দ্র প্রমুখ শিক্ষিত বাঙ্গালী ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তাগণ বিবেচনা করিতেছিলেন। এখনকার মত তৎকালে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইংরাজী স্কুল ছিল না। দেশীয় ব্যক্তিগণ ও মিশনরীগণের অর্থে ও চেষ্টায় কতকগুলি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লণ্ডন মিশনরী স্কুল খৃষ্টান পাদরী ও মিশনরীগণের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রথমে সামান্য চালা ঘরে স্কুলের কার্য্য চলিত। সে সময় ছাত্রেরা বিনা বেতনে পড়িত। এখন স্কুলের যে বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়। স্কুলের নূতন বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত হইবার পর ছাত্রগণের মাসিক আট আনা করিয়া বিদ্যালয়ের বেতন ধার্য্য হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইলে এই বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাধীন হয়। তদানীন্তনকালের কার্য্য-বিবরণী হইতে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

রেভাঃ জে, মুদেন্স, প্রিন্সিপাল—বাইবেল ও নীতি-বিজ্ঞানের শিক্ষক।
রেভাঃ ই, ষ্টরো—প্রধান ইংরাজী শিক্ষক।
রেভাঃ ডবলিউ জনষ্টন—ইংরাজী ও ব্যাকরণ শিক্ষক
এ, এফ, জয়েশ—ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক।
জেমস্ ডবলিউ হাইড—আবৃত্তি শিক্ষক।
শ্রীনাথ শিকদার—সহকারী আবৃত্তি শিক্ষক।
তারানাথ চক্রবর্ত্তী—প্রধান বাঙ্গালা শিক্ষক।
গোপালচন্দ্র সাহা—বাঙ্গালা শিক্ষক।
পণ্ডিত রামবিকাশ বিদ্যারত্ন—প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক।

ইহা ব্যতীত চারিজন বাঙ্গালী শিক্ষক ছিলেন। কার্য্য বিবরণীতে তাঁহাদের নাম উল্লেখ নাই।

তারকনাথ যে সময় বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, সেই সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা পাঁচশত। ইহা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর

মধ্যভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবার পর বাঙ্গালীরা ইংরাজী লেখাপড়া শিখিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র ও অগ্রসর হইয়াছিল।

তারকনাথ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় স্বভাবগুণে সহপাঠীগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধ্যায়ীগণের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্য জীবনে উচ্চপদস্থ ও কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় রায় বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, স্বর্গীয় উমাচরণ দাস, স্বর্গীয় রায় ডাক্তার মধুসূদন সেন বাহাদুর, স্বর্গীয় রায়সাহেব অদ্বৈতচরণ বসাক, শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত স্মৃতিকণ্ঠ মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজবাবুর নিকট যে কয়জন সহধ্যায়ীর নাম জানিতে পারিয়াছি ও যাঁহারা উচ্চপদস্থ ও কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই নামোল্লেখ করিলাম। স্বর্গীয় রায় বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বাহাদুর ডাকবিভাগে প্রথম বাঙ্গালী ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, স্বর্গীয় উমাচরণ দাস মহাশয় ডিপুটী কনট্রোলার, স্বর্গীয় রায় মধুসূদন সেন বাহাদুর সিভিল সার্জ্জন, অদ্বৈতচরণ বসাক, প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত ব্রজবাবু ডিপুটী কনট্রোলার আফিসের (আধুনিক ডিপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারেল পোঃ এবং টেলিগ্রাফ) হেডক্লার্ক ছিলেন, শ্রীযুক্ত স্মৃতিকণ্ঠ মল্লিক সব জজ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়বাবু জনপ্রিয় মিউনিসিপাল কমিশনর। বাল্যে গ্রাম্য-পাঠশালায় তারকনাথ যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গুরু জয়মল্লিককে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক গণকেও প্রতি বৎসর সেইরূপই উত্তরোত্তর চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সর্ব্ব বিষয়েই তারকনাথ পারদর্শিতা দেখাইতেন। তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সহধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, তারকনাথ ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে তাদৃশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। সকল শিক্ষকের প্রিয়পাত্র ছিলেন বটে, কিন্তু অঙ্কের জন্য জয়েণ সাহেব বড়ই দুঃখিত ছিলেন, পরে জয়েণ সাহেবের যত্নে তারকবাবু যাহা কিছু অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইতিহাস বেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রিয় পাঠ্যবিষয় ছিল। তিনি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর [illegible] জ্ঞান-তৃষ্ণা অতিশয় প্রবল ছিল। তৃতীয় [illegible] পঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস [illegible] আরম্ভ করেন; [illegible] বেভাঃ মুলেসই [illegible] পাঠ তৃষ্ণানলে আহুতি প্রদান করিয়াছেন, [illegible] ইংরাজী [illegible]

নানা প্রসিদ্ধ পুস্তক তারকনাথকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে, স্লেভাঃ সাহেব ও তাঁহার বৃদ্ধ মাতা নূতন স্কুল বাড়ী প্রস্তুত হইবার পর স্কুল বাড়ীতেই থাকিতেন। এই বৃদ্ধা স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। যে সমস্ত ছাত্র মনোযোগের সহিত বাইবেল পাঠ করিত, তাহারা বৃদ্ধার সমধিক স্নেহপাত্র ছিল ও তাহারা ইংরাজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধ পুস্তক সকল উপহার পাইত। তারকনাথ বাইবেল খুব ভাল করিয়াই পাঠ করিয়াছিলেন ও বৃদ্ধার নিকট হইতে একখানি উপহার পাইয়াছিলেন।

তারকনাথের অধ্যয়ন-অনুরাগ সম্বন্ধে স্বর্গীয় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। তিনি বলিয়াছেন, আমি ও তারকবাবু যৌবনে কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতাম। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতাম, তারকবাবু মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতেন। তারকবাবুকে মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্য পুস্তক পড়িতে অতি অল্প সময়ই দেখিতাম। তিনি অধিকাংশ সময়েই হয় ডিকেন্সের কোন উপন্যাস, না হয় মেকলে কিম্বা গিবনের ইতিহাস পড়িতেছেন। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল। এজন্য আমরা অনেক সময় বিদ্রূপ করিতাম, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে (রাসবিহারী (স্যর রাসবিহারী ঘোষ) তারকবাবুকে বলিতেন, তুমি ডাক্তার হবে, তোমার ইতিহাস ও সাহিত্য পড়ার দরকার কি? তারকবাবু বলিতেন, সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা ভাল। এই কথা শুনিয়া রাসবিহারী ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি বামুনের ছেলে, তোমাদের কাজ হচ্চে তিনটী, উনুনে ফুঁ, কালে ফুঁ, ও শাঁকে ফুঁ। আমাদের যৌবনে এখনকার মত কলিকাতায় বইয়ের দোকান ছিল না। ইংরাজী বই থ্যাকারস্পিঙ্কের দোকানে পাওয়া যাইত, সবগুলি সব সময় পাওয়া যেতনা। সে সমস্ত বই মাদ্রাজ হইতে আনাইতে হইত। তারকবাবু অনেক সময় মাদ্রাজ থেকে বহি আনিয়া পাঠ-তৃষা মিটাতেন।

তারকনাথ প্রতি বৎসর বাৎসরিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন।

তারকনাথ প্রথম যৌবনে হৃষ্টপুষ্ট না হইলেও কৃশ ছিলেন না। সদা প্রফুল্ল, পোষাক-পরিচ্ছদ দেহে ও মনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। শৈশবের এই অভ্যাস ভাবিষ্য-জীবনে বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। কর্ম্মজীবনে

যাহাকে Healthy mind in a healthy body বলে তিনি তাহারই প্রতিরূপ ছিলেন। স্বর্গীয় শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, তারকনাথ সদাপ্রফুল্ল, হাস্যবদন ছিলেন, তাঁহার চক্ষু দুটী বুদ্ধি ও প্রতিভা-পূর্ণ ছিল। বৈশব হইতেই তাঁহার গলার স্বর মধুর ও কথাবার্ত্তা সরস ছিল। সরস কথাবার্ত্তার সম্বন্ধে স্বর্গীয় আদর্শচরিত্র স্বনামধন্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, বহরমপুর অবস্থানকালে তারকবাবুর সহিত আমার আলাপ হয়। অক্ষয় বাবু (সরকার) আমার সহিত আলাপ করিয়া দেন। তারকবাবুর মধুর ও সরস কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হই। ক্ষণিকের আলাপে তিনি পরকে আপনার করিতে পারিতেন। কালে হয় ত তারকবাবুর সব ভুলিতে পারি কিন্তু তাঁহার 'মিষ্টিমুখ' কখনও ভুলিতে পারিব না।" জেমস হাইড ও শ্রীনাথ শিকদার আবৃত্তি-শিক্ষা দিতেন। ইহাদের নিকট বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রই সুন্দর আবৃত্তি করিতে শিক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কেহই স্বর-মাধুর্য্য স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণের উৎকর্ষে তারকনাথকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

তারকনাথের আবৃত্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্বর্গীয় দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। স্বর্গীয় দীনবাবু মিশন স্কুলের ছাত্র ছিলেন; তিনি তারকনাথের অপেক্ষা এক শ্রেণী নিম্নে পাঠ করিতেন। দীনবাবু বলিয়াছেন, "আমাদের স্কুলে তারকবাবুর গলার খুব সুখ্যাতি ছিল; তাঁহার গলার স্বরটি খুব মিষ্ট ও কথার উচ্চারণ বড় স্পষ্ট ছিল। স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণ-সভায় তারকবাবুকে প্রতি বৎসরই হাইড সাহেবের আদেশে আবৃত্তি করিতে হইত। আমাদের স্কুলে আবৃত্তির প্রতিযোগীতা-পরীক্ষাও হইত। এই প্রতিযোগীতা-পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া অনেক মেডেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। এক বৎসরের প্রতিযোগীতা-পরীক্ষায় প্রসিদ্ধ পাদরী Rev. George Smith সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রগণকে গুণানুসারে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সভায় প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পাদরী কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (Rev. K. M. Banerjee) উপস্থিত ছিলেন। তারকনাথের আবৃত্তি শুনিয়া পাদরী স্মিথ সাহেব এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তারকনাথকে মেডেল পুরস্কার দিবার সময় একবার আমাদের Principal Rev. Mullence সাহেবের দিকে ও একবার তারকনাথের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, এই বালক [illegible]

এত চমৎকার যে মনে হয় যেন nightingle শিষ দিচ্ছে। Rev. Mullence সম্মানের সহিত হাইড সাহেব ও শ্রীনাথ শিকদারকে দেখাইলা [illegible], তাঁহাদেরই শিক্ষানৈপুণ্যে বালক কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে। সভা ভঙ্গের পর [illegible] বাবু তারকনাথকে বুকে জড়াইয়া চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, তারক, তুমি আমাদের মুখরক্ষা করিয়াছ। হাইড সাহেব আনন্দ গদ্গদ স্বরে you make us proud my jolly nightingle! বলিয়া পিঠ চাপড়াইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় তারকনাথ স্বর-মাধুর্য্য উত্তরাধিকার [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি তারকনাথের বৃদ্ধপিতামহ ইন্দ্রনারায়ণ বলাকুশলী গায়ক ও বাদক ছিলেন, তিনিও স্বর-মাধুর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন; তাঁহার পর এ বংশে তারকনাথই স্বর-মাধুর্য্যের জন্য খ্যাতিলাভ করেন।

মাইকেল মধুসূদন ও তারকনাথ।

সাগর দাঁড়ীর দত্ত পরিবারের সহিত গাঙ্গুলী পরিবারের সবিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। সাগর দাঁড়ীর উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তারকনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী দাক্ষায়িণী দেবীর বিবাহ হয়। উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাটী, রাজনারায়ণ দত্তের বাটীর পার্শ্বস্থ বাটী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই দুই পরিবারের অতিশয় প্রণয় ছিল। দাক্ষায়িণী দেবীর বিবাহের সময় হইতে দত্ত পরিবারের সহিত গাঙ্গুলী সৌহার্দ্দ আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তারকনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অম্বিকাচরণ ভবানীপুরে কাঁশারী পাড়ার যে বাটীতে বাস করিতেন, সেই বাটীর পার্শ্বস্থ বাটীতে মধুসূদনের জনৈক বন্ধু বাস করিতেন। মধুসূদন প্রায়ই অপরাহ্ণ সময়ে বন্ধুর বাটীতে আসিতেন। এই স্থানেই মধুসূদনের সহিত গাঙ্গুলীদের পুনরায় পরিচয় হয়। এই স্থানেই বালক তারকনাথ মধুসূদনের সহিত পরিচিত হন ও স্নেহলাভ করেন। যাঁর বাহাদের [illegible] শ্রীযুত প্রিয়নাথ বসু মহাশয় বলেন, "মধুসূদন তারকনাথকে [illegible] স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বন্ধুর বাটীতে আসিলেই [illegible] সংবাদ লইতেন। মধুসূদন তারকনাথের চক্ষুঃ বড়ই প্রশংসা করিতেন"। মধুসূদন বালকগণকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; বালকগণও মধুসূদনকে ভাল [illegible] তিনি তাহাদের সহিত ক্রীড়ার যোগদান করিতেন। মধুসূদন মধ্যে মধ্যে [illegible]

উচ্চারণে ইংরাজীকে উদ্ভব শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এ ছেলে ইংরাজী শিখিতে পারিবে। মধুসূদনের ভবিষদ্বাণী ফলিয়াছিল। জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত কয়েকটী ইংরাজী প্রবন্ধ ব্যতীত তারকনাথের কোন ইংরাজী রচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু মহাশয় বলেন, তারকবাবু Friend of India পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। তারকনাথের বাল্য সহযায়ী শ্রীযুত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, হরিশ বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে স্যনড়ে লিটরারী ক্লাবের তরফ হইতে এক শোক-সভার অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে তারকবাবু একটী ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি রমাপ্রসাদ রায় এই প্রবন্ধটীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তারকনাথ বিশুদ্ধ ইংরাজী রচনার জন্যই আমাদের প্রিন্সিপ্যাল রেভাঃ মুলেন্সের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তারকনাথের অন্যতম বন্ধু স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও তারকনাথের ইংরাজী রচনার প্রশংসা করিতেন।

ভবানীপুর স্যানডে লিটরারী ক্লাব।

তারকনাথ যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করেন, সেই সময় কয়েক বন্ধু মিলিয়া এই সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানীপুর নিবাসী স্বর্গীয় বলরাম বসুর বাটীতে প্রতি রবিবারে এই সমিতির অধিবেশন হইত। তারকনাথ এই সভার সেক্রেটারী ও হরিশচন্দ্র ঘোষ এসিট্যাণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন। হাই-কোর্টের উকীল গিরিজাশঙ্কর মজুমদার সভাপতি ছিলেন। যুবকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সভার সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। চিরস্মরণীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বালকগণের মধ্যে যাহাতে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহ দিতেন। তিনি এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিতেন না। তিনি পেট্রিয়ট লইয়া এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে তাঁহার মুহূর্ত্তের জন্য সময় থাকিত না। তথাপি তিনি বালকগণকে উৎসাহ দিতেন। হরিশচন্দ্র ঘোষ হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত তারকনাথের বন্ধুত্ব ছিল। ভবানীপুরের মিশন স্কুল ও অন্যান্য স্কুলের অনেক ছাত্র এই সভায় যোগদান করিতেন। এ সভায় ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত। ভবানীপুর নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সভার সভ্য ছিলেন। তিনি বলেন, স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, সি-আই-ই মহাশয়

সে সময় ভবানীপুরে তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিতেন ও তিনি সেই সময় এই সভার একজন সভ্য ছিলেন। তিনিও ইংরাজীতে প্রবন্ধ রচনা করিতে ও উত্তম বক্তৃতা দিতে পারিতেন। সকল রবিবারেই প্রবন্ধ পাঠ হইত না, কোন কোন রবিবারের অধিবেশনে কোন বিষয় লইয়া তর্ক হইত। তারকবাবু অল্প সময়ই তর্কে যোগদান করিতেন। তবে তিনি নিয়মিত ভাবে সন্দর্ভ পাঠ করিতেন; তিনি "বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবন" ও "ইতিহাসের শিক্ষা" নামক দুটী প্রবন্ধের জন্য সভাপতি গিরিজাবাবু ও হরিশ মুখোপাধ্যায়ের সবিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।"

কাব্যানুরাগ।

রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু বাহাদুর বলেন, তারকনাথ ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের অনুরাগী ছিলেন। তিনি বলিতেন, [illegible] ক্ষমতাশালী কবি অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল তাঁর প্রিয় কাব্য ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাও খুব পড়িতেন। কুলীনদিগের বহু বিবাহ বিষয়ক ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলি [illegible] তখন আবৃত্তি করিতেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বলেন, তারকনাথ নিজে কুলীনের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুলিন মহিলাগণের মনঃকষ্টের কারণ কুলিনদিগের বহু বিবাহকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।" তারকনাথের এই অভিজ্ঞতার ফল, "ললিত-সৌদামিনী" "বিবিলিলি" উপন্যাস দুই প্রসিদ্ধ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, [illegible] বলিয়া।

এক দিন তারকনাথ বৈঠক খানার ঘরে বসিয়া [illegible] পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মধুসূদন তাঁর বন্ধুর বাটীর [illegible] হন। তিনি দাঁড়াইয়া তারকনাথের ভারতচন্দ্র পাঠ শুনি [illegible] এক মনে সুর করিয়া ভনিতা পূর্ণ শেষ পদ "ভারত [illegible] আবৃত্তি করিয়া থামিলে মধুসূদন বৈঠক [illegible] তারকনাথের মত সুর করিয়া বলেন, "তারক [illegible] তারকনাথের কাব্যানুরাগ বরাবরই সমভাবে ছিল। তিনি জ্ঞানাঙ্কুরে কতকগুলি কবিতাও লিখিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে তারকনাথ যেমন সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, তেমনই ইতিহাসের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার ইতিহাসানুরাগ সম্বন্ধে স্বর্গীয় শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, বালক তারকনাথ তাঁহার বড় ভাই (জেঠতুতো) আমার বন্ধু অম্বিকাচরণের সহিত আমাদের বাটী আসিত। আমি তাহাকে তাহার পড়াশুনার সম্বন্ধে ইংরাজীতে প্রশ্ন করিতাম। তারকনাথও বিশুদ্ধ ইংরাজীতে উত্তর দিত। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-ইতিহাস ব্যতীত তারক এই অল্প বয়সে অন্যান্য কয়েকখানি ইতিহাসও পড়িয়া ফেলিয়াছিল।

প্রিন্সিপাল উমেশচন্দ্র দত্ত ও তারকনাথ।

তারকনাথ যখন লণ্ডন মিশনরী স্কুলে পড়িতেছিলেন, সিটী কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই সময় তারকনাথ অপেক্ষা দুই শ্রেণী উচ্চে পড়িতেন। উমেশচন্দ্র মেধা বুদ্ধি বিষয়ে একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। স্বর্গীয় দীনবাবু বলিয়াছেন, ক্লাসের মধ্যে পড়াইতে পড়াইতে ইংরাজীর প্রধান শিক্ষক রেভাঃ ষ্টবো বলিতেন, তারকনাথ ও উমেশচন্দ্রের মত আর কোন প্রতিভাবান্ ছাত্র এ স্কুলে আসে নাই। মেধাশক্তিতে উমেশচন্দ্র অপেক্ষা তারকনাথ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। উমেশচন্দ্র ও তারকনাথ উভয়েই বৃত্তিধারী ছিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তারকনাথ চৌদ্দ টাকা বৃত্তির সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষোত্তীর্ণ সংবাদে তারকনাথের জেঠাইমা ও পিতা মহানন্দ প্রভৃতি বাটীর পরিজনগণের আনন্দের সীমা ছিল না। অম্বিকাচরণ নিজে যেরূপ ইংরাজী [illegible] ভবিষ্য ছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারকনাথ যাহাতে সেইরূপ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হয় এবং তাহাকে ইংরাজী সাহিত্যের অনুরাগী দেখিয়া পিতৃব্য মহানন্দকে পত্রযোগে তারকনাথের পাঠ্যবিষয়ে মতামত ও উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তারকনাথের পিতা মহানন্দ পুত্রের প্রবেশিকা উত্তীর্ণ সংবাদ পাইবা মাত্র তাহার ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তিত ছিলেন। শৈশব হইতে তারকনাথের কবিরাজী ক্রীড়া দেখিয়া তাহাকে মেডিক্যাল কলেজে পড়াইবার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, আজ সেই ইচ্ছা ফলবতী হইতে দেখিয়া শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া অম্বিকাচরণকে তারকনাথের মেডিক্যাল কলেজে পাঠের ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। প্রথমে তারকনাথ ডাক্তারি পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, পরে যে ঘটনায় তিনি মত পরিবর্ত্তন করেন, সে বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

তারকনাথের বিবাহ।

তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে কৈশোরে ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে ১৪ বৎসর বয়সে ছাত্রাবস্থাতেই তারকনাথের বিবাহ হইয়াছিল। ২৪ পরগণা ঢোঁড়া-নিবাসী রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (মাশচরক) মহাশয়ের কন্যা নিস্তারিণী দেবীর সহিত তারকনাথের বিবাহ হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতি দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। যজমান-বৃত্তির সামান্য আয়ে অতিকষ্টে তাঁহাকে সংসার প্রতিপালন করিতে হইত। অতি সামান্য ভাবে কন্যা পাত্রস্থা করেন। বিবাহের সময় কন্যাকে কোন অলঙ্কার দিতে পারেন নাই। তিনি এতই দরিদ্র ছিলেন যে, অর্থাভাবে বরের—জামাতার জন্য চেলীর কাপড়ের পরিবর্ত্তে সামান্য সূতার কাপড় নটকান রঙে ছোপাইয়া রাখিয়াছিলেন। তারকনাথ বিবাহ-আসরে বসিবার সময় চেলির পরিবর্ত্তে নটকান রঙে ছোপান কাপড় দেখিয়া মহারাগান্বিত হন। তিনি রঙে ছোপান কাপড় পরিধান করিতে স্বীকৃত হন নাই। যে কাপড় পরিধান করিয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন, সেই কাপড়েই বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

সন্ধান।

ওগো, সারা বিশ্ব উজোর করে
খুঁজেছি তোমায়;
কেওত কভু দেয়নি সাড়া
আমার কথায়।
মেঘের বাসরে বিজলীরে দেখি,
ছুটেছি গো সখা, অমনি চমকি
সাগর ফেণায়,
নভো নীলিমায়,
শুধু তোমারেই চেয়েছি
কখনও ত দেখা, পাইনিযো সখা,
নিরিখিছি শুধু ঘুরেছি।

মাতাল মনে [illegible] ধরি
[illegible] যায় যবে মুখে,
তোমারই তরে রয়েছি গো চেয়ে
(তার) ফাগুয়া মাখান মুখে
উদাসী সন্ধ্যার গৈরিক আঁচলে,
সুধা সিঞ্চিত চাঁদ—ঝলমলে
রূপসীর হাসে,
বালকের ভাষে,
তিল তিল করে দেখেছি;
তবু—খোঁজ তব পাইনিকো সখা,
বৃথাই কেবল ঘুরেছি।

উদার মাঠের ঘন সবুজের
শিশির মালিকা'পরে
বহুদিন সখা, খুঁজেছি তোমায়
সারাটী সকাল ধরে,
রোদের আলিপনা দেয়া আঙ্গিনাতে,
কুসুম ভূষিত কানন ভূমিতে
জননীর বুকে,
লাজারুণ মুখে,
তোমারেই সখা খুঁজেছি;
আজ ঘরে ফিরে এসে, দেখে তুমি বসে
সবমে দাঁড়ায়ে রয়েছি।

শ্রীহেমপ্রভা রায়।

গয়ার কথা।

ব্রহ্মগয়া।

(৩)

অত্রিসংহিতায়।

অত্রিসংহিতায় লিখিত আছে যে, বহুপুত্রের কামনা করা উচিত, কারণ তাহাদের মধ্যে যদি কেহ গয়ায় গমন, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান অথবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে। নরকভীত পিতৃগণ এইরূপে পুত্রের কামনা করিয়া থাকেন, যে গয়ায় গিয়া তাঁহাদের উদ্ধার করিবে। ফল্গুতীর্থস্নান গদাধরদেবের দর্শন, এবং গয়াশীর্ষস্থিত পদের অর্চ্চনা করিলে, লোকে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ করে। মহানদী স্পর্শ করিয়া দেবতাও পিতৃতর্পণ করিলে অক্ষয়লোক লাভ ও বংশের উদ্ধারসাধন করা হইয়া থাকে।* অত্রিসংহিতার মতে মহাগুরুপাতে বৎসরের গয়াশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নহে বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়া থাকেন।†

---

* এষ্টব্যা বাহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেতবাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥
কাতরক্ষন্তিপিতরঃ পর্ব্বে নরকাগু রাভীরবঃ।
গয়াং যাস্যতি যঃ পুত্রঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বাদৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্।
গয়াশীর্ষং পদাক্রম্য মুচ্যতে ব্রাহ্মহত্যায়া॥
মহানদী মুপস্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ॥
(অত্রি সংহিতা বঙ্গবাসী সংস্করণ ৫০ ৫৮ শ্লোকে।)

† গুর্ব্বর্থে স্নানং মহাদানং বচ্চান্ত তিলতর্পণম্।
অন্যমেকং ন কুর্ব্বীত মহাগুরু নিপাততঃ॥
গঙ্গাগয়াত্বমাস্যাবৃদ্ধিশ্রাদ্ধেক্ষয়োঽহনি।
ময়াপিণ্ডপ্রদানং স্যাদ্যত্র পরিবর্জ্জয়েৎ॥

বিষ্ণুসংহিতায়।

গয়াশীর্ষে, অক্ষয় বটে, ফল্গুতীর্থে, উত্তরমান সে মতঙ্গবাপীতে বিষ্ণুপদে শ্রাদ্ধ করিলে, অক্ষয় ফল লাভ হয়। এইরূপ পিতৃগীতা গ্রন্থে আছে যে সমাহিত হইয়া গয়াশীর্ষে বা অক্ষয় বটে আমাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে, সেই নরোত্তম যেন আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করে। বহুপুত্রের কামনা করা উচিত, যদি তাঁহাদের মধ্যে একজনও গয়াগমন, অশ্বমেধযজ্ঞ বা নীলবৃষ উৎসর্গ করে।*

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত বঙ্গবাসী সংস্করণের ঊনবিংশ সংহিতার অন্তর্গত অত্রিসংহিতায় উপরোক্ত শ্লোকের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে বলিয়া লিখিত আছে।

* পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

"অথ পুষ্করেষ্বক্ষয়শ্রাদ্ধম্ ॥ ১॥ অপ্যহোমতপাশ্চিচ ॥ ২ ॥ পুষ্করে স্নানমাত্রতঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতোভবতি ॥ ৩ ॥ এবমেব গয়াশীর্ষে ॥ ৪ ॥ অক্ষয়বটে ॥ ৫ ॥ অমরকণ্টকপর্ব্বতে ॥ ৬ ॥ বরাহ পর্ব্বতে ॥ ৭ ॥ বজ্রক্রচন নর্ম্মদাতীরে ॥ ৮ ॥ যমুনাতীরে ॥ ৯ ॥ গয়ায়াং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ কুশবর্ত্তে ॥ ১১ ॥ বিন্দুতে ॥ ১২ ॥ নীলপর্ব্বতে ॥ ১৩ ॥ কনখলে ॥ ১৪ ॥ কুব্জাম্রে ॥ ১৫ ॥ ভৃগুতুঙ্গে ॥ ১৬ ॥ কেদারে ॥ ১৭ ॥ মহালয়ে ॥ ১৮ ॥ পতঙ্গেকাষায়ে ॥ ১৯ ॥ সুগন্ধায়াম্ ॥ ২০ ॥ শাকম্ভর্য্যাম্ ॥ ২১ ॥ ফল্গুতীর্থে ॥ ২২ ॥ মহাগয়ায়াম্ ॥ ২৩ ॥ ত্রিফলিকাগ্রামে ॥ ২৪ ॥ কুশাবারায়াম্ ॥ ২৫ ॥ প্রভাসে ॥ ২৬ ॥ বজ্রক্রচন সরস্বত্যাং বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥

পম্পায়াংবে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।
সততং নৈমিষারণ্যে বারাণস্যাং বিশেষতঃ ॥ ২৮ ॥

অগস্ত্যাশ্রমে ॥ ২৯ ॥ কণ্বাশ্রমে ॥ ৩০ ॥ কৌশিক্যাংবে ॥ ৩১ ॥ সমুষুতীরে ॥ ৩২ ॥ গোদণ্ড বাবলাসঙ্গমে ॥ ৩৩ ॥ বড়বায়াম্ ॥ ৩৪ ॥ মাতঙ্গবাপ্যাম্ ॥ ৩৫ ॥ সপ্তার্ষে ॥ ৩৬ ॥ বিষ্ণুপদে ॥ ৩৭ ॥ গর্ম্মার্পদে ॥ ৩৮ ॥ গোদাবর্য্যাম্ ॥ ৩৯ ॥ গোমত্যাম্ ॥ ৪০ ॥ বেত্রবত্যাম্ ॥ ৪১ ॥ বিপাশায়াম্ ॥ ৪২ ॥ বিতস্তায়াম্ ॥ ৪৩ ॥ শতরুদ্রীরে ॥ ৪৪ ॥ চন্দ্রভাগায়াম্ ॥ ৪৫ ॥ ইরাবত্যাম্ ॥ ৪৬ ॥ সিন্ধোস্তীরে ॥ ৪৭ ॥ দক্ষিণ পথনদে ॥ ৪৮ ॥ ঔসজে ॥ ৪৯ ॥ এবমাদি যবান্যেষুতীর্থেষু ॥ ৫০ ॥ সন্নিহত্যাম্ ॥ ৫১ ॥ সর্ব্বেষপিস্থভাবেষু ॥ ৫২ ॥ পুলিনেষু ॥ ৫৩ ॥ প্রস্রবণেষু ॥ ৫৪ ॥ পর্ব্বতে ॥ ৫৫ ॥ নিকুঞ্জেষু ॥ ৫৬ ॥ ধনেষু ॥ ৫৭ ॥ উপবনেষু ॥ ৫৮ ॥ গোষ্ঠেষুলিপ্তেষু ॥ ৫৯ ॥ মনোজ্ঞেষু ॥ ৬০ ॥ অত্রত্য পিতৃগীতাগাথা ভবন্তি ॥ ৬১ ॥

কুলেস্মহ্মাকং সজ্জন্তঃ স্যাদ্যোনোদ্যাত্মজাত্রজীন্।
নদীষু বহুতোয়াসু শীতলাসু বিশেষতঃ ॥ ৬২
অপি জায়েতসোঽস্মাকং কুলে কশ্চিন্নরোত্তমঃ।
গয়াশীর্ষে বটে শ্রাদ্ধং যোনঃ কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৬৩
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৬৪

(বিষ্ণুসংহিতা বঙ্গবাসী সংস্করণ।)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার শ্রাদ্ধপ্রকরণে লিখিত আছে যে, পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য গয়ায় শ্রাদ্ধকালে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, সে সকল অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে।*

উশনসংহিতায়।

উশনসংহিতায় এরূপ লিখিত আছে যে, গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় হয়। মনীষিগণ এই গাথাকীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণসম্পন্ন বহুপুত্র কামনা করা উচিত, কেন না, সেই সমবেত পুত্রগণের মধ্যে যদি একজনও গয়ায় গমন করে। অনুষঙ্গক্রমেও কেহ গয়ায় গমন করিয়া যদি শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক পিতৃগণ তারিত হন, এবং সেও পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। বরাহ পর্ব্বতে বিশেষতঃ গয়ায় এবং অপরাপর স্থানে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।*

কাত্যায়নসংহিতায়।

কাত্যায়ন বলেন যে, কোন কোন পণ্ডিত পিণ্ডদানের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন, কেন না দেখা যায়, গয়াতে মাত্র পিণ্ডদানই বিহিত আছে। অন্য মহর্ষিগণ পাত্রান্নভোজনের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন, কেন না ব্রাহ্মণ পরীক্ষা বিষয়ে মহাযত্ন দেখা যায়। আমশ্রাদ্ধ বিধি অনুষ্ঠান বিনা পিণ্ডে হইতে পারে।

---

* "যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে।
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রথম অধ্যায় ২৬১ শ্লোক।

* গয়ায়ামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং প্রয়াগে মরণাদিষু।
গায়ন্তি গাথাং তে সর্ব্বে কীর্ত্তয়ন্তি মনীষিণঃ॥ ১৩০
এষ্টব্যাবহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তোগুণান্বিতাঃ।
তেষান্তু সমবেতানাং যদ্যেকোঽপিগয়াং ব্রজেৎ॥ ১৩১
গয়াং প্রাপ্যানুষঙ্গেণ যদি শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
তারিতাঃপিতরস্তেন সযাতি পরমাংগতিম্॥ ১৩২
বারাহপর্ব্বতে চৈব গয়ায়ঞ্চৈব বিশেষতঃ।
এবমাদিষ্বতী তেষু তুষ্যন্তি পিতরস্তদা॥ ১৩৩
(উশনঃ সংহিতা ৩য় অধ্যায় ১৩০-১৩৩ শ্লোক।)

শ্রাদ্ধারম্ভে ও শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণেও অনধ্যায় হয়। পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিয়া আমি এই স্থির করিয়াছি; উভয় কার্য্যেরই প্রাধান্য আছে বলিয়া ইহা সমুচ্চয় জানিবে।*

বৃহস্পতিসংহিতায়।

বৃহস্পতিসংহিতায় লিখিত আছে যে, নরকভয়ভীত পিতৃগণ সর্ব্বদা অভিলাষ করেন, যে পুত্র গয়াধামে গমন করিবে, সেই সন্তানই আমাদিগের পরিত্রাণ করিবে। বহুপুত্রের কামনা কি উচিত, তাঁহাদের মধ্যে যদি একজনও গয়ায় গমন করে, অথবা কেহ যদি অশ্বমেধযজ্ঞ বা নীলবৃষ উৎসর্গ করে।*

শঙ্খসংহিতায়।

শঙ্খসংহিতার মতে গয়াক্ষেত্রে, গয়াতীরে শ্রাদ্ধকালে যাহা কিছু দান করা যায়, সমস্তই অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে।*

---

* প্রাধান্যং পিণ্ডদানস্যকেচিদাহুর্মনীষিণঃ।
গয়াদৌপিণ্ডমাত্রস্য দীয়মানস্যদর্শনাৎ॥ ৯
ভোজনস্যশ্রবনত্বং বদন্ত্যন্যে নহর্ষয়ঃ।
ব্রাহ্মণস্যপরীক্ষায়াং মহাযত্নপ্রদর্শনাৎ॥ ১০
আমশ্রাদ্ধবিধানস্য বিনাপিণ্ডৈঃ ক্রিয়াবিধিঃ।
তদালভ্যাপ্যনধ্যায় বিধানশ্রবণাদপি॥ ১১
বিধমতমুপাদায় নমাপোতন্ত্র দিস্থিতম্।
প্রধা মনুভয়োর্যস্মাৎ তস্মা দেষ সমুচ্চয়ঃ।" ১২
(কাত্যায়নসংহিতা ২২ খণ্ড, ২-১২শ্লোক)।

* "কাঙ্ক্ষন্তি পিতর সর্ব্বে নরকাত্তরঃভীরবঃ।
গয়াং যো যাস্যতে পুত্রঃ সনস্মাতা ভবিষ্যতি॥ ২০
এষ্টব্যাবহবঃ পুত্রাঃ যত্নোকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেতবাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥ ২১
(বৃহস্পতি সংহিতা ২০—২১ শ্লোক)।

* যদ্দদাতি গয়াক্ষেত্রে প্রভাসে পুষ্করেঽপি চ।
প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে সর্ব্বমানন্ত্য মুচ্যতে॥ ২
পঞ্চাষমুনয়োস্তীরে তীর্থে বাসরকণ্টকে।
নর্ম্মদায়াং গয়াতীরে সর্ব্বমানন্ত্য মুচ্যতে।"
(শঙ্খ সংহিতা; ১৪ অধ্যায় ১-২ শ্লোক।)

লিখিতসংহিতায়।

লিখিতসংহিতায় লিখিত আছে যে লোকের বহুপুত্রের কামনা কর্ত্তব্য। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ গয়ায় গমন অশ্বমেধযজ্ঞ বা নীলবৃষ উৎসর্গ করে। গয়াশিরে যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করা হয়, তাহাদের মধ্যে যে নরকস্থ থাকে, যে স্বর্গে গমন করে, এবং যে স্বর্গস্থ থাকে, সে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। আত্মীয়ব্যক্তি হউক, বা পরই হউক, যাহার নামোল্লেখ করিয়া গয়াধামে যেখানে সেখানে পিণ্ডদান করা হয়, সেব্যক্তি শাশ্বত ব্রহ্মপদ লাভ করে।*

বসিষ্ঠসংহিতায়।

বসিষ্ঠসংহিতার মতে যে পুত্র গয়ায় গিয়া শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণ তদ্দ্বারাই পুত্রবান্ হন।

শ্রীনিখিল নাথ রায়।

---

* "এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপেকোগয়াং ব্রজেৎ।
যজেতবাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥ ১০
বারাণস্যাং প্রবিষ্টস্তু কদাচিন্নিষ্ক্রমেদ্ যদি।
হনস্তি তস্তভূতানি অন্যেষ্বং করভাড়নৈঃ॥ ১১
গয়াশিরে তু যৎকিঞ্চিন্নাম্না পিণ্ডন্তুনির্ব্বপেৎ।
নরকস্থো দিবং যাতি স্বর্গস্থোমোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ১২
আত্মনো বা পরস্যাপি গয়াশ্রেত্রে যতস্ততঃ।
যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েদ্ ব্রহ্মশাশ্বতম্॥" ১৩
(লিখিত সংহিতা ১০-১৩ শ্লোক।)

† "যদগয়াযোদয়াত্যন্নং পিতরস্তেন পুত্রিনঃ॥"
(বসিষ্ঠ সংহিতা একাদশ অধ্যায় ৪

বর্ষা-মঙ্গল।

কাজল আঁখির সজল দৃষ্টি
করুণা কাতর মেঘের বৃষ্টি!
এস নেমে এস নেমে ভুমি!
সজল অঙ্গে কত বিভঙ্গে
নাচিবে ভুমি ধরণী চুমি!
বহু দিবসের বিরহ বিধুর
পরাণ তোমার করুণ মধুর
এস নেমে এস নেমে ভুমি!
কুঞ্জ কুটীরে পুঞ্জ তিমিরে
মুগ্ধ করিয়া বনানীভূমি।
আকাশে তুমি গো ঘুরিছ হুতাশে
পাওনিকো-কিছু ঘুরিয়া বাতাসে
তবে এস নেমে এস নেমে।
বহু দিবসের ব্যথা হৃদয়ের
(ওগো) নীরবে যাইবে থেমে।
ফুটিয়া উঠিবে শতেক সুষমা
তোমার মালঞ্চ পুলক চন্দ্রমা
সখি, কোথা তাহার তুলনা!
আকুল চিত্ত করিবে নৃত্য
ভরিয়া শত নীল অঙ্গনা।
তুমি এস তুমি এস বিরহিণী।
বিরহ কাতর বিপুল ধরণী।
দূরিত কর সব বেদনা,
সিঞ্চিয়া তব প্রেমে অভিনব
নিত্য নবীন করুণা;

নাচিছে আজিকে ময়ূর ময়ূরী
নীপ তরু শাখে শত আঁখি ভরি
ছড়ায় হরষ কামনা।
আজিকে পবন বিজয় নিশানে
উড়ায় অভয় রচনা। রমলা।

মৌলিনা আব্দুর রহমান জামী।

প্রাচীন পারস্য কবিগণের মধ্যে শেষ বিখ্যাত কবির নাম মৌলনা নূরউদ্দিন আব্দুর রহমান জামী। ইনি ১৪১৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর জামের নিকট বর্ত্তী খিরগার্দ্দ নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তৎকালে মির্জ্জাশাহ রুখ উক্ত স্থানের রাজা ছিলেন।' জামী, খাজা ও বেয়দুল্লাহ আহরারী সাহেবের নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হন, শেখ সাদ উদ্দিন কাশগরি সাহেবের নিকটে ও ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াছিলেন। কাশগরি সাহেব নক্‌স্‌বন্দি বংশের একজন খলিফা ছিলেন। মৌলানা জামী তাঁহার পরে উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' তিনি প্রথমে সুলতান আবু সায়েদের দরবারে ছিলেন; পরে ঐ সুলতানের হত্যার পর তিনি সুলতান হোসেন বায়্‌কারার অতিশয় প্রিয়—পাত্র হন। জাম নামক স্থানের নাম হইতে তিনি 'জামী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জামের অন্য এক অর্থ 'পান পাত্র'। তাঁহার ব্যবহার অতিশয় ভদ্র ছিল। তিনি এরূপ বিদ্বান ছিলেন যে সে সময়ে পারস্য রাজ্যের মধ্যে তাঁহার ন্যায় আর কেহ ছিল না। সমস্ত রাজাই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তিনি একজন বড় সুখী ছিলেন। কবি অদ্বৈতবাদ ও বিজ্ঞান চর্চ্চা ও করিয়াছিলেন। কবি অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার উপদেশ খাঁটী ছিল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিতেন তখন সকলেই খুব মনোযোগের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। তিনি প্রায়ই হিরাটের বড় মস্‌জিদে আসিতেন। ব্যাকরণে ধর্ম্ম তত্ত্বে ও কবিতায় তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইউসুফ ও জোলেখা, লয়লা ও মজনু, বাহারিস্তান প্রভৃতি বিখ্যাত। তাঁহার বাহারিস্তান সাদীর গোলেস্তাঁর অনুকরণে লিখিত। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে হিরাট নগরের সকলেই শোকাকুল হইয়াছিলেন। আলি বখ্‌তেওয়ার।

ভাবনার জয়।

(ক)

রমা নিরালা বসিয়া কত কথাই ভাবিতেছিল, যতীশের সঙ্গে ব্যবহারটা তার মোটেই ভাল হয়নি। যতীশ যাহাই করুক, তা'কে ভালবাসে তো। 'তোমার মুখ দেখবনা' কথাটা বলা উচিত হয়নি। সমস্ত কথা রমার মনে কাঁদা বৈশাখীর মত এসে একত্র জ'ড় হতে ছিল। রমা ছিল শুধু মৌন এবং গম্ভীর।

(খ)

যতীশ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, 'না ভাই, আর এখানে থাকা পোষাল না, আমার যেতেই হবে।' ধীরেন হাসিয়া হাত ধরিয়া কহিল, "তুই পাগল তুমি তোর বৌ'দির বোন,—ও, ভাবী কুটুম' তা'র 'জন্য তুই পড়া শুনা ছেড়ে দিবি? যতীশ সাফল্যের মাথা নাড়িয়া কহিল, 'নিশ্চয়' সে আমায় অমন কথা বল্লে, দোষ আমার,—আমি সেদিন যাইনি? এইত! আমি যাবই।"

(গ)

'জন্মের মত বিদায় নিতে আসছি রমা' বলিয়া যতীশ ঘরে ঢুকিল এবং একটু করুণস্বরে একবার শুধু চেয়ে দেখ, আর এ জন্মে মুখ দেখতে হবে না।' রমা একটা দুই হাসি হাসিয়া বলিল, 'আমাদের গাড়ী তৈয়ারী আছে; চল, তোমায় ষ্টেশনে দিয়া আসি। যতীশ বলিল, 'চল'।

(ঘ)

মেসের নিকটে গাড়ী থামিলে যতীশ চাকরটাকে চারি আনা বক্সীষের লোভ দেখাইয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত জিনিষপত্র তুলিয়া লইল। ভাল করিয়া বসিয়া সফারকে বলিয়া দিল 'হাওড়া'। সফার হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

(ঙ)

গাড়ী হাওড়া না গিয়া যখন রমাদের বাড়ীর ফটকে আসিল, তখন যতীশ রাগে শ্রাবণ মাসের আকাশের মত চোখ দুটা ঘোলাটে করিয়া সফারকে ধমক দিয়া বলিল, 'এ কি'? রমা হাসিয়া বলিল, 'আমি বলেছি।' যতীশ আর কিছু বলিতে পারিল না আস্তে আস্তে বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

শ্রীসুধা দেবী।

কালাজ্বর।

আজকাল বাঙ্গালাদেশে কালাজ্বর বেশী দেখা যাইতেছে; পূর্ব্বে আসামেই ইহার বেশী প্রাদুর্ভাব ছিল। অনেকদিন জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া যাহাদের পেটজোড়া পিলে হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই প্রকৃত ম্যালেরিয়া নয়, কালাজ্বর। কালাজ্বরের সৃষ্টি এদেশে নূতন হয় নাই, পূর্ব্বে ডাক্তারেরা কালাজ্বরকে ম্যালেরিয়া ভাবিতেন এবং ইহার নিদান ও চিকিৎসা তখন আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এখনও যে কত শত লোক কালাজ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যেও এখন কালাজ্বর হইতেছে।

কালাজ্বর কথার অর্থ এই যে—যে জ্বরে রং কাল হইয়া যায়। যাহাদের রং কাল কালাজ্বরে তাহাদের ললাট, গণ্ডদেশ ও শরীরের স্থানে স্থানে কাল হয় বটে, কিন্তু যাহারা সুন্দর তাহাদের রং আরও ফ্যাকাসে হইয়া যায় এবং স্থান বিশেষে সামান্য কাল দাগ পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ কালাজ্বর কথাটীর অর্থ অন্যরূপ করিয়া থাকেন, যথা—কালস্বরূপ জ্বর অর্থাৎ যে জ্বরে মৃত্যু অনিবার্য্য। কবিরাজেরা কালাজ্বরকে বিষমজ্বর কহে। কালাজ্বরের নাম—দমদমারজ্বর, কালাজ্বর ও ইংরাজীতে Black fever। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়ম লিশম্যান একটী মৃত সৈনিকের প্লীহা হইতে কালাজ্বরের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ঐ সৈনিকটীর কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদম্ নামক স্থানে জ্বরের সূত্রপাত হয় এবং ঐ জ্বরেতেই তাহার পরিশেষে প্রাণবিয়োগ হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ডনোভন্ সাহেবও কালাজ্বরের জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই কারণে কালাজ্বরের জীবাণুকে "লিশম্যান ডনোভন জীবাণু" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আসামে Black water fever নামক এক প্রকার জ্বর হয়। উহা কালাজ্বর নহে। উহাতে গাঢ় লালবর্ণ রক্তপ্রস্রাব হয়।

যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে গারো পর্ব্বতে কালাজ্বরের প্রথম সৃষ্টি হয়। তথা হইতে উহা আসাম ও আসাম হইতে

বাঙ্গালাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এখন ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই কালাজ্বর হইতেছে। সিংহলে, আফ্রিকার অন্তর্গত সুদানে, আরব এবং চীনদেশেও কালাজ্বর আছে।

কালাজ্বরের জীবাণু, আক্রান্ত-ব্যক্তির যকৃৎ, প্লীহা ও অস্থির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে। উহাদের মধ্য হইতে রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জীবাণু পাওয়া যাইবে। জীবাণুগুলি দেখিতে অতি-ক্ষুদ্র কড়ির মত। অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত উহাদিগকে দেখা যায় না। খরগোসের রক্ত লইয়া তাহাতে উহাদিগকে জমাইলে উহারা ক্ষুদ্র পিষ্টকের ন্যায় আকার ধারণ করে এবং উহাদের একটী করিয়া শুঁয়া বাহির হয়, যাহা দ্বারা উহারা চলা-ফেরা করিয়া বেড়াইতে পারে।

কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীর ধমনী হইতে অথবা আঙ্গুল ফুটাইয়া রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রক্তের জমাট বাঁধিবার শক্তি খুবই কম এবং এই জন্যই কালাজ্বরে অনেক স্থলে নাক অথবা দাঁত হইতে রক্ত পড়ে। যদি কোন রোগী কিছুদিন ধরিয়া যকৃৎ ও প্লীহা-ঘটিত জ্বরে ভুগিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে নাক অথবা দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়িতে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে রোগীর খুব সম্ভবতঃ কালাজ্বর হইয়াছে।

কালাজ্বরে রক্তের আর একটী প্রধান পরিবর্ত্তন হয়। রক্তের শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকা উভয়েরই সংখ্যা অনেক কমিয়া যায় কিন্তু শ্বেতকণিকা,—যাহারা আমাদের দেহ-দুর্গ রক্ষার জন্য যোদ্ধার ন্যায় কার্য্য করে তাহারা অত্যধিক পরিমানে কমিয়া যায়। সুস্থকায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রক্তে শ্বেত কণিকাগুলির সংখ্যা ৮০০০ হইতে ১০০০০ কালা জ্বরে উহাদের সংখ্যা ৫০০০ হইতে ৫০০, এমন কি ১০০ পর্য্যন্তও হইতে পারে। দেহ এইরূপে যোদ্ধাবিহীন হওয়ায় যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, রক্তাশয়, গণ্ডের দুষ্ট ক্ষত ইত্যাদি ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সুস্থ ব্যক্তির রক্তে প্রতি ৫০০ হইতে ৬০০ লোহিত কণিকায় একটী করিয়া শ্বেত কণিকা আছে। কালাজ্বরে শ্বেত কণিকাগুলি এত কমিয়া যায় যে প্রতি ১৫০০ অথবা এমন কি ৩০০০ লোহিত কণিকার মধ্যে কেবল একটী করিয়া শ্বেত কণিকা পাওয়া যায়।

কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাক্তার নেপিয়ার সাহেব কালাজ্বর

নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রক্তের একটী সহজ নূতন পরীক্ষা আবিষ্কার করিয়াছেন। ধমনী হইতে রক্ত লইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দেওয়া হয়। রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায় এবং পরে তাহা হইতে অল্প হল্‌দে রংএর তরল পদার্থ (Serum) নিস্থত হয়। ঐ তরল পদার্থে এক ফোঁটা করম্যালিন মিশাইলে উহা জমিয়া গিয়া সিদ্ধ ডিমের শ্বেতাংশের ন্যায় আকার ধারণ করে। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও একটী সহজ পরীক্ষা আবিষ্কার করিয়াছেন। অঙ্গুলি হইতে এক বিন্দু রক্ত লইয়া পরিশ্রুত জলে মিশাইলে জল ঘোলাটে হইয়া যায়, এবং তলায় পলি পড়ে।

কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীর রক্ত যদি খরগোসের রক্তে জমান যায় তাহা হইলে শুঁয়াওয়ালা জীবাণুগুলি এক সপ্তাহের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ রোগীর রক্ত অণুবিক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জীবাণু অধিকাংশ স্থলে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে কালাজ্বরের জীবাণু কি প্রকারে অন্য দেহে চালিত হয়। এটী একটী প্রধান বিষয়। কারণ এইটী ঠিক হইলেই রোগের বিস্তার বন্ধ করা যাইতে পারে। ইহার এখনও ঠিক হয় নাই। কেহ কেহ বলেন ছারপোকা দ্বারা রোগ চালিত হয়। কেহ বলেন দূষিত পানীয় দ্বারা হয়। যাহাই হউক না কেন—মানুষের সংস্পর্শেই কালাজ্বর চালিত হয়। দেখা গিয়াছে এক বাড়ীতে ৩।৪জনের হইয়াছে। এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী গিয়াছে।

সুতরাং কালাজ্বর হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে পানীয় ও ছারপোকা সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। এবং রোগীর সংস্পর্শে না হওয়াই বিধেয়। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে—কালাজ্বর খুব সংক্রামক নহে॥

কালাজ্বর গ্রস্ত রোগীর বিষ্ঠা ফিনাইল দিয়া শোধন করা বা পুড়াইয়া ফেলাই ভাল।

পাবনার কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় সেদিন আয়ুর্ব্বেদবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে কালাজ্বর কুইনাইন খাইয়া হয়। কুইনাইন খাওয়া নবজ্বর বিষম জ্বরে পরিণত হয়। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে,—অনেক সময় কালাজ্বর টাইফয়েড্ জ্বরের ন্যায় অকস্মাৎ দেহকে আক্রমণ করে এবং কুইনাইন না খাইলেও তাহা কালাজ্বরে পরিণত হয়।

কালাজ্বরের সূত্রপাত চারি প্রকারে হইয়া থাকে। প্র[illegible]

স্থায়ী হইয়া কালাজ্বর আরম্ভ হয়। রোগী জ্বরে ভুগিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্লীহা ও যকৃৎ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। রোগী টাইফয়েড ভুগিতেছে কি কালাজ্বরে ভুগিতেছে তাহা এক এক সময়ে ঠিক করা খুবই শক্ত হইয়া পড়ে। রোগীর একটী লক্ষণ দেখিয়া কালাজ্বর হইতে টাইফয়েডের তফাৎ করা যাইতে পারে। টাইফয়েডে রোগী নির্জ্জীবের ন্যায় পড়িয়া থাকে, কিন্তু কালাজ্বরে ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী জ্বরসত্ত্বেও রোগী কথাবার্ত্তা কহে এবং উঠাবসা প্রভৃতি করিতে পারে। অধিকন্তু টাইফয়েড নাড়ীর গতি জ্বরের অনুপাতে হয় না, কালাজ্বরে যেমন জ্বর বাড়ে, নাড়ীর গতিও তেমনি বেশী হয়। অনেক সময় জিহ্বার অবস্থা দেখিয়াও টাইফয়েটেড ধরা যায়।

টাইফয়েড সারিয়া যাইবার পর রোগী কিছুদিন ভালই থাকে তৎপরে পুনরায় অল্প করিয়া জ্বর হইতে থাকে এবং যকৃৎ প্লীহা আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত কালাজ্বরে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ কালাজ্বর কখন কখন পেটের অসুখ বা রক্তামাশয় হইয়া সূত্রপাত হয়। রক্তামাশয়ে উদরস্থ খাদ্যনালীতে ঘা হয় এবং মলের সঙ্গে শতশত জীবাণু বাহির হয়।

তৃতীয়তঃ রোগী কিছুদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে থাকে, জ্বর শীত করিয়া আসে, ছাড়িয়া যায়, কুইনাইনে বন্ধ হয়, কিন্তু প্লীহা একেবারে কমে না। তৎপরে হয়ত একদিন টাইফয়েডের ন্যায় জ্বর হইয়া কালাজ্বরে পরিণত হয়। অথবা শেষে এরূপ অবস্থা হয় যে কুইনাইনে আর কিছুমাত্র উপকার হয় না। এখানে একটী কথা মনে রাখা উচিত যে একদেহে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া দুইই থাকিতে পারে। পল্লীগ্রামস্থ অধিকাংশ ডাক্তার কালাজ্বর বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকায় কালাজ্বরকে ম্যালেরিয়া ভাবিয়া রোগীকে কুইনাইনের উপর কুইনাইনের উপর কুইনাইন খাওয়াইয়া শেষে যখন কোনও উপকার বুঝিতে পারেন না তখন কলিকাতা বা অপর কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের কাছে পাঠাইয়া দেন।

চতুর্থতঃ কালাজ্বর ধীরে ধীরে আসিয়াও দেখা দেয়। রোগীর ঘুসঘুসে জ্বর হইতে থাকে, শীতও করে না, কোন সময়ে ছাড়ে, কোন সময়ে ছাড়ে না—যকৃৎ ও প্লীহা বাড়িয়া উঠে।

বঞ্জার্স সাহেব বলিয়া গিয়াছেন কালাজ্বরে অনেক সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২ বার জ্বরের বৃদ্ধি হয়। ২ বার জ্বরের বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে যকৃৎ ও প্লীহা বর্দ্ধিত থাকিলে—কালাজ্বর বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ম্যালেরিয়া

অপেক্ষা কালাজ্বরে যকৃত বহুগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং ইহা দ্বারা [illegible] সময় ম্যালেরিয়া হইতে কালাজ্বরের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।

যাহার শরীরে কালাজ্বর ভালরূপে প্রকাশ পাইয়াছে [illegible] শরীরের অস্থিচর্ম্মই সার হয়; পেটটী খুব বড় হয়, পেটে জলও জমে, [illegible] একটু ফুলে; গাল দুটী বসা, নাকটী সুস্পষ্ট, কপালে [illegible] দাগ থাকিতে পারে। মাথার চুল পাতলা, গা [illegible] এবং [illegible] সময়ে ঠাবাও হয়। ক্ষুধা বেশী, জিহ্বা পরিষ্কার থাকে। [illegible] জ্বরের একটী প্রধান লক্ষণ। মেডিকেল কলেজে কালাজ্ব [illegible] পরিমাণ পথ্য দিতে হইত। অধিকন্তু কোন কোন রোগী [illegible] করিয়া থাইত।

সপ্রতি ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী দেখাইয়াছেন যে কালা [illegible] থুতে সর্ব্বাঙ্গে উপদংশের ন্যায় স্ফোটক বাহির হয় এবং ঐ স্ফোটকগুলিতে অসংখ্য জীবাণু থাকে। রোগীর রক্তে জীবাণু থাকে, যকৃত প্লীহাও বড় থাকে না এবং তাহাতে জীবাণুও থাকে না।

কালাজ্বরের জীবাণুকর্ত্তৃক শরীরের স্থানে স্থানে একরূপ ঘা হয় ইহাকে ইংরাজীতে Oriental sore অথবা Delhi boil কহে।

চিকিৎসা :—সর্ব্বসাধারণকে আমি এই বলিয়া আশা দিতে যে কালাজ্বরের সুচিকিৎসা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রধান প্রতিষেধক—আন্টিমনি নামক ধাতু এই ধাতুটী ষোড়শ শতাব্দীতে বেসিল ভ্যালেণ্টাইন নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঘটনা ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা কতকগুলি সন্ন্যাসীর (Monks) মৃত্যু ঘটে এবং সেই জন্যই ইহার নাম Antimony অর্থাৎ against the monk হইয়াছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাসপার ভায়না নামক ডাক্তার কালাজ্বরে ধমণীতে আন্টিমনি পরিচালনের প্রথম সূত্রপাত করেন।

কালাজ্বরের সূত্রপাত চারি প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ টাইফয়েডের ন্যায় জ্বর হইয়া কালাজ্বরে আরম্ভ হয়। রোগী জ্বরে ভুগিতে থাকে তখন সোডিয়ম অথবা পটাসিয়ম অ্যান্টিমান ট্রাটের শতকরা দুইভাগ তনুপাতে জলে গুলিয়া ধমনীতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়।

এই চিকিৎসাতে শত শত লোক আরোগ্য লাভ করিতেছে। কেহ কেহ ভাল হইবার কিছু দিন পরে পুনরাক্রান্ত হয় বটে, তথাপি যেখানেই অ্যান্টিমোনি দ্বারা কালাজ্বরের চিকিৎসা হইতেছে সেই খানে কালাজ্বরের সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে।

ডাক্তার—শ্রীগণপতি পাঁজা।

সাময়িকী।

লর্ড লিটন ঢাকা ও বরিশালে যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়াছেন, ২০শে জুলাই তারিখের 'নায়ক" তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। সারাংশের ভাবার্থ এই যে লর্ড লিটন সাহেব আমাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয় সবর্ণীয় উজীর ও আমীর, দেব (M. L. C.) এর হাতে ক্রীড়া-পুত্তলি মাত্র। তাঁরা সোণার কাঠি ছুঁয়ালেই তিনি জাগিয়া উঠেন, আর যেই রূপার কাঠি ছুঁইয়ে দেয় অমনি তিনি একবারে গাঢ় সুষুপ্তিতে গা ঢালিয়া দেন। এরূপ প্রশ্ন হইয়াছে, যদি ব্যাপারটুক অত খানিই সহজ সরল হয়, তবে রাজনীতিক বন্দীদিগের উপর চণ্ডনীতি প্রয়োগের বিপক্ষে যখন এম্ এল্ সিরা দাঁড়াইয়াছিল এবং ভোটে ও যখন জিতিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল কি? মুল্‌সী পেটাতে 'বঙ্গ রাজ বিভূতি'র মঙ্গলাচরণের জন্য যে ৩০০০ অধিবাসীদিগকে পৈতৃক ভিটা হইতে ভিটা ছাড়া কারবার আয়োজন হইতেছে,—তাহাদের আকুল ক্রন্দনে কাহারও কোমল প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে কি? লর্ড লিটন হয়ত বলিবেন তোমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাহাই হইবে; যদি অদৃষ্টে মরণ থাকে তবে 'কাল সাধ্য বোধে তা'র গতি'। আবার নজীর ও আছে।

"মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে।"

* * * * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক দিন যাবৎ ওঝা লাগাইয়া ভূত ছাড়ানের মন্ত্র পড়াইতে ছিলেন। সম্প্রতি ভূত "যাব যাব" হইয়াছে। সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ঘাটতির মধ্যে আড়াই লাখ সরকার দিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। কথায় বলে, 'কেউ দেখে শিখে, কেউ ঠকে শিখে"—কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ও এবার ঠকিয়া শিখিয়াছেন। এখন বোধ হয় বিশ্ব বিদ্যালয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে "বল বল বাহু বল।" পরের আশায় নিজস্ব ১২ লাখ খরচ না করিলে বোধ হয় আজ আর মন্ত্রীত্বের টীকা চন্ চন্ করিয়া উঠিত না। স্বদেশী কি বলেন?

* * * * *

যাহারা অল্প মূলধনে ব্যবসা করিতে চাহেন, তাহাদিগকে আমরা একটা সুন্দর পথের সন্ধান বলিয়া দিতে পারি যে তাহারা এই পথের খোঁজ পাইলেই আনন্দে একবারে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন এ কথা নিশ্চয়। তবে পথ বলিয়া দিবার পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, যে এই ব্যবসাতে অন্ততঃ পক্ষে হাজার দুই টাকা পুঁজি আর ৭৷৷০ মন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর খাঁটী সরিষার তেল চাই তাহা হইলেই একবারে "কেল্লা ফতে।" এই দুই হাজার টাকার credit এ তাহারা তিন্‌টী পূর্ণ বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে ৪০,০০০৲ টাকা মুনাফা করিতে পারিবেন। যাহারা এই ব্যবসা সম্বন্ধে আরও সঠিক খবর পাইতে চান, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া M. L. C.দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

* * * * *

একটা কথা আছে যে সাত্‌টা গাধা মর্‌লে একটা কেনাণী তৈয়ার হয়, কিন্তু কয়টা ভারতবাসী মর্‌লে একজন বাদ্‌সার ছেলে তৈয়ার হয় কেহ জানেন কি? যুবরাজ যখন এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন শুধু বাংলা সরকারের (অবশ্য টাকাটা বাঙ্গালীরই) খরচ হইয়াছে একুনে মোট ৩১৩৮৬৯৵১৷৷ গণ্ডা। এদিকে ভারতবাসীর গড়পড়্‌তা দৈনিক আয় ৵০ এক আনা, মোরাকী গড়ে ।৹ চারি আনা, তাহা ছাড়া দুর্ভিক্ষও আছেই। এখন হিসাব করিলে কত দাঁড়ায়?

* * * * *

প্রাচীনকালে জনৈক বাঙ্গালী যুবক—দ্রাবিড়ে সংস্কৃত শিখিতে গিয়াছিলেন। তিনি পরমপণ্ডিত হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে তিনি বহুদিন দ্রাবিড়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া বাংলা একদম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাতকে বলিতেন "অন্ন", আর জলকে বলিতেন "অপ্"। বাড়ীতে আসিয়া তিনি অন্নাহার করিতে চাহিলেন, স্নেহময়ী জননী—সংসার অন্ন ও পক্ষব্যঞ্জন রাঁধিয়া কৃতী পুত্রকে খাইতে দিলেন। কয়েক গ্রাস খাইতে পুত্রের গলায় একটা মাছের কাঁটা ঠেকিয়া গেল, পুত্র তারস্বরে "অপ্ অপ্" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিলেন। বাঙ্গালী মা অপ্ অপ্‌কে জল বুঝিতে পারিলেন না। ফলে এই দাঁড়াইল যে "অপ্ অপ্" করিয়া এক বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিতের প্রাণ বিয়োগ হইল। আজও কথায় বলে,

বাংলা মায়ের পণ্ডিত পুত্‌
অপ্ অপ্ করে মৈল পুত।

* * * * *

আমাদের কজলুল্ হক্ সাহেবের উর্দ্দু ভাষায়ও এই দশা হইবে কিনা জানিনা তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ এ সি বসু খবর দিয়াছেন যে এবার ৩৮১১ জন মুসলমান মাতৃকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে ৩৩৭১ জনের মাতৃভাষা বাংলা। মৌলবী সাহেব কি এখন এই বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান-দিগকে মুসলমান বলিয়া অস্বীকার করিবেন না পক্ষ গব্যের ব্যবস্থা করিবেন ? Pan-Islam আতাতের কি ইহাই "প্রথম শিক্ষা" ?

* * * * *

মুক্ত-অন্তরীনদের ভিতর আমরা যে কয়েকজনকে খুব ভাল রকমে জানি তাহাদের মধ্যে ২।১ জন বিভীষণ ছাড়া আর সকলেই স্বাধীন ব্যবসা করিতে-ছেন। আমরা একজন ভদ্রলোকের কথা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে তিনি সম্প্রতি মিডল্ ইষ্ট কোং নাম দিয়া ষ্ট্রাণ্ড রোডে আমদানী—রপ্তানীর (Export and Import) ব্যবসা করিতেছেন। জার্ম্মেণী আমেরিকা জাপান ও ফ্রান্স ইত্যাদি স্থান হইতে অত্যাবশ্যকীয় শিল্প যন্ত্রাদি কাগজ ও সিমেণ্ট ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া এখানে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। তত্রত্য ব্যবসায়ীদের নাকি তাহার উপর এত বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে তাহারা এখন তাহাকে ৬০।৯০ দিনের জন্য ধারেও মাল বিক্রী করিতে ইতস্তত করে না। তিনি এই ব্যবসার দুর্দ্দিনেও গত বৎসর পাঁচ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। বৎসর দুই আগে তিনি ৫০০০ টাকা মূলধন লইয়া এই ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন আর আজ বছরে পাঁচ হাজার টাকা লাভ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘর-জামাই বি-এ দের এদিকে একটু চোখ ফুটিবে কি ? অথচ যাহার কথা বলিতেছি, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ধারই ধারেন না, দেখিতে নেহাৎ নেহাৎ ছেলে মানুষ, বয়স ২০।২১ এর বেশী হইবে না। তাহার নাম শ্রীমান ব্রজেন্দ্রকুমার নিয়োগী।

* * * * *

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন (জে, এম, সেন) ও বোম্বাইয়ের ব্যারিষ্টার মিঃ জয়াকর আবার আদালতে যোগ দিবেন বলিয়া ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত অজুহাত দেখাইয়াছেন যে খালি পেটে দেশের কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরম্পর জানিতে পারিলাম, যে মিঃ সেন গুপ্তের নাকি কিছু ঋণ ও হইয়াছে। কথাটা কতটুকু সত্য জানি না —যদি হইয়া থাকে তবে ঋণ পরিশোধের জন্য মিঃ সেনগুপ্তের আদালতে যোগদান করাকে আমরা নেহাৎ অন্যায় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

এখন কথা উঠিবে যে এই ভাবে যদি দেশের সকল নেতাই—আবার—ইংরেজের সঙ্গে সহযোগ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে দেশের জনসাধারণ কি করিবে? মিঃ জে এম সেন, জয়াকর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ছাড়িয়া দিলেন এখন যদি দেশবন্ধু ও জেল হইতে আসিয়া—আবার আদালতে যোগ দেয় তাহা হইলে উপায় কি? দেশের লোক এখন কা'র মুখ চাহিয়া কাজ করিবে?

* * * * *

উপায় একদিন বাংলার কবি-সম্রাটের হাত দিয়ে বার হয়েছিল,

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তোর ভাবনা করাতো চল্‌বে না।

* * * * *

বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি হয়ত বাতি জ্বল্‌বেনা।

আজ সেই দিন আসিয়াছে। ১৯০৫ সালে যে বাতিটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আন্দামানের মৌসুমী-হাওয়াতে সেই বাতিটা নিবিয়া গিয়াছে। আবার এখন যে বাতি জ্বলিয়া-উঠিয়াছে, হয়ত—এই বাতিটাও নিবিয়া যাইতে পারে। এখন যাহারা দেশবাসীর মনের মুকুট-খানি বলিয়া খ্যাত তাঁ'রা হয়ত—দুদিন পরেই আবার লাট-বেলাট হইয়া বসিতে পারেন। নজীরও আছে। কিন্তু জনসাধারণ কি তাহাতেই হাল ছাড়িয়া দিবে?

* * * * *

যদি ছাড়িয়া দেয়? তবে বুঝিতে হইবে—যে আমাদের এখনও "স্বরাজ" পাওয়ার সময় আসে নাই। যেখানে ব্যষ্টির চেতনা নাই, সেখানে সমষ্টির চেতনা—হইতে পারে না। যদি এক জনের কিংবা—দশ জনের—পশ্চাৎগমনে লক্ষ জন ও পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে তবে বুঝিতে যাইবে যে আমাদের আত্ম শক্তি এখনও জাগিয়া উঠে নাই। কিন্তু—দেশের জনসংঘের যে অবস্থা দেখা যাইতেছে, নানাবিধ কার্য্য কারণে তাহাদের যে গভীর দেশানুরক্তির পরিচয়—পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় না—যে দেশবাসী এত শীঘ্রই—ঘরের তরণীকে তরঙ্গে ছাড়িয়া দিবেন। আমরাও বলি, ছাড়িবার দরকার নাই, দেশকে দেশের মত করিয়া ভাল বাসিতে শিখ,—নিজের আত্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল, তখন কে চ'লে গেল, কে পড়ে রইল আর চেয়ে থাকতে হবে না। তখন হয়ত সকলেই বলিবে,

"ভয় নাই ভাই, কাপুরুষে হবে হারাতে,
কাপুরুষ ধরে করিয়া সাধন শিব হয়ে হবে দাঁড়াতে।" শ্রীবরদা গুপ্ত।

সমালোচনা !

বঙ্গবাণী—আষাঢ় !

প্রথমেই 'ধোঁয়ার ছলনে কাঁদিছে' ছবি। ছবি খানিতে আর্ট মোটেই নাই। রাধাকে দেখিলে মনে হয় যেন রাধার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে, কেবল শাশুড়ীর ভয়ে রাঁধিতে আসিয়াছে। তারপরই কাজী নজরুল ইস্‌লামের কবিতা, 'শায়ক বেঁধা পাখী'। কবিতাটী মন্দ হয় নাই, তবে 'পথ ভোলারে' লুটিয়ে পড়ি এ কার বুকের পর? কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর?' কথাটী যেন কেমন বাঁধ বাঁধ ঠেকে। শত সুখে দুঃখে—যে জননীর স্নেহোক্ত বক্ষে মাথা রাখিয়া প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াই; যে মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া আমরা 'করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা' সেই মা যদি আজ আহত সন্তানকে দেখিয়া বলে, "কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর? তবে উপায় আছে কি?" আফিসে সাহেবের দাঁত খিচুনী, পথে পাওনাদারের 'কর্ত্তা, অনেক দিন হয়ে গেল', আর ঘরে গিন্নীর নাকি সুরের নহবতের আলায় অস্থির হইয়া যদি মায়ের কাছে গেলে মা বলে, কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর, তবে—'অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথাগৃহম্'। কাজী সাহেব "বিদ্রোহী" কবিতায় প্রথিত যশা, কিন্তু এ কবিতা খানি তত ভাল নাই। 'বিদেশ বাণিজ্যে ভারতের দশা' জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। "অভিমান" গলপটী অস্বাভাবিক। ভাষাও যেমন কেমন কেমন। "চোদ্দটা বসন্তের পাগল হাওয়া অধীর এই দেহের উপর দিয়ে যখন বয়ে গেল, তখন বাপমার মনে হলো যে আমার বিয়ে দিবার বয়স হয়েছে।" তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর কিছু মনে হউক আর না হউক অন্তত পক্ষে লেখকের মনে হইল যে বঙ্কিম চন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" বই খানি একবার খুলিয়া দেখি। 'সারাদেহ একটা বিপ্লব-সূচনার তড়িৎ-পৃষ্ট লতার মতন সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে, মনে বাজছে শুধু নিশীথ রজনীর একটা বাঁশীর গান।' এই বাঁশীটা "কখনও তা'কে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি" ঐ বাঁশী, না, নিশীথ কান্তির বাঁশী, লেখক বলিয়া দিবেন কি? 'তৃষ্ণা মিটে গেল যে প্রবল ঘৃণা পূর্ণ অবসাদ—আসে,"—

গেল না গেলে। "চোখে তাঁর এমনি একটী উজ্জ্বল সুদূর চাউনি। "সুদূর" "চাউনি" কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। চাউনি না চাহনী। অনর্থক কতগুলি শব্দ যোজনা করিলেই ভাষা সুন্দর হয় না। লেখকের গোলাঘরে অনেক গুলি শব্দ—জমেছে বুঝিতে পারিতেছি, শব্দ গুলিকে আর ও কয়দিন একটু মক্সের আঁচে রাখিয়া পাকাইয়া লইলে—বোধ হয় কথায় দোষটা চলিয়া যাইবে। 'বাংলার নবযুগের কথা' লেখকের গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। 'উৎসব" কবিতাটী বেশ ঝর্ ঝরে'। "অপরাজিতা" সবে 'আগুণ লইয়া খেলা," আরম্ভ করিয়াছে। "শিল্প ও ভাষা" সকলেরই একবার পড়িয়া দেখা উচিত। বাংলার সৌন্দর্য্য তত্ত্বের (Asthetis") বিকাশ এই প্রথম। শিল্পীর লেখনী অমর হউক, বঙ্গ ভাষা তাঁহার নিকট অনেকটা আশা করে। "গীতি" তাল মানে কিরূপ হইবে জানি না। উদ্ভট সাগরের রস রচনায় বেশ বাহাদুরী আছে। তাঁহার অ্যাট লহয়ের কবিতাটী আমাদের ভাল লাগিয়াছে। "মার্কিনে চারিমাস" বলিয়াছে। "লাভ্ লোক সান" খতাইয়া দেখিবার পূর্ব্বে ও পরে সমান উপভোগ্য। "পাশের বাড়ী" গল্পে সৌরীণ বাবুর পাকা হাতের ওস্তাদী বেশ বুঝা যায়। গল্পটী বেশ হইয়াছে। 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিজ্ঞানের স্থান" গবেষণা। "আনন্দ" কবিতাটী শুভ্র যুথিকার মতই আনন্দ ময়ী। 'হারাই হারাই সদা মনে হয় হারাইয়া ফেলি থকিতে' ছবিখানিতে শিল্পী তাঁহার নিপুন তুলিকা পাতে ভারতের খাসন সংস্কার-প্রয়াসী মধ্য-পন্থীদের সপিণ্ডকরণের আয়োজন করিয়াছেন। মধ্য পন্থীরা অনুগ্রহ করিয়া ছবি খানি একবার তলাইয়া দেখিলে তাঁহাদের পিণ্ডের ব্যবস্থাটা খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। 'হারানো খাতা,' উপন্যাস হারাইবার পথেই বসিয়াছে। "ভ্রান্তি' কবিতা পড়িলে প্রাণে শান্তি আসে। "নারীর রাজনৈতিক অধিকারে" আমাদের কিছু বলিবার নাই।

প্রবাসী—আষাঢ়।

প্রচ্ছদ পটে "কৌতুহল" ছবিটী বেশ সুন্দর। বধূটীর কৌতুহলাবিষ্ট আধনীমিলিত আঁখিতে যেন স্নেহ মাখান একটা—কৌতুহলের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সব চেয়ে বেশী সুন্দর—পাখীর ভাবটী। পাখীর ভাবে যেন 'যাব—কি যাব না' ভাবটী ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'জলসত্র' ছবিটী খুব ভাল হয় নাই। বট গাছের—ছবিটী যেমন নেহাৎ সেকেলে বলিয়া মনে হয়। বট গাছের চিত্রটী আর ও পরিষ্কার হইলে ছবিটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর

হইত। "বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয়" জ্ঞাতব্য বিষয়। "ধর্ম্ম পূজা"তে সাহিত্যের কোন হাত নাই। 'চরকা ও খদ্দর" সময়োপযোগী প্রবন্ধ। সকলেরই একবার পড়িয়া দেখা উচিত। আমরা সেই অমূল্য প্রবন্ধ হইতে কতটুক উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। "দেশ শুদ্ধ সবাই কি মূর্খ সংশয়ী এই সোজা কথা কেন বুঝেন না, কলের সহিত চরকার প্রতি-যোগীতা কেন মনে করেন, তাহারা পাই না। তুলার দামে সূতা, তাঁতিকে বানি দিয়া কাপড়। কলে কাপড়ের দাম পড়িল, তুলার দাম, বুনিবার বানি। কোন্ কলে এত সস্তায় কাপড় বেচিতে পারে? যে কৃষকের কাপাস-চাষ আছে তাহাকে তুলার দাম ও লাগে না। তাহার কাপড়ের দাম তাঁতীর বানি, দশহাত কাপড়ে ৷৷৵০ আনা মাত্র। বিলাতের সে কাপড়ের দাম আজ কাল ২৷৷০ টাকার কম নয়। দেশের লোক মূর্খ ছিল না; মূর্খ হইয়াছি আমরা"। একবারে নির্জ্জলা সত্য কথা। খনান ঘরে অর্থ নীতিজ্ঞ অধ্যাপক ভি, জে, কেলে ও কয়লাঘাটার শতবর্ষীয়া বৃদ্ধা ভিক্ষুনি যাইবেন কিনা জানি না। "দেরাদূনে বাঙ্গালী" বাঙ্গালীর গৌরব কথা। "রূপান্তর" কবিতাটী কবিতা হিসাবে একটী প্রথম শ্রেণীর কবিতা। তবে ছন্দের একটু গড়মিল আছে। তবু কবিতাটী সুন্দর।

"আজ তা'রে চেনা দায় পরম বিস্ময়! দেখি যত বারে বারে, মমতা ততই বাড়ে যদি খসে যায় ভাবে, এই শুধু ভয়।" কবি সম্রাটের মুক্ত ধারা" আজ মুক্ত হইয়াছে। লেখক 'পথ-মোচন" করিয়া অনেকের সন্দেহ মোচন করিয়াছেন। রবীন্দ্র পরিচয়ে" লেখকের গভীর অভিনিবেশ ও ভাব প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। "স্ত্রী-শিক্ষা-সংস্কার" সম্বন্ধে—আমাদের একটু বলিবার আছে। স্ত্রী শিক্ষা—যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ততই' দেশের কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না, তাহা আমরা খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান স্কুল কলেজে প্রবর্ত্তিত স্ত্রী শিক্ষাকে আমাদের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারি না। বর্ত্তমান স্কুল কলেজের আদর্শ সম্বন্ধে' লেখকের ভাষায় আমরা বলি, "এই বিষকে বিষ জানিয়া স্ত্রী শিক্ষার পরিত্যাগ করিতে হইবে; এবং শিক্ষাকে ভক্তি ত্যাগ ও সংযমের পরিত্রতায় মহীয়সী করিয়া তুলিতে হইবে।" "নিউজিলাণ্ডের নারী" উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। লেখক পরিশ্রম করিয়া গত কয়েক মাস যাবৎ যে ভাবে নানা দেশীয় নারীদের বিষয় আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের প্রভূত কল্যাণ হইবে। 'বাংলার মনসা পূজা' গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক।

'মানের দায়' গল্পটী মোটেই জমে নাই। গল্পের শেষ ভাগে হঠাৎ কিশোরীর প্রেম ও অনুপমের ছেলে গঘনের সংবাদে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে 'মুড়ীর সঙ্গে পাঁপড় ভাজা'র কথাই মনে হয়। "নিশীতে" কবিতাতে

'কুসুম-কলিকা ঝড়িছে বিটপী মূলে' ভাল বুঝিতে পারিলাম না ফুল ফুটিলেই ঝরিয়া পড়ে জানি, কিন্তু কলি অবস্থায় কোন ফুল ঝরিতে শুনি নাই। শব্দ-পূরণের জন্য যা তা লিখিলে কষ্ট হয়। কবিদের সাতখুন মাপ হয় জানি, কিন্তু কবি নিজকে খুন করিলে কোন রকমেই যে—কসুর খালাস পাইতে পারে না। 'বন্দুগা হইতে" ছবিটীতে বেশ আর্ট আছে। কিন্তু মুসলমান মহিলার দেহের সঙ্গে পা' দুটীর সামঞ্জস্য মোটেই নাই। পা দুটী এত দীর্ঘ হইয়াছে যে মহিলাটী একটু খানি আয়াস স্বীকার করিলেই প্রবাসীর ২১৬ পৃঃ ফ্রেড উইল্‌সনের মত লোকের মাথা ডিঙ্গিয়ে হাঁটতে পারে। 'বর্ষা' কবিতাটী মন্দ নয়। তবে খুব ভাল বলিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরীর ছবি 'কাল ও ক্ষণ'। ছবি খানিতে শিল্পী যথেষ্ট আর্টের পরিচয় দিয়াছেন। মানিক সচরাচর যে সমস্ত ছবি বাহির হয়, সেইগুলির তুলনায় এই ছবি খানিকে খুব সুন্দর বলা যাইতে পারে। তবে কালের গলাটা এবং ক্ষণের হাত দুইটা যেন একটু লম্বা বলিয়া বোধ হয়। শুধু তাহাই নহে, কালের গলাটা আর একটু সরু করিলে—"কণ্ঠ শঙ্খ সমাযুক্তম্" বলিয়া আমাদের যে প্রাচীন আদর্শ আছে, তাহা বোধ হয়—চিত্রের ছবির সঙ্গে আকাশে আকারে মিলিয়া যাইত। আর ছবি খানিও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। শিল্পী নবীন, আশা করি সময়ে এই সমস্ত দোষ শোধরাইয়া গিয়া তিনি একজন পাকা চিত্রকর হইবেন। "আওরংজীবের সাঁতারা অবরোধ" ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। "ভকুল হারা" সুন্দর কবিতা। লেখকের যথেষ্ট কবিত্ব সম্পদ আছে। তবে তিনি যে ভাবে ভাষার দোটানায় পড়িয়াছেন তাহাতে ভয় হয় পাছে তিনি "কার বুকে হায়—দেয় সে বল ধরা"। "বিপর্যয়ে" সবে বিপর্যয়ের সূচনা হইতেছে। "পাষাণে" লেখক যে "কোমলতার পারিজাতের পরশ" ফুটিতে ভুলেছে,—তাহাতে লেখকের যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক যে তাঁহার শক্তির অপব্যবহার করেননি তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট। 'অসীম'

অনীমের দিকে ছুটাছে—কবে যে সসীমে আসিবে ভগবান জানেন। "বঙ্গের ইলিয়াস সাহী সুলতানগণ" ঐতিহাসিক গবেষণা। "বিরজা" গল্প পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম না। বিরজার চরিত্র যেন শীতকালের পদ্মকলি - ভাল করিয়া ফুটে নাই। "উ! আজ আমাদের সত্যি বিয়ে" কথাটার সম্পূর্ণ সার্থকতা লেখক রাখ্‌তে পারেনি। তার পর ভাষাও খুব জোরালো বলিয়া মনে হয় না। "অতঃপর উভয়ের বাহুতে অস্ত্রঘাতান্তে নল দ্বারা সংযোজন করিয়া দিলেন"—এ যে মথি লিখিত সুসমাচারের ভাষা। তার পর "নারিকেল কুঞ্জের আড়াল থেকে যেন আবীর মেখে চাঁদ উঠ্‌ছে—সে দিন পূর্ণিমা।" কবির নাত খুন মাপ হইলেও এ খুনের খালাস নাই। চাঁদকে কেউ কখন আবীর মেখে উঠ্‌তে দেখেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের চর্ম্ম চক্ষে সেই—"আবীর-মাখা" চাঁদকে কখনও দেখি নাই। বোধ হয় শীঘ্রই এই সমস্ত অঘটন-ঘটন পটু লেখকদের কৃপায় "আবীর মাখা" চাঁদের চন্দ্রমুখ সন্দর্শন করিয়া চঞ্চল চিত্ত চকোর 'চন্দন মাখা" হইয়া যাইবে। আত্মজানী বাণিজ্য জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। কেরাণীর দেশে এই সমস্ত প্রবন্ধে অনেকটা উপকার হইতে পারে। "নায়েব মহাশয়," পাকা হাতের পাকা লেখা—এই মাসে তিনি "দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়াছে।" নির্দ্দোষ—কবিতা। কবিতাটী তত ভাল হয় নাই। সোজা কথার এইটী কুমুদ রঞ্জনের কৃষ্ণ পক্ষের কবিতা। "বিজিতা" চলিয়াছে। "মহীশূর ভ্রমণ" অনেকটা অগ্রসর হইতেছে। দুঃখাবসান" গল্পটী মন্দ হয় নাই। তবে গিরীন্ বাবুর গল্পের যে একটা আলাদা মাধুর্য্য আছে এই গল্পটীতে যেমন তেমন মাধুর্য্যটুকু ফুটে নাই। এই গল্পটীর সঙ্গে যখনই গিরীন বাবুর অন্যান্য গল্পের কথা মনে হয় তখনই মনে হয়—যে এই—গল্পটী যেন ফরমাইসের গল্প, লেখকের প্রাণের কথা নহে। দেখন হাসি"—কবিতা, ভাল লাগিল না। লেখকের শব্দ-সম্পত্তি মন্দ নহে, ছন্দ মিষ্ট ও সুন্দর কিন্তু ভাব প্রকাশে লেখক দরিদ্র। তবে যাহা ভাল বুঝা যায় না।' তাহাই যদি mysticism বলিয়া কথিত হয়, তবে—লেখকের লেখাতে বাহাদুরী আছে বটে। আমরা কিন্তু—সেই "অবুঝ অজানা, অচেনা" ভাবের পক্ষপাতী নই। "শিব" শিবের মতই গম্ভীর ও মহান্। "বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজ্ নাম্‌চা"—সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা নূতন ধারার সৃষ্টি করিবে। 'কার্য্যের সংজ্ঞা জ্ঞাপকতা' মনস্তত্ত্বের বিশদ বিশ্লেষণ। এই সমস্ত জিনিষ দেশে যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল! 'সমস্যা চিত্রটী—চিত্র হিসাবে অপেক্ষা ভাব বিশ্লেষণে অতি সুন্দর।

যে সচল চরকা আজ ম্যাঞ্চেষ্টারের ২৮০০০ তাঁত অচল করিয়া দিয়াছে, তাহাকে কি করা যায় বৃটিশ সিংহের সমস্যার বিষয় বটে। শিল্পীর তুলি "অমর অক্ষয় অব্যয়, অজয়" হউক। "ভাব ও বুদ্ধি" পড়িবার জিনিষ বটে। লেখকের শেষ কথা গুলি প্রণিধান যোগ্য। "একাগ্র ভাব অবসাদ জানে না; নৈরাশ্য কি তাহা বুঝে না; পর নির্দ্দিষ্ট বিধানের অনুগত হইতে পারে না। সে আপন পথে কর্ম্ম করিয়া যায়। যে পথে মানব প্রকৃতিকে জয়—করিয়াছে, সেই পথে এক লক্ষ্য তন্ময় সাধক বুদ্ধির বাধা জয় করেন" কি, সুন্দর ভাব। বর্ত্তমানে দেশের যে আবহাওয়া দেখিতেছি, এই সকল বাণীতে দেশ বাসীর প্রাণে নবভাবের প্রেরণ। আসিবে বলিয়া আশা করি। তবে "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলে" মহা ফ্যাসাদ লাগিবে হজম হইবার ভয় আছে। "হার জিতে" লেখক যে সমস্যার সমাধান করিতে স্থির করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জিতিতে পারেন নাই, বরং হারিয়া গিয়াছেন। আরও একটু সহজ সরল করিয়া—বিশদভাবে বুঝাইতে চাহিলে বোধ হয় লেখক কৃতকার্য্য হইতেন। "নেশাখোরের অভিধান" সুন্দর কবিতা। "শেষ সাধ" প্রথম শ্রেণীর গল্প। লেখকের শক্তি যেন অক্ষরে অক্ষরে ফুটে উঠিছে। "দাবী" কবিতাতে আমাদের অনেক কথা দাবী করিবার আছে। প্রথম দাবী, লেখক কবিতাতে যে উচ্চ আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা আরও সরল করিলে হেয়ালী দোষ থাকিত না। দ্বিতীয় দাবী লেখক অত তরল ভাষা ব্যবহার না করিয়া আরও একটু জোরালো ভাষা ব্যবহার করিলে বোধ হয় আরও ভাল হইত। কবিতাটি সুন্দর ও লালিত্যময়। "ওঝাজীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত" মন্দ নয়। "নিখিল প্রবাহ" নিখিলের দিকে ছুটিয়াছে। "ইঙ্গিতে" মেরুদণ্ডহীন আধুনিক গ্রেজুয়েটরা বাচিয়া থাকিবার অনেক ইঙ্গিত পাইবেন। বিশ্ব-ভারতী এবার উপন্যাসের কথা আলোচনা করিতেছেন। অজ্ঞাত শ্মশ্রু নবীন ঔপন্যাসিকদিগকে একবার এই প্রবন্ধখানি পড়িতে অনুরোধ করি। 'কয়েদি' কবিতা। মন্দ হয় নাই। ভাষাটা আরও ঝরঝরে হইলে ভাল হইত। স্থানে স্থানে যেন অনেকটা পাঁচালীর ভাষার গন্ধ পাওয়া যায়। আর কবিতাটি আরও ছোট করিলে বোধ হয় আরও ভাল হইত। কবিতা অতি মাত্রায় দীর্ঘ করিলে সেই হারাইয়া যায়, পাঠকেরও ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া যায়। তারপর আজকালকার ॥০ আনা দামের সস্তার রাবিশ উপন্যাসের দিনে, অনেকেই কবিতা পড়িতে চান না, আবার এত দীর্ঘ কবিলে রক্ষা আছে কি?

বেতাল।

বৈঠকী।

রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর হইতে বঙ্কিমের যুগ পর্য্যন্ত, এমন কি রবীন্দ্রনাথের আদি, মধ্য ও শেষভাগের প্রথম অংশ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য লেখার একটা সর্ব্বজনমান্য পদ্ধতি এবং শৃঙ্খলা প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা ব্যাঘাত কাহারও রচনায় ঘটিলে তখনকার সমালোচকগণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রতিবাদের নায়ক ছিলেন। আর ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজের পক্ষ হইতে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং "হালি-সহরপত্রিকা"র পরিচালকগণ সমালোচনার কথা অতি কঠোর ভাবে চালাইতেন।

* * * * *

রাজা রামমোহনের সময়ে শব্দচয়নের কড়াকড়ি বড়ই ছিল। রাজা রামমোহনের লিখিত পুস্তক সকলে একটি বাজে শব্দ পাইবে না। যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত ধাতুপ্রত্যয় আদি দ্বারা সিদ্ধ হয় না, যাহার বিশিষ্ট প্রয়োগ নাই, অর্থাৎ পূর্ব্বজ কবিগণের লেখায় যাহার প্রয়োগ পাওয়া যায় না, তেমন শব্দ ব্যবহার রাজা রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় তর্কবাগীশ প্রভৃতি গোড়ার আমলের বাঙ্গালা গদ্য লেখকগণ করিতেন না। এমন কি ইংরেজি soul শব্দের পরিবর্ত্তে "আত্মা" শব্দের প্রয়োগ রাজা রামমোহনের লেখায় পাইবে না। তখন'ত অনুবাদের যুগ আইসে নাই, ইয়োরোপের কোন কিছুই বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিবার কোন প্রয়োজন তখনও বোধ হয় নাই। তখন শাস্ত্রব্যাখ্যার যুগ ছিল, সংস্কৃত দর্শন পুরাণ, স্মৃতি কাব্য প্রভৃতি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত হইতেছিল। একপক্ষে রাজা রামমোহনের দল, এই কাজ করিতেছিলেন, অন্যপক্ষে শোভা-বাজার রাজবাটির ধর্ম্মসভার দল ঐ অনুবাদ এবং সংগ্রহের কাজ অন্য ভঙ্গীতে করিতেছিলেন। ফলে ইংরেজি ভাষার শব্দ বিশেষের কোন্‌টা ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হইবে, সে চিন্তা রাজা রামমোহনের যুগের লেখকগণকে পীড়িত করে নাই। তাই এই যুগের বাঙ্গালা গদ্য অনেকটা বিভক্তি বাদ দিয়া, অনুস্বর বিসর্গ মুছিয়া দিয়া কাদম্বরীর সংস্কৃত গদ্যের অনুরূপ হইত।

* * * * *

ইহার পরই বিলাতী ভাবের ও ভাবের আমদানীর যুগ। এই যুগের প্রধান তিনজন ছিলেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত। এই সময়ে নূতন শব্দচয়নের নূতন শব্দসৃষ্টির ধুম পড়িয়া গেল। তখনও কিন্তু আলগাভাবে শব্দ প্রয়োগ করা হইত না। সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল শব্দের দ্যোতনা ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট আছে, সে সকল শব্দের উপর নবীন অর্থ আরোপ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে চালান হইত না। বরং মূলধাতু আশ্রয়ে শব্দ বিশেষের অর্থগত ব্যাপ্তি ঘটাইয়া বাঙ্গালা গদ্যে তাহার প্রচলন চেষ্টা হইত, পরন্তু নূতন অর্থ আরোপের চেষ্টা কেহ করিতেন না; একটা উদাহরণ দিব,—অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়" নাম বিশাল পুস্তকের নামটা অন্ততঃ অনেকে শুনিয়াছেন। "উপাসক সম্প্রদায়" নাম দেওয়া হইল কেন? আজকালকার আলগা লেখকগণের মতন "ধর্ম্ম সম্প্রদায়" নাম দেওয়া হয় নাই কেন? Religion শব্দ প্রয়োগ করি পাশ্চাত্য শিক্ষিত ইংরেজ যাহা বুঝেন বা বুঝাইতে চাহেন, তাহা ধর্ম্ম নহে। কাশীর শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার রচিত "ধর্ম্মব্যাখ্যা" গ্রন্থে ধর্ম্ম শব্দের শাস্ত্র সম্মত অর্থ অতি প্রাঞ্জলভাবে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আজকালকার অনেক লেখকগণ সে পুস্তকখানা পড়ে নাই। অক্ষয়কুমার দত্তের সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই ধর্ম্ম শব্দের অর্থ জানিত। তাই তিনি তাঁহার পুস্তকের নাম দিয়াছিলেন "উপাসক সম্প্রদায়।" কেবল এইটুকুই নহে, উপাসক এবং [illegible] ব্যাখ্যাত হইলে ভারতবর্ষের নরনারীর ধর্ম্ম ও উপাসনাতত্ত্ব যে কি ও কত তাহা জানিতে পারা যায় এবং তাহা জানিলে "উপাসক সম্প্রদায়" প্রণয়নের যে কত উপযোগী তাহা উপলব্ধি করা চলে। শব্দ প্রয়োগের এই [illegible] পদ্ধতি বঙ্কিমের দলের প্রায় সকল লেখকই অনুসরণ করিতেন, কেন না তাঁহারা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের তুল্য অতি সাবধান শব্দ-চয়ন-কর্ত্তা ইদানীং বাঙ্গালায় আর কেহ মহাকবি বা বড় লেখক উৎপন্ন হন নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।]

* * * * *

ইংরেজি যুগে, বিলাতী বিদ্যা এবং সভ্যতার সঙ্ঘাতে বাঙ্গালার দুইটা স্বতন্ত্র সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। পূর্ব্বে মোগল-পাঠানের যুগে বাঙ্গালার দুইটা স্বতন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম ভক্তি প্রধান চণ্ডী সাহিত্য, দ্বিতীয় প্রেম-মূলক,—আত্ম নিবেদন মূলক বৈষ্ণব সাহিত্য। চণ্ডী সাহিত্যকে প্রোজ্জ্বল

করিয়া তুলেন মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র এবং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। বৈষ্ণব সাহিত্যকে প্রোজ্জ্বল করেন শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণ—কবিরাজ গোস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া "রাধামাধবোদয়ের" লেখক পর্য্যন্ত বৈষ্ণব প্রেমিক কবি মাত্রেই। তেমনই ইংরেজি যুগে প্রথমে রাজা রামমোহনের সাহিত্য এবং ধর্ম্ম সভার সাহিত্য, দুইটা স্বতন্ত্র সাহিত্যের বিকাশ হয়। রাজা রামমোহনের সাহিত্য ক্রমে "ব্রাহ্ম সাহিত্যে" পরিণত হয়। ব্রাহ্ম সাহিত্যের লেখকগণের মধ্যে, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, গৌরগোবিন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। হিন্দু সাহিত্য পুষ্ট করেন, ঈশ্বরচন্দ্র, মদনমোহন, রামগতি, মাইকেল, ভূদেব, হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি। ঠাকুর বাড়ীর সাহিত্য এই দুই সাহিত্যের সমবায়ে একটা "সবের" সাহিত্য হিসাবে ফুটিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দুই যুগের গদ্যপদ্য প্রায় সবটাই হিন্দু ভাব প্রধান। ব্রাহ্ম সাহিত্য শেষে খৃষ্টানী সাহিত্যের আংশিক অনুবাদ হইয়া পড়ে। কেশবচন্দ্র প্রতাপচন্দ্র এবং কতকটা শিবনাথ শাস্ত্রী এই সাহিত্যকে খৃষ্টানী আকার দিয়া গিয়াছেন। তেমনি বঙ্কিম যুগের সাহিত্য শেষে অনেকটা "কোমৎ-মতের" বিশাল বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ এবং হরপ্রসাদ শেষে কোমতের Humanitarianismকে চাপিয়া খাঁটি শাস্ত্র সম্মত এবং বিষয় সঙ্গত ভাব আনিয়া উহার হিন্দু আকার রক্ষা করেন। উভয় পক্ষের এই দুই চেষ্টার ফলে শেষে সাবধান শব্দচয়নটা মন্দীভূত হয়। "আর্য্যদর্শনের" দল এ পক্ষে বিষম অপরাধী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে ও ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন না; ইংরেজি ভাবে প্রমত্ত হইয়া তাঁহারা যা-তা একটা শব্দ যেখানে-সেখানে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে হইয়াছে এই, যে ইংরেজি না জানিলে এখন অনেক বাঙ্গালা পদ্যের ভাব উপলব্ধি করা যায় না।

* * * * *

"ধর্ম্মতত্ত্ব" বহি লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছিলেন, যেরূপ সাবধানে শব্দ চয়ন করিয়াছিলেন, তেমন মুন্সীয়ানা দেখাইবার লেখকও বাঙ্গালার নাই, তত পরিশ্রম-সামর্থ্য বুঝি বা আজ কাল কার লেখকগণের নাই। এক রবীন্দ্রনাথ পারেন, তিনি অধুনা এ পক্ষে বড়ই আলস্য হইয়াছেন। তাঁহাকে অনুকরণ-করিবার মনীষা অনেকের নাই, অথচ অনুকরণ করা চাই-ই তাই আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য বিভূত কিমাকার হইয়া উঠিতেছে। এই ইন্দ্র বঙ্গ সাহিত্য টিকিবে না; কেন না ইহার ব্যাপ্তি নাই; উহা কলিকাতার

সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ, বাঙ্গালার জন সাধারণ উহার খবর রা-
না। সখের সাহিত্যটিকে না লিটরেচার dilettantie হইতে মোনের পুতুলের
মতন গলিয়া যায়। দেখ না, অতবড় ব্রাহ্ম সাহিত্য এখন একেবারে লো-
প্রায়। ব্রাহ্ম সমাজের খুব কমলোকেই এখন রাজা রাম-মোহনের লেখা
পড়ে, কেশবচন্দ্রের "সার্ম্মণ" পড়ে, এমন কি শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাস
গুলির ও তেমন প্রচলন নাই। চিরঞ্জীব শর্ম্মার পুণ্ডরীকে, বিদ্যু চট্টো-
পাধ্যায়ের অমন মধুর গাণ-সকলও বিস্মৃত ও উপেক্ষিত। বঙ্গ সাহিত্যের
স্বাতন্ত্র্য নাই, পুষ্টি নাই, ব্যাপ্তিও নাই। "সারদামঙ্গলের" কবি লাল,
"মহিলার" সুরেন্দ্র মজুমদার, সদ্ভাব সতর্কের কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কোন লেখক
কবি হইলেও তাঁহারা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যের
কোন অংশই সজীব নাই। চন্দ্রশেখরের অমন অদ্ভুত চিত্রাঙ্কণ প্রেম
এখন আর কেহ তেমন করিয়া পড়ে না। ইন্দ্রনাথের কৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখা
"ভারতোদ্ধার" ও তত্তটা সজীব নাই। থাকিবে তাহা কেহ পড়িলে না
এবং সনাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত পরিচয় সম্বন্ধে সংযুক্ত। কি
তত্তটা পরে এক নামে বুঝাইব। ডাউডেন এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলি-
গিয়াছেন। ডাউডেনের (Dow den) সিদ্ধান্ত গুলির সম্যক আলোচনা
বাঙ্গালায় হয় নাই। অক্ষয়চন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এ সম্বন্ধে একটু লিখি-
ছিলেন বটে পরন্তু তাহার তেমন আলোচনা হয় নাই।

বন্দী-বরণ।

ওগো শান্তি,
ওগো বন্দী
ওগো পতিত জাতির জীবন-মরণ সন্ধি,
ওগো মানুষের মাঝে আসল যাদুষ
আজিকে তোমায় বন্দি।
করুণ সিন্ধু উছলে আজি পরশি চরণ-তল,
উচ্ছল চল চঞ্চল জল করে ছল ছল ছল।
সিন্ধু পুলিনে বসি ত্যাগাসনে সন্ন্যাসী নিরমল,
দুঃখীর বেদনা স্বরাজ-সাধনা
উঠিছে পরাণে নন্দি।

তুমি বীর,
তুমি ধীর
তুমি শত দুখতাপে হিমাচল-সম থির,
তুমি বার বার কারা করেছ বরণ
পালিয়া আপন শির।
হিংসারে তুমি করেছ নিধন সংযমআসি হানি,
বাসনার মুখে অশনি হেনেছ বসন দিয়াছ টানি
তুমি অলসে বিলাসে মদির-কলসে প্রলয় দিয়াছ আনি,
তুমি শতধীর ধরার নবির সেতারে
কষিয়া বেঁধেছ মীড়।

তুমি বায়,
তুমি শ্যাম,
তুমি প্রেম দিয়ে জয় করিয়াছ পশু-কাম,

তুমি জাতীয় পাষাণে নিশ্চয় গড়া
শুনায়ে অমৃতময় বাণী।
নর তুমি শুধু নহ নারায়ণ নহ দেবতার অংশ,
নহ তুমি যীশু দেবতার শিশু নহ অবতার বংশ,
সাধনা-মন্থন গরলে সদাই করেছ ও দেহ নাশ,
তাই সবের মাঝারে আসিয়াছে শিব
এ কি রূপ অনুপাম।

তুমি ভীষ্ম,
তুমি নিম,
তুমি প্রাণের ভিতরে এনেছ টানিয়া বিশ্ব,
সকলি ভারতে উজলে তোমার,
তুমিই প্রবল শিখা।
পতিত অতীত ঝরেছে শোণিত সেই বিরোধের স্থানে,
দুই কুলকুলে গলাগলি আজ একই রাখীর বন্ধনে;
আজিকে জাতির নহেকো ধ্বনিত পতাকা তোমার গানে,
সারাটী ভারতে একি পুণ্যধাম
নবীন মধুর দৃশ্য।

তুমি নর,
তুমি মর
তুমি কালের মাঝারে রেখেছ তোমার ঘর,
তুমি আপনার তেজে তেজীয়ান সদা
নহে দেবতার বর।
পূর্ণ স্বরাজ জনমে তোমার অধীনতা তবদাস
বন্দনা আজি চরণ পাখি করিছে তোমাতে বাস
মরণ আজিকে লভেছে শরণ তোমার চরণ পাশ,
তাই জিজীষ ভব মন্ত্রীর নাম
নামিছে চরণ'পর।

ভারত-শিল্পতত্ত্ব।

(২)

মানব-ভাষা যখন পর্য্যাপ্ত বিকাশ লাভ করে, তখন তাহার শব্দার্থ-প্রয়োগের জন্য ব্যাকরণ-রচনার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। ভাষা অসংযত স্বেচ্ছাচার সুসংযত করিয়া, রচনা-প্রতিভার উন্নতি সাধন করে। শিল্পের অবস্থাও সেইরূপ। তাহার ব্যাকরণের নাম—"শিল্প-শাস্ত্র।"

এই সরল সত্যের মর্ম্মানুসন্ধান না করিয়া, অনেক শিল্প-সমালোচক শিল্প-শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন;—তাহাকে শিল্পের অযৌক্তিক নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেও ইতস্ততঃ করেন না। অনেকের নিকট শিল্প-শাস্ত্র অনাবশ্যক শাসন-শৃঙ্খল বলিয়া নিন্দিত;—নিতান্ত আধুনিক রচনাও শিল্প-শাস্ত্রে উপেক্ষিত। ইতিহাস-লেখকের নিকট তাহা অবিচারে উপেক্ষিত হইতে পারে না।

ভারত-শিল্পশাস্ত্র কত পুরাতন, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে না। অতি পুরাতন বলিয়াই, তাহার জন্ম-কথা জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথমে সূত্রের, তৎপরে বৃত্তির, এবং তৎপরে ভাষ্যের আবির্ভাবের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিল্প-সাহিত্যেও এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাপ্রচলিত সূত্র-বৃত্তি ভাষ্য, উত্তরকালে শিল্প-শাস্ত্র নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং শিল্প-শাস্ত্রের রচনা-যুগ শিল্প সাহিত্যের আদি যুগ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা আরম্ভ নহে, পরিণতি।

ভারত-শিল্পশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহা যে আদি গ্রন্থ নহে, তাহাতেই তাহা উল্লিখিত আছে। শিল্প-শাস্ত্র একটী স্বতন্ত্র শাস্ত্র নহে, তাহা পশুবিদ্যার অন্তর্গত। ইহাতে অতি প্রাচীনত্বেরই ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব-সভ্যতার প্রথম সোপান—বাস্তুরচনা। গৃহনির্ম্মাণ কৌশল অধিগত করিয়াই মানব-সমাজ নানাবিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি লাভের অধিকারী হইয়াছে। গৃহকে কেবল প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়াই মানব-সমাজ নিরস্ত হইতে পারে নাই;—তাহাকে সাজসজ্জায় সুশোভিত

করিবার আকাঙ্খা বিবিধ শিল্প-কৌশল উদ্‌ভাবিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং বাস্তুবিদ্যাকেই শিল্প-বিদ্যার মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও দেশে শিল্পবিদ্যা এরূপ ভাবে বাস্তুবিদ্যার অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; বরং বাস্তুবিদ্যা এক শ্রেণীর শিল্প-বিদ্যা বিবেচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ধারণা অধিক বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া বোধ হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজক মনুত্রিবিষ্ণুহারীতাদি ঋষিগণের নাম এখনও হিন্দু-সমাজে পরিচিত হইয়া থাকে; কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র-প্রয়োজকগণের নাম হিন্দুর নিকটেও অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। বিংশ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবোজকের নামের ন্যায় অষ্টাদশ বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকের নামও এক সময়ে তুল্যভাবেই সুপরিচিত ছিল। যথা—

"ভৃগুরত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্ম্মা ময়স্তথা।
নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
ব্রাহ্ম কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এবচ।
বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্র-বৃহস্পতি।
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকাঃ॥"

মৎস্যপুরাণোক্ত এই অষ্টাদশ বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকের মধ্যে অনেকের নামই কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্ট শতাব্দীতে, "বৃহৎ সংহিতা" সঙ্কলিত করিবার সময়ে, বরাহ-মিহির গর্গ-বিরচিত বাস্তুশাস্ত্রের সারাংশ সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে নগ্নজিতাদির মতামত ও স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। শতবর্ষ পূর্ব্বেও, ইংরাজী-ভাষায় গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া রামরাজ দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত কোন কোন বাস্তুশাস্ত্রের বিলুপ্তপ্রায় অংশবিশেষের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল অধুনাবিলুপ্ত গ্রন্থ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বাস্তুজ্ঞান সূত্রাকারে বর্ত্তমান ছিল। বাস্তুসূত্রের, বাস্তুশাস্ত্রের, এবং তদঙ্গীভূত শিল্পশাস্ত্রের মূলগ্রন্থগুলি অল্পাধিক মাত্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অন্যান্য গ্রন্থে আলোচিত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে, মৎস্যাদি পুরাণে উপপুরাণে, হিন্দু বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে, প্রতিষ্ঠা-নিবন্ধে, শুক্রনীতিসারে, যুক্তিকল্পতরুতে এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয় সঙ্কলিত করিতে হইলে, এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। প্রাচ্যকাব্যে, দৃশ্যকাব্যে, আখ্যায়িকায়, এমন কি, সকল শ্রেণীর গ্রন্থেই প্রাচীন শিল্পের অল্পাধিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য সকল গ্রন্থই

অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এক গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, তাহাতে কোন গ্রন্থের বা প্রাচীন টীকার সাহায্যে সকল স্থলের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। এই সকল কারণে, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মানব-শিল্প বিশেষ-বিশেষরূপে হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। কারণ, সকল দেশের শিল্পের মধ্যেই প্রচলিত বিষয়বিশেষের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত-শিল্প যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া, আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভারতবর্ষের বিশিষ্টতার পরিচয় প্রদান করে। তজ্জন্য ভারতবর্ষকেই ভারত-শিল্পের উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

এক সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ইহার প্রতি প্রণিধান না করিয়া, ভারত-শিল্পকে পরানুকরণলাভ বলিয়া বর্ণনা করিবার জন্যই প্রয়াস স্বীকার করিতেন। কালক্রমে তাহার গতি ক্রমশঃ মন্থরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন একটি অপ্রকৃত অকৃত্রিম ভারত-শিল্পের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশের অভ্যাস পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন কেবল ভারত-শিল্পের উপর বিদেশীয় প্রভাবের ছায়াপাত সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তাহা যে ভারতীয় ভাবে রূপায়িত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় আকার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইতেছে।

গ্রীকৃগণ ফিনিসীয়দিগের নিকট বর্ণমালা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহার সেই বর্ণমালার সাহায্যে ফিনিসীয় সাহিত্য রচনা করেন নাই,—গ্রীক সাহিত্যই রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ যদি কোনও বিদেশের নিকট হইতে কোনও শিল্প কৌশল গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার সাহায্যে ভারত শিল্পই রচিত হইয়াছে; বিদেশীয় শিল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং ভারত সাহিত্যের ন্যায় ভারত-শিল্পও ভারতবর্ষের নিজস্ব। পণ্যের আদান-প্রদানের ন্যায় জ্ঞানের আদান-প্রদান সকল দেশেই সুপরিচিত। তাহাতে কাহারও শিল্প-মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর বিবিধ বিষয়ে নূতন নূতন রচনা প্রতিভা বিকাশ লাভের অবসর প্রাপ্ত হয়।

কিরূপ উপাদানে ভারত-শিল্প প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিবার সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই। অতি পুরাতন সাহিত্যে শিল্পের উল্লেখ দেখিয়া, এবং অতি পুরাতন শিল্পনিদর্শন দেখিতে না পাইয়া স্বতই মনে হয় যেন প্রথমে কেবল ক্ষণভঙ্গুর উপাদানে রচনা-বিকাশ করিয়া, ভারত-শিল্প ক্রমে ক্রমে স্থায়িত্ব লাভের অভিপ্রায়ে, দৃঢ়তর উপাদানের শরণাপন্ন

হইয়াছিল। ভারত-স্থাপত্য এই অনুমানের পক্ষসমর্থন করে। যাহা ইষ্টক-প্রস্তরে রচিত হইয়াছিল, তাহাও সহসা দারুগৃহ রচনা কৌশল পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অনেক পাষাণপ্রাচীরে, এবং পাষাণ তোরণে, দারু-কর্ম্মের সুপরিচিত প্রণালী অভিব্যক্ত হইয়া, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। মূর্ত্তি-শিল্পের ঈষদুদ্ভিন্ন রচনা-নিদর্শনের মধ্যেও তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতবাসীর জীবনযাপন-প্রণালীর সহিত ভারত-শিল্পের যে নিগূঢ় সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ভারতবর্ষকেই ভারত-শিল্পের উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অনেক শিল্প বিশেষভাবে বিশেষ প্রয়োজনে, কেবল ভারতবর্ষেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। অন্য কোনও দেশে তদনুরূপ শিল্পের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই শিল্পচর্চ্চা অত্যধিক মাত্রায় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা প্রতিদিবসের আহার-বিহারের সহিত, অতিথি-অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনা-রীতির সহিত, উৎসব ও আনন্দ বিধানের বিধি ব্যবস্থার সহিত, নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মাচরণ পদ্ধতির সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। তাহা গৃহপ্রাঙ্গণের আলিম্পন-প্রণালীতে বা কামিনীকুন্তলের কবরী রচিতে তুল্য ভাবেই অভিব্যক্ত হইত। এইরূপে ভারতবর্ষীয় সমস্ত সমাজের নরনারীর পক্ষে চতুঃষষ্টি কলাজ্ঞান সুশিক্ষার নিদর্শন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহা সমাজে মর্য্যাদা দান করিত,—সৌভাগ্যের দিনে সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিত,—দুঃখ দুর্দ্দিনে জীবনোপায় হইত।

জীবন যাত্রার পুরাতন প্রণালী পরিবর্ত্তনে, ধর্ম্মাচরণের অনুষ্ঠান-বিলোপে, কলাজ্ঞানহীন বিদ্যা-শিক্ষার আধুনিক ব্যবস্থায়, ভারতবর্ষের চিরপরিচিত চতুঃষষ্টিকলা; অনুশীলনের অভাবে, অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যে নাটকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেও, তাহাকে কবি-কল্পনা মনে করিয়া, কেহ তাহার তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

চতুঃষষ্টি কলার নাম গুলি এক এক গ্রন্থে এক একভাবে উল্লিখিত থাকায়, প্রথম দৃষ্টিপাতে পার্থক্যের কারণ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। বাৎস্যায়নোক্ত কামসূত্রের টীকাকার যশোধর ইহার রহস্য ভেদ করিয়া গিয়াছেন। চতুঃষষ্টি কলা অঙ্গ-বিদ্যা; তাহা যে গ্রন্থে যে মূলবিদ্যার অঙ্গবিদ্যারূপে উল্লিখিত, নামগুলি সেই মূল বিদ্যার উপযোগী। কামসূত্রোক্ত চতুঃষষ্টিকলা কামশাস্ত্রের অঙ্গবর্গী,

সুতরাং নামগুলি কাল্পনিক বোধ হয়। যে শাস্ত্রের যাহা অঙ্গ, সেই শাস্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে।

বাৎস্যায়নোক্ত চতুঃষষ্টিকলার সাধারণ নাম,—"ঔপেয়িকী,"—উপায়। অন্য গ্রন্থান্তরে যে ভাবে কলাগুলি উল্লিখিত, তদনুসারে চতুর্ব্বিংশতি "কর্ম্মাঙ্গ,"—নির্জ্জীব সজীব-ভেদে বিংশতি "স্বতাশ্রয়া;" —ষোড়শ "উপচার;";—এবং চারিটি "উত্তম কলা" নামে কথিত। এই গুলি "মূল-কলা," ইহাদিগের অন্তর্নিবিষ্ট "অন্তর কলার" সংখ্যা পাঁচশত অষ্টাদশ। সমস্ত কলার সংখ্যা ৫৮২, তন্মধ্যে মূলবিদ্যা ভেদে তদঙ্গীভূত ৬৪ কলা পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে, অবশিষ্ট কলাগুলি "অন্তর-কলার" অন্তর্গত-বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা এক গ্রন্থে চতুঃষষ্টিকলার অন্তর্গত, তাহা অন্যত্র অন্তরকলার অন্তর্গত; কেবল কতকগুলি সকল গ্রন্থেই সমান। নৃত গীত বাদ্য আলেখ্য সর্ব্ববাদী সম্মত মূল কলা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট সকল গুলি "সুকুমার কলা" বলিলে সমাদর লাভ করিবে না। কারণ, এরূপ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য বিকাশ-ব্যবস্থা পাশ্চাত্য কলাশাস্ত্রে অপরিচিত। কিন্তু ভারত-শিল্প জ্ঞাত হইতে হইলে, ইহাদিগের সমালোচনা অপরিহার্য্য। কোন্ বিশিষ্ট প্রণালীতে কিরূপ সূত্র ধরিয়া ভারত শিল্প বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহারও সন্ধান লাভের সম্ভাবনা আছে।

অনেক আধুনিক শিল্প-সমালোচক ভারত-শিল্পকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়াই বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন; এবং আকারে ইঙ্গিতে ধর্ম্মকেই মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছেন। এখনও যে সকল বিচিত্র দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ,—যে সকল শিল্প সুষমা মণ্ডিত গিরিবান্ধব,—যে সকল জীর্ণ কদাচিৎ শিল্প স্তূপ-বিহার,—এবং যে সকল ক্ষতাক্ষত শ্রীমূর্ত্তির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত। কিন্তু তাহাই ভারত শিল্পের [illegible] নিদর্শন নহে। অন্যান্য নিদর্শন অপেক্ষাকৃত দুর্লভ,—কোন কোন [illegible] সৌভাগ্য. তথাপি ভারত শিল্প যে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত-হইয়াই জন্ম লাভ করিয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত যে, আস্থা স্থাপন করা যায় না। ভারতবাসী কেবল ধর্ম্মাচরণে অবসর লুপ্ত হইয়াই জীবন যাপন করিত,—সাংসারিক ব্যাপারে [illegible]

প্রাচীন শিল্প পরিচয় লোকসমাজে সুপরিচিত হইয়ে, এক[illegible]রূপে অন্তর্হিত হইবে।

সভ্যতা বিকাশের প্রথমপ্রভাতে, অন্যান্য দেশের [illegible] ভারতের [illegible] সমাজ চিত্রাঙ্কনে চিত্তবিনোদন করিত। তাহার [illegible] নিদর্শন ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছে, তাহাতে মৃগয়া-চিত্রই [illegible] লৌকিক অভ্যুদয়লাভের প্রয়োজন ও পথ ভারতবর্ষেও [illegible] সাংসারিক অভ্যুদয় সাধক শিল্প-নিদর্শন অভ্যুদয়ের [illegible] নাম। এখন ভারতবর্ষের পুরাতন অভিধান দেখিতে [illegible] মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া দ্বীপ-দ্বীপান্তরে যাতায়াতের উপায় ভা[illegible] ছিল,—এরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। পুরাতন সাহিত্যের তাহার প্রতিকূল প্রমাণ ভস্মীভূত সাহিত্য ভারত শিল্পকে ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করে নাই। বিদ্যা" দেবগণ-বিদ্যার" অন্তর্গত বলিয়াই উল্লি[illegible] (১)(২) তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

অতি পুরাকালেই মানব-সমাজে ধনোপার্জ্জনের প্রয়োজন অনুভূত ছিল। তখন হইতে বাণিজ্যই লক্ষ্মীনিবাস বলিয়া ভারতীয় জনসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিল, এবং বিবিধ শিল্প বিস্তারের সহায়তা সাধন করিয়াছিল। ভারতীয় সূক্ষ্ম শিল্প বহু দূর দেশে নীত হইয়া, উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। শিল্প এইরূপে ধনোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। বাণিজ্য উপলক্ষে নানা দেশের সহিত পরিচয় সংস্থাপিত হইবার পর, ভারত-শিল্পের রচনা-কৌশল দিন দিন অধিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন—নানাদেশ হইতে উপাদান সংগ্রহের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, ভারত-শিল্প প্রতিভা-বিকাশের অনেক নূতন ক্ষেত্রের সন্ধান লাভ করিয়াছিল, এইরূপে সেকালের বিদেশের সম্পর্ক ভারত—শিল্পের অবনতির পথ উন্মুক্ত না করিয়া, উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল।

অভ্যুদয়-যুগের ভারত-শিল্পের সাধারণ লক্ষণে যাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বৃহৎ এবং সুন্দর ;—সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন। ফার্গুসন্ তাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অমিতব্যয়িতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে শিল্প-

* ভারতাচার্য ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"গীত যুক্তি নৃত্য গীত বাদ্য বিদ্যাদি

ব্যসন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারত-শিল্পের পক্ষে তাহা কত স্বাভাবিক, [illegible] জন্য প্রয়াস স্বীকার করেন নাই।" যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—এই ধারণা ভারত-স্থাপত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বৃহৎ এবং সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মধ্যে যে শিল্প-প্রতিভা বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহা অজ্ঞাতসারে বৃহতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া, বৃহতের আদর্শেই পরিচালিত হইয়াছিল।

বৃহত্তের আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়া, ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্প এক নূতন ভাব প্রকাশে প্রশ্রয় লাভ করিয়াছিল। তাহা দেবমূর্ত্তিতে দুই বাহুর পরিবর্ত্তে বহু বাহুর, এক মস্তকের পরিবর্ত্তে বহু মস্তকের অবতারণা করিয়া, অলৌকিক রচনা-বিলাসকে অতিশয়োক্তিতে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল। সাহিত্যের ন্যায় শিল্পেও অতিশয়োক্তি একটি সুপরিচিত অলঙ্কার, তাহা রচনা-দোষ বলিয়া বিবেচিত হইত না।

অসীম উপাদানে গঠিত, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সীমায় সুসংযত, দেবমূর্ত্তির মধ্যে অসীমের আভাস-প্রকাশ চেষ্টা ভারত-শিল্পকে অতিশয়োক্তির অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার প্রভাবে ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্প, বেশভূষার আতিশয্যেও উত্তরোত্তর অধিক ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি ভারত-শিল্পের মূলসূত্র কোনও যুগেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। তাহা ভাব সূত্র,—বশানুগ ভাবস্বর্য্যের বাহ্য-বিকাশ,—ধীর, শান্ত, সমাহিত, আত্মস্থ, আত্মতৃপ্ত। তাহাতে গতি আছে, চাঞ্চল্য নাই;—স্থিতি আছে, স্থবিরতা নাই;—বিলাস আছে, আবিলতা নাই। তাহা সান্ত নহে, অনন্ত;—দৃষ্টিগম্য নহে, ভাবগম্য। কি কারু-শিল্প, কি চারু-শিল্প, সকল শ্রেণীর ভারত-শিল্পের মধ্যেই এই ভাবসূত্র তুল্যভাবে দেদীপ্যমান। ভারত-শিল্পের নানা যুগে নানা রচনা-রীতি প্রচলিত হইয়াছিল; কিন্তু কোনও রীতিই মূলসূত্র বিস্মৃত হয় নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নিশীথে।

গভীর রাত্রি। ঢল ঢল পূর্ণচন্দ্র, আকাশ [illegible] তার স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্না-সায়রে পৃথিবী যেন [illegible] প্রতি মুহূর্ত্তে কবিত্বে কল্পনায়—সৌন্দর্য্যে সুষমায় [illegible] মর্ম্মা ভ'রে উঠ্‌চে। সৌরভ সম্ভার বুকে লুকিয়ে নিয়ে [illegible] যেন নীরব নিথর নৈশ প্রকৃতির বুকখানি ঈষৎ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। [illegible] ঢ়ি দে দৃষ্টি—যুগপৎ আনন্দ-বিষাদ-ক্লিষ্ট—অমল ধবল চন্দ্রো[illegible] অঞ্জনতল শান্তি—ঈষৎ চঞ্চল ঈষৎ স্থির আমি—এই সৌন্দর্য্যের নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝখানে—একা কি জানি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

শুভ্র জ্যোতির দেশ। সম্মুখে রজত তরঙ্গ। আকাশ গঙ্গা কল কল নাদে প্রবাহিত হচ্ছে। তার সেই এসরাজ নিন্দিত স্বরগ্রাম আমার কর্ণ কুহরে যেন সুধা ঢেলে দিচ্ছে। দু'একখানা সোণারতরী রজত পাল উড়িয়ে তীরের দিকে ছুটে আস্‌চে। সুবর্ণময় তট,—সেই তটের উপর দাঁড়িয়ে এক পরিচিত রমণী মূর্ত্তি! তার পরিধানে জ্যোৎস্নাশাটী—অঞ্চল প্রান্ত হ'তে জ্যোৎস্না ধারা বারি-বিন্দু বৎ তার পাতলা নিবিক্ত ক'রে মন্দাকিনী সলিলে মিশে যাচ্ছে!

একি তুমি! ওগো আমার চির পরিচিতা—একান্ত প্রার্থিতা—আমার তৃষিত হৃদয়ের সরস প্রারটশ্রী—আমার ব্যর্থ জীবনের সঞ্চিত আশা—তুমি এস! ওগো আমার স্বপ্ন-লাঞ্ছিতা—শত অত্যাচার পীড়িতা—অনাদৃতা—উপেক্ষিতা মর্ত্তের প্রেয়সী আমার সঙ্গে এস! ওগো আমার উষর জীবনের পুষ্পিতা মাধবী—ওগো আমার মরুহৃদয়ের সুবর্ণ বল্লরী,—ওগো আমার নিদাঘের নিভৃত নিকুঞ্জ—বর্ষার তপ্তনীড়—শরতের চন্দ্র প্রভা—হেমন্তের স্বর্ণ রৌদ্র—বসন্তের মদির স্বপ্ন—তুমি এস। ওগো আমার প্রাণাধিকা—সেবা-নিপুণা সহিষ্ণু কর্ম্মী সহচরী, ওগো আমার মানময়ী—প্রেমময়ী—মহিমাময়ী গৃহের লক্ষ্মী-প্রতিমা একবার এস! ওগো আমার নিরাভরণা—দীন হীনা—জন্ম দুঃখিনী—পাগলিনী—অভিমানিনী কুটুম্বিনী—তুমি আমার সঙ্গে এস! তুমি অভিমান ভরে চলে [illegible] একটী কথার ক'য়ে যেওনা—লক্ষিতে

চলে গেলে। আমার উপর অভিমান করেছ—হ'তে পারে! আমার জন্ত না আস'—তোমার দুটী শিশু কাঁদচে—তারা আজ পরের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌চে—অন্ততঃ তাদের জন্যে এস। তাদের বিষণ্ণ মুখশ্রী আমার বেদনাতুর হৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ কর্‌চে। তাদের কচি হৃদয় পলে পলে মুয়ে পড়্‌চে। আজ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্‌চি—তোমার অভাব।—আমি যে তোমার কাছে বড় অপরাধী প্রিয়ে!

সে তখন ধীরে ধীরে বল্লে "আমার যে যাবার ক্ষমতা নাই, প্রিয়তম!"

হঠাৎ কচি মেয়েটার কান্না আমার কর্ণে প্রবেশ কর্‌ল। আমি যেন দেখ্‌লাম আমার সে 'অতীত কাহিনী' প্রেয়সী পূর্ব্বের মত আমার পায়ের কাছে শুয়ে নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে পড়েচে। আমি যেন তাড়াতাড়ি তাকে ডেকে বল্লাম "ওগো ওঠ—নীলু উঠেচে দুধ দাওগে"!—অম্‌নি আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো।

হায়, কোথা সে অভাগিনী? তেম্‌নি জ্যোৎস্নাভরা আকাশ—তেম্‌নি স্বপ্নভরা পৃথিবী—শুধু দুবিন্দু তপ্ত অশ্রুজল আমার চোখে দিয়ে গাড়িয়ে পড়্‌ল।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গভূমি।

তনুখানি ঘিরি নাচিয়া নাচিয়া,
নদী বহে কার দুকুল ছাপিয়া
আপনার মনে তরীটী বাহিয়া,
মাঝি গেয়ে চলে গান।

শুভ্র উজলা, পুষ্পাভরনা,
গীতি মুখরিতা, সুনীল বসনা,
নন্দিয়া দিক্ উঠে বন্দনা,
কুলু কুলু কলতান।

স্নিগ্ধ ধরণী, শস্য-শ্যামলা,
কা'র বুক জুড়ে প্রকৃতির খেলা,
উচ্ছ্বাসভরে বহিছে অনিলা
ফুল-পরিমল চুমি।

হৃদয় বাহির বহিয়াছে ঘিরি
জননীর স্নেহ পরশ মাধুরী
মরতের মাঝে স্বরগ সেইতো

"মধুর ভিক্ষা"

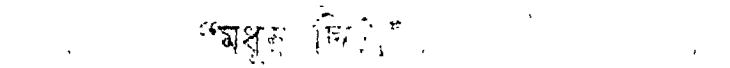

[illegible] আমা
[illegible] এসে [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] কথাটা আমি [illegible]
[illegible] উপর তুলে নিয়ে [illegible]
[illegible]?"

[illegible] বা মুখে কোন রকমের থাকায় জিনি
[illegible] [illegible]'র অভাব হ'ল না,—বেশ [illegible]
ব'লতে,—"[illegible]"

এই সঙ্গে আমার আর একদিনকার এমনিই একটা [illegible] যে
গেল, সে [illegible]'র মা অথবা অমনিই কারুর মুখে [illegible]
প্রীনস্পেক্টর [illegible] বেড়াতে এসেছিল।

[illegible] বিধারে অনেক [illegible] বিদায়ের [illegible]
মধ্যে তখন গাঁস খেয়ে দেশের [illegible] নিয়ে [illegible]
আরম্ভ হ'য়েছে। বেন আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা [illegible]
সংসারের আর সকলে মত দেবার জন্যে হাঁ ক'রে [illegible]
তর্ক!

এমন সময় কোত্থেকে একটি ফুট্ ফুটে ছোট্ট ছেলে এসে [illegible]
দাঁড়াল। দাঁড়াল, সে এমনি ক'রেই—যেন, আর দু'মিনিট [illegible]
নিজের অখণ্ডনীয় মতটা প্রকাশ্য ক'রে আমা-ব্যাচারাদের [illegible]
মীমাংসা ক'রে দিয়ে যাবে।

একটা হাত ধরে বসল,—খোকা, তোমার নাম কি?' খোকা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলে,—'ঝাশীনাথ'...যেন জগতে আর কেউ কেটা!

আমার কি ছেলেমানুষী! হেসে ফেল্লুম—বল্লুম,—"আচ্ছা কাশীনাথ,—তুমি তো কাশীর নাথ, আমার ভয়ানক পেটের অসুখ হ'য়েছে ভাল ক'রে দাও না!"

কাশীনাথ বল্লে—"আমি তো ডাক্তার নই—কাকা বাবু।"

এই সময় বন্ধুবর দুলাল মার আমার উপর ঝাপ্পা হ'য়ে উঠে ব'ল্লে,—"আঃ! কি ছেলেমো করছিস্ বিনু, কোন্—হাঁ, তুই যে বলছিলি গান্ধী ."

আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে ব'লে উঠলুম,—"রাখ তোর গান্ধী আমি যে এখন কাসির জ্বালায় মরছি—" ব'লতে ব'লতেই একবার ধক্ ধক্ ক'রে কেশে দিলুম।...দুলাল ও আর সকলেই হেসে কেঁ'ললে। আমি বল্লুম,—"তো কাশীর নাথ—তুমিও তো কাশি ভাল করতে জান।"

কাশীনাথ আর দ্বিরুক্তি না ক'রে, ধীরে ধীরে আমার মাথা নাবিয়ে নিয়ে তার ওপর দু'টি [illegible] দিয়ে, তারপর তার হাত দিয়ে পেটে ধীরে চাপড় মেরে বেশ বল্লে,—'হ'য়েছে।"

হাত দুলেক দূরে, নিজের দু'একজন সঙ্গিনীর সঙ্গে খাবার আড়ালে খুব সম্ভব তাঁর মা [illegible] এই কাণ্ড দেখছিলেন। এই সভ্যতাটুকু [illegible] কি, এই সময় এদিকে আসে কাশীনাথের মর্য্যাদাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল, তা" নয়।...

...বুঝলুম, ব্যাপারটা আর কিছু নয়,—সে যখন জল কিম্বা দুধ খেতে খেতে হঠাৎ কাসতে আরম্ভ [illegible] তখন তাঁর মা কাছে থাকেন যে-কেউ কাছে থাকেন তিনিই তার মাথাটার সঙ্গে এমনি [illegible] ঠিক করেন; আর তা'র ফলে তাঁর কাসি থেমে যায়।

আমাদের মুখে বিশেষতঃ [illegible] তাঁর মায়ের দলের সকলের মুখের [illegible] খুব বেশী খুসি [illegible] পেলুম না, একথা বলাই [illegible] এই [illegible] উপহাস [illegible]। গভীর প্রকৃতির করার হিসাবেই মাথাটা [illegible] সত্যি ভা [illegible]"

[illegible] ছাড়ু [illegible] হেসে বাঁচা [illegible] তুমি আমাকে চেনো?"

তা'র মনে তখন খুব বেশী সুখ ছিল না। [illegible] —ব'লে—"হাঁ..."

"বলো দিকিন, আমি কে?"

সে সাফ জবাব দিলে,—"মানুষ..."

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ [illegible]

প্রলাপ।

চলে গেল বুল্ বুল্ [illegible]
ভোরবাগে সব [illegible] ঝরে' পড়ে পুঞ্জে,
"কুহু কুহু" সাধ নাই— [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

তুলসীদাস।

ভারতবর্ষে হিন্দীভাষী লোকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু হিন্দী ভারতের অনেক স্থানে প্রচলিত থাকিলেও, তাহা সর্ব্বত্র একরূপ এবং ভাল নয়। ব্রজের হিন্দীর সহিত রাজবারার হিন্দী মিলিত না, আবার কাশীর হিন্দীর সহিত অযোধ্যার হিন্দীর মিল ছিল না। প্রাচীন কবিদিগের রচনা পাঠ করিলে একথা খুব ভাল করিয়া জানা যায় যে হিন্দীর রূপ অনেক প্রকার ছিল। চন্দবরদাই এর পূর্ব্বে অনেক হিন্দী কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকেই হিন্দীর আদিকবি বলিয়া গৃহীত হন।

চন্দের পর কবীর, সুরদাস প্রভৃতি অনেক কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তেমন সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। সুরদাস ও তুলসীদাসের নিকট তাঁহারা কিছুই ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুরদাস স্বীয় গ্রন্থাদি ব্রজভাষাতেই লিখিয়াছেন কিন্তু তুলসীদাস এক অতি লোকপ্রিয় ভাষায় রামায়ণাদি লিখিয়া গিয়াছেন। সুরদাস অপেক্ষা তুলসীদাস বাঙ্গালীর নিকট সমধিক পরিচিত, এই জন্য এবার তুলসীদাসের বিষয় কিছু বলিব। অন্যবার সুযোগ পাইলে সুরদাসের কথাও বলিব।

তুলসীদাসজী ১৩৮৯ বিক্রমাব্দে বাঁদা জিলাস্থিত রাজাপুর নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম দুবে এবং মাতার নাম হুলসী দেবী। তাঁহার প্রকৃত নাম রামবোলা কিন্তু তিনি তুলসীদাস নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু অত্যন্ত (১) দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার গুরুর নাম নরহরি দাস (২) ছিল। তিনি দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলীকে বিবাহ করেন। তিনি স্ত্রীর উপর এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত ও চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না। তাঁহার স্ত্রী অনেকবার তাঁহার নিকট পিতৃ গৃহে যাইবার জন্য আজ্ঞাপ্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি একবার ও

(১) যথা "আযো ঘর মে ভজন কঠিনাবলী।

(২) "বন্দউঁ গুরুপদ কঞ্জ, কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি মহামোহতম পুঞ্জ যাস্ বচন রবিকর নিকর।

তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে একদিন তাঁহার স্ত্রী পতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে পিতৃ গৃহে গমন করেন।

"তুলসীদাস যে সময়ে কোন কার্য্যবশতঃ বাহিরে গিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রীকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া তথায় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করা লোকচক্ষে হেয় ছিল। এই জন্য তাঁহার পত্নী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া দুইটী দোঁহা (১) বলিলেন। তাহার ভাবার্থ এই" আপনি আমার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া এখানে আসা সত্ত্বেও, কি আপনার বিন্দু পরিমাণ বোধ হইতেছে না? আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে এমন যদি, আমার অস্থি চর্ম্মময় দেহে আপনার যত প্রেম আছে, তত যদি শ্রীরামস্মরণে থাকিত তাহা হইলে আপনি ভবভীতি হইতে মুক্ত হইতেন"

তুলসীদাস পত্নীর নিকট হইতে এবম্প্রকার তিরস্কার বাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মন তখন বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তীর্থযাত্রা করিলেন। এই ঘটনা তুলসীদাসের জীবনে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। তুলসীদাসের স্ত্রী এই মহাঅনর্থের বিষয়ে জানিতে পারিয়া, অনেক বিনতি করিয়া তুলসীদাসের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তুলসীদাস বিচলিত হইলেন না। তিনি তাঁহার সমস্ত কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তুলসীদাস তাঁহার অবশিষ্ট জীবন তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া অতিবাহিত করেন। যদিও তিনি প্রধানতঃ কাশী ও অযোধ্যায় বাস করিতেন তথাপি তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, চিত্রকূট প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। একবার চিত্রকূট হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি ভূমক্রমে স্বীয় শ্বশুরের গৃহে অতিথি হন। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়েই তখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। কেহই কাহাকেও কিছু মাত্র চিনিতে পারে নাই। যখন তুলসীদাস আত্মপরিচয় দান করিলেন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহার পদতলে পতিত

(১) "লাজ না লাগত আপনো, দৌরে যাবত সাথ।
ধিক ধিক এয়সে প্রেমকো, কহা কহোঁ মৈঁ নাথ।
অস্থি চরমময় দেহ মম, তামে জৈসী প্রীত।
তৈসী জো শ্রীরাম মঁহ, হোতী তৌ ন ভব ভীত।

পল্লী-চিত্র।

(শ্রাবণে)

সূর্য্য এখনও উদয়াচলের কোলে স্থান পায় নাই। গৃহস্থের বড় আদরের জিনিষ—পঞ্চমে গাওয়া গীত লহরী আজ সাত রাজার ধনের মত বড় অমিল হইয়া উঠিয়াছে। কৃষকেরা কাজের শেষে একটু ফুরসৎ পাইলেই এই ভাটিয়াল রাগিণী টানিয়া মনের আনন্দ মাঠ ঘাট ছাড়াইয়া সুদূরে ছড়াইয়া দিত। চারি দিকের সুর মিশাইয়া পবন এক নূতন সুরের গান জুড়িয়া দিত, বাঁশীর সুর (চারিদিকের) সে নূতন সুরে মিশিয়া এক মাধুরীর হাট বসাইয়া দিত—পল্লী প্রান্তরের পথে ঘাটে। এখন কাজও আছে, অবসর আছে, কিন্তু সে রাগিণী উঠে না—সে বাঁশরী বাজে না—আকাশে-বাতাসে সে মোহন হাট বসে না।

দিবসের শ্রমের পর রজনী,—কৃষিজীবিদের কাছে এ রজনী যেমন ভোগের ও সুখের তেমন কার কাছে—তা জানি না। কচি ছেলে কাছে যেমন মায়ের কোল, মধুপায়ীর কাছে যেমন মধু, নবোঢ় যুবকের কাছে যেমন প্রেয়সীর কন্ কনে কাঁকনের কন্‌কনি—তেমনি কৃষকদের কাছে দিবসব্যাপী হাড়ভাঙ্গা শ্রমের পর রজনীর মায়াময় কোল শান্তির, সুখের ও ভোগের। এ রজনী তাদের শ্রমের ক্লান্তি দূর করে, হৃদয়ে উৎসাহের ধারা ঢেলে দেয় ও সংবাদ পত্রের আফিসের মত—দেশ বিদেশের খবর আনিয়া দেয় তাদের সরল সোজা মনের সাম্‌নে।

সন্ধ্যার পর পাড়ায় পাড়ায় এক এক মেলা বসিয়া যায়। এ মেলার চিত্র বড় সুন্দর। মাঝে অগ্নিদেব এক মৃৎভাণ্ডের আশ্রয়ে, হুক্কাদেবী ও পাত্রের মধ্যে তাম্রকূট এবং এতদসম্বন্ধীয় সরঞ্জাম যিত্র সাজিয়া প্রায় নিকটেই; চারিদিকে বলিষ্ঠকায় শ্যামল কৃষক মণ্ডলী। এ মেলায় কত জিনিষ উঠে। চারি পাশের নূতন খবর, বৃষ্টির কথা, সৃষ্টির কথা কত কি!

এখানে রাজনীতি নিয়া ও অনেক তর্ক বিতর্ক হয়; ধর্ম্মের কথা—প্রাচীন কথা আলোচনা আজ কালের দিনের সঙ্গে তাদের যুক্তি মিলাইয়া—কত বিচার

সে মেলায় উঠে। কংগ্রেসের কথা—বুড়াবুড়ির সুতাকাটার কথা, রাজা বাদশাহের কথা ইত্যাদি অনেক জিনিষই সে মেলায় উঠে।

এ মেলায় আর একটা নূতন জিনিষ উঠে। মাঝে মাঝে খোল করতাল সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের নাম গান, শ্রীগৌরাঙ্গের পালা ইত্যাদি অনেক রকমের সঙ্গীতও গীত হয়। মাঝে মাঝে রায়ের বাড়ীতে আজ কলা পাকিয়াছে, শ্যামের ধবলী গাই বকনা প্রসব করিলে ৫ সের বাতাসার হরিলোট মানত করিয়াছিল—ইত্যাদি অনেক রকম উপলক্ষ ধরিয়া হরিলোট ও সঙ্কীর্ত্তন পাড়াগাঁয়ে লাগিয়াই আছে।

চাঁদনী রাতে গৃহিণীরা মেলা বসাইয়া গানের মধ্যে মজিয়া যায়। সকলেরই আনন্দ; প্রকৃতি ও সে আনন্দে নাচিয়া উঠে—বাদ্যের তালে তালে অপূর্ব্ব নাচে নাচিতে থাকে।

রজনী ত এখন সে অপূর্ব্ব মোহনী ভাণ্ডার খুলিয়া পল্লীতে বেড়ায় না। আজত সে মেলায় তত্ত্বের আলোচনা, ইতিহাসের গবেষণা ইত্যাদি উঠে না। মেলা বসে কিন্তু এ মেলার চিত্র বড় বিষাদময়! সকলেই সন্ধ্যার কুসুমের মত ম্লান। সকলেই মুখে চিন্তার কালিছায়া যাদুকরের সাপের মত সব আজ নিস্তেজ! বাদশাহী আমলের মন্ত্রণা সভার মত বড় গম্ভীর।

চুপি চুপি আলাপ চলিয়াছে—এ আলাপ স্ফূর্ত্তির আলাপ নয়—এটা আপন আপন দুঃখের ইতিহাস। এ ইতিহাসের ভিত্তি আছে এ ইতিহাসের অর্থ আছে। এ ইতিহাসে—ইতিহাস আছে।

সংকীর্ত্তনের কথা কি—সংকীর্ত্তন বড় অমিল খোল করতালের ধ্বনি কালে-ভদ্রে কানে আসে। চারিদিকে একটা গাম্ভীর্য্যের হাওয়া বহিয়া চলিয়াছে।

যেখানে হর্ষ ছাড়া কিছু ছিল না—সেখানেও আজ বিষাদ আসন পাতিয়া বসিয়া আছে।

এ বিষাদের গোড়ায়, এ নিরানন্দের গোড়ায়, এ শক্তিহীনতার গোড়ায়—একটা আগুন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া জ্বলিতেছে :—এ'টা—চিন্তা—অন্ন চিন্তা—পেটের দায়।

এখন ২।৪ জন বড় গৃহস্থ ছাড়া সকলেরই গোলা ফুরাইয়াছে। (আজকাল) আগেকার মত "ধন ধান্যে" ক্ষেত ভরে না; এ বসুন্ধরাও "ধন ধান্যে" পুষ্পে" ভরে না। বৎসরের ধানের যোগাড় প্রায়ই বড় একটা হইয়া উঠে না। তার উপর এই ফসলের বিনিময়ে—গৃহস্থেরা—কাপড়, মাছ, তরকারী

সব আবশ্যকীয় জিনিষই পাইয়া থাকে। বর্ষায় ধানের যাঁর অল্পেই বার করিয়াছে। এখন সকলের প্রায় গোলা খালি। কেহ কেহ এমাদি যখন করিয়াছিল,—তাহাও বিক্রয় করিয়া এখন তাহারা একেবারে নিঃস্বহইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘরে ভাত নাই, হাতে টাকা নাই, চারিদিকেও টাকার সংস্থান নাই; এক সময়ে সকলেরই অন্নসমস্যা উপস্থিত। পরিবার প্রতিপালন দায় ঠেকিয়াছে। কেহ কেহ কয়েক দিনের জন্য মজুর সাজিয়া বোঝ আট দশ আনা পয়সা আনিয়া তিন চার জনের ভাত যোগাইতেছে, কেহ বা হালের গুরু বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে পরিবার নির্ব্বাহ করিতেছে, আবার কেহ বা স্ত্রীর গহনা পত্র ও নিজের অতিরিক্ত বাসন কোসন বন্ধক রাখিয়া টাকা আনিবার জন্য পাগলের মত ভূঁ ভূঁ করিয়া ফিরিতেছে। এ ভাবে অন্ন সংস্থানের জন্য সকলেই ব্যস্ত। কেহ কেহ—টাকাওয়ালাদের বাড়ী যাইতে—নূতন নূতন পথের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে—এ যাওয়া আসার মানে—'তৈল মাখাইয়া'—মহাজনদের নিকট হইতে টাকা আদায়। মহাজন পেট উঁচু করিয়া বেশ আরামে আগোলায় দুই একটা টান দিতেছেন আর কত দরে কি সর্ত্তে টাকা লগ্নী করিবেন সিদ্ধান্ত পূর্ণ করিতে পারিবেন—সেই চিন্তা করিতেছেন। তারপর অনেক 'টেপা টেপির পর একটা উচ্চ সুদে টাকা লগ্নী করিবেন এই বলিয়া মহাজন কৃষককে আশ্বাস দিলেন। কৃষক বিপাকে পড়িয়া—তাহাই স্বীকার করিল। এই ভীষণ দুর্দ্দিনে উঁচু সুদে টাকা আনিয়া অনেকেই চুপি চুপি আপনাদিগকে ফকির করিতেছে।

এভাবে অতিকষ্টে-কৃষকের দিন চলিয়াছে। কেহ কর্জ্জ পাইয়াছে—কেহ পায় নাই। আজ রামের বাড়ী হইতে ১ সের, কাল যদুর বাড়ী হইতে ২ সের চাউল কর্জ্জ করিয়া অতিকষ্টে দিন পাত করিতেছে। ছোট বড় কাহারও ঘরে বড় একটা সোয়াস্তি নাই। এ অগ্নি সকলকেই পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—তবে কম আর বেশী। চাউলের দর ৭৷৷০। ৮ টাকা। যাহারা চাউল কিনিয়া খায় না তাহাদের কাছে-এ দর একেবারে ভয়ানক একটা কিছু। রাস্তায়, ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্রই শুধু এই অন্ন অসহ্যার কথা বার্ত্তা কিস্ কিস্ করিয়া উঠিতেছে আর পড়িতেছে।

কৃষকদের মুখের দিকে চাহিলে হৃদয় দ্রবীভূত হয়—তাহাদের অবস্থার কথা ভাবিলে চোখে জল আসে। ধান ফুরাইয়াছে, দুর্ভিক্ষ তাদের দুয়ারে হানা দিয়াছে। দুঃখীর দিন ফুরায় না বড় অফুরন্ত,—তাই ধরিয়া এ কৃষকদের

দিন অফুরন্ত নয়। এ দুঃখের দিনেও তাহাদের হৃদয়ে আশার লতা শান্তি আনিয়া দিতেছে—তাই বিপদের মাঝেও দিন বেশ চলিয়াছে।

পাট গাছ বাড়িতেছে, ধান গাছ উঠিতেছে এবং তাদের সাথে সাথেই কৃষকের আশালতাও বাড়াইতেছে। প্রকৃতির হাতে সন্তানদের ভার রাখিয়া বুক পেতে যত দুঃখ যাতনা ভোগ করিয়া দরিদ্র কৃষাণ দিন কাটাইতেছে।

এখন দেশের কথা—বাঙ্গালার কথা—শস্য শ্যামলা—বঙ্গ জননীর দুঃখের ইতিহাস। অন্নপ্রসবিণী, জঠরানল নিবারিণী, রত্নগর্ভা ধরিত্রীর ফিনফিনে পোষাকের কোলে শোভিত, উচ্চ বেতনভোগী বাবুদের খাদ্যোৎপাদক 'ঘৃণিত' কৃষক আজ অন্নের জন্য পরের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে।

নাকের উপর চশমা লাগাইয়া বাবুর দল আকাশ কুসুমের লাল নীল রং দেখিতেছেন কৃষক মরুক, কৃষক, বাঁচুক এ খবরের দরকার বা কি? কোন মতে কুকুর বেড়ালের মত চুরি ডাকাতি করে রাজভোগ খেয়ে খেয়ে বড় দামের কথা ক'য়ে হাট লেই'ত আজ কাল "ভদ্র" নামের দাম চড়ে গেল! এ দিকে দৃষ্টি করার দরকার কি? ধান গাছ বড়একটার খোঁজ না নিয়ে বিলাতের লেনিন ও বিসমার্কের খোঁজ করে তাদের বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের কার্য্যকলাপ ঘুটে মাথা ঘামাইলেইত জীবন আমাদের বেশ সফল হয়ে যায়।

মনে পড়ে সেই আদি দিনের মুনি-রাজাদের কথা। তারা এক হিসাব মজুর ছিল—রাজা হ'লেইবা কি? তা না হলে কি আর তারা সকাল বেলার "ক্ষীর ঘুম" ছেড়ে ক্ষেতে বের হত? যাজ্ঞবল্ক্য আর মহর্ষিগনক নবীন চোষ ওয়ালাদের কৃষকদের ঐ ঘৃণিত স্থানই দখল করিয়াছিলেন।

এখন বাবুদের ননীদিয়ে গড়া তুল্ তুলে শরীর খানা—মেহন্নত না করে, ক্ষেতের হাড় ভাঙ্গা শ্রমে না গিয়ে—একেবারে হাড় ছাড়া কার্ত্তিক ঠাকুর হয়ে এক এক জন বাতাসের সাথে নুইয়ে পড়ে।

নূন ভাত আর ভাল ভাত খেয়ে আর হাড়ভাঙ্গা শ্রম করে কৃষকদের এখন যে শরীর আছে—২।৪জন উচ্চ শিক্ষিত বাবু এখন ও একু জনের সাথে এঁটে উঠ্‌তে পারবেন না।

এখন হল বাবুদের মান নিয়ে "কোশ্চেন" প্রশ্ন। কৃষকের ছেলে যারা স্কুল কলেজে পড়ে একটু কিছু শিখেছে—তারা ও কৃষি কথাটা শুনলেই নাকটা একেবারে এক হাত তু'লে ভাবী একটা ঘৃণা ব্যঞ্জক ভাব ব্যক্ত করে ফেলেন।

এটা কি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার গুণ? দেশের উন্নতির আশালতা কি এদের যত্নেই নির্ভর করে? আমি বলি যে দেশে শত করা ৫।৭ জনের খাওয়ার মত খাওয়া মিলেনা তাদের আবার লজ্জা বা ঘৃণা কি? জগতে কি এমন কোন কাজ থাকতে পারে না? যার ভাত নাই, কাপড় নাই তার আবার একটা মানের বড়াই!

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার রায়।

সন্ধ্যা-মালতী।

(ছোট গল্প)

কেন্দুবিল্বে, অজয়ের তীরে যেখানে জয়দেব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় আজিও একখানা ক্ষুদ্র কুঁড়েঘর অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য দিতেছে। অবশ্য গ্রামের প্রাচীন কিংবদন্তীতে, ঐ কুড়েখানাই জয়দেবের কুটির বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, আধুনিক ইতিহাসবেত্তাগণ তাহা স্বীকার করিতে চান না; যাহা হউক, আমরা উহাকে অজয়তীরের "জয়কুটির" বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বের কথা, একদিন পৌষের দারুণ শীতে; কাঁপিতে কাঁপিতে, একটী যুবতী আসিয়া সেই কুটির সোপানে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, যখন তার শ্রান্তি বোধ হইল, তখন সেই স্ত্রীলোকটি একটা "বিচালির গাদা" সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িল। অজয়ে তখন বান্ ডাকিবার কোনও আশঙ্কা ছিল না, তাই সে অনেক্ষণ বসিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। ক্রমে চন্দ্রমা যখন মেঘের কোলে লুকাইয়া গেল, দূরে ঝোপের মাঝে পেচক ডাকিয়া উঠিল, তখন সে বাধ্য হইয়া কুটিরের দরজায় ঘা দিল। কুটিরাভ্যন্তর হইতে এক অশীতিপর বৃদ্ধ, তাহাকে সাদরে গৃহমধ্যে লইয়া গেল। বৃদ্ধ "দীপ-নারায়ণের" সেই শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মুখমণ্ডলে তখন একটা বাৎসল্যের করুণ আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে তার লোল গণ্ডস্থলে দু'ফোটা স্নেহের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। একটা বর্ত্তিকার আলো লইয়া সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একটা রুদ্ধ আবেগ তখন

হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারে, সবলে কড়াঘাত করিতেছিল। স্নেহের উৎসে সে তখন মেয়েটাকে বুকে জড়াইয়া, মা, মা, রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। "মালতী" তখন ধীরে ধীরে, তার বৃদ্ধপিতার স্নেহাশ্রুবিন্দু, আপনার কোমল হাত দুখানি দিয়া মুছাইয়া দিতেছিল।

(২)

"দীপনারায়ণ রায়" কোন সময় কার্য্য উপলক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চলে, একটা ছোট সহরে বাসা লইয়াছিল। তখন দীপনারায়ণের পরিজনের মধ্যে ছিল এক পত্নী এবং এই শিশু কন্যা। বাড়ীটার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য "সন্ধ্যামালতী" ফুটিয়া থাকিত। রোজ সন্ধ্যায় "মালতী" সেই ফুলগুলি স্বযত্নে তুলিয়া লইয়া, হনুমান-জিউ বিগ্রহের জন্য মালা গাথিত। ঠাকুরের গলায় "সন্ধ্যামালতীর" মালা গাছা পড়াইয়া দিয়া, আরতি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত "মালতী" জোড়হস্তে, গলবস্ত্র হইয়া, দাঁড়াইয়া থাকিত। সাত বৎসরের মেয়ের বুকভরা ভক্তিটুকু দেখিয়া, হনুমানজিউর প্রাণে দয়া হইয়াছিল। দীপনারায়ণের অবস্থার দিন দিনই উন্নতি হইতে লাগিল। মালতী রোজই সন্ধ্যায় একছড়া করিয়া মালা গাঁথিত, আর হনুমান জিউর দুই চারিটা স্তব, যাহা সে তুলসী ঠাকুরের কাছ থেকে মুখস্থ করিয়াছিল, তাহাই আওড়াইয়া যাইত। একদিন "কুঠি" হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে, দীপনারায়ণ সেই "সন্ধ্যামালতীর" বাগানে প্রবেশ করিল। অদূরে এক ভীষণ কৃষ্ণসর্প তাহার পানে মুখব্যাদন করিয়া চাহিয়াছিল। "দীপনারায়ণের" আর সহ্য হইল না, সে সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিবার কড়া হুকুম দিল। যখন সেদিনের ম্লানসন্ধ্যায় মজুররা প্রায় কাজ শেষ করিয়াছে, তখনও দুই চারিটা সন্ধ্যা-মালতী বাঁচিয়াছিল। "মালতী" তাহার বাবার পা দুটো জড়াইয়া ধরিল। নির্ম্মম পিতা কিছুই শুনিল না। সেই মুহূর্ত্তে সন্ধ্যা মালতীর বাগান এক মরুভূমে পরিণত হইল। পরের দিন, সন্ধ্যায় শূন্য হাতে, হনুমান্‌জিউর মন্দিরে যাইয়া, মালতী যখন তার প্রাণের সমস্ত বেদনা জানাইয়া আসিল, তখন "দীপনারায়ণের" বাটীতে ডাকাত পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিকে একটা আকস্মিক গোলমালের সৃষ্টি হইল, সেই গোলমালে মালতীকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

(৩)

তার পর স্বামী স্ত্রীতে, তাহাদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র মেয়েটার কত খোঁজ খবর করিয়াছে—পায় নাই। আর কত সয়, একদিন সত্যি সত্যিই

"দীপনারায়ণের" "অন্দরের দীপটী" নিভিয়া গেল। তার পর এই বিশ্ব সংসারে যখন তার আপনার বলবার কেহই ছিল না, তখন সে বাংলা মুলুকে ফিরিয়া আসিয়া, অজয়ের তীরে কুটির বাঁধিল। জয়পুর থেকে "হনুমান জিউর মূর্ত্তি" গড়াইয়া আনিল। আর সন্ধ্যামালতীর একটী অপূর্ব্ব বাগান সাজাইয়া মালতীর আশায় বসিয়া রহিল। মালতী যেমন করিয়া মালা গাঁথিত, বৃদ্ধও তেমনি ভাবেই মালা গাঁথিয়া বিগ্রহের গলায় পরাইয়া দিত, আর ঠাকুরের কাছে কায়মনোবাক্যে তার মেয়েটী ফিরাইয়া দিবার কথা বলিত। মালতীও আপন মনে তার ঠাকুরকে অনেক কথাই বলিত। তবে তার বলা কওয়ার মধ্যে ছিল, বুকভরা ভক্তি আর বৃদ্ধের ছিল, সুধুই নয়নভরা জল। আজ বহুদিন পরে পাথরের ঠাকুরের, পাষাণ হৃদয়টা, বৃদ্ধের নয়নজলে গলিয়া জল্ হইয়া গিয়াছে। তাই সে তার হারাণ মাণিকটী কুড়াইয়া পাইয়া, ভোর না হতেই তাকে "সন্ধ্যামালতীর" বাগানে লইয়া গেল। মালতী তখন ছল্ ছল্ চোখে, সন্ধ্যামালতী তুলিয়া লইয়া "হনুমানজিউর" গলায় নূতনভাবে মালা গাঁথিয়া দিল। যে "মালতীর" করুন ক্রন্দনে দস্যুসর্দ্দার তাকে "মা" বলিয়া ডাকিত, সেই মালতীর ভক্তির অবস্থানে, হনুমানজিউর পাথরের মুখে তখন সজীব হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়।

রোদনের সুখ।

কত যে দুখ রোদন দিলে
জানিতে বল বাকি কার,
কত যে সুখ রোদনে মেলে
জানালে আজি আঁখিধার।
নিশিতে আজি স্বপন মাঝে,
দেখিতে পেনু রাখাল রাজে
চিনেছি দেখি শিখীর পাখা
নয়ন বাঁকা সখি তার।

২

দেখিনু বাঙা অরুপ ভাসা
অপরূপ সে পদতল,
গযাগঙা, সংজ্ঞা হরা
দুখ সাগরে শতদল
হৃদি সে পদ পরশনে
ভিজিল সুধা বরিষণে
ঠাঁই যে প্রাণে পাইনে খুঁজে
সে ধারা ধরে রাখিবার।

৩

আপনি দেখি আপনি কাঁদি
পুলক নীরে ভেসে যাই,
রোদনে এত মধু যে পেলে
হাসি কি ভালবাসে ভাই।
মধুর মধু সে রোদন
ব্রজবঁধুর উদ্বোধন,
রোদন সুখে থাকেনা বুকে
বাসনা ফিরে আগিবার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

"বর্ত্তমান ভারত"।

সোণার ভারত আজ মহাশ্মশানে পরিণত। পুরাণের বর্ণিত দেবতার লীলাভূমিতে আজ মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও অভাবের হাহাকার রব উত্থিত হইতেছে। যাহার শান্ত ও পবিত্র গ্রাম সমূহ হইতে কোন দিন বেদ ও চণ্ডীর সুমধুর গীতধ্বনি বায়ুস্তরকে প্লাবিত করিয়া তুলিত এবং গৃহে গৃহে বিমল শান্তি ধারা বর্ষণ করিয়া পার্থিব ঐশ্বর্য্যকে অনিত্য এবং হেয় প্রমাণ করিত, এক্ষণে সেখান হইতে ক্রন্দনের রোল, দলাদলির বাগ্বিতণ্ডা ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। একদিন ছিল যেদিন ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিরা রোগ-জরা মৃত্যু প্রপীড়িত মানব জাতিকে সত্যালোকে লইবার জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে বেদের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সামমিনাদিত কণ্ঠে সৃষ্টি-রহস্য ও মানব জীবনের ইতিকর্ত্তব্যতা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আজিও হিমাচল সেই অতীত যুগের মহিমাময় স্মৃতি বক্ষে করিয়া অটলভাবে দণ্ডায়মান। আজিও উহার প্রত্যেক শিলাখণ্ড ভারতের লুপ্ত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া আছে। যে ভারতীয় সভ্যতা এক সময়ে পৃথিবীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল—আজ তাহা বিচ্ছিন্ন ও মৃতপ্রায়; আজ ভারতবাসী জগতসমক্ষে অসভ্য এবং মূর্খ। আজ ভারতের জাতীয় ইতিহাস ও শিক্ষা বিদেশীয়দের হস্তে। তাঁহারা এদেশের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম দর্শন সামাজিক রীতিনীতি সর্ব্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ সুতরাং তাহাদের সংস্পর্শে ভারতবাসী তাহাদের জাতীয় জীবনটুকু হারাইতে বসিয়াছে। ভারতের সেই বেদ-পুরাণ, শ্রুতি-স্মৃতি, যোগ-যাগ সাংখ্য-ন্যায় সকলই আজ বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত। ভারতের অদৃষ্টাকাশ সুপ্রসন্ন বলিয়াই যুগে যুগে-কৃষ্ণ-অর্জ্জুন, বুদ্ধ-শঙ্করাচার্য্য, জয়দেব-চৈতন্য, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ন্যায় মহা মহা পুরুষেরা অভিভূত হইয়া বেদ পুরাণাদির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ভারতে জ্ঞানের আলোক বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। নতুবা আজ হিন্দুস্থানের কি শোচনীয় অবস্থা হইত—ভাবিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়।

অবশ্য এখন এবিষয়ে একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া বোধ হয়

সহস্র বৎসরের সঞ্চিত অলসতা ও নিস্তেজ অবসান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পুরুষকার ও আত্ম শক্তিতে বিশ্বাস জাগিতেছে। মনে হয় ভারতবাসী স্বধর্ম্ম পালন ও নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনের জন্য প্রণোদিত হইতেছে। বাস্তবিকই আজ হিন্দু সমাজ—হিন্দুর জাতীয় জীবন ধর্ম্মতেজে উদ্দীপ্ত না হইলে, আজ ভারতবাসী ত্যাগের আদর্শ-সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে-স্বজাতি-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অনন্ত শক্তি ও তেজের উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে, বুঝিবা হিন্দুর সর্ব্বস্ব যাইত।

প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার দ্বার আজি ও রুদ্ধ। প্রকৃত শিক্ষা-তাহাই, যদ্বারা হিন্দুর আদর্শ-আমাদের চক্ষে আর ও মহান্ ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। এক জন মহাত্মা বলিয়াছেন, "জেনো হিন্দু ধর্ম্ম একটা প্রকাণ্ড ভুল নয়। ডুবে দেখ, গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে অনুসন্ধান কর-তারপর বুঝতে পারবে কি অতল স্পর্শ সমুদ্র এই হিন্দু ধর্ম্ম।" আমাদের বৈদেশিক শিক্ষার মোহে ভুলিলে চলিবে না। দেশটাকে বুঝিতে হইবে, ভারতটাকে বুঝিতে হইবে, জাতীয়-জীবনের-গতি, বৃদ্ধি ও প্রসার কোনদিকে, তার উদ্দেশ্য কোন লক্ষ্যের অভিমুখী তাই দেখিতে হইবে। যখন নিজেদের ঠিক করে বুঝে নেওয়া যাবে তখন সব গোল চুকিয়া যাইবে।

শ্রীবিশাখা বসু।

মিলন।

ফুলত একদিনে ফোটেনা। তাহার ফোটবার জন্য অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক কথা অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার ডাটায় যে জন্ম জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুলত অনেক কাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

মহাত্মাজী চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন মায়ের অপরূপ রূপে এ বিচিত্র উদ্যান ভরিয়াছে। কত দিন কত কাল মায়ের অপরূপরূপ ধ্যানে ধরে, মহাত্মাজী জাগিয়া দেখিল মা তাহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া আহ্বান করিতেছেন। মায়ের ডাকা বড় মর্ম্মান্তিক। এ ডাকে কেহই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, মন প্রাণ—বিচিত্র আনন্দ রসে ভরিয়া উঠিল। তন্ময় মনে ভরা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া শুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া কাহার আকুল আহ্বান। মহাত্মাজী তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল মা তাঁহার আঁধার প্রাণে আলোক বিকিরণ করিতেছে। ভাবিল আমার প্রাণে যে আছে, কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে এইরূপ জড়াইয়া জড়াইয়া আকুল করে? আবার অন্তরে অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে; কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই। কে বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে। মহাত্মাজী প্রাণে প্রাণে বুঝিল এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব্ব মিলন! মহাত্মাজী এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল যেন মিলিয়া ও মিলায় নাই মিশিয়া ও মিশায় নাই প্রভেদ অথচ অভেদ। মহাত্মাজী মাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, বলিতেছে, মা আমাকে গ্রহণ কর আমি যে তোমারই হৃদয়ের ধন। মা ও তাঁহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে "এস এস, আমিত তোমাদেরই।" দেখিল সে এক মহা মিলন, বুঝিল জন্ম সার্থক। মৃত্যু সার্থক। দেহ সার্থক। প্রাণ সার্থক। আত্মা সার্থক। এ মহা মিলন সার্থক।

বাহির সুধু বাহির নয়। অন্তর সুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয়...য়া যায়া

প্রথম ধরা যায় তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যেকের প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্ত প্রকৃতি আছে সেই বহিরাবরণ ও অন্ত প্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক। মহাত্মাজী এই মিলন মন্দির। বহুদিন হইতেই মহাত্মার বুকে অনেক আশা অনেক ভাব আপনা আপনি জমাট বাঁধিতে ছিল। সে যে হৃদয়ের মাঝে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কিসের খোঁজ করিতেছিল, মিলন পরশের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রাণের ভিতর ডুবিয়া যেই দেখিতে পাইল আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা আপনি ফুটিতেছিল সে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সেরূপ কেমন—তাহাকে দেখিয়া মহাত্মা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিল। শুধু অন্তরের মাঝে মরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতে ছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন দেখিতে পাইলেন তাহার সেই আরাধ্য মাতা তাহার আঁধার প্রাণ আলো করিয়া রহিয়াছে।

কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে মহাত্মার সঙ্গে মায়ের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন যে স্বদেশ প্রেমিক তাহা জানুক আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক মহাত্মার প্রাণ সেই মহা মিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলনেই (আজ হিন্দু মুসলমানের মিলন আনিতে সক্ষম হইয়াছে। এত মিলন নয়—এ শুধু ভক্তি আর বিশ্বাসের মুক্তির দশাশ্বমেধ ঘাটে পূণ্য-স্নান—বিসর্জ্জন।)

মীরজা।

শুভক্ষণ।

(১)

সে ছিল মোদেরি গ্রাম্য বালিকা
মোদেরি পাড়ায় ঘর,
শান্ত সুন্দর স্বভাব সরল
ছিলনা কাহারো পর।
অকালে তাহার দরিদ্র জনক
চিরতরে দু'টা আঁখি—
যে দিন মুদিল, হায় রে! তাহারে
জননীর কোলে রাখি;
ভীষণ সে শোকে ক্ষুদ্র সান্ত্বনা
তাহারে ধরিয়া বুকে,
সহিলা জননী সে ভীম আঘাত
শান্ত সংযত দুখে।

(২)

দেখেছি তাহারে তরুণ প্রভাতে
অরুণ উদয় সনে
শুভ্র বসনা ক্ষুদ্র বালিকা
আমাদেরি উপবনে—
বদনে প'ড়েছে উষার আলোক
পৃষ্ঠে সজল চুল—
ক্ষুদ্র সাজি ভরি' মাতার তাহার
তুলিতে পূজার ফুল।
দেখেছি তাহারে-গ্রাম্য নদী পথে
ভরে কলসী ভরি।

গৃহ কর্ম্মে মা'র ক্ষুদ্র সহায়তা
আনিতে সলিল ধরি।

(৩)

দেখেছি তাহারে—জননীর সনে
ভকতি আনত আঁখি,
গ্রাম্য দেবগৃহে কর দু'টী জুড়ি,
অভিষ্ট লইতে মাগি,
দেবের ভাণ্ডার লুটিয়া আনিয়া
মধুর সুষমা মাখি,
সরল সুন্দর আননে তাহার
কে দিয়াছে রেখা আঁকি।
পূজা অবশেষে নমি' দেবতায়
প্রণমিতে গুরুজনে
বিশ্ব দেবাশীষ পড়িছে, ঝরিয়া
সবারি আশীষ সনে।

(৪)

ছিলনা সে দিব্য মোহিনী রূপসী
বিদ্যুৎ বরণী কায়,
সরল চঞ্চল নয়ন যুগল
ছিলনা খঞ্জন প্রায়,
বদনে তাহার সরোজ ভাবিয়া
উড়ি, পড়িতনা অলি
রক্ত লোহিত অধরে হইতনা কারো
বিভ্রম বান্ধুলী বলি
চলন বলিয়া হইতনা ভ্রম
কুঞ্চিত চিকুর রাশি
মুখে মনোভাব ছিলনা নির্ণীত
নখরে শারদ শশী।

(৫)

একদা মোদের সরসী সোপানে
উদাস করুণ চক্ষে,
সে ছিল দাঁড়ায়ে ঈষৎ বঙ্কিমে
ক্ষুদ্র কলসী কক্ষে।
গোধূলী আলোক পড়েছিল ছেয়ে
সহাস আননে তার
বাসন্তীবসনে ঘেরা ছিল তার
দেহখানি সুকুমার।
বিশ্বের দেবতা ঢেলেছিল তাহে
বিশ্ব-সৌন্দর্য্য ভার।
চাহি তার পানে ফিরিলনা মোর
মুগধ নয়ন আর।

(৬)

কৃপণ আমার উন্মুখ যৌবন
সঞ্চিয়া যত বিত্ত,
যত্নে রেখেছিল সম্পদনিকর
ভরিয়া ভাণ্ডার চিত্ত,
রিক্ত করিয়া সঁপিল তাহার
সিক্ত চরণমূলে,
আমার বলিয়া রহিল না কিছু
বিকাইনু বিনামূলে।
সেই একদিন—একটী নিমেষ
বুঝি ছিল শুভক্ষণ,
চিনিনু তাহারে—"সে ছিল আমারি
চির আপনার জন।"

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়।

পরমহংসদেব ও অবতারবাদ।

পরমহংসদেব অবতার ছিলেন কিনা, এই সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক চলিতেছে; প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বপক্ষকার অন্যান্য বহু সাধুর প্রস্তাবিত অবতারত্ব সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য পরমহংসদেবের প্রতি এবম্বিধ কটাক্ষপাতে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়াছেন। পরিণামে, বিচার তর্কের সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। 'আক্রমণই' বলিলাম—কারণ কেবল সত্য প্রকাশ বা সত্য নির্ণয় উদ্দেশ্য থাকিলে পূর্ব্বপক্ষকারের এত জিদ্, একটু রীষ, একটু রোষে ঝাঁজাল জিদ্, দেখা যাইত না। তাঁর পক্ষের এই রীষ্ আমারকাছে অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য। তর্ক বুদ্ধির বিষয়,—মনের জ্বালের ব্যাপার, কথায় কথায় প্রমাণ পঞ্জী প্রদর্শন করিতে হয়; বিশ্বাস লইয়া তর্ক চলে না। বস্তুতঃ পৃথিবীতে রোষের হেতু নিতান্ত অল্প। এমন কি ব্যক্তিগত আক্রমণেও রোষের কারণ নাই। কেন না, আমাকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত উক্তি প্রয়োগ হইল, সেই সমস্ত উক্তিতে যদি সত্য নিহিত থাকে, তবে আমার রাস্তা একেবারে অমূলক; আর যদি মিথ্যাই থাকে, তবুও তাহাতে রাগ করিবার কি আছে? সাংসারিক ক্ষতি হইতে পারে; সত্য ব্যাপার একবারমাত্র প্রকাশ করিলেই সেই মিথ্যার নিরসন হয়। তাহাতেও যদি অপর পক্ষ বিরত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে সে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা দোষারোপ করিতেছে, কিংবা আমি সত্য ব্যপদেশে মিথ্যার প্রচার দ্বারা মিথ্যার অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহাতে মিথ্যা তর্কের জীবন বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছি। প্রথমটা, ঠিক হইলে, সে নিতান্ত খল; আমার আদালত ছাড়া উপায় নাই। আর আমি যদি প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসী হই, তবে এই কথা আমার জানা উচিত যে, মিথ্যার মশকজীবন ক্ষণস্থায়ী, খলতা সর্পস্বভাব ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়া করিবেই। আর যদি দ্বিতীয়টাই ঠিক হয়, তবে আমার বুঝা উচিত ছিল, মিথ্যার দ্বারা মিথ্যার নিরাকরণ হয় না, অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার দূর হয় না, বাড়ে মাত্র; সত্যের নিকা জ্যোতিতেই মিথ্যা বিলীন হইয়া যায়। মিথ্যা স্বতই টিকে না, কারণ তাহার ভিত্তি নাই। বাস্তবিক মিথ্যার কোথা হইতে উদ্ভব হইল, তাহা দার্শনিক আলোচনার বিষয়।

পরমহংসদেবের শিষ্যমণ্ডলীর রাগ রোষ কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি; কারণ তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাসের উপর আঘাত করা হইয়াছে; ইহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবননাশের আশঙ্কা আছে। ধর্ম্মার্থীর বিশ্বাসের উপর আঘাত করা সমীচীন কি? যে ধর্ম্মার্থী, সে বিশ্বসিত বিষয় অতিক্রম করিয়া সত্য লক্ষ্যে গিয়া উপস্থিত হইবেই; কারণ, যতদিন লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে না, ততদিন তাহার সাধনার বিরাম হইতে পারে না, তাহার চিত্তে শান্তি, প্রসাদ থাকিতে পারে না। তবে নানা বিপথ কাটাইতে সাধককে বেগ পাইতে হইবে মাত্র। এই বিপথ হইতে ফিরাইয়া সুপথে চালনা করাই হিতোপদেশে বিশ্বাসভঙ্গ করার সার্থকতা। ইহাই জ্ঞানের সত্যের প্রচার উদ্দেশ্য। কেবল বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিলে হইবে না, সুপথ চেনা থাকা চাই, দেখাইয়া দিবার ক্ষমতা থাকা চাই। বিশ্বাসের অমৃতত্ব প্রদর্শন করিয়া শূন্যতা সৃষ্টি করিলে চলিবে না, তৎস্থানে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই শূন্যতা পূর্ণ করিতে হইবে। ইহাকেই বলে সত্য প্রচারের 'চাপরাশ থাকা। নতুবা সাধক ইতোভ্রষ্টঃ ততোনষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাতে অনিষ্টের সম্ভাবনা, কি বেশী নহে? ধর্ম্মপ্রচারে এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

বিশ্বাসভঙ্গে এবম্বিধ সমূহ প্রত্যবায়ের আশঙ্কা স্বত্বেও তাহাতে রোষ প্রকাশ করা স্বাভাবিক হইলেও কি ঠিক? হিন্দুশাস্ত্র বিধানোচিত? কারণ হিন্দুশাস্ত্র আশঙ্কিত শ্রোতার উভয় কর্ণে অঙ্গুলিনিহিত করিয়া, দরকার হইলে স্থানান্তরে গমনের বিধান করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান পন্থীর পক্ষে এই বিধান নহে। তাহাকে প্রত্যেক বিষয় বিচার বিতর্ক করিয়া যাচিয়া দেখিতে হয়; ধ্যানপ্রভাবে তৎসম্বন্ধে সত্যজ্ঞান উপলব্ধি করিতে হয়। বিচার উপাসনাসাহায্যে এই সত্যে উপনীত হইলে, উহা বিশ্বাসে পরিণত হয়। জ্ঞান যতদিন শুষ্ক জ্ঞানই থাকে, ততদিন উহার স্থির প্রতিষ্ঠা নাই। জ্ঞান ও ভক্তির মিলন, সমন্বয় স্তরে স্তরে অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য; নতুবা কাহারো প্রকৃত সার্থকতা নাই, ভিত্তি নাই; ভক্তি ততদিন অন্ধ, জ্ঞান ও অজ্ঞাত প্রতীয়মান, তার স্থির প্রমাণ নাই। এই উপলব্ধ সত্যের একটি লক্ষণ তাহার নিত্যত্ব ও নিরপেক্ষত্ব (inoari ability and absoluteness)। যাঁহারা কোন আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এবম্বিধ সত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে বিচলিত হন না। এই জন্য উন্নত সাধুসন্দের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া আলোচনা হইতে পারে, হইয়া থাকে, তাহাতে কিন্তু বিরোধ

উভয়পক্ষই সরলভাবে প্রকৃততত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, সেইখানে উদ্দেশ্য-সামান্য নিরবচ্ছিন্ন বিরোধ হইতে পারে না। তর্কের সময় উভয়পক্ষই প্রায় এই কথা ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ তর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ থাকে না। বাস্তবিক হিন্দু শাস্ত্রে তর্কের নিন্দাই আছে। তর্কের পশ্চাতে থাকিয়া তার্কিকের বিরাট অহমিকা হুঙ্কার দিতে থাকে, আর আলোচনার অন্তরালে জ্ঞানান্বেষী শিষ্যের বিনয় পরিস্ফুট।

এখন প্রকৃতানুসরণ করি। শিষ্য যদি গুরুকে অবতার বলিয়া ভাবেন ও প্রচার করেন, তাহাতে কোন হিন্দুর যে আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা অবিশ্বাস্য। হিন্দুর প্রতিমা পূজার গূঢ়ার্থ কি? প্রতিমা আমারই নির্ম্মিত, আমারাই সৃষ্ট অথচ তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকি। আপাতদৃষ্টে ইহাতে ভাববিরোধ প্রতীত হয়, ইহা উপহাসের কথা। কিন্তু এই প্রতিমাকে ভগবানের প্রতীক (symbol) ভাবিয়া, তাহাতে অনন্তগুণাবলী, ভগবত্তা আরোপ করিয়া বস্তুতঃ সগুণ ঈশ্বরেরই ধ্যানও অর্চ্চনা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে যে ব্রহ্ম ধ্যান করি, তাহাতে যে সমস্ত গুণ আরোপ করি, সেই ব্রহ্ম ও তাঁহার গুণাবলীও আমার সৃষ্ট, তিনি আমার মানসপুত্র,—উহাকে 'আদর্শ আমি' বলা যায়। প্রতিমা যেমন অসীম, এই মানসপুত্রও সসীম—কারণ অসীমের ধারণাই করিতে পারি না; একটা অসীম অথচ বিশাল সমুদ্রের ধারণাও মানুষ করিতে পারে না। বাস্তবিক এই হিসাবে মানুষ মাত্রেই প্রতিমোপাসক,। ইহার উপযোগিতা সুস্পষ্ট, অবিসংবাদিত এবং সর্ব্ববাদিসম্মত। যে যাহা ভাবে, সেই তাহাই হয়। এই গুণময় প্রতীকের এবং ধ্যান ধারণায় সাধকে সেই সমস্ত গুণ সঞ্চারিত ও বর্ত্তিত হয়। হৌক উহা প্রতিমা, শিলাকষ্টিময় জড় পদার্থ; সাধনা সৌকর্য্যার্থে এই প্রতিমা গঠন করিয়া-সাধক উহাকে মনে মনে যে দেশ কালের অতীত করিয়া-লইয়াছে, তাহাতেই সেই অসীম প্রতিমা সাধকের চক্ষুতে অসীমত্ব লাভ করিয়াছে জড় পদার্থ প্রাণিত হইয়াছে, গুণ হীন গুণ বিরাট হইয়াছে। তাহার প্রতীকত্ব ও (Symbolism) সাধকের পক্ষে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পক্ষে ঐ ভগবান্; অপরের পক্ষে উহা জড় পদার্থ যে যখন সিদ্ধিলাভ করিবে, তার পক্ষেও তখন উহা জড় পদার্থ; হিন্দুর প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিমা বিসর্জ্জনের এই গূঢ়ার্থ।

এইজন্য হিন্দু শিষ্য মাত্রের প্রতি স্বীয় গুরুকে অবতার বলিয়া ভাবিবার ও

অধিকার করেন। সাধক শিষ্য তাঁহার অবতারত্ব বা ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যে দেশকালাতীত ও সর্ব্বগুণেশ্বর বলিয়া ধারণা করেন, তাহাতে গুরু অবতার কিংবা মুক্ত না হইলেও সাধক-শিষ্য মুক্ত হইয়া যান। গুরু অপেক্ষা উন্নত শিষ্য-সাধুর উদাহরণ বিরল নহে। এই দিক দিয়া দেখিলে শিষ্য মণ্ডলী যদি স্বীয় গুরুকে অবতার বলিয়া ভাবেন বা পূজা করেন, তবে অপরের তাহার প্রতিবাদ করিবার কি হেতু আছে?

কিন্তু এই সাধনার কৌশল হিসাবে শিষ্যমণ্ডলী গুরুকে অবতার বলিয়া ভাবেন বা প্রচার করেন না। এইরূপ কৌশল জ্ঞান থাকিলে ত সমস্তই মাটি; তাহারা প্রকৃত অবতার বলিয়াই বিশ্বাস করেন,—এই বিশ্বে সাধনার কৌশল জ্ঞান একেবারেই নাই। তাঁহারা সত্য সত্যই মনে করেন, ভগবান, পৃথিবীর দুঃখে করুণার্দ্র হইয়া পতিতপাবনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। কারণ প্রথমতঃ যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মার্থী, তাঁহারা আত্ম-দৌর্ব্বল্য ও আত্মদোষ সম্বন্ধে যেইরূপ সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত থাকেন, সেইরূপ পৃথিবীতে দোষের এত বাহুল্য থাকে ও দোষত্যাগে বহু ধর্ম্মার্থী তাঁহাদের চক্ষে সেই বাহুল্য এত বিশেষভাবে উন্মোচিত ও প্রত্যক্ষ হয় যে, যাহাতে তাহারা মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মগ্লানি এত হইয়াছে যে অবতার নিশ্চয় হইবে কিংবা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের গুরুদেবকে—যাঁহার কাছে তাঁহারা প্রকৃত আলোকের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, যাঁহার সাধন সম্পদ তাঁহাদের ধারণাও হয় না—তাঁহাকে অবতার বলিয়া ভাবেন এবং প্রচার করেন।

দ্বিতীয়তঃ গুরুর সাধন সম্পদ্ ঠিক করিতে না পারাতে, তাহার সীমারেখা টানিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে অসীম বলিয়া মনে হয়। এইখানে ব্যবহারিক উদাহরণ স্বরূপে একটা পূর্ব্বস্মৃতির উল্লেখ করিতেছি। আমরা যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন আমাদের গণিতের শিক্ষক যিনি ছিলেন, তিনি এফ-এ ফেল। কিন্তু এফ্ এ ফেল হইলে কি হয়, তিনি যতটুকু পড়িয়াছেন, তাহার এমন অনুশীলন করিয়াছেন যে তৎসম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই ছিল না। কোন ছাত্র তাঁহাকে কোনদিন কোন জায়গায় ঠকাইতে পারে নাই; বাস্তবিকই প্রবেশিকা পরীক্ষার পাটীগণিত, বীজগণিত কিংবা জ্যামিতিতে তাঁহার সমূহ জ্ঞান ছিল। আমি তখন গণিতালোচনায় যেমন অগ্রণী ছিলাম, তেমন নিতান্ত উৎসুকও ছিলাম। সকল সময়েই গুরুশিষ্যে আলোচনা হইত, গুরুমারা প্রভৃতির প্ররোচনায় তাঁহাকে

ঠকাইবার চেষ্টাও যে না করিয়াছি তাহা নহে, কিন্তু পারি নাই। আমার তখন কাম গণিত সম্বন্ধে ধারণা ত এই প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত; আমি মনে করিতাম, মাষ্টার মহাশয়ের গণিত সম্বন্ধে কি অগাধ অপার জ্ঞান! গণিতে তাঁহার চূড়ান্ত জ্ঞানই, হইয়াছে! আহা, কখন তাঁহার মত গণিতে বড় হইতে পারিব? তখন আমার জীবন সার্থক হইবে! ঈশ্বর কৃপায় এখন বুঝিতে পারি, তাঁহার গণিতজ্ঞান কত? ইহা স্বাভাবিক, বাল্য শিক্ষা পাঠার্থীর কাছে চারুপাঠাধ্যেতার জ্ঞান অসীমই বোধ হইবে।

বস্তুতঃ পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে হইলে উভয়েই সমান হওয়া চাই। একজন অপরকে বুঝিতে হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমান কিংবা তদপেক্ষা উন্নত হওয়া চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অবতার কিনা, এই কথা ত পূর্ব্বপক্ষকার বলিতেই পারেন না। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারেন এমন কেহ আছেন কিনা বলিতে পারি না, থাকিলেও সেই প্রমাণ বুঝিবার উপযুক্ত অধিকারী আমি নহি। প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজে অবতার বলিয়া বোধ হয় স্বীকার করিবেন না, কাজেই অবতার সম্বন্ধে তাঁহার পঠিত বিদ্যা থাকিলেও ধ্যানলব্ধ বিশ্বাস না থাকিতে পারে, কাজেই সত্যজ্ঞান নাই। আর পরমহংসদেবের শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে ত তেমন পরিচয় নাই—আর তেমন ঐকান্তিক ধর্ম্মার্থী নাই বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশও করিতে পারি না। তবে তাঁহাদের মধ্যেও কেহ পরমহংসদেবের সমান বলিয়া স্বীকার করিবেন কিনা সন্দেহ। কাজেই পরমহংসদেব অবতার নহে, ইহা যেমন পূর্ব্বপক্ষকারের ধারণা, আর তিনি অবতার ইহাও তেমন তাঁহার প্রকৃত শিষ্যমণ্ডলীর প্রকৃত সরল বিশ্বাস, বড় জোড় তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, বিশ্বাস লইয়া আলোচনা চলে না। যীশুখৃষ্টকে নাকি মাত্র তাঁহার দ্বাদশজন শিষ্য চিনিতে পারিয়াছিলেন। মহম্মদ ও বুদ্ধ যে অবতার, তাঁহাদের সমসাময়িক কয়জনে চিনিতে পারিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। রামায়ণকার পরশুরাম কিংবা শ্রীরামকে মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করিয়াছেন।

যাঁহারা জগতে অবতার বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্রের বাহিরকার ব্যক্তি তাঁহাদের দোষ প্রদর্শন করেন। কিংবা তাঁহাদের বিরোধও নিন্দা করেন, তবুও ধর্ম্মচক্রস্থিত ব্যক্তিদের কাছে অন্ততঃ তাঁহাদের অবতারত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চারিত্রিক দৌর্ব্বল্য ও দোষ তাঁহার সময়ের শিশুপাল

প্রভৃতি সমাজপতিগণও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এখনও অনেক হিন্দু তাঁহার গোপীলীলা হজম করিতে পারে না। তার পর হিন্দু ব্যতিরিক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অবতার ও ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বলিয়া ভাবেন না। চৈতন্যের বিরুদ্ধবাদী লোক তাঁহার সময়েও নবদ্বীপে কম ছিল না। যীশুখৃষ্টের নিন্দাকারী দোষদ্রষ্টা দর্শনকারী লোকের তখন যেমন অভাব ছিল না, এখনও তেমন অভাব নাই। বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে হিন্দুগণ 'পাষণ্ডী', 'হেতুবাদী' আখ্যা দিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের দোষোল্লেখ বিজয়াবসরে সমরকালে তাঁহার পুত্রগণই করিয়াছিলেন। এখনও কি তাঁহার বালী বধ ও সীতাবর্জ্জন সকলে সমর্থন করেন? আর দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া কাজ নাই।

বস্তুতঃ অবতার হইতে হইলেই যে সকলের দৃষ্টিতে ভ্রমপ্রমাদহীন হইতে হইবে ও সকলের দৃষ্টিতে অবতার হইতে হইবে, তাহা নহে। অবতারগণ মানব ধর্ম্মের অধীন। তাঁহাদের ব্যাধি দুঃখ কষ্ট হইবে না, এমন কোন কথা নাই। তাঁহারা যদি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই হন, তবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সমস্ত বিরোধের নিরসন করিতে পারেন কিংবা অবতীর্ণ না হইয়াও ত ভগবান্ এই কাজ করিতে পারেন। তাঁহাদের অসাধারণ মানবত্বই তাঁহাদিগকে মানবের প্রিয় আদর্শ করিয়া তুলে—তাহাতেই মানবের আশা উৎসাহ। এই প্রসঙ্গে এই কথা স্মরণ রাখা দরকার, হিন্দু ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী এই অবতারবাদ বড় মানেন না। অবতারমাত্রেই ধর্ম্মার্থীর আদর্শ, গুরুস্বরূপ ঋষি; মানব—তিনি সেই দ্রষ্টা ঋষি, যিনি ধর্ম্মের গ্লানি কোথায়, সমাজের বৈকল্য কোথায়। ইহা অন্তর্দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া সেই বিশিষ্ট লোকসমাজে সেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন ও সেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন ও সেই ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একই সঙ্গতে সমাজবন্ধন করেন। যখন কোথাও ধর্ম্মবিপ্লব ঘটে, তখন সেই সমাজেরও বিপ্লব ঘটে, তাহাতে নানা অশান্তিতে জনসাধারণ পর্য্যন্ত প্রকৃত পন্থার জন্য, দুঃখ কষ্ট অশান্তি হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সমাজহৃদয়ে সেই আলোড়নের ফলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধক সংস্কারক তাহাতে জন্মায়, তাহাতেও বিপ্লব-শান্তি না হইলে তাঁহাদের অপেক্ষা উন্নত, শক্তিমান্ পুরুষ জন্মিয়া থাকেন, যিনি সেই বিপ্লব শান্ত করিতে পারেন, ধর্ম্মচক্র, সমাজ ও সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। ইনিই সেই সমাজের নারায়ণ। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মানুষ মাত্রেই আপনাপন ক্ষেত্রে অবতার—সেই ক্ষেত্রে তাহার মত একজন লোকের অভাব হইয়াছিল বলিয়াই তাহার উদ্ভব।

ভগবানের সংসারে এতটুকু বাহুল্য নাই ;—সেই অভাব পূরণ করাই তাহার এই জীবনের কর্ম্ম। যাহারা অবতারবাদ মানেন, তাঁহাদিগকে এই কথাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

নতুবা আংশিক অবতারের অন্য কোন সদর্থ নাই। ধর্ম্মের যত পরিমাণ গ্লানি তত পরিমাণ গ্লানি দূর করিবার কোন সামর্থ্য তিনি তাহাতে স্ফুরিত করেন। আর যেই সমাজের মধ্যে এই ধর্ম্মগ্লানি দেখা যায়, সেই সমাজের জন্যই তিনি অবতার। তাহার সংস্কারও চিরস্থায়ী হয় না, হইলে অবতার একজন মাত্রেই হইত, "সম্ভবামি যুগে যুগে" হইবার প্রয়োজন ছিল না। দেশকাল কর্ম্মের এই অবিচ্ছিন্নতাতেই অবতারের আংশিকত্ব ও মানবত্ব। অবতারমাত্রেই সময়োপযোগী বা time server.। কোন দেশে কোন কালে ধর্ম্মের যখন সমস্ত পাদই বিপ্লবপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মের সর্ব্বতোভাবেই গ্লানি ঘটে, তখন সেই দেশে সেই সময়ের জন্য পূর্ণাবতার জন্মগ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত একজন লোকের যে বঙ্গদেশে তখন প্রয়োজন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, এই দিকে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সকলেই ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী, মহামনীষী সমাজপতি ছিলেন। তাঁহাদেরও প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তবুও জনসমাজ তাহাতে প্রকৃতভাবে শান্তি ও চিত্তপ্রসাদ যেন লাভ করিতে পারিতেছিল না। কারণ তাঁহারা ছিলেন বিশেষভাবে শুষ্কজ্ঞানী, বহুশাস্ত্রাধ্যায়ী, তাঁহাদের ধ্যানলব্ধ সত্য, ভক্তির দৃষ্টি বা শক্তি তেমন ছিল না। সমগ্র সায়ণ বেদাধ্যয়ন করিলেও শুষ্কজ্ঞান লাভ হইতে পারে,—তেমন জ্ঞান সংসারে বহু লোকেরই আছে। কিন্তু তাহাতেই যে সকলের ধার্ম্মিকত্ব বিকশিত হইয়াছে, এই কথা কেহ বলিবে না। তথা কথিতজ্ঞানী অথচ অধার্ম্মিক ব্যক্তির উদাহরণ এই সংসারে বিরল ত নহেই—বরং প্রচুর। আমরা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই কি ধার্ম্মিক? রামমোহন রায় প্রভৃতি প্রধানতঃ শুষ্কজ্ঞানী ছিলেন, এই কথা বলিলে তাঁহাদের অপমান করা হয় না। কারণ এই জ্ঞানের প্রয়োজন সমাজে আছে, তখনও ছিল। জ্ঞানীরও ধ্যান বা উপাসনার দরকার। পণ্ডিতের উপাসনার দরকার নাই, এই কথা পূর্ব্বপক্ষকারও স্বীকার করিবেন না, বোধকরি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রবলে ভূতপ্রেত বিতাড়া ব্যাধি দূর করেন, সর্প বিনীত করেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে মন্ত্র জানিলেই হয় না, তাহার অর্থগ্রহ হইলেই হয় না, তাহাতে ভক্তি হইয়া সাধন সাধনা

করিতে হয়, তাহার সত্যমে অবশ্যম্ভাবিত্বে অগাধ বিশ্বাস জন্ম চাই, নতুবা তাহা ফলে না। আজিকে সেইরকম দুয়েকটা মন্ত্র ও সকলেই রচনা করিতে পারেন তাহাতে ফল হইবে না। কারণ সাধনসম্পদ্ নাই। ধর্ম্মবক্তা কিংবা ধার্ম্মিক হইতে হইলে অধীত শাস্ত্র না হইলেও খুব চলে। অনেক প্রকৃত বিখ্যাত সাধু সন্ন্যাসীর শাস্ত্রাধ্যয়ন নাই। উপাসনা-বলে তাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সাধন সম্পদ্‌হীন শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞান প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান বলিয়া পরম-হংসদেবের সময়ে হিন্দুসমাজেও একটা প্রচলিত ধারণা হইয়াছিল—বৈজ্ঞানিক ব্যাখা প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। আর নানামতের যে সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তি করিয়াছিলেন, সত্য দৃষ্টির দিক্ দিয়া তাহারও একটা প্রকৃত সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল। অন্ততঃ কলিকাতার হিন্দুসমাজে সেই কাজের সূচনা করেন ব্রহ্মানন্দ স্বামী, তাহার সম্পূর্ণ সমাধা করেন পরমহংসদেব।

শ্রীবিনোদ বিহারী দত্ত।

টলষ্টয়।

বর্ত্তমান নবীন কবের যিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বের ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন, যদি কেহ তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কোন দৈবীশক্তির কিংবা অমানুষিক অনুষ্ঠানের সম্ভব আশা করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই দুঃখিত হইতে হইবে। সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সাধারণ ভাবে জগতের এই অসাধারণ ব্যক্তিটী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কোন দেবতা স্বর্গপথে হুলুধ্বনি দিয়াছিল কি না জানি না, মন্দাকিনে নন্দনের পারিজাত-সৌরভ আসিয়াছিল কি না জানি না, তবে মানবচক্ষু-গোচর কোন কিছু অমানুষিক সংঘটিত হয় নাই, একথা খাঁটী সত্য।

বিদ্যালয়ে টলষ্টয়ের মত আর খারাপ ছাত্র কেহ ছিল না বলিলেও চলে। বেণীর মত দুরন্ত হইলেও হয় ত তাঁহাকে একদিকে ভাল বলিতে পারা যাইতে, কিন্তু বিধাতা এমনি ভাবে এই ব্যক্তিটীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে

কি লেখা পড়া, কি খেলা ধূলা, কোন দিকেই তাঁহার চিন্তার তেমন উৎকর্ষ দেখা যায় নাই। কলেজেও তিনি এমন উন্নতি করিতে পারেন নাই। প্রথম যখন প্রাচ্যনীতি পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন মনে করিয়াছিলেন যে অতি সহজেই বুঝি তিনি প্রাচ্যনীতি আয়ত্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, তাহার মনের ভিতর আইন শিক্ষার বাসনা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে তিনি আইনই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু "বিধি যদি বাদী, বাদী বিশ্ব-চরাচর" আইনও তাহাকে ধীরে ধীরে যে-আইনী করিয়া তুলিল, তিনি আইন পড়া ছাড়িয়া দিলেন। যে মহামানবের চিন্তার ধারা পৃথিবীতে ভবিষ্যতে নবীন যুগের সৃষ্টি করিবে, তাহার পাঠ্যলীলা এই ভাবেই সম্পূর্ণ হইল।

শূন্যমন লইয়া থাকা যায় না—টলষ্টয়ের মনের ভিতর নানা রূপকদর্য্য চিন্তা আসিয়া রঙ্গীন আভা বিস্তার করিতে লাগিল। সংসারনভিজ্ঞ সুকুমারমতি যুবক পাপের উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া লোলুপ পতঙ্গের মত ছুটিল। জুয়াখেলা, মদ্যপান ইত্যাদি যত রকম উৎকট ও বিভীৎস পাপ আছে, তাহার কোনটারই আস্বাদ লইতে তিনি বাকী রাখিলেন না। কিন্তু যখন জাগরণ আসিল তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার প্রাণের যে আশাটী এত-কাল ধরিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা যেন মলিন হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছে, অমনি তাঁহার মনের উপর তাঁহার আর বিশ্বাস রহিল না। তিনি অসংযমী মনকে শান্তি করিবার জন্য নানারূপ কৃচ্ছ সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন একটা গ্রন্থিপূর্ণ দড়ী লইয়া কোমর পর্য্যন্ত নগ্ন হইয়া, তিনি নিজকে এমন ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত তাহার চোখে জল না আসিয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত তিনি কিছুতেই বিরত হন নাই। এই ভাবে নিজকে নিজে সংযত করিবার জন্য কয়জন চেষ্টা করিয়া-ছেন জানি না।

তাহার ভাই নিকোলাস সৈনিক পুরুষ ছিলেন। টলষ্টয়ের মন যখন কিছুতেই শান্ত হইতে চাইতেছিলে না, তখন, তিনি তাহার ভাইয়ের সঙ্গে একবার ককেশাসে বেড়াইতে যান। সেখানে পার্ব্বত্য সুষমা ও বাধাহীন, সরল ও নির্ম্মল পার্ব্বত্যজীবনের মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার মনে সৈনিক হইতে বাসনা জাগে। বাসনা কার্য্যে পরিণত হইতে অধিক সময় যায় নাই। তিনি কসাক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইলেন।

১৮৫৩ খৃঃ ক্রীমিয়াল যুদ্ধ পর্য্যন্ত তিনি সৈন্যদলে ছিলেন, তারপর তাঁহার মনের ভিতরকার আসল পুরুষটা এই সমস্ত নৃশংস ধ্বংস ব্যাপারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি তখনই সেই সৈন্যদল ত্যাগ করিলেন। সৈন্যদল ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার বিখ্যাত 'সিবাষ্টোপল' পুস্তক খানি বাহির হয়।

তিনি সেণ্টপিটার্সবার্গে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রুষিয়াতে এক বিরাট সামাজিক রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝড় বহিতেছিল। সেই ঝড়ে যে টলষ্টয়েরও কিছু পরিবর্ত্তন না হইয়াছিল, এমন নহে, তবে সেই সমস্ত পরিবর্ত্তন যেন একটু অসম্পূর্ণ বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল। তিনি চিরকালই রুষীয়াকে প্রাচ্যদেশীয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং প্রাচ্যদেশের প্রতীচ্যের রীতি নীতি কিংবা ধারকরা পরিবর্ত্তন যে খুব মঙ্গলের হইবে, সেই ধারণা তাঁহার মনে মোটেই স্থান পায় নাই।

বোধহয় সেই জন্যই তিনি ১৮৫৭ খৃঃ একবার দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু সে ভ্রমণ তিনি সর্ব্ব সময়ই নিষ্ফল বলিয়া বিবেচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই ভ্রমণের পর পুরোপুরি তিনটী বৎসর তিনি মস্কো ও পলিনাতে শান্ত ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শান্ত ভাবে জীবন যাপন করিলেও তাহার মন চিরকালই নানা অভিজ্ঞতা ভাবে ব্যস্ত থাকিত। এই সময়ও তিনি স্বীয় দেশবাসীর রীতি নীতি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম-যে পর্য্যবেক্ষণ শুধু-সুখ বলিয়াই তাহার ধারণা ছিল, পরবর্ত্তীকালে তাঁহার প্রকৃতি হইয়া পড়িল। প্রাণের অদম্য এক আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তিনি আবার দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। ফলে যাহাই হউক না কেন, পর বৎসরই তিনি 'শান্তি রক্ষক" নিযুক্ত হইলেন।

১৮৬২ খৃঃ তিনি মিস্ সোণায়া নাম্নী জনৈকা গ্রহিতার পানিগ্রহণ করেন। তার পর (১৮৬৩ ১৮৭৮) পূর্ণ পনরটী বৎসর আর তিনি অন্য কোন দিকে মন সংযোগ না করিয়া গার্হস্থ্য সুখের ক্রোড়ে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু, এই সময় তিনি "এনা কেরানিনা" ও 'যুদ্ধ ও শান্তি' নামক দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং গ্রীক ও জার্ম্মাণ ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই তাহার মনের ভিতর আরব সেই দীপক রাগিণী বাজিয়া উঠিল। সাম্যের পাঞ্চজন্য শঙ্খের রবে তাহার

সুপ্ত মনোবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এতদিন তিনি শুধু মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া সুখের আশায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়াছিলেন। 'সুখ, সম্পদ ও শক্তি'তে সুখ নাই, যদি কিছু সুখ থাকে, সে শুধু আত্মবলিদানে আর সাধনায়। টলষ্টয় খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া শুধু এই সত্যই আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এই শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধান করিবার জন্য সক্রেতিস হইতে সোপেন হাওয়ার পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে বাকী রাখেন নাই। নানা ধর্ম্মের সন্ন্যাসী দরবেশ কিংবা পাদরীকেও অনেক দিন তিনি এই প্রশ্নই করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আশা মিটে নাই।

১৮৮৫ খৃঃ তিনি যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার কার্য্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি মদ্য মাংস ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া নিরামিষ আহার করিতে লাগিলেন। ধূম পান করা শীকার করা যাহা পূর্ব্বে তাঁহার জীবনে একমাত্র সুখের গ্রন্থিস্বরূপ বর্ত্তমান ছিল, আস্তে আস্তে তাহাও তিনি ছাড়িয়া দিলেন এবং সামান্য কৃষকের ন্যায় বেশভূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৯১ খৃঃ তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া দিয়া তাঁহার মহা-প্রব্রজ্যার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির স্বত্বও বিক্রয় করিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সৎ পরামর্শেই তাহা হইয়া উঠে নাই।

১৮৯১ খৃঃ রুষে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইতে লাগিল। সেই সময় টলষ্টয় দরিদ্রের অন্নদানের ভার গ্রহণ করিলেন। তৎকালে মস্কোবাসী কতকগুলি ইহুদির নিকট ডাকেবুর্দিগকে মুসলমানভাবে হত্যা করা হয়। রুষ-সরকার উক্ত বিষয় জনসাধারণের নিকটে যাহাতে প্রকাশিত না হয় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, ১৮৯৫-৯৮ খৃঃ টলষ্টয় জনসাধারণে প্রকাশ করেন যে, রুষ-সরকার উহা জনসাধারণের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। যাহারা রুষ-সরকারের অধীনে সামরিক কার্য্য ছাড়িয়াছিল, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি "রিসারেকসন" নামক পুস্তকের কপিরাইট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ১৯০১ সালে রুষীয়ার খৃষ্টান সমাজ তাঁহাকে 'একঘরে' করিয়া ফেলিলেন। ১৯১০ সালে টলষ্টয় কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার কন্যা ও একজন ডাক্তার তাঁহাকে একদিন এসষ্টোভে দেখিতে পাইলেন। তখন

তিনি গুরুতর পীড়াতে সাংঘাতিকভাবে পীড়িত। সেই মুমূর্ষ অবস্থায় তাহার গৃহ-পরিত্যাগের কারণ প্রকাশ পাইল যে, তিনি সরল কৃষকদিগের মধ্যে শান্তভাবে জীবন যাপন করিবার নিমিত্তই গোপনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৯১০ ইং ২০শে নবেম্বর মহাত্মা টলষ্টয় ৮২ বৎসরে শান্তভাবে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

শ্রীহেমরঞ্জন রায়।

"অনুভূতির ব্যথা"।

আমি ভাবি, জীবনে এমন অনেক-কিছুই তো অনুভব ক'রে থাকি, কিন্তু আজকে আমার এই ক্ষুদ্র-মহান্ অনুভূতিটাকে নিয়ে পাঁচ জনের সুমুখে এসে দাঁড়াবার জন্যে আমার মনের এমন অদম্য পণ কেন? আর তা' ছাড়া, আমার এই অনুভূতি আমার কাছে যত বড়, আর সকলের যোগে ও কি তত বড় দেখাবে! আর, সকলের চেয়ে বড় কথা—আমি যা' ব'লতে বসেছি, লোকে তা' শুনবে কেন? এতে তো "নতুন কিছুর" বাদকতা নেই—এর যে প্রায় সব খানিই পুরোণো আর পুরোণো!

মন আমাকে তাগিদ দিচ্ছে—তবু আমায় ব'লতে হ'বে! লোকে হাস্‌বে?... হাস্‌লো বা!.....

আমাদের দেশে "হরিষে বিষাদ" ব'লে একটা চল্‌তি কথা আছে, কিন্তু "বিষাদে হরিষ" এমন তো কেউ ব'লে না! আজ এর কারণটা ধ'রতে গেলে লোকের কাছে ছুটে এসে আমার এই অদ্ভুত মস্তিষ্কের আবিষ্কারটুকু দেখাবার যে পাণ্ডিত্য—সেটা যেন কোন মতেই চেপে রাখ্‌তে পারলুম না ...

সেটা এই রকম—সংসারে মানুষের মনের দুঃখটা যত বড়, সুখটা তত বড় নয়;...ওকি! উঠে পড়লেন যে?...বসুন বসুন, দোহাই আপনাদের আর একটুক্ষণ বসুন!

হাঁ, যা ব'লছিলুম,—সংসারে দুঃখটাই বড় বলে "হরিষের" ও যখন "বিষাদ" [illegible] সেই 'বিষাদ'টাই প্রবল হ'য়ে ওঠে; কিন্তু যে

এমন হয়—'বিষাদের' ওপর 'হর্ষ' এসে পড়ে, তা' হ'লে অন্ততঃ তৎক্ষণাৎ সেই হর্ষটাকে চিনতে পারা যায় না, আর যদি বা চিনতে পারা যায়—কিন্তু তৎক্ষণাৎ এই হর্ষ সেই বিষাদকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে না ;—মানের মধ্যে খুব সেই বিষাদটাই কাজ ক'রতে থাকে' 'তারপর অনেকক্ষণ পরে হয় তো সেই হর্ষ মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুল্‌তে আরম্ভ করে।

এর পর যা' ব'লছি, তা'তে যেন এরই একটা 'সোজাসুজি' উদাহরণ ব'লে বুঝাবেন না। তবুও যে ব'লছি তার কারণ, নীচেকার এই ঘটনাটাই আমার দ্বারা এই অদ্ভুত আবিস্কারটুকু করিয়ে নিয়েছে, "কেমন ক'রে" এ প্রশ্নের জবাব দিতে আমি পারবো না...আচ্ছা-আচ্ছা, আর বাজে ব'কবো না, আপনারা বসুন'

আজ কদিন ধ'রে বৃষ্টি হ'চ্ছে—আমার পাচকা দু'জন কি জানি কা'কে গেলুবার জন্যে 'হাঁ' করেছেন, মুচি এসে ব'লুলে—"ছ আনা পড়বে বাবু।"

কাজ দেখে, আর কাল বৈকালের সেই দুটোয়" দেওয়া" স্মরণ ক'রে ভাবলুম, ব্যাটা খুব বেশী বলেনি, কিন্তু "লোকের ছেলেদের মতন "কেমন দর ক'রে" জিনিষ-পত্তর' কিন্‌তে পারিনে ব'লে মা বাপের কাছে আমার একটা' 'চিরাকালে' অখ্যাতি আছে। ব'লুলুম,—"না, চার আনা পাবি—হয় তো ক'রে দে।"...

"না বাবু পাঁচ আনা"

তাহা মিথ্যে ক'রে ব'লুলুম—"না, আর একজনকে তিন আনা ব'লে ছিলুম, তোকে তবু চারটে পয়সা বেশী ক'রে বলুলুম।"...কিন্তু সত্যি কথাটা না-বোলা এই যে, "আর একজনকে পাঁচ আনা ব'লে ছিলুম"—ব্যাটা রাজী হয়নি।...

...এ ব্যাটা ক্ষুন্ন-মনে—সেই "বাবু পাঁচ আনা, পাঁচ আনা" বলতে বলতে শেষটা ব'ললে" আচ্ছা বাবু আজ থেকে তুমি আপনির যো খুসি হোয় ওই দিও..."

আমি ব'ললুম,—"আজ দেখে তো বটেই, কিন্তু চার আনার বেশী এক পয়সাও পাবিনে ;"

এর ওপর সে আর কোন কথাই ব'ললে না, অর্থাৎ চার আনাতেই রাজী হ'ল।

সে কাজ আরম্ভ ক'রলে—আমি বসে দেখতে লাগলুম।...

তার মুখ দেখে আর তার মত ক'রে কাজ করা দেখে আমি আগেই বুঝতে

পারলুম, ব্যাটা মনে ঠিক ক'রে নিয়েছে—বদিও চার আনায় রাজী হ'য়েছি, কিন্তু কাজ 'দেখে "বড়া বাবু" খুসী হ'য়ে পাঁচ আনাই দেবে—"ভাগ্যে লোগ আছে!'...

তা'র এই 'ভোদ্দর লোগ' কিন্তু বেশ করে কাজটা দেখে নিয়ে চারি আনা পয়সা তা'র হাতে দিলে।

পয়সাটা ওণে দেখে সে নিজের মুখ খানা ব্যথায় ভরিয়ে শুধু কেবল একটী বার আমার মুখের পানে চাইলে' কিন্তু দেখ্‌লে, আমার মুখ খানা তখন অচল অটল, স্থির গম্ভীর! দেখে এই 'বাবু জাত'টার প্রতি হয় তো আজ তা'র নতুন ক'রে ঘৃণায় এবং বিতৃষ্ণায় তা'র মুখ খানা টন্ টনে হ'য়ে উঠল।..কি? আমাকে কোন কথা বলবার তা'র অধিকার নেই—সুতরাং ব'ললেও না। পয়সা গুলো ব্যাগের মধ্যে ফেলে দিলে।

ভেবে ছিলুম—চাইলে ব্যাটাকে খুসী ক'রবো।...চাইলে না। আর আধ মিনিটও স্থির থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল' 'বল্‌লুম,—"আচ্ছা, তুমি এই আর চারটে পয়সা নাও।"...

সে কলের পুতুলের মতন হাত পাতলে। চারটে পয়সা তা'র হাতে প'ড়ল, এ দেখেও তা'র মুখের তারের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হ'ল না—খুসী হ'য়ে বাবুকে বাবুকে সেলাম করা তো দূরের কথা!

বন্ধুবর সতীশ আগাগোরা আমার সঙ্গে রোয়াকের উপর বসে ছিল। ইংরিজী ক'রে বলে উঠ্‌ল—"কি অকৃতজ্ঞ এই পশুটা নগেন!"

আমি সতীশের কথায় কোন উত্তর দিতে পারলুম না। বাড়ী ঢুকে আমার বুকের ভেতরটা অনেক পর্য্যন্ত কেবলি কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগল,—প্রথমেই কেন ওকে পাঁচ আনা দিয়ে খুসী ক'রলুম না।—যদি ক'রতুম, নিশ্চয়ই খুসী হ'য়ে আমাকে যা' হোক কিছু একটা ব'ল্‌তো।

আমি যে খুসী ক'রে সেলাম পাবার এতখানি কাঙ্গাল, আজ তা' না পেয়ে যেমন ক'রে বুঝলুম, এমন ক'রে আর কোন দিন বুঝিনি।

আমি ভাবছি, সে যদি আর কোন দিন আমার বাড়ী এসে, আমাকে চিনতে পেরে, আজকের কথা উল্লেখ ক'রে—তবে সেই দিনে আমার আজকে-কার এই গভীর ব্যথা মুছে যাবে কি?

আপনারা বোধ হয় মনে মনে হাসছেন!

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

আকাশ।

(১)

প্রভাত থেকে প্রদোষ আমার সারা দিবস ধরি'
ওরে, কাটল সময় আকাশ পানে চেয়ে—
কতই বরণ, কতই বিলাস দেখ্‌নু আহা মরি!
তার, স্মরণে সব-প্রাণটা আছে ছেয়ে।

(২)

তারায় খচিত তিমির পাশে উষার রঙীন লেখা
যেন চাঁপার ভাতি ঠেকল প্রথম-ঝোঁকে,
তার পরে মোর বাতায়নে রক্ত-রবির রেখা
রাঙা ডালিম ফুলের রং ধরালো চোখে'

(৩)

ক্রমেই উজলতর দিশি—আভাস দিলে নীল
সেই কাক-ডিমে রং স্নিগ্ধ আকাশ খানি,
রশ্মি-ছটায় মুক্ত হ'ল হাঁকিয়ে-ওঠা দিল
দিগে' ঘুচিলে রাতের জমাট বাঁধা গ্লানি।

(৪)

বাহির হ'লাম নূতন, পথে—মধুর রৌদ্র করে
মিঠে কিরণ-ধোওয়া সে-ক্ষণ কি আর ভুলি
রূপের আভায় রূপ-রুপালি হাজার ধারায় ঝরে
সে কি বিশাল বক্ষ! হৃদয় গেল খুলি!

(৫)

তার পরে সেই নীলের দেশে পেঁজা তুলোর রাশ
দূর অল জুড়ে শুভ্র মেঘের খেলা'
কখনো বেশ নিস্তি হ'য়ে দিলে সকল-পাশ
হেসে তড়িৎ-রাণী জানিয়ে দিলে :

(৬)

কাজল মেঘে ঝল্‌ল বারি ভিজ্‌ছু কত বসি
দেখ্‌ছু উড়ে বায়নো মনের সাধ
দুলিয়ে গলে আশার মালা মুছ্‌ছু মনের মসী
নিজে সাহসভরে নদী হলাম পার।

(৭)

জাগ্‌ল আবার আলোর খেলা মেঘের সীমানায়
বিকে সোনালী রং লাগ্‌ল এসে রোদ
তুতের বরণ ধ'র্‌ল আকাশ সুখের নীলিমায়
কবি! সে সুধাকে ভুলে?—আমি খোদ।

(৮)

সূর্য্য এখন বস্‌ছে পাটে ঘনায় সাঁঝের কায়া
পুন এখন নানা বরণ জাগে ঘটে
সি দুর গোলাপ হল্‌দে—এ যে কতই রঙের মায়া
ওরে হায় যেন ফুট্‌ছে আকাশ-পটে।

শ্রীজীবন বিদ্যা

কান্ত কবি রজনীকান্ত।*

মহৎ জীবনী পবিত্র তীর্থ বারি। তাহাতে স্নান করিয়া আমরা নির্ম্মল হই, স্নিগ্ধ হই ও সজীব হই। মহান্‌জীবন আমাদের মহত্ত্বের পথে আহ্বানের সঙ্গীত শত দুর্ব্বলতা পরাজয়ের বীর্য্যপ্রদ প্রেরণা এবং নব জীবনের পথ প্রদর্শনের ইঙ্গিত স্বরূপ। মহৎ জীবনের আদর্শ স্বার্থান্ধকারময় জটিল জীবন পথে মঙ্গল জ্যোতি। যে মহানুভব নিজ জীবনের সেই মহান্ আদর্শ জগতের চিরন্তন সম্পত্তিরূপে দান করিয়া যান তিনি যেমন চির নমস্য আবার যিনি সেই আদর্শ অজানার অন্তরাল হইতে সযত্নে জনগণের নয়ন সমক্ষে আনিয়া ধরেন তিনিও সেইরূপ আমাদের একান্ত কৃতজ্ঞতার পাত্র। এ কৃতজ্ঞতার আর এক হেতু এই যে, জীবনী লেখক যেন ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন কুসুমদানে একখানি সম্পূর্ণ মাল্য গ্রন্থন করিয়া আমাদের উপহার দেন। একটি জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে যে অনুভূতির প্রয়োজন জীবনী লেখকের সে অনুভূতি না থাকিলে জীবনী রচনা ব্যর্থ হইয়া যায়। জীবনী রচনার প্রথম কথা এই যে, 'একই চিরন্তন সত্য ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্টে নূতন নূতন ভাব বৈচিত্র রঞ্জনে অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়। বংশধারা সঙ্গ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাত এমন একটি জিনিসকে ক্রমে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলে যেটি সেই মহান্ জীবনের কেন্দ্র বা গূঢ় সত্য। জীবনী লেখক জীবনের সেই মূল সূত্রটি ধরিয়া সুনিপুণ মালাকরের ন্যায় জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনাগুলি তাহাতে সুশৃঙ্খল ও সুন্দর বিন্যস্ত করিয়া গাঁথিয়া যান, এবং যেখানে কিছু অস্পষ্ট সেখানে নিজ অনুভূতির তুলিকা স্পর্শে এমন-ভাবে ফুটাইয়া তুলেন যেন আমরা সেই জীবনীর সম্পূর্ণ মূরটি লেখকের অনুভূতির সহায়তায় স্পষ্টতররূপে অনুভব করিতে পারি।

কান্ত কবির জীবনী লেখক এইরূপ একজন সুনিপুণ মালাকর। জীবনীর প্রারম্ভেই তিনি স্বর্গীয় কবি বিহারীলালের যে কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা

* শ্রীনলিনী রঞ্জন পণ্ডিত-প্রণীত ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট বেঙ্গল বুক কোম্পানী হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি টাকা।

কি সুন্দর সঙ্গত হইয়াছে। সূত্ররূপে সেই কয়েক ছত্র কবিতার মধ্যে কবি রজনীকান্তের সম্পূর্ণ জীবনই যেন অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"জ্বলুক যতই জ্বলে
পর জ্বালামালা গলে,
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে জ্বলে হলাহল স্মৃতি,
হিমাদ্রিই বক্ষ পরে
সহে বজ্র অকাতরে,
জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায়;
অস্তাচলে চলে রবি
কেমন প্রশান্ত ছবি!
তখন কেমন আহা উদার বিভূতি!"

সুনিপুন—জীবনী লেখক এখানে—যে ভাবে গ্রন্থের নান্দীস্বরূপ—এই কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নির্ব্বাচনের সুখ্যাতি—না করিয়া থাকা যায় না। বস্তুতঃ কেবল রজনী কান্তের কেন,—উদ্ধৃত—কয়ছত্র কবিতা মহৎ চরিত্র ব্যক্তি মাত্রেরই জীবনের সার কথা। সংখ্যা বলিয়াছেন, "অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তিই' পরম পুরুষার্থ।" এ জগতে বীরশ্রেষ্ঠগণ কত ভাবে চরণে পদে দলন করিয়া সেই অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই দুঃসহ দুঃখের হাসি প্রসন্ন মনে বীরদর্পে পদক্ষেপ কোন্ দুর্ব্বলচিত্তের না হৃদয়ে বল দান করে!

সে যেন

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ

পার্থসারথীর এই পাঞ্চজন্য নির্ঘোষের সজীব প্রতিধ্বনি। এই যে "নীলকণ্ঠ কণ্ঠেজ্বলে হলাহল স্মৃতি" এই "হিমাদ্রিই বক্ষপরে, সহে বজ্র অকাতরে" এই অস্তাচলে চলে রবি কেমন প্রশান্ত ছবি"—ইহার প্রত্যেক শব্দের ধ্বনিই আমাদের মনে সেই দারুণ দুঃখজয়ী মহাবীরের জীবনাভিনয় দৃশ্যের আরম্ভ সূচন সম্প্রতি আমরা যে দৃশ্যের দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছি।

কবি-চরিতকে যদি আমরা মহাবীর-চরিত বলি, তাহা হইলে কোন ভুল হয় না। যিনি কেবল নিজকৃত কাব্যে নয় নিজ জীবনেও কবি তিনি নিশ্চয়ই মহাবীর। কান্ত কবির জীবনই কবিতাময়। দারুণ-যন্ত্রণাময় মৃত্যু মুখে

তিনি পরিহাস রসিক, পদে পদে মৃত্যুকে পরিহাসে তুচ্ছ করিয়াছেন, আবার মাতৃ সমুখীন শিশুর মত তিনি উলঙ্গ সরল, তাঁহার গোপন করিবার যেন কিছুই নাই। তিনি অনায়াসে সর্ব্ব-সমক্ষে বলিতে পারেন।

"আমি দশের চোখে ধূলা দিয়ে
কি না ভাবি কি না করি!
সে সব কথা বলি যদি
আমায় ঘৃণা করবে লোকে,
বসতে দেয় না এক বিছানায়
বলে ত্যাগ করিলাম তোকে।"

ছেলেরা যেমন বলে "ছেলে বেলায় আমি এইরকম করতাম" সরল কবিও তেমনি শিশুর মত-সরলভাবে বলিয়াছেন "আমি এমন তো ছিলাম না বড় সবল ছিলাম ছেলে বেলায়।" সরল শিশুর মাতৃনির্ভরের ন্যায় তাঁহারও সেই একান্ত নির্ভর'—

"কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি কত আশা করে বসে আছি
পাব জীবনে না হয় মরণে।"

এই যে "পাবই পাব" "পাব জীবনে" না হয় মরণে" ইহা সংশয়ীর উক্তি নয়, এ উক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের; ইহা দুর্ব্বল চিত্তের উক্তি নয়, এ উক্তি বীরের উক্তি; তাঁহার মুখের এই উক্তি তিনি নিজ জীবনে সফল করিয়া গিয়াছেন। তাই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "তাঁহার কবিতা তো সুন্দরই, কিন্তু কবিতা অপেক্ষাও মৃত্যুপ্রত্যাশায় তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাব আমার নিকট বেশী সুন্দর বোধ হইত। মৃত্যুভীতি—তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক, কবিতার প্রস্রবণ বন্ধ করিতে পারে নাই ইহা তাঁহার ভাবময় জীবনের মধুরতা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কান্তকবির সেই সর্ব্বপ্রথম গান।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই!

এ গান বাংলা দেশে কে না শুনিয়াছেন, কে না গাহিয়াছেন? মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়েরই সব—এই অলঙ্কার হীন দু'ছত্র সরল প্রাণের উচ্ছ্বাসে

কিন্তু গানটি ভাল করিয়াই জানেন। আজও কি এই গান গাওয়ার দিন ফুরাইয়াছে? এখনও কি ভাইকে ভাইয়ের এ অনুরোধের দিন—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই—

এ-করুণ আবেদনের দিন ফুরাইয়াছে, এ গান স্বদেশী আন্দোলনের সেই দিনের জলন্ত স্মৃতি, যে দিন আমারা "ভাই ভাই এক ঠাঁই "বলিয়া হাতে রাখী বাঁধিয়াছিলাম? সেইদিনের স্মৃতি এখনও প্রাণের ভিতর কবি রজনীর খোলা প্রাণের বীণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইতেছে,

এমন বাতাস আর ব'বেনা,
পারে যাওয়া আর হ'বে না,
মরণ সিন্ধুমাঝে গিয়ে
পড়বিরে নিজ কর্ম্ম দোষে।
এই হাওয়া পড়ে গেলে
স্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে
কূল পাবিনে ভেসে যাবি
মর্‌বি মনের আপশোষে।"
আসিয়ে ভাই, আরো আগে,—
"আজ এক সবে দে সন্ধ্যা নমাজ—
মিশিয়ে দে আজ বেদ-কোরাণ!
(জাতি ধর্ম্ম ভুলে গিয়েরে)
(হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়েরে)
থাকি একই মায়ের কোলে পরি
একই মায়ের স্তন্য পান।

* * * *

একি অপূর্ব্ব চিত্র! অতি সহজ সরল, সুখেরও-বুঝিবার কোন বাধা নাই। কেবল প্রাণ থাকা চাই, কেন না প্রাণ দিয়া না বুঝিলে প্রাণের এত সহজ কথাও বোঝা যায় না। আজিকার দিনের একখানি, চিত্রে দেখিয়াছি, মহাত্মা গান্ধী মৌলানা মহম্মদ আলীর কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া "অমৃত বাজার

পত্রিকা" পড়িতেছেন। রজনীকান্তের স্বদেশী যুগের ভাব আজ কি ভাবে পল্লবিত, ইহা অনুভূতিতে ধারণার বিষয়। কিন্তু তবুও এ কথা বলিবার দিন আজও আসে নাই

"ব্রত উদ্‌যাপন আজি হোমাগ্নিতে পূর্ণাহুতি যজ্ঞ সমাপন"

এখনও আমাদের বিদ্বান কর্ম্মী-ধনী-লব্ধ প্রতিষ্ঠ ও প্রতিভাবান ভাইদেরও বুঝাইবার—দিন ফুরায় নাই

"ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক্ সে সোণা মোদের মায়ের-ক্ষেতের ধান।
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।"

এখনও শিক্ষিতা ভগিণীগণ, যাঁহারা-স্বদেশকে ভালবাসেন বলিয়া অভিমান করেন—তাঁহাদেরও একথা শুনানোর দিন ফুরায় নাই,

"মিহি কাপড় প'রব না আর যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় পর্‌লে কেমন সাজে,
দেখ্‌তো পর্‌লে কেমন সাজে।"

হে আমার স্বদেশবাসী ভাই বোন নাইল নদীর বক্রগতির অন্তরাল হইতে মিশর-মরালের এখনও সেই আক্ষেপের গান শোন,

"বিধাতা আপনি এসে পথ দেখালে,
তাও কি তোরা ভুল্‌বি ?
বিধাতা আপনি এসে জানিয়ে দিলে
তাও কি ঘুমে চুল্‌বি ?
বিধাতা পন করা আজ শিখিয়ে দিলে,
তবু কি ভাই দুল্‌বি ?
বিধাতা এত মানা কর্‌ছে তবু
দুধে তেঁতুল গুল্‌বি ?

গাও কবি, বুক-ভরে কণ্ঠ ফিরে পেয়ে যাও গান.
এ দুর্ভাগ্য-নীল-নদে ভেসে যাও মিশর-মরাল
* * * * কভু যদি হও অন্তরাল
বঙ্কিম নীলের গতি রাখে যদি লুকায়ে তোমারে,
তবু গান গেয়ো কবি সুদূর সিন্ধুর পর পারে।

স্বর্গীয় ইন্দু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধাতা ধান দিয়েছে-উপোষ থেকে
পথে পথে বুলবি ?"

গ্রন্থকার কান্ত-কবির জীবন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, "সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে।" দ্বিতীয় "হাস পাতালে মৃত্যু শয্যায়"। ও তৃতীয় "বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে।" এই তিনটী বিভাগের স্তর ও তাহার নাম নির্ব্বাচন অতি সুন্দর হইয়াছে-এবং প্রত্যেক বিভাগের উপরের উদ্ধৃতাংশই গ্রন্থকারের সুনিপুণ মনোনয়নের পরিচায়ক। "বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে" নামক খণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদে "কবি রজনী কান্ত হাস্য রসে" "কবি রজনী কান্ত —দেশাত্ম বোধে" "কবি রজনীকান্ত—সাধন তত্ত্বে" ও কবি রজনীকান্ত কাব্য পরিচয়' এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "জন প্রিয় রজনীকান্ত" ও "সাধক রজনী-কান্ত—এইরূপে শ্রেণী বিভাগ করিয়া গ্রন্থকার রজনীকান্তের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই বিভাগ জীবনী লেখকের বিশেষ কৃতিত্বের পরি-চায়ক; এই বিভাগ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে পাঠকগণ যেমন ভাবে কবি জীবনী বুঝিয়া লইতে পারিবেন অন্যথা তেমন ভাবে পারিতেন না। যদিও গ্রন্থকারের মন্তব্যের সহিত পাঠকগণ সর্ব্বত্র একমত না ও হইতে পারেন তথাপি সেই মন্তব্যই "তাহাদের কবি চরিত্র অনুশীলনের অধিক সহায়ক। "হাস পাতালে রজনীকান্ত" শীর্ষক অংশটী এতই অপূর্ব্ব-যে সম্পূর্ণ না পড়িলে অল্প কথায় তাহার মূল মাধুর্য্য বুঝানো অসম্ভব; কবির নিজ লিখিত রোজ নামচা—এই অংশটীর সুখ্যমণি। এই রোজ নামচা কবি-হৃদয়ের আবরণ হীন প্রকাশ। শ্বাস যন্ত্রে দারুণ ক্যানসার ব্যধির আক্রমণে—কবির শ্বাস রোধে মৃত্যু সম্ভাবনার আশু প্রাণরক্ষার জন্য গলদেশে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল, এই অস্ত্রোপচারে "সুকণ্ঠ কবির রসনা নির্ব্বাক হইয়াছিল; লেখনীই তখন তাঁহার ভাব বিনিময়ের একমাত্র সহায় হইয়াছিল। সে সময় হাস পাতালে অনেকেই কবিকে দেখিতে যাইতেন, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন এবং অন্যান্য কথোপকথনও তাঁহাকে শ্লেটপেন্সিল অথবা দোয়াত কলমের সাহায্যে করিতে হইত! অন্য কোন গুণগ্রাহী দেশে সেই লেখার প্রত্যেক অক্ষরটিই মহামূল্য সম্পত্তির মত সযত্নে রক্ষিত হইত, কিন্তু আমাদের দেশে তাহা আশা করা যায় না। যতটুকু আমরা পাইয়াছি তাহার জন্য জীবনী লেখক শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আমাদের অসীম ধন্যবাদের পাত্র। ভরসা করি তিনি রোজা নামচার অপর

যে যে অংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা ও পরে প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে মূল্যবান করিবেন।

গলদেশে অস্ত্রোপচারের ফলে চির জীবনের মত বাক্‌শক্তি হারাইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কবি হাসপাতালে কটেজ বিভাগে অবস্থান করিতেছেন। রোগের ভীষণ যন্ত্রণা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, তদুপরি অর্থভাব পরিবারের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার চিন্তা অতীতের স্মৃতি ও বর্ত্তমানের লোকানুগ্রহ গ্রহণের দহন তাঁহার নিয়ত সঙ্গী। রজনীতে নিদ্রার শান্তি তিনি একেবারেই হারাইয়াছেন। সে সময় ও রজনীকান্ত নিজের শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে পরিহাস করিয়া লিখিতেছেন "আমি আমার রাজসাহির অট্টালিকা ছেড়ে যখন কুঁড়ে ঘরে এসেছি তখন শরীর তো ভাল থাকার কথাই নয়। এটা cottige (কটেজ-কুঁড়ে ঘর) কি না ?" আনন্দময়ী ও অমৃত তাঁহার সেই সময়ের লেখা। কবি রসময় লাহা নিজ কৃত "ছাই ভস্ম" পুস্তক উপহার দিলে তিনি তাঁহাকে "অমৃত" দিয়া পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন "ছাই ভস্ম দিয়ে অমৃত নিয়ে যাও।" কে বলিবে যে এ মৃত্যু ব্যাধি পীড়িতের পরিহাস!

তাঁহার রোগশয্যায় হাসপাতালে থাকিবার সময় যে-সকল—ডাক্তার "ডিউটী"তে থাকিতেন তাঁহাদের একজনের নিকট "রজনীকান্ত কেমন আছেন" জিজ্ঞাসা করিয়া এই উত্তর পাইয়াছিলাম, "তাঁকে আবার পীড়িত কে বলে? বরং আমরাই পীড়িত আমাদেরই তিনি আনন্দ দিয়া সর্ব্বদা সুস্থ রাখেন। তিনি আছেন বলে হাসপাতালের কাযের দিন গুলি যে কোথা দিয়ে চলে যায় বুঝ্‌তেও পারি না।" শ্রীযুক্ত হাথাল মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "রজনী বাবু সাংঘাতিক রোগে উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিতেন তথাপি তিনি তাঁহার সহজ প্রফুল্লতায় বঞ্চিত হন নাই তিনি যতদিন ছিলেন ততদিন আমার হাসপাতাল "বাস সুখের ছিল।" তাঁহার স্বর্গারোহণের পর হইতে আমার হাসপাতাল বাস প্রকৃতই হাসপাতাল বাস হইয়াছে।"

প্রকৃতপক্ষে হাসপাতালে যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন তিনিই বাক্যহীনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই রক্ত মাংস ক্ষুধা তৃষ্ণায় জগতের পরপারের এক আনন্দময় জগতের আভাস, ব্যাধি নিকেতন নিরানন্দ হাসপাতালে, সেই মৃত্যু যন্ত্রণায় পীড়িতের নিকটেই সকলে পাইয়াছেন। স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেন। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন "কবির যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া যদিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথাপি

ফিরিয়া আসিবার সময় মনে হইল, যেন কোন তীর্থস্থান হইতে ফিরিলাম। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিব না।" কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মৃত্যুঞ্জয় মহাবীরকে দেখিয়া যে ভাবে বিভাষিত হইয়াছিলেন তাঁহার পত্রে তাহা বুঝা যায় সে পত্র হইতে কয় ছত্র উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"মনে আছে, সেদিন আপনি আমার রাজা ও রাণী নাটক হইতে প্রসঙ্গ ক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—

—"এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগারে,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ দুঃখ বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়া কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি তার ততই বেশী করিয়া জ্বলিতেছে।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচি, ইন্দু প্রকাশ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অতুল কুমার মৈত্র প্রভৃতি কবিতায় তাঁহাদের যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও এই জীবনচরিতে সংগৃহীত হইয়াছে।

কবি রজনীকান্ত কি গুণে সকলকে এত মোহিত করিয়াছেন ইহা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সংক্ষেপে তাহার একটি মাত্র উত্তর এই, "মানব জীবনের একমাত্র সাধনা মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করা, রজনীকান্ত আমাদের সেই পথে পথ প্রদর্শক। প্রকৃত কবি যিনি, মিশরমরালের ন্যায় তাঁহার মর্ম্মভেদী সঙ্গীতের ছন্দেই পরিসমাপ্তি হয়। বিহারীলালের ভাষায়

"অস্তাচলে চলে রবি, কেমন প্রশান্ত ছবি!
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি!"

রোগ জরা বার্দ্ধক্য কদর্য্য নয়, কিন্তু তাহার কদর্য্যতা সেখানে, যে মনে যৌবনের আবরণে আমাদের অন্তরের যে কদর্য্যতা গোপন ছিল বার্দ্ধক্য ও জরার অক-

মতা তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। পক্বপত্র শ্রীহীন হয় একথা কে না জানেন কিন্তু কোন কোন পাহাড়িয়া গাছের পাতা পক্বাবস্থায় গাঢ় হিঙ্গুলরসে রঞ্জিত হইয়া অতি সুন্দর দেখায়। আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার সেইপত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা যেন বুড়ো বয়সে ঐ পাকা পাতার মত হতে পারি।" কান্ত কবির যন্ত্রণাময় অন্তকাল সেই পক্বপত্রের মত মনোহর। কেননা যদি তাঁহার জীবনে কোন ভুল ভ্রান্তি থাকে সে কেবল বাহিরের ছেলে খেলার ধূলামাখা মাত্র, একবার স্নান করিলেই ধুইয়া যায় অনন্তর তাঁহার চিরদিনই সমরণ সরল স্তর সমভাবে প্রেমময়। তিনি খ্যাতি ভালবাসিতেন, কিন্তু সে খ্যাতি-প্রিয়তার অহঙ্কার বা অভিমান ছিল না, ছিল কেবল ভালবাসা পাওয়ার ও দেওয়ার আনন্দ। তাই তিনি লিখিয়াছেন "স্কুলের ছেলেরা আমাকে বড় ভালবাসে। আমি মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের কবি বলে তারা আমাকে ভালবাসে।" আবার হাসপাতালের রোজ নাম্‌চাতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"আমার এত সৌভাগ্য,—আমার ব্যারাম না হলে বুঝ্‌তে পারতাম না কোন পুণ্যে এই অসুখ হয়েছিল।

"আমায় সবাই ভালবাসে এমন সৌভাগ্য ক'জন কবির হয়। কেউ আমার শত্রু নাই। স্কুলের ছেলেরা আমাকে বড় ভালবেসেছে। আমি তাদের কি দিতে পারি?"

"কোন্ দেশের বাঙ্গাল কবি, তাও এখন কাঙ্গাল হয়েছে। আমার গুণটা কি? আমি দেশের কি করেছি? দেশ আমাকে বড় ভাল বেসেছে।"

সুপ্রভাতে তাঁহার জীবনী ও ছবি দেখিয়া তিনি যে সুখী হইয়াছেন, সে টুকু লিখিতে দ্বিধা করেন নাই, আবার গলায় অস্ত্রোপচারের সময় ছোট ছেলের মত "ব্যাথা লাগেনি কিন্তু ভয় করেছিল" সরল ভাবে বলিয়াছেন।

এই সরলতা ও ভালবাসাই তাঁহার জীবনের কেন্দ্র। এই গুণেই রজনীকান্ত কান্ত কবি। তাঁহাকে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের শুধু কৃতজ্ঞতা দেন নাই, প্রেমরূপ দুর্লভ নিধি দান করিয়াছেন। তিনি শয্যাপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথের আগমনে যে ভাবে ভক্তি গদ্ গদ্ হইয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, যে ভাবে মহারাজ মনীন্দ্র নন্দী কুমার শরৎ কুমার প্রভৃতির স্তুতি করিয়াছেন তাহা স্তাবকের স্তুতি নয় তাহা ভগবৎ প্রেমিকের প্রেমানুভূতির নিবিড় আনন্দ। [illegible] সকলের সঙ্গেই তিনি সমভাবে সে আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন।

নাম্ যায়—"আমাকে সারদা মিত্র 'গুরুদাস বাবু রবিবাবু অশ্বিনী দত্ত সবাই কত আশ্বাস দিয়ে চিঠি লিখেছেন, সেই চিঠি গুলো একখানি আমার দয়ালের চরণামৃত। সেই গুলো আমি পড়ি, আর আমার কান্না পায়।"

ভাগবত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের জ্ঞানানন্দ স্বামীকে দেখে লিখ্‌ছেন—"ভগবদ্দর্শনের পূর্ব্বে সাধুরে সাক্ষাৎ হয়। আমার তাই হল। আমি কি সৌভাগ্য করেছিলাম? আমার এ সাধ অঘটন্ সৌভাগ্যে পূর্ণ হল? মহাপুরুষ! আমি কি দিয়ে অভ্যর্থনা কর্‌বো? চরণের ধূলা এককনা দিন, মাথায় করে নিয়ে যাই।"

ডাক্তার রায়কে বল্‌ছেন "ডাঃ রায় আপনি প্রার্থনা কর্‌ছেন, না ঋষি প্রার্থনা কর্‌ছেন?

* * আপনার মত কয়টা লোক করেছে? না করে না পারে? বিবাহ করেন নাই, কেবল পরার্থে আত্মোৎসর্গ।

শরৎ কুমার লাহিড়ীকে বল্‌ছেন "আপনাকে দেখ্‌লেই আমার ভগবৎ প্রেম হয়। কেন জানিনে আপনার মুখে সেই আভা পাই।"

শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্তের সম্বন্ধে রোজ নামচায় লিখ্‌ছেন "অশ্বিনী বাবু আমাকে একখানি পত্র লিখেছেন, আমি আমার স্ত্রীকে বলে রেখেছি যে যখন মরি তখন তুলসীর পাতা—যেমন গায়ে দেয় তেমনি ঐ পত্রখানা আমার শরীরে বেঁধে দিও।

* * * * *

একটা এই আক্ষেপ রয়ে গেল, একবার অশ্বিনী দত্তের মত মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হল না।

আবার তাঁহার স্নেহাস্পদ সার্থক জন্মা ডাক্তার হেমেন্দ্র বক্সির সম্বন্ধে লিখ্‌ছেন "হেমেন্দ্র সেই সুখ থেকে আছে। আমার জন্য বুক দিয়ে পড়ে আছে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার কাছে বসে আছে যেন "নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।" হেম, তোমার মত মন্দনিদ্র তো হবে? বসে আছ, না ঠায় বসে আছ, ব্যাসদেবের ন্যায়।" এই সমুদায় উক্তির মধ্যেই সূক্ষ্ম ভাবে বুঝিলে সেই এক ভালবাসা পাওয়ার ও দেওয়ার অতুল আনন্দ। এ আনন্দে পরিপূর্ণ পাত্রের মত তাঁহার জীবন শেষে সময় পর্য্যন্ত—আপনার আনন্দে আপনি ভরপূর ছিল। তাঁহার এই "বসুধৈব কুটুম্বকে' ছোট বড় ভেদ ছিল না, যাহাকে কাছে পাইয়াছেন তাহাতেই তিনি আনন্দিত, যাহাকে কাছে পান নাই, যাত্রা কালে—নিজে ডাকিয়া তাহাকে না সম্ভাষণ করিয়া গিয়াছেন। গরবর

অসহিষ্ণুতা দূরের কথা, পরবশ কীর্ত্তনেই তাঁহার পরমানন্দ ছিল। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট "আপনার আদর্শে-অমৃত লিখেছি, লিখে ধন্য হয়েছি" এ কথা স্বীকারে তাঁহার কতই না আগ্রহ।

রজনীকান্তের জীবনের মূলসূত্র অনুসরণ করিলে এ টুকুও বেশ বোঝা যায় ভাঙ্গাবাড়ীর সেন পরিবারের পারিবারিক জীবনের প্রীতিবন্ধনই তাঁহার প্রীতি-পূর্ণ জীবনের মূল। যখন মৃত্যুর সম্মুখে তিনি বীরের মত নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান

"আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করছি,
"কতবার মরে মরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।"

* * * 'বিধাতার প্রয়োজন হয়েছে পার্থিব প্রয়োজনে আর আমাকে বেঁধে রাখবে কে,' ইহাই যখন তাঁহার মনের ভাব, তখনও তিনি যাত্রাপথে "আনন্দের হাট ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছি" বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। সেই মৃত্যুশয্যাতেও ভগ্নীর বৈধব্যে "আমার পিঠের ছোট বোনটী, আমি বসে বসে দেখি মাছ হলে ও এতগুলি ভাত খায়" বলিয়া যে ভাবে বিলাপ করিয়াছেন তাহাতে তিনি কিরূপ স্নেহময় ভ্রাতা তাহা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রীতিই পরিবার, দেশ ও ক্রমে সমস্ত জগতে ব্যক্তিলাভ—করিয়াছে। তাই তাঁহার হাস্যরসাত্মক কবিতার বিদ্রূপে কেবল সংশোধন চেষ্টা মাত্র আছে, বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ও নাই।

কান্তকবির কবিতা সম্বন্ধে—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা অসম্ভব। তাঁহার ভগবৎ-বিষয়িনী কবিত স্বদেশ প্রেমের কবিতা ও হাস্যরসের কবিতা সম্বন্ধে জীবনী লেখক পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যায় স্বরূপভাবে আলোচনা করিয়াছেন, যে রজনী কান্তের কোন কবিতা পাঠ না করিলেও জীবনীমাত্র পাঠক তাঁহার কাব্যরসের বিশেষ পরিচয় পাইবেন' এবং সুকণ্ঠ কবির কণ্ঠের সঙ্গীতের ভুবন মোহিনী উন্মাদনা পর্য্যন্ত যেন পাঠকের চিত্তে মোহ সঞ্চার করিবে। বস্তুত পক্ষে, যেরূপ ভাবুক ভার সঙ্গে এই জীবন চরিত চিত্রিত হইয়াছে,—তাহাতে ইহাকে বঙ্গ চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি হৃদয়মুগ্ধকারী চিত্র বলিয়াই ভ্রম হয়।

আজিকার দিনে আশাঙ্কিকা বোধে দেশ যখন জাগরণোন্মুখ—এইদিনে কান্তকবির এই অপূর্ব্ব জীবনী উপহার দিয়া নলিনী রঞ্জন সমগ্রবঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থ রচনার জন্য যেরূপ শ্রম ও অর্থক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন, তাহার পক্ষে চারি টাকা কিছু অধিক নহে। আমাদের

কান্তকবির জীবনী—যদি বাংলার প্রতি গৃহে অন্ততঃ একখানিও না থাকে তবে নিতান্ত দুঃখের বিষয় তাহাতে ভুল নাই।

প্রবন্ধ শেষে একটি কথা বলিবার আছে। হাস্যরসের কবিতার বিচারে গ্রন্থকার ঈশ্বর গুপ্ত হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির কবিতার হিত যে ভাবে তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন তাহার প্রভাবে সমালোচনা কোন সার্থকতা আছে। মনে হয় না। শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের তুলনায় সমালোচনে একজনকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন কবিতে যাওয়া ব্যাপারটীই ভ্রমাত্মক পন্থা। বিশেষতঃ হাস্যরসের-কবিতার এরূপ তুলনা চলিতেই পারে না। কেন না হাস্যরসের কবিতা মাত্রই সাময়িক সমাজ, সাময়িক ঘটনা, সাময়িক শ্রেণী বিশেষ অথবা ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ চিত্র। এ ব্যঙ্গ যদিও অনেক সময় বেদনা হৃদয়ের উত্তাপে কিছু প্রখর ভাব ও ধারণ করে কিন্তু তাহাকে বিদ্বেষ বলা যায় না দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি। আজকাল স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে সকল ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয় সেগুলি বিদ্বেষ প্রসূত, অথবা আঘাতবেদনার প্রকটমূর্ত্তি ব্যক্তিমাত্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন।
অতএব ঈশ্বর গুপ্ত যদি বা ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে লিখিয়া থাকেন।

"ধর্ম্মতলা ধর্ম্মহীন—গোহত্যার ধাম
ক্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া সেরূপ তব নাম।"

ইহাতে বিদ্বেষ অপেক্ষা চরিত্র অঙ্কণ নৈপুন্যই পরিস্ফুট। ইহা ভিন্ন সাময়িক কবিতার সম সময় গ্রহণ করা অসম্ভব, হেমবাবুর 'বাজে সব কবিতায় দেশবাসী এমনই আমোদিত হইয়াছিল যে অনেকের এখনও সম্পূর্ণ কবিতাটী মুখস্থ আছে, এ কবিতার মধুর ব্যঙ্গে হেমবাবু কাহাকেও অব্যাহতি দেন নাই, এমন কি নিজেকেও নয়। কিন্তু এখন তাহার রস গ্রহণ সেরূপভাবে করিতে পারা অসম্ভব। তাদৃশ কেরাণী ডিপুটী ডাক্তার ও উকীল কুলের ভাব পরিবর্ত্তনে রজনীকান্তের ব্যঙ্গ কবিতাগুলি পরবর্ত্তী কালের জনসাধারণের নিকট এরূপ ভাবে কখনই আদৃত হইতে পারিবে না। কেন না হাস্যরসের কবিতায় পরমায়ু দীর্ঘ নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের কবিতার কোন কোন স্থানে প্রতিভার খামখেয়ালী ছেলে মানুষী ভাব আছে, বটে, কিন্তু তথাপিও সেগুলি মিষ্টত্বহীন নহে। অনুকৃতি কবিতা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সঙ্গে—আমরা অনেক স্থলেই একমত, যদিও সর্ব্বত্র নহে।

পর পবিত্র-স্মৃতি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন-করি। রবীন্দ্রনাথের কথায় আমাদের তীর্থ স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। 'প্রবন্ধ শেষে অক্ষয় কুমারের কণ্ঠ মিলাইয়া আর একবার সেই জয়োচ্চারণ করি,

"চির যাত্রি। মহাতীর্থ সম্মুখে তোমার
অনিন্দ্য আনন্দধাম, জরামৃত্যুহীন

শ্রীসরলাবালা দাসী।

প্রিন্স ক্রোপটকীন।

প্রিন্স পিটার ক্রোপটকীনের জীবন উপন্যাসের গল্পের মত অদ্ভুত। পূর্ব্বকালে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি বোধ হয় "দেবতা" আখ্যা পাইতেন আর তাহার কীর্ত্তি গাহিয়া কবিগণ ও অমর হইতেন। এমন উদার ও সরল প্রকৃতির লোক এ যুগে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত রুরিক (Rurik) বংশে মস্কোনগরে তাঁহার জন্ম হয়। তখন রুষদেশ ঘোর দুর্দ্দিন অমনিশা-উদ্ভাসক ফুটিবার পূর্ব্বাবস্থা। প্রথম নিকোলাস তখন রুসিয়ার দুর্দ্দান্ত সম্রাট। একদিকে ক্রোপটকীন যেমন বালক ভৃত্যরূপে (Page Boy) সম্রাটের সংস্পর্শে আসিলেন অন্যদিকে সমস্ত দেশব্যাপী দুর্দ্দিন, দুঃখ, দারিদ্র্য ও শোচনীয় দাসত্ব তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিত করিল। এইরূপ ঘোর ব্যবধানের মধ্যে তাঁহার বাল্য জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল।

একদিন তাঁহার পিতা গৃহের ক্রীতদাসগণের উপর অত্যাচার করিয়া গিয়া হতভাগ্য বাবুর্চ্চি ম্যাকারেকে একখানি চিঠি দিয়া একশত ঘা" বার্চের (Birch Rod) চাবুক খাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী পুলিশের আলয় পাঠাইয়া দিলেন, বালক ক্রোপটকীন কাঁদিয়া আকুল, প্রাসাদের এক অন্ধকার গলিপথে তিনি ম্যাকারের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। মলিন মুখখানি লইয়া ম্যাকার ফিরিয়া আসিলে বালক তাহার হস্তচুম্বন করিতে গেল। হাত ছাড়াইয়া লইয়া ম্যাকার বলিয়া উঠিল—

"না আর দরকার নাই। বড় হইলে তুমিও আর এমনটা থাকিবে না।" মর্ম্মবেদনায় বালক কাঁদিয়া বলিল—"না ম্যাকার আমি কখনও হইব না।"

পট পরিবর্ত্তিত হইল। ক্রীতদাস প্রথা দূর হইল বটে, কিন্তু সে এবার অত্যাচারী পুলিসের হাতে পড়িল। সহস্র সহস্র নির্দ্দোষ লোকের ফাঁসী হইয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোকে জেলে অথবা সাইবেরিয়ায় জীবন্ত সমাধিক্ষেত্রে কারা যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। সমস্ত রুসিয়াব্যাপী বিরাট ভীতি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু রুসিয়ার প্রাণ তখন ভিতর হইতে জাগিয়াছে। ভিতীয় আলেকজান্দার পুলিসের হাতে রাজ্য সঁপিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন কিন্তু স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের সাহিত্য যে জাতীয় প্রাণস্পন্দিত করিতে ছিল তাহাকে বাঁধা দেয় কাহার সাধ্য? এই ঘোর জাতীয় বিদ্রোহের ও গুপ্ত স্পন্দনের নায়ক অদ্ভুত-কর্ম্মী মেষচর্ম্মপরিহিত বোরোদীন (Borodin) পুলিস ঘোরোদিন [illegible] সহকর্ম্মী চোকোওয়াস্কী (Tschayowsky) এবং ষ্টেপনেক্‌কে [illegible] দূর করিতে পারিলে বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হইতে পারিত। কি [illegible] লীনকে ধরিবার যো ছিল না—সে ছায়ার মত বিভ্রম [illegible]। [illegible] তন্তুবায় ও কারিকরকে গ্রেপ্তার করা হইল, শত শত জেলে গেল এবং অনেকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিল কিন্তু কেহই দুরন্ত পুলিসকে তাহাদের নায়ক বোরোদীনের সন্ধান বলিয়া দিল না।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এক বাসন্তী সন্ধ্যায় সমগ্র সেণ্টপিটার্সবর্গের বৈজ্ঞানিকগণ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটীর গৃহে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পিসক্রোপট্‌কীনের ফিন্‌-ল্যাণ্ড-সম্বন্ধীয় নূতন ভূতত্ত্ব শুনিবার জন্য সমবেত হইলেন। তিনি পণ্ডিত ভূতত্ত্ববিদ্ গণিত কলাবিদ্ ও লেখক। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও দার্শনিক, ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাঁহার দখল ছিল, সাতটা ভাষায় অনায়াসে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন,—ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি রুসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্‌গণের একজন হইলেন। রাজনিয়মে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। তিনি সাইবেরিয়া আপনার কর্ম্মভূমিরূপে চালিয়া লইয়াছিলেন। পাঁচবৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া স্বীয় শাস্ত্রীয় সংশোধন প্রণালীর জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন—অদ্ভুত গবেষণাদ্বারা সমগ্রএসীয়ার ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন। সেদিন সান্ধ্যসভায় রুসিয়ার প্রধান ভূতত্ত্ববিদ্ বারোবোং-বো-সামনে মুক্তকণ্ঠে পিসক্রোপটকীনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন। অতঃপর তিনি ভূতত্ত্ব [illegible] নির্ব্বাচিত হইলেন।

পিসক্রোপট্‌কীন যখন বীর গাড়ী চড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছেন তখন আর একখানি গাড়ী হইতে একজন তন্তুবায় তাঁহার গাড়ীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইল—"মিষ্টার বোরোদীন" পশ্চাতের গাড়ী হইতে একজন পুলিসের গোয়েন্দা লাফাইয়া উঠিল "মিষ্টার বোরোদীন প্রিন্সক্রোপট্‌কীন আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম" গোয়েন্দার ইঙ্গিতে চতুর্দ্দিক হইতে পুলিশ ঘাসিয়া পড়িল, যার গা ঢাকা দেওয়ার আশা বিড়ম্বনামাত্র। পুলিস ক্রোপট্‌কীনকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল সঙ্গে তাহার সেই তন্তুবায় শিষ্য।

পিটার ও পলের দুর্গের নিভৃত কারাকক্ষে তাঁহার দুই বৎসর কাটিয়া-গিয়াছে। এই দুর্গে রুষিয়ার কত উদার হৃদয় মহাপ্রাণ স্বদেশসেবক ও কবিগণের জীবন্ত সমাধি হইয়াছে। তিল তিল করিয়া তাঁহারা মরিয়াছে। এই সকল নিভৃত কারাগর্ভে (cell) তাঁহাদের কতজন উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। দুই একজন ভীত হইয়াছে কিন্তু এখনও ক্রোপট্‌কীনের বিচার হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার কোন মানুষের সহিত আলাপ হয় নাই। বহুকাল ধরিয়া মৃত্যুবিহীন কারাকক্ষে বাস করিবার পর পার্শ্ববর্ত্তী বন্দীগণের সহিত আলাপের জন্য অল্প কয়েকটী শব্দের সঙ্কেত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার সাহায্যেই কিছু কিছু আলাপ চলিত। তাঁহার কক্ষের এক কোন হইতে অপর কোন পর্য্যন্ত এক হাজারবার হাঁটিলে পাঁচ মাইল হইত এইরূপ হাঁটিয়া তিনি স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ব্যবহারের দ্রব্যের সাহায্যে ব্যায়াম করিতেন, তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা আলেকজান্দারের চেষ্টায় তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পুস্তক লিখিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি এতদিনে পাগল হইয়া যান নাই। তাঁহাকে গান গাহিতে দেওয়া হইত না বলিয়া তিনি নিজের কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

আর দুই বৎসর পরে তিনি পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে সামরিক হাঁসপাতালে নেওয়া হইয়াছে। এখানে তিনি স্বাধীনতা কারাপ্রহরীর সহিত বেড়াইতে পাইতেন। একদিন অদ্ভুত উপায়ে নিজ কৌশলে তিনি মুক্তি পাইলেন। কাষ্ঠবাহকগণের প্রবেশের জন্য দুর্গদ্বার মুক্ত রহিয়াছে, পিসক্রোপট্‌কীন নিকটেই বেড়াইতেছেন দুর্গের বাহিরে দূরে কেহ বেহালা বাজাইতেছিল, সবাই তাহা শুনিতেছে, দ্বারের প্রহরী অন্যমনস্ক-ভাবে একব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল, ক্রোপট্‌কীন ঘুরাইয়া সঙ্কেত জানাইলেন। বেহালায় যেন বাজিয়া উঠিল "দৌড়" দৌড়" আর সেই

সঙ্গে সঙ্গেই "দৌড়" ক্রোপট্‌কীন দুর্গের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার জন্য গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল; তাহাতে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। সমস্ত সেণ্টপিটার্সবর্গে যখন খানাতল্লাসীর ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন ক্রোপট্‌কীন নির্ভয়ে এক মনোরম ভোজন গৃহে বসিয়া আহার করিতেছিলেন। একখানা কৃত্রিম ছাড়পত্র (pass port) লইয়া তিনি ফিনল্যাণ্ড অতিক্রম করিয়া সুইডেনে ও তৎপরে ইংলণ্ডে আসিয়া পড়িলেন।

প্রিন্স ক্রোপটকীনের সমস্ত জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা তাঁহার মধ্যে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করি ১। জ্ঞানের জন্য ও ২। মানবের স্বাধীনতা। এই জ্ঞানাকাঙ্খা ও স্বাধীনতার ইচ্ছা তাঁহার প্রাণের সার্ব্বজনীন মানব প্রীতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি যতটা সমাজতন্ত্রী (Socialist) তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে বিপ্লবপন্থী [Revolutionist) ছিলেন *

শ্রীঅমাথবন্ধু দত্ত।

---

* Fields of Society হইতে ভাষান্তরিত। অনুবাদক।

আমির খসরু।

ইয়া মিনুদ্দিন আবুল হাসান আমি খসরু একজন বিখ্যাত গায়ক ও ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি। তাঁহার পিতা আমির সইফুদ্দীন মাহমুদ শামসী বাল্‌খের হাজারা নায়ক' স্থান হইতে ভারতে আসিয়া পাতিয়ালা রাজ্যে বাস করেন। কবিবর খসরুর ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালাতেই জন্ম হয়। সপ্ত বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তদীয় পিতা সইফুদ্দীন এলাহাবাদের নিকটে যুদ্ধে নিহত হন। সেই কারণে কবি বাল্যে তদীয় মাতামহ কর্ত্তৃক প্রতি পালিত হন। কবিবর খসরু বিখ্যাত সাধু পুরুষ নেজামদ্দিন আওলিয়ার (রহঃ) প্রিয় শিষ্য ছিলেন, কবি তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। আমির খসরু পারস্যভাষা ভিন্ন হিন্দীতেও কবিতা লিখিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীর অনেক বাদ্‌শাহের অধীনে সভা কবি ছিলেন এবং ৯৯ খানি ফার্সী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। খসরু পাঠান আমলের একজন বিখ্যাত ফার্সী কবি ছিলেন। কবির দেওয়ান' কাব্য সকলে অতি আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। এমন কি সুফীগণ উহা গান করিয়া থাকেন। নেজামদ্দিন আওলিয়ার (রহঃ) দেহত্যাগের ছয় মাস পরে কবির মৃত্যু হয়। গুরুর দেহত্যাগে কবি অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার কবরের নিকটেই পুরাতন দিল্লীতে কবিকে সমাহিত করা হয় ১৩২৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কবি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কবির 'দেওয়ানের' কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

আফ্‌সোস্ আজি হেয়াতকে বর্‌বাদ্ মি রওদ্,
কাই মা নাহ্ বর্ রওশে দাদ্ মিরওদ।
হর্‌দম্ জে মনকে পেয়্‌র বিয়ে দেও মি কুনদ্,
বর্ আস্‌মানে ফেরস্তয়ে ফরিয়াদ্ মি রওদ্॥
বহ্ কিন্ দেলে খরাবে এমারত 'কোথা শওদ্
সইলে মনস্ত চুনিন কে বেহ্ বুনিয়াদ্ মি রওদ্।

অর্থঃ—হায়! এ জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছে (জীবন) পদ্ধতি সুবিচারের পথে যাইতেছে না।

প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সয়তান আমার পশ্চাদ্দাহ সরল করিতেছে; অভিযোগের স্বর্গীয় দূত আকাশে উঠিতেছেন।

আচ্ছা কি প্রকারে এই অপূর্ব্ব অন্তঃকরণ ফলশালী হইবে,
যখন আমার দুষ্টতার বন্যা এরূপ যে উহা তাহার ভিত্তিতে পৌঁছায়।

'ইরাক্'

বিগত মহাযুদ্ধের কল্যাণে 'মেসোপোটেমিয়া' আর বাঙ্গালী পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। দুইটি গ্রীকশব্দের অপভ্রংশ লইয়া মেসোপোটেমিয়া নামের উৎপত্তি—শব্দ দুইটীর মোটামুটি অর্থ দুই নদীর দেশ। উক্ত প্রদেশের ভৌগোলিক সংস্থান যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, উক্ত প্রদেশের নদীদ্বয় টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস, সেই দেশবাসীদের ভাষায় দজ্‌লা ও ফরাত্। নদীদ্বয় মেসোপোটেমিয়ার উত্তর পশ্চিম প্রান্ত দিয়া দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রায় সমান্তরাল ভাবে চলিতে চলিতে সিন্ধবাদের বসোরা নগরীর প্রায় ৪০ ক্রোশ উত্তরে মিলিত দেহে শাত্-এল-আরব বা আরব দেশের নদী নাম ধারণ করিয়া বসোরার আরও ৪০ ক্রোশ দক্ষিণে সাগরসঙ্গম প্রাপ্ত হইয়াছে।

শাত-এল-আরবকে বাঙ্গালীরা শীতল-আরব বলিতে ভালবাসিত। বস্তুতঃ শীতল-আরব নামের সার্থকতা আছে। মরুভূমির দেশ আরবের যে অংশ মেসোপোটেমিয়া নামে খ্যাত, সেই অংশকে শীতল-আরবই শীতল তথা সরস, এবং অনেকটা সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা করিয়া রাখিয়াছে।

দেশবাসীদের দেওয়া ও তাদের দেশের একটা নাম ছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষকে যেমন এখন আর বহির্জগতে 'ইণ্ডিয়া' না বলিলে চিনিতেই চাহে না, মেসোপোটেমিয়ারও সেইরূপ দেশবাসীদের দেওয়া নামটাও এক রকম বাতিল হইয়াই গিয়াছিল। তুরস্কের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদের প্রমাণ স্বরূপ তাহারা তাহাদের দেশের নিজেদের দেওয়া নামই আবার জগতে প্রচার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। সেই নামটি হইতেছে 'ইরাক্ ('Iraq.)

মেসোপোটেমিয়ার, নবচন্দ্রনেজ্জরের ব্যাবিলনের, সভ্যতা অতি প্রাচীন এমন কি অনেকানেক ঐতিহাসিকের মতে ভারতীয় সভ্যতা হইতেও প্রাচীন। এ বিষয়ে তর্ক করিবার প্রবৃত্তিও আমার নাই, আর তাহার স্থানও এ নহে; মোটের উপর একথা স্বীকার করিতেই হইবে, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা হইতে প্রাচীনতর না হউক, সমসাময়িক বটেই। জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা ব্যাবিলনের পুরাকীর্ত্তিসমূহের খননকালে যে সমস্ত শিলালিপি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা

হইতে জানা যায় যে, ভারতে ও ব্যাবিলনে পরস্পর বাণিজ্যের সম্বন্ধ গাঢ় ছিল। এমনও শুনা যায় মেসোপোটেমিয়ার নেনিভা ও ভারতের নালন্দা এবং তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান চলিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ভারতের নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতির যে দশা, কালের কঠোর হস্তস্পর্শে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের একতম ব্যাবিলনেরও সেই দশা। কেবল কতকগুলি পর্ব্বতাকার স্তূপ অতীতের সেই বিরাট জাতীয়তার বিশ্বের বিস্ময়কর কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ বর্ত্তমান আছে।

জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা ব্যাবিলনের ইতিহাসের উদ্ধার কল্পে বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং কার্য্যও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু সহসা যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠায় জর্ম্মণদের উক্ত প্রদেশ হইতে চলিয়া যাইতে হয়। ফলে কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। যে পর্য্যন্ত কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন যাপনের অনেক পরিচয় পাওয়া যায় এবং তখনকার গৃহনির্ম্মাণ প্রণালী ও গৃহস্থালীর আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহেরও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। শুনা যাইতেছে ঐতিহাসিক ও অন্য প্রকারে মূল্যবান প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহের অধিকাংশই জর্ম্মণরা উক্তপ্রদেশ পরিত্যাগের সময় সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও অপ্রবেশ্য অতীতেতিহাসের যে পত্রাঙ্ক তাঁহারা উন্মুক্ত করিয়াছে তাহার মূল্য কম নহে। ব্যাবিলনের খনিত ভূভাগের সন্নিকটে এবং যাদুঘরে তথাকার প্রাপ্ত কতগুলি জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। শূন্যোদ্যান নামেই মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শূন্যোদ্যান ব্যাবিলনের প্রসিদ্ধ ভূস্বামী নবচননেজ্জরের আমলে পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত হয়?

ব্যাবিলনের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই নবচননেজ্জরের নাম জানেন। তাঁহার অসংখ্য মহিষী বৃন্দের একজন আজম বা কাম্বোজ * পরম রূপবতী রাজকন্যা বৈচিত্রময়ী প্রকৃতির লীলাস্থল, হ্রদ-নদী-উপল-পর্ব্বতাদি পরিপূর্ণ কুসুমাকর ভূরুতা ফলফুল সুশোভিত স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া একরূপ বৈচিত্রহীন ব্যাবিলনের প্রান্তরে আসিয়া বড়ই ম্রিয়মাণা হইয়া পড়েন। নবু চননেজ্জর রাজকন্যাকে অশেষ প্রকারে প্রফুল্ল করিতে সচেষ্ট হইয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। পরিশেষে অনুসন্ধান করিয়া রাজকন্যার মনের ভাব জানিতে

* বর্ত্তমান পারস্য।

পারেন এবং বৈচিত্রহীন ব্যাবিলনে এক অপূর্ব্ব উদ্যান রচনায় মনোভিনিবেশ করেন।

ভারতের তাজমহল যেমন প্রেমের কল্পলোক এবং স্বপ্নের সুষমার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যাবিলনের-শূন্যোদ্যানও তেমনি প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা নবচননেজ্জর ব্যাবিলন হইতে বহু দূর দেশস্থ পর্ব্বতসমূহ হইতে প্রস্তর আনাইয়া এক কৃত্রিম পাহাড়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তাহার উপর মনোলোভা ফল-ফুল বৃক্ষাদি রোপন করিয়া স্বীয় মহিষীর আনন্দবিধান করিয়াছিলেন। সে বাগান আজ আর নাই, প্রদর্শকগণ কেবল একটী মহোচ্চ টিলাকে দেখাইয়া প্রাচীন শূন্যোদ্যানকে মনে করাইয়া দেয় আর তোতা পাখীর মত উহার ইতিহাস আবৃত্তি করিয়া যায়। তাহাদের বর্ণনার সঙ্গে অনেক স্থলে জর্ম্মণ ও ইংরেজে গবেষণাকারীদের বর্ণনায় সময় সময় সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। তিন প্রকার বর্ণনার মধ্যে আমার কাছে যাহা ভাল লাগিয়াছে এই প্রবন্ধের মধ্যে তাহাই আমি উল্লেখ করিয়াছি।

ব্যাবিলনের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে এক প্রকার অদ্ভুত অর্দ্ধমূর্ত্তি সমাঙ্কিত প্রাচীর ও অগ্নি-উপাসক আরবদের অগ্নিদেবের পূজার স্থান বিশেষ দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে আরবগণ মূর্ত্তিপূজক ছিল। তদ্ভিন্ন তাহাদের মৃত দেহ সৎকারের পদ্ধতি ছিল, ভারতীয় পার্শী জাতির মৃত দেহের সৎকারের অনুরূপ। এক উচ্চমঞ্চোপরি মৃত ব্যক্তির শব রক্ষা করা হইত এবং শকুনি প্রভৃতি মাংসভুক পক্ষীরা মাংস ভক্ষণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে অবশিষ্ট কঙ্কালাদি তন্নিম্নস্থ এক গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইত। শব সৎকারের এই অপরূপ প্রথা এখন আর বর্ত্তমান নাই অগ্নি উপাসকও আর এখন সেদেশে বড় দৃষ্ট হয় না। তাহা না থাকিলেও জাতি এবং জাতীয় প্রথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এক উচ্চ স্তূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রদর্শকগণের আবৃত্তি অনুসারে প্রতীয়মান হয় নবচননেজ্জর অশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়া স্রষ্টাকে পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রাবণের মত স্বর্গের সিঁড়ির পরিকল্পনা করিয়া এই সুউচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নবুচন্নেজ্জর নিজে অগ্নি উপাসকছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, সুতরাং শেষোক্ত বর্ণনাকে কল্পিত বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।

সেখানে নারীমূর্ত্তির উপরে এক বিরাট সিংহমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। তাহার গায়ে উৎকীর্ণ লিপি অনেকাংশ প্রাচীন পালি বা সংস্কৃত লিপির অনুরূপ।

পূর্ব্বে বোধ হয় সে দেশবাসীর ভাষার সঙ্গে আমাদের দেশের ভাষার তথা লিপির বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল; পরে নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে বর্ত্তমানে সে দেশের ও আমাদের দেশের ভাষার মধ্যে এত পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের পরস্পরের নৈকট্য অনুমান করাও দুরূহ।

প্রবাদ যে পূর্ব্বোক্ত কারের রাজ কন্যার চরিত্রে সন্দেহ হওয়ায় মহারাজ নবু চননেজ্জর মহিষীকে সিংহের পদতলে নিক্ষেপ করেন এবং প্রস্তরে তাহাদের মূর্ত্তি খোদাইয়া ব্যাবিলনের প্রবেশ দ্বারে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত করিয়া নাগরিক দিগের ভয় বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। শুনা যায় পরে মহারাজ নবচননেজ্জরের সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছিল এবং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি বড়ই অশান্তিতে কাটাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ব্যাবিলনের নিকটে কোন পর্ব্বতাদি বর্ত্তমান নাই। এমতাবস্থায় সিংহ মূর্ত্তির প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় বৃহদায়তন প্রস্তর কি প্রকারে আনীত বা বাহিত হইয়াছিল তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। নবুচননেজ্জর খৃষ্টের প্রায় সমসাময়িক সুতরাং এই সমস্ত প্রস্তরশতসমূহ বাহিত হইয়াছিল প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক কল কব্জার উদ্ভবের বহু আগে।

সিংহ নারী মূর্ত্তি এক খণ্ড প্রস্তরে খোদিত; দৈর্ঘ্য প্রায় চব্বিশ ফুট, প্রস্থ ষোল ফুট এবং উচ্চতা আঠার ফুট।

সিংহ মূর্ত্তি মস্তক হীন। প্রবাদ যে কতকগুলি দুষ্ট লোকের ধারণা হইয়াছিল যে উক্ত মূর্ত্তির অভ্যন্তরে বহু গুপ্ত ধন নিহিত আছে এবং সেই ধন লাভের আশায়ই তাহারা এই মহা আয়াস সাধ্য কার্য্য করিয়াছিল। বলা বাহুল্য তাহাদের আশা ফলবতী হয় নাই।

জর্ম্মণ পণ্ডিতেরাও বহু আয়াসে মূর্ত্তির সামান্য অংশ পরীক্ষার জন্য খোদিত করিয়াছিলেন। তাহাদের পরীক্ষার ফল কি হইল অনেক চেষ্টায়ও তাহা জানিতে পারি নাই। নিজে জর্ম্মাণ ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া মূলের সন্ধান করিতে পারি নাই এবং তজ্জন্য বাদুঘর ও হিস্টা পলিটিকাল আফিসের যাবতীয় ব্যাবিলন সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াও এ সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই। ব্যাবিলনে খণিত প্রাচীন ইষ্টক গৃহাদি দৃষ্টে ব্যাবিলনবাসী যে মোটেই অসভ্য ছিল না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার যব দেখিলে মনে হয় যেন এই সেদিন তৈয়ার হইয়াছে, একস্থানেও রংএর একটু বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, একস্থানেও একটু খসিয়া খসিয়া পড়ে নাই। কিন্তু

কোন গৃহেরই ছাদ বর্ত্তমান নাই। ব্যাবিলন বোধ হয় কোন অনৈসর্গিক কারণে সহসা ভূতলে পতিত হইয়াছিল। সেই জন্য প্রাচীর গুলির কোনই ক্ষতি হয় নাই পরন্তু সমস্ত ছাদ এককালে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

যে প্রাচীরে পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত অশ্বমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সেই বাটী প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তৎকালে ঐরূপ অশ্ব সমূহ পরিদৃষ্ট হইত। কালপ্রভাবে সেই অশ্বজাতি অধুনা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। বাইবেলে কথিত হয় ব্যাবিলনের পতনের হেতু ভগবানের অভিশাপ। এ কথা আমিও মানি এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী যাঁহারা তাঁহারা সকলেই মানিবেন। ভারতের দিকে চাহিয়া দেখ, রোমের দিকে চাহিয়া দেখ, মিশরের দিকে চাহিয়া দেখ। জাতি যখন বড়ই উচ্চে উঠিয়া যায়, সৃষ্ট যখন স্রষ্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, দর্পহারী ভগবান তখনই তাহার দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে উচিত শিক্ষা দিয়া থাকেন। পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া নিজের যাহারা তাহাদিগকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিলে পতন অনিবার্য্য। ভগবানের 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ' নিয়মে উপরে যে আছে সে নীচে নামিয়া আসিতেছে আর নীচের যাহারা তাহার উপরে যাইতেছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না, হইতে পারে না। যে যতই বড়াই করুক দিন তাহার আসিবেই। নীচের যে যতই দুর্ব্বল হউক না কেন ভগবানে বিশ্বাস থাকিলে দিন তাহারও আসিবেই—উপরে সে উঠিবেই। কোন শক্তি, দৈব, পাশব বা মানুষ যাহাই হউক না কেন, কিছুতেই তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।

লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতে ভগবানের এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে কিন্তু দৈবী মায়া এমনই প্রবল যে মানুষ দেখিয়াও দেখে না। নবুচনেজ্জরও দেখে নাই। সে বড় হইয়া তাহার স্রষ্টাকে ছাড়াইয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। সে পড়িয়াছে। তাহার জাতিরও পতন হইয়াছে। তাহার সে বিস্তীর্ণ রাজ্যও আর নাই। আছে কেবল অতীত কীর্ত্তি কাহিনীর বক্তব্য একটা বিরাট বিশাল ধ্বংসস্তূপ কালের সাক্ষী স্বরূপ ধরণীর কোলে দাঁড়াইয়া।

আজ যাহারা পর্ব্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে কালের প্রভাবে কাল এমনই দিন আসিবে যে, তাহাদেরও অতীত কাহিনীর সাক্ষ্য দিবার জন্য এক বিরাট ধ্বংস স্তূপ মাত্র অবশিষ্ট রহিবে।

এত দেখিয়াও কি মানুষ শিখিবে না, সাবধান হইবে না ?

ব্যাবিলন বসোরা বাগদাদ রেলপথের হিল্লা নামক ষ্টেশন হইতে মাইল

ভিনেক উত্তরে প্রায় কুড়ি বর্গ মাইল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিল। জর্ম্মণরা উক্ত ভূখণ্ডের যে অংশের অন্যান্য কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়াছে তাহা করিতে তাহাদের বহু কোটী মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-বিজ্ঞানাগার ব্যতীত খনিত ভূভাগের মৃত্তিকা বহন করিবার জন্য তাহাদিগকে ক্ষুদ্র রেলপথ পর্য্যন্ত পাতিতে হইয়াছিল। খনিত ভূভাগে যে সমস্ত ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া গিয়াছিল তাহার সমুদয়ের পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। সেই সমস্ত উপকরণের মধ্যে প্রাচীন লিপি ও অদ্ভুত ত্রিপদি অঙ্কিত ইষ্টকও প্রস্তর খণ্ড সমূহই প্রধান। বহু প্রকার জীব যাহা পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন পূর্ব্বে পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল এবং এখন আর তাহাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না তাহাদের ছবিই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রহ্মদাস গোসামী।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ।

নব্যতন্ত্রের কবিকুলের মধ্যে কবিতার সাধনায় যিনি একটী নিজস্ব বিশেষ পথ কাটিয়া লইয়াছিলেন—অনন্য সাধারণ মনীষা ও বিচারশক্তি, ঐকান্তিক অধ্যয়নস্পৃহা, অপর্য্যাপ্ত বৈচিত্র্য এবং বিবিধ-বিষয়-স্পর্শী প্রাণস্পন্দন লইয়া মাসিক সাহিত্যের একদিক যিনি পরম উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন,—তাঁহাকে অসময়ে ও অতর্কিতে হারাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারি নাই। তথাপি তৈল ফুরাইবার পূর্ব্বেই প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া মানববন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ আষাঢ় প্রকৃতিতে মিলাইয়া গিয়াছেন, যে হেতু তাঁহার কামনা—

"ঘরে আজ নয় রে থাকা,
নয় রে থাকা, নয় রে কভু;
পোড়ে তো পুড়বে পাখা,
উড়বে চাতক, উড়বে তবু।"

মানব-পরিত্যাগ আকস্মিক হইলেও তাঁহার শক্তি বঙ্গসাহিত্যে যে,

বিশিষ্টতার রেখাপাত করিয়াছে, আমাদের আশা আছে, নূতন নূতন গুণীর গুণপনায় অদূর ভবিষ্যতে তাহা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

বিচিত্র ছন্দের উদ্ভাবনায় ও সহজ নৈপুণ্যে তাহাদিগকে গতিমান কার্য্যে সত্যেন্দ্রনাথের বহুমুখী শক্তির যে দিকটা অত্যুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার সমবয়সীদের কথা দূরে থাক, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ছন্দ শক্তির ততদূর বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন নাই। এইজন্য নিজেদের মধ্যে আমরা সত্যেন্দ্রনাথকে "ছন্দের যুবরাজ" আখ্যা দিয়াছিলাম। এই ছন্দের দিকে অত্যধিক প্রবণতার জন্য একদিকে তাঁহার কবিতা যেমন অপূর্ব্ব-শ্রী ও অপরূপ ঝঙ্কার লাভ করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি অনেক কবিতাই কাণে বাজিয়া মাত্র দায়িত্ব শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছে—প্রাণে গিয়া বাজিতে পারে নাই। এরূপ হইবার অন্য কারণও আছে; অপরিচিত, অভিধান-দুর্ল্লভ প্রাদেশিক ও বৈদেশিক শব্দের প্রচুর প্রয়োগ তাঁহার কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি; এইজন্যও তাঁহার বাণী অনেক স্থলেই পাঠকের মনশ্চক্ষে আকার ধরিতে পারে নাই। শব্দ-সম্পদ থাকা যে দোষের, এমন কথা অবশ্যই বলি না—কিন্তু যে-সকল শব্দ সুপরিচিত নয় তাহাদিগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ পংক্তির মধ্যেই কৌশলে অর্থ আরোপ করিয়া অল্পে অল্পে পাঠকের অনায়াস-পরিচয়ের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে জাগাইয়া তোলাই শব্দ-শিল্পের দিক হইতে আবশ্যক। সত্যেন্দ্রনাথের এদিকে বিশেষ খেয়াল সর্ব্বত্র সজাগ ছিল না—তাঁহার দ্রুত ধাবমান ছন্দের মধ্যে ঐরূপ শব্দ বাক্যালঙ্কার-রূপেই দেখা দেওয়ায় সর্ব্বত্র ভাব-প্রকাশক হইয়া উঠিবার সুবিধা পায় নাই। কবি যে অনেক জানেন, তাঁহার সৃষ্টিতে এ-সত্য যে-পরিমাণ বৃহৎ হইয়া দেখা দিয়াছে, পাঠকের সহিত তাঁহার সহানুভূতির প্রমাণ সে-পরিমাণে বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। এই-ত্রুটীর জন্য, আমাদের আশঙ্কা হয়, তাঁহার অনেক কবিতাই যথেষ্ট শিল্প সৌন্দর্য্য ও গঠন, পারিপাট্য-সত্ত্বেও অকাল-মৃত্যুলাভ করিবে; তবে বাংলা ভাষার ভাবী লেখকেরা কবির এই শব্দ-ভাণ্ডার হইতে চয়ন করিয়া পরিমিত ব্যবহার করিলে উপকৃত হইবেন।

এরূপ ত্রুটী যে সর্ব্বত্র ঘটিয়াছে, তাহা অবশ্যই নহে। ভাবে ও ভাষার হাত ধরাধরি করিয়া কবি-চিত্তবেগে অগ্রসর, এমন অনেক কবিতাও আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি যাহা সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া চিত্তে চিত্তে প্রেরণা সঞ্চারিত করিবে। তাহা ছাড়া, সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কবিতা-গুলি, দেশের সুসন্তানদিগের উদ্দেশে বিরচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি-সমূহ, ভারতের নানা

স্থান-পরিদর্শন-ফলস্বরূপ চিত্তসকল, এবং বিবিধ কুপটাচার ও হৃদয়হীন প্রথার বিরুদ্ধে বিনির্গত অন্তর্দাহ-মূলক উক্তি গুলি প্রত্যেকেরই অবশ্য পাঠ্য হইয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারকে সুরভি-সুন্দর করিয়া রাখিবে।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ নৈপুণ্য সাহিত্যরসিক মাত্রেরই সুবিদিত, তথাপি এমন কথাও কোন কোন নবীন লেখকের রচনায় দেখা গিয়াছে, যে অপরের রচনার অনুবাদ তাহারাই করে যাহারা নিজের আত্মার সন্ধান পায় নাই।* সভ্যদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ভাণ্ডারের বহুল অংশই অনুবাদ পুষ্ট—তথাপি এদেশে যে আত্মার নামে অনুবাদের দুর্নাম রটাইবার চেষ্টা হয় ইহাকে আমরা সুলক্ষণ মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে, অনুবাদ করিবার অধিকার তাঁহাদেরই আছে যাহারা আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই নিজের আত্মাতে অপরের আত্মাকেও অনুভব করিতে পারেন, এবং তাহার ব্যবধান ভেদ করিয়াও, নিজের ও পরের আত্মার ঐক্য দেখিয়া বলেন—জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানবজাতি।

সঙ্কীর্ণ পরিসরে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-পরিচয় দিয়া আজ আমরা মাসিকের দায়িত্ব শেষ করিতে বসি নাই; এই নবীন কবিটী যে বঙ্গভাষাভাষী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরে অনেকখানি জায়গা করিয়া লইয়াছেন, তাহাই শুধু আমরা আরও প্রকাশ করিয়া বলিতে চাই। যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী, সাহিত্য-চর্চ্চায় ব্রতী, এবং সাধারণভাবে হৃদয়-মনের উৎকর্ষ-সাধনে যত্নবান, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই গৃহে বঙ্গসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই সত্যেন্দ্র সাহিত্য সসম্মানে রক্ষিত হউক—তাঁহার আবিস্কৃত পথখানি পথিক সমাগমে মুখরিত হউক এবং তাঁহার কাব্যে যাহা কিছু সুন্দর ও কল্যাণময় তাহা লেখকলেখিকাদের রচনা ও আলোচনায় বারংবার আবির্ভূত হইতে থাকুক, এই কামনা মাত্র জানাইয়া আমরা আজিকার বক্তব্য শেষ করিতে চাই।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

---

* সুরেশ চক্রবর্ত্তী 'সবুজপত্র'।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(জীবনী-প্রসঙ্গ)

(৪)

মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী

তারকনাথ কলিকাতায় আসিয়া যে সকল মনস্বী ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত হন ও স্নেহলাভ করেন, তন্মধ্যে পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর নাম, তাঁহার পুণ্যচরিত গাথা, শুনেন নাই এমন বাঙ্গালী বোধ হয় নাই। আদর্শ চরিত্র রামতনু লাহিড়ীর সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা, সত্যাদর্শ, উদারতা, সহৃদয়তা মানব-সমাজের জীবন ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে দেশাত্মবোধের—চেতনা স্পন্দন হয়, যে সময় বাঙ্গালার সারস্বত-কুঞ্জে মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র তারকনাথ, হেমচন্দ্র, মনোমোহন প্রমুখ ভক্তপূজারীর আবির্ভাব হয়, যে মহা চিরস্মরণীয় দেশহিতব্রত হরিশচন্দ্র, "স্বদেশরক্ষার ভীম" রামগোপাল প্রমুখ বীরগণ প্রতীচ্য আদর্শে বাঙ্গালীকে কর্ম্মের পথে আহ্বান করিতেছিলেন, তখন চরিত্র লাহিড়ী মহাশয় সেই যুগে, বাঙ্গালী-চরিত্রে সাধুত্বের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন। কবিবর দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুরধনী কাব্যে লিখিয়াছেন,—

পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়
সত্যবিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়।
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত
সুখদুঃখ সমজ্ঞান ঋষিদের মত।
জিতেন্দ্রিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ।
এক দিন তাঁর কাছে কবিগণ যাপন
দশদিন ভাল থাকে দুর্ব্বিনীত মন।
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত
নাম তাঁর রামতনু সকলে বিদিত।

তারকনাথ আদর্শচরিত্র রামতনু লাহিড়ীর সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার স্নেহলাভ করিয়া ধন্য হয়েন।

তারকনাথের জীবন-অধ্যায় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, দেশের যে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার জীবন ও চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং যাঁহাদিগের আদর্শচরিত্র তিনি নিজ জীবন ও চরিত্রে আদর্শ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সকল মনস্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর, কবিকুলচূড়ামণি শ্রীমধুসূদন, রামতনু নামের সার্থকতা সম্পাদনকারী রামতনু লাহিড়ী এই তিন জন বিরাট পুরুষের নাম সর্ব্বাগ্রে ও সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। যে শুভ্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্র গৌরবে তারকনাথ আজীবন গৌরবান্বিত ছিলেন, তাহা আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ চরিত্র রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শ চরিত্রকে নিজজীবনে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া, সে সহৃদয়তা, উদারতা, পরোপকার স্পৃহা শৈশব হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত সমভাবে প্রবহমান ছিল তাহা [illegible] বিদ্যাসাগর-চরিত্রকে আদর্শ করিয়া যে অমূল্য Healthy mind is a Healthy body লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও চরিত্রকে আদর্শ করিয়া তাহা চিরদিনই সমভাবে জ্ঞানালোচনাতেই আবদ্ধ হইল।

গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ করিবার সময় হইতেই তারকনাথ এই তিন মনস্বী ব্যক্তিগণের নাম ও গুণের কথা শ্রবণ করিয়া আসিতে চিত্ত তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইংরাজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসিয়া এই মহাপুরুষ-ত্রয়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গৌরব দেখিয়া তাহার বালক-হৃদয়ে মহাপুরুষ দর্শন ইচ্ছা বলবতী হয়। ভগবান তাঁহার এ ইচ্ছা পূর্ণ করেন। কিরূপে এবং কি উপায় তারকনাথ এই সকল মনস্বী ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত ও স্নেহলাভ করেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী।

পুণ্যচরিত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় যেমন পুণ্যের ও পুণ্য চরিত্রের আদর্শ রাখিয়াছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয়ও এই ভ্রাতার ন্যায় সদাশয়, উদার স্বভাব ও পরোপকারী ছিলেন। পরোপকার ব্রতই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবিবর দীনবন্ধু মিত্র ডাক্তার লাহিড়ীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

কোমল স্বভাব তাঁর মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন।
ছেলেদের কালীবাবু, ছেলেরা কালীর,
উভয়েতে মিশে যায় যেন নীরে ক্ষীর।

কালীবাবু কৃষ্ণনগরে ডাক্তারী করিতেন। লাহিড়ীবংশ কৃষ্ণনগরকে উজ্জ্বল করেন। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলের লাইনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেই সময় কলিকাতা আসিতে হইলে, হয় নৌকা না হয় পদব্রজে আসিতে হইত। বাগআঁচড়া হইতে কলিকাতা আসিতে হইলে হাঁসখালি ও কৃষ্ণনগরের মধ্য দিয়া আসিতে হইত। তারকনাথ এই সময়-প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাগআঁচড়া হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। হাঁসখালি পার হইয়া পদব্রজে কৃষ্ণনগরের মধ্য দিয়া যাইতেছেন; ডাঃ কালীচরণ লাহিড়ী সেই সময় পাল্কী চড়িয়া চিকিৎসার্থ বহির্গত হইয়াছেন, পথে যাইতে যাইতে ডাঃ লাহিড়ী দেখেন, একটী কান্তিমান কিশোর বয়স্ক বালক পদব্রজে চলিয়াছে, গৌড়ে বালকের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ পাল্কী হইতে নামিয়া বালকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন; এমন সময় এক বৃদ্ধ আসিয়া ডাক্তার লাহিড়ীকে জানাইল, তাহার একমাত্র পুত্র মরণাপন্ন, সত্বর তাহাকে দেখিতে যাইতে হইবে। রুগী মুমূর্ষু শুনিয়া পরোপকারী লাহিড়ী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তারকনাথকে পাল্কীতে তুলিয়া লইয়া রুগির বাটীতে গমন করেন; বিনা দর্শনীতে রুগির ব্যবস্থাপত্র ও বিনামূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দেন। অর্থ না থাকিলেও চিকিৎসার দ্বারা মানুষের সবিশেষ উপকার করা যায় দেখিয়া তারকনাথ স্থির করেন যে, তিনি ডাক্তার হইবেন। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি তিনি আশৈশব ইংরাজী সাহিত্যানুরাগী ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ডাক্তার লাহিড়ীর সহিত এক দিনের পরিচয়ে ও ডাক্তারি দ্বারা অতি সহজেই পরোপকার করিতে পারা যায় দেখিয়া তিনি উচ্চ ইংরাজী পাঠ সঙ্কল্প ত্যাগ করেন এবং মেডিকেল কলেজেই পাঠের ইচ্ছা করেন। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পিতার এইরূপই ইচ্ছা ছিল। পিতার ইচ্ছারই জয় হইয়াছে দেখিয়া কলিকাতায় আসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট মেডিক্যাল কলেজে পাঠের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন; পরে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন।

ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী সমস্ত রাস্তা তারকনাথের সহিত আলাপ করিতে

করিতে যান, তারকনাথের কথা বার্ত্তায়, প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া বলেন, তুমি কলিকাতায় যাচ্ছ, আমার বড়-দা রামতনু বাবু কলিকাতায় থাকেন, তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিও। তারকনাথ এতদিন যে আশা মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা এতদিনে ফলবতী হইতে চলিল দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হন। তারকনাথকে সেদিনের মত ডাক্তার লাহিড়ীর বাসাতে থাকিতে হইল। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রথমে পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রথম দিনের আলাপেই লাহিড়ী মহাশয় তারকনাথকে চুম্বক আকর্ষণের মত হৃদয়ে টানিয়া লন। লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র নবকুমার সেই সময় এন্ট্রান্স স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল,—তিনি নবকুমারকে ডাকিয়া আনিয়া তারকনাথের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁহাদের এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ইহার পর হইতে তারকনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের এতই স্নেহপাত্র হন যে, তিনি তারকনাথকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তারকনাথও লাহিড়ী মহাশয়কে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের পরোপকারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম। তিনি গরীবের নিকট হইতে ফিস্ গ্রহণ করিতেন না। অধিকাংশ সময়ে বিনামূল্যে নিজ ডিস্পেন্সারী হইতে ঔষধও দিতেন। একবার কালীবাবু কৃষ্ণনগরে এক দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে চিকিৎসার্থে আহূত হইয়া দেখেন, রোগির গৃহের চালের খড় এত অম্ল যে তাহাকে সম্ভবতঃ আম হিম ভোগ করিতে হয়। তিনি বিনা দর্শনীতে রোগির ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ব্যবস্থা পত্রের এককোণে লিখেন "এক গাড়ী খড়।" রোগির লোক তাঁহার ডিস্পেন্সারীতে আসিলে কর্ম্মচারীরা হাসিয়াই অস্থির। রোগির লোক ঔষধ লইয়া যায়। কর্ম্মচারীরা এক গাড়ি খড়ের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া চিন্তিত হয়। কালীবাবু আসিলে তাহারা এক গাড়ী খড়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখিলাম, কাঁচা খড়ের প্রভাবে সারা রাত হিম ভোগ করে, তবে আর আমার ঔষধ ও চিকিৎসার কি ফল হইবে বলিয়া ঔষধের সঙ্গে একগাড়ী খড় পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছি। এই ঘটনাটী উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, তারকনাথ ডাক্তারী পড়িতে গেলে তাঁহাকে প্রায়ই রোগির একগাড়ি খড়ের মত ব্যবস্থা করিতে হইত। তিনি প্রায়ই আত্মীয় বান্ধবগণের নিকট বহুত করিয়া কালীবাবুর এক গাড়ী খড়ের গল্পের উল্লেখ

বিদ্যাসাগর ও তারকনাথ।

যে সময় তারকনাথ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের স্নেহলাভ করেন সেই সময় তাঁহার পুত্র নবকুমার তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেছিল। তারকনাথ প্রত্যহ লাহিড়ীমহাশয়কে দেখিতে যাইতেন ও তাঁহার অনুরোধে নবকুমারকে পড়াইতেন। একদিন তারকনাথ নবকুমারকে পড়াইতেছেন এমন সময় প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর "তনু তনু" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যে গৃহে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় নবকুমার ও তারকনাথ ছিলেন সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাসাগর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নবকুমারের নিকট তারকনাথকে দেখিয়া রামতনু বাবুকে নবাগত বালকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। রামতনু লাহিড়ী মহাশয় তারকনাথের পরিচয় দিয়া বলেন ও বড় ভাল ছেলে, বৃত্তি পাইয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতেছে। বিদ্যাসাগর বৃত্তিলাভ ও মেডিকেল কলেজে পড়িতেছে শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত তারকনাথের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথম দর্শনেই বিদ্যাসাগর তারকনাথকে স্নেহের চক্ষে দেখেন; বিদ্যাসাগর বাটী ফিরিবার সময় তারকনাথকে বলেন তুই আমার সঙ্গে দেখা করিস নবর সঙ্গে আমার বাড়ী যাস্।" এই পরিচয়ের পর হইতে তারকনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মীয় মধ্যে গণ্য হন ও তাঁহাকে আজীবন ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ও চিরদিনই তারকনাথের প্রতি স্নেহশীল ও তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

মেডিকেল কলেজে প্রবেশ।

প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর তারকনাথ মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। তৎকালে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা মেডিকেল কলেজে প্রবেশের অধিকার পাইত।—সে সময় মেডিক্যাল কলেজে দু'টী বিভাগ ছিল,—বাঙ্গালা ও ইংরাজী বিভাগ।—এখনকার মত ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে মেডিক্যাল কলেজে এত অধিক ছাত্র সংখ্যা ছিল না, তৎকালে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল মেডিকেল কলেজে পড়িলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে। এই কুসংস্কারান্ধকার অপনীত হইয়া ধীরে ধীরে ছাত্রসকল মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিতেছিল। বাঙ্গালা বিভাগে বাঙ্গালা ভাষাতেই অধ্যাপনা হইত এবং অধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ বাঙ্গালী অপেক্ষাও হিন্দুস্থানী ছাত্রগণের সংখ্যাই অধিক ছিল। যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ তাহারাই ইংরেজী বিভাগে পাঠ করিত। বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণকে চারিবৎসর ইংরাজী বিভাগের ছাত্রগণকে পাঁচবৎসর পাঠ করিতে হইত।

তারকনাথ ইংরাজী বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি বৃত্তিধারী ছাত্র বলিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য বিনা বেতনে পাঠ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন।

শিক্ষাবিভাগের কথা ও মেডিক্যাল কলেজ ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

বঙ্গদেশের শিক্ষার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় হইতেই দেশে প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। পাদরীদের উত্তেজনা-তেই হউক, কোর্ট অব ডিরেক্টারদের আদেশেই হউক, শাসন কার্য্যের সুবিধা বা অপর যে কোন কারণেই হউক ১৮৩৫ খৃঃ ৭ই মার্চ্চ তারিখে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এদেশে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুল সমূহে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করিবার সঙ্কল্প করিয়া এক আদেশ পত্র সাধারণ শিক্ষা সমিতির সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের মন্তব্যের ফলে বঙ্গদেশে হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত কলেজ, হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। এই কমিটী গঠনের পূর্ব্বে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসায় চিকিৎসা শাস্ত্র-অধ্যাপনা হইত। চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল বিভাগের মোটামুটি শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে চিকিৎসা শিক্ষার কথা উঠে এবং ইহার জন্য একটি সমিতি (committee) গঠিত হয়। Dr. Grant এই সমিতির সভাপতি হন। এই সমিতি স্থির করেন যে, সমগ্র চিকিৎসা শাস্ত্র ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। সমিতির এই মন্তব্যের ফলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্ট আদেশ করেন যে, সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসায় যে চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করা হইবে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে কমিটির মন্তব্যানুযায়ী একটী মেডিকেল্ কলেজ খোলা হইবে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার নিয়ম হইল যে, ছাত্রগণকে ইংরাজী, বাঙ্গালা কিংবা হিন্দি ও গণিত এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে ও পরীক্ষার ফল অনুসারে প্রবেশ লাভ করিবে। এই সকল ছাত্রেরা ৭৲ হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইবে। এতদ্ভিন্ন অপর বালকেরা বিনা বেতনে পড়িবার অধিকার পাইবে। শিক্ষা বিভাগের বিবরণী পাঠে জানা যায় প্রথম বৎসর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষার ফলে ৪৯ জন বৃত্তিধারী ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে ৪৮ জন হিন্দু ও একজন খৃষ্টান। কলেজ প্রতিষ্ঠা

হইবার পর প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক (Secretary) নিযুক্ত হন।

প্রথম যখন কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময় প্রশ্ন উঠে যে, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রেরা কবী দেখিবে কোথায়? সেই সময় কলিকাতা-ইউরোপীয়ানদিগের নিমিত্ত জেনারল হাঁসপাতাল, (General Hospital) ও দেশীয়গণের জন্য নেটিভ হাঁসপাতাল, (Native Hospital) কোম্পানীর ডাক্তারখানা, চক্ষু রোগের চিকিৎসালয় (Eye Infarmary) এই চারিটি ডাক্তারখানা কলেজ হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। ইউরোপীয়ানদের হাঁসপাতালে শিক্ষা অসম্ভব, কারণ ইংরাজের রোগ বাঙ্গালীর রোগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই কারণ একটী নূতন হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের আবশ্যকতা বোধ হইল। হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাধা সত্যচরণ ঘোষাল, বর্দ্ধমানের মহারাজা অর্থ ও সাধ্যমতে প্রভূত অর্থ সাহায্য করেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর হাঁসপাতালের নিমিত্ত অধিকাংশ জমি দান করেন। Lord Dalhousie ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই হাঁসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম রোগী ভর্ত্তি হয়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তারকনাথ মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তদানীন্তন কালের কার্য্য-বিবরণী হইতে ছাত্রগণের পাঠ্য তালিকা ও মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অধ্যাপকগণের নাম।

1. Norman Chivers M. D. Principal.
2. J. Ewart. M. D. Prof. of Anatomy and Physiology and Curator of the musum.
3. Do Prof. of Comparative Anatomy and Zoology,
4. S. B. Partidge F.R.C.S. Prof of Descriptive and Surgical Anatomy and clinical surgery.
5. Nilmadhob Mukherjee M.B Demonastrator of Anatomy.
6. T. Anderson M. D. Prof, of Botany

7. S. G. Chakrabutty M.D. Prof. of Materia Medica.
8. F. N. Macnamara M. D. Prof. of Chemistry.
9. N. Chivers M. D. Prof. of Medicine.
10. J. Fayrer. M.D, F.R.C.S. Prof. of Surgery.
11. T. E. Charles M. D. Prof. of Midwifery.
12. C. T. O. Woodford M.D. Prof. of Medical Jurisprudence.
13. N. C. Macnamara M. D. Prof. of Opthalmic Medicine and Surgery.
14. J. P. Smith M. D. Prof. of Dentestry.
15. J. M. Cunningham M.D. Prof. of Hygine

এল, এম, এস, পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠ্য ছিল :—

CURRICULAM OF STUDIES FOR THE LISCENTIC MEDICAL & SURGERY.

1st Year Class

Descriptive and Surgical Anatomy, General Anatomy and Physiology, Dessection, Chemistry and Botany.

2nd Year Class

Descriptive and Surgical Anatomy, General Anatomy, Physiology Dessection, Chemistry, Botany Meteria Medica,

3rd Year Class

Comparative anatomy and Zoology, Dissection, Meteria Medica, Practical Chemistsy, Hospital and Dispensary attendannce, Medical Words, Surgical Words each for six months with clinical lecture and clinical instruction.

4th Year Class.

Medicine, Surgery (including operations) Midwifery, Medical jurisprudence, Dissection of regions and performance of surgical operations on the dead body. Hospital and Dispensary attendance. Medical Words Surgical Words each for six months with clinical lecture and clinical instruction.

5th Year Class.

Medicine, Surgery (including operations) Opthalmic medicine and Surgery, Midwifery, Medical Jurisprudence, Dentestry, Dissection regions and performance of surgical oper-

tions on the dead body. Practical Midwifery, Medical Words Surgical Word, Eye Infirmatory, outdoor dispensary each for 3 months with clinical lectures and clinical instruction.

লণ্ডন মিসনরী স্কুলে যেরূপ তীক্ষ্ণ মেধা বুদ্ধি ও বিদ্যানুরাগের পরিচয় দিয়া অধ্যক্ষ রেভাঃ মুলেন্স ও অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া তারকনাথ সেইরূপই অধ্যাপকগণের স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন। শল্য চিকিৎসার অধ্যাপক (Prof of Surgey) ডাক্তার ফেরার ও প্রিন্সিপাল ডাক্তার নরম্যান চিভার্স তারকনাথের তীক্ষ্ণ মেধা বুদ্ধি প্রতিভা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন। তাঁহারা তারকনাথকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের নূতন নূতন গবেষণার কথা জানাইতেন, জ্ঞান ও উপদেশ দিতেন।

সহৃদয়তার একটী দৃষ্টান্ত।

স্কুল বা কলেজে পাঠ করিবার সময় ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে অশিষ্টতা দোষে দুষ্ট হন। তারকনাথ চরিত্রে এ দোষ কখনও স্পর্শ করে নাই। তিনি শৈশব হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত উদার, সহৃদয় ও পবিত্র অন্তঃকরণ ছিলেন। প্রথম বাঙ্গালী ডিপুটী কন্‌ট্রোলার স্বর্গীয় উমাচরণ দাস মহাশয় তারকবাবুর সহপাঠী ছিলেন। লণ্ডন মিশনরী স্কুল হইতেই উমাচরণ ও তারকনাথ এক-শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া উভয়েই মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। উমাচরণ বাবু জাতিতে রজক ছিলেন। কলেজের দুষ্ট বালকেরা তাঁহাকে দেখিলেই গাধার ডাক ডাকিত ও 'শুভ্রকায়' বলিয়া বিদ্রূপ করিত। তারকনাথ কখনও অশিষ্ট ছাত্রদিগের মিশিয়া তাহাদের এই অশিষ্ট কর্ম্মে যোগদান করেন নাই। তিনি অপরাপর ছাত্রগণকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন,—ইহাতে বিপরীত ফল ফলিত, তাহারা আরও চীৎকার করিত উপরন্তু তারকনাথের সহিত তাহাদের ঝগড়া হইত। তারকনাথ শৈশব হইতে কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না বা উচ্চ নীচ ভেদাভেদ বিচার তাঁহার ছিল না। সকলেই তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান পাইত। শৈশব-জীবনে যে উদারতার বীজ তাঁহার হৃদক্ষেত্রে উপ্ত হয়, যৌবনের প্রাক্কাল হইতে বিদ্যাসাগর-রামতনু-সাহচর্য্যে তাহা মহান মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। উদারতা সহৃদয়তার এরূপ শতশত দৃষ্টান্ত আছে। যথাস্থানে এই সকল কথা বিবৃত হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

"প্রবন্ধে বঙ্কিম প্রতিভা"

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য গগনের দীপ্তসূর্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করিতে যাওয়া, আমাদের মত ক্ষুদ্র, নগণ্য বটতলার সাহিত্যিকের পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হইতেছে; তবে মহতের সমালোচনায় হৃদয়ে মহৎ প্রবৃত্তির সহজ উন্মেষ হয়। প্রতিভাবান লেখকের সমালোচনার নগণ্যেরও প্রতিভার বিকাশ হয় তাই সাহস করিয়া বঙ্কিম প্রতিভার আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির বহুল ধারাবাহিক সমালোচনা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের "বিধবা," "ননদভাজ" প্রভৃতির সমালোচনাও আমাদের সুযোগ্য শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখনীতে সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে কোনও ধারাবাহিক সমালোচনা না করিয়া আমি কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ বিশেষ দুই একটি প্রবন্ধের সমালোচনাই করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

যদি ব্যাপকভাবে ধরা যায় তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধকে সাধারণতঃ বিশেষ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়"—(১) গল্প ও উপন্যাসের ভিতরে প্রবন্ধ এবং (২) বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত যে সব প্রবন্ধ। স্যার ওয়ালটার স্কটের নভেলের অধিকাংশ অধ্যায়কে (chapterকে) এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এবং মূল উপন্যাসে তাহার বিশেষভাবে সমালোচনা করা যাইতে পারে। কবীন্দ্র রবিন্দ্রনাথের "গোরার" মধ্যেই অনেকগুলি অধ্যায়কে বিশেষ প্রবন্ধভাবে ধরিয়া লইয়া তাহার সমালোচনা (Isolate) আলাদাভাবে করিলেও "গোরার" গোরাঙ্গী নষ্ট হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধে সবই আছে যেমন—"অনুকরণ, "ভারত কলঙ্ক," "বেদ," "প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি" ইত্যাদি।

আবার ধারাবাহিক উপান্যাসের ভিতরেও বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধকে (Isolate) আলাদা করিয়া ধরিলেও মূল উপন্যাসের কোনও অঙ্গহানী হয় না। ধারাবাহিক উপন্যাসের ভিতর হইতে কয়েকটি (Isolated) আলাদা প্রবন্ধের

নাম করা যাইতে পারে যথা—"বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা" "তারাচরণ," হরিদাসী বৈষ্ণবী ইত্যাদী। রাজসিংহে, মাণিকলাল, বুড়ি খড় সতর্ক ইত্যাদি, কমলাকান্তে, "বসন্তের কোকিল" "আমার" দুর্গোৎসব; দুর্গেশ-নন্দিনিতে, বীর পঞ্চমী, গড়মান্দারণ ইত্যাদী। এ প্রবন্ধগুলি কতকটা এ্যাডিসনের Spectatorএর মত।

প্রথমতঃ "বসন্তের কোকিলের" কথাই ধরা যাউক। এক "বসন্তের কোকিলের" ভিতরে যে কত সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি এবং মনস্তত্ত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিতে বোধ হয় অনেকের জীবনের অনেক বসন্ত চলিয়া যাইবে।

"—তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে থরহরি কম্প লাগে তখন কোথায় থাক বাপু?

রাগ করিও না, তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ কেকিলে তাহার গহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, কোঁটা, তেড়ি, চসমার ছটা নাচিয়া যায়.....আর যে বছরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসীবাবুর পুত্রটির অকাল মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও অসুখ এজন্য আসিতে পারিলেন না, কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসা কথা, সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?

কি স্পষ্ট কথা! লোকচরিত্রে কি সুন্দর অভিজ্ঞতা!! ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ Sky lark এ কতকটা এইভাবের কথাই বলিয়াছেন "—

Ethereal ministrel! Pilgrim of the Sky!

Dost thou despise the earth where cares abound?

তবে সে উপরে বিচরণ করিলেও সংসারটাকে (neglect) অবহেলা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, আর এখানে মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতার মুড়িকে চাবুক দেওয়া হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র Misan thrope ছিলেন না। তিনি সমাদৃষ্টির প্রতিভা বলে মানবচরিত্রের প্রতিস্তরে ঐতিহাসিক ধারে। করিয়াছেন। এবং সেই প্রতিভাবলেই মানবচরিত্রের প্রকাশ একটা Defect একটা বড় Selfish side আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছেন। শরৎবাবু যেমন "পল্লী সমাজে" সমাজের গলদকে সম্মার্জ্জনীতে জর্জ্জরিত করিয়াছেন, ... য বাবুও তদ্রূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে

ভিতর দিয়া স্বার্থপর তোষামোদকারী Bottle friends এবং time server দের সম্মার্জ্জনী প্রহার করিয়াছেন।

একটু অন্তর্দৃষ্টি থাকিলেই বুঝা যাইবে যে তিনি একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এই উভয় সমাজকে একরূপ তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তাহার কোনও একটা বিশেষ দিক ধরিয়া সমালোচনা করিয়াছেন—যেমন পূর্ব্বেই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই আমাদের জাতীয় সমাজের গলদ সম্যক পরিস্ফুট হয়, তেমনি নিম্নোক্ত কথা কয়টা দ্বারা পাশ্চাত্য সমাজের, রাজনৈতিক জগতের স্বার্থপরতার দিকটা সম্যক পরিস্ফুট করিয়াছেন। এবং জগতে যে অনেক স্থানেই গুণের সম্যক বিচার বা সম্মান হয় না, তাহাও বিবৃত করিয়াছেন।... ...."এ পৃথিবীতে গ্লাড্‌ষ্টোন্, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায় তুমি কেবল গলা বাজিতে জিতিয়া গেলে নহিলে এত কালো চলিত না, তোমার চেয়ে হারিচাঁচা ভাল। গলাবাজির এতগুণ না থাকিলে যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্ট্রায়ার্টমিল্, পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন? ... ... স্যর জেম্‌স্ ম্যাকিণ্টশ তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির কড়ি-মধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন—আর মেকলে রেটরিকের পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভ স্বর কে শুনে? দেখ, লোকের বৃদ্ধপিতামাতার বেসুরো বকাবকিতে কোন্ ফল দর্শে? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কাণ টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং পিড়িং বলেন কি না?

Raligh (র‍্যালে) মিল্টনের সমালোচনা করিতে যাইয়া Fynes Morysonএর এই প্রকার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"In the general pride of England," says Fynes Moryson, "there is no fit difference made of degrees; for very Bankrupts, players are cutpurses go apparelled like gentlemen."

তারপর বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রার কথা ধরা যাইতে পারে। এ একটী Descriptive প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে মানবচরিত্রের নিত্য সম্বন্ধের যে জ্ঞান তাহারই সম্যক বিকাশ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ তিনি জল সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে, বাতাসে নাচি-

তেছে,—বৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত অনন্ত ক্রীড়াময়। এক নদীর জলকে এমন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া কে বর্ণনা করিতে পারিয়াছে?

তারপরে কৃষক এবং কৃষাণ-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "গরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। তারপর কৃষক মহিষীদের ছেঁড়া কাঁথা পচামাদুর, কপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈচে দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ এবং রুক্ষ কেশ। নৌকা বিহার অনেকেই জীবনে করিয়া থাকেন এবং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম-চন্দ্রও হয়ত নদীবক্ষে নৌকাযাত্রাকালেই এই সব দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এক খুঁটিনাটি ভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ণনীয় বিষয়কে বাস্তবের ন্যায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা এক বঙ্কিম প্রতিভারই উপযোগী। তারপর তিনি নদীর ছল্ ছল্ কল্ কল্ উন্মুক্ত উদার ভাবের সঙ্গে বালকবালিকাদের বাহ্যপ্রকৃতির উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভাব সম্যক্ পরিস্ফুট করিয়াছেন—"আর বালকবালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না, মুদ্রিত নয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদায় শিব লইয়া পলাইতেছে। সর্ব্বশেষে—এই Descriptive প্রবন্ধের মধ্যেও ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে তিনি ছাড়েন নাই। যদিও এটা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তবু আংশিক ভাবে কতকটা সত্য বটে "আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠনিমজ্জিত কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন।"

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা বঙ্কিম প্রতিভার সম্যক্ সমালোচনা হওয়া সম্ভবপর নহে। আর শুধু Quotation অথবা প্রশংসা বা নিন্দা করিলেই সমালোচনা হয় না। কারণ প্রধান কথাই হইল এই "The criticism of literature and art is after all but a subordinate chapter all but a subordinate chapter in the criticism of life." ভবিষ্যতে যদি সুযোগ সুবিধা হয়, তবে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল, আর যদি সুযোগ নাই হয়, তবে "উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রান্ মনোরথান্ ইব" ভাবেই মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই থাকিয়া যাইবে।

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়।

মাসিকী।

বঙ্গবাণী—শ্রাবণ।

প্রথমেই "পড়িয়া গাঙ্গিত শবদেহ কোলে কলার মান্দাসে বেহুলা"। ছবি খানি মন্দ হয় নাই। তবে চিত্রকর লালরংয়ের বাড়াবাড়িটা একটু বেশী করিয়া ফেলিয়াছেন। মানুষের গায়ের রং ও লাল, কাপড়ের রং ও লাল আর মান্দাসের আশে পাশেও লাল, আর একটু লাল হইলেই—একবারে "সব্ লাল হো"ঃ হইয়া যাইত। এই এক দোষ ভিন্ন ছবি খানিতে আর কোন দোষ নাই। 'শিল্পের সচলতা ও অচলতা' অতি সুলিখিত প্রবন্ধ। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন, "অনাহতের ধ্বনি ব্যক্ত করে যে ভাষা; অরূপের ইঙ্গিত ও রূপ দর্শন যে ভাষা, নিশ্চল নির্ব্বাক পাষাণকে চলায় বলায় যে ভাষা, তাকে বিনা সাধনায় মনে করলেই কি কেউ পেয়ে থাকে। * * * তাদের তপস্যায় বলীয়ান মানুষ পাথরের কারাগারে থেকে বার করে নিয়ে এল যে ভাষাকে চির সুধাময়ী রসের নির্ঝরিণী—তারি চতুঃষষ্টি ধারা হ'ল কথা, ছবি, মূর্ত্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কলাবিদ্যা।" সাধকের প্রাণের কথা বটে! "চিন-চেনা" গান—ছন্দে তালে মানে বেশ হইয়াছে। 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ" উপেন বাবুর লেখা,—পরিচয় অনাবশ্যক। "শুষ্ক-মরু" শুষ্ক মরুর মতই শুষ্ক। গল্পটি ভাল জমে নাই। "বাঙ্গালী" কবিতাটি—কুমুদরঞ্জনের শুক্লপক্ষের কবিতা। ভাবে ভাষায়, ছন্দে ঝঙ্কারে একবারে ঝর ঝর। একটু নমুনা দেখুন, "লড়ে গিয়া রেজিমেন্টে পড়ে গিয়ে জাপানে, মার্চে সে গোলাদাগে, চড়ে উড়ো ঝাঁপানে। পরিখার মাঝে তা'র আছে খাব ছড়ানো; রাইনের বুকে আছে, ভুলে গেছে ডরানো।" সুন্দর জিনিষ। "স্বরাজ-সাধনায়" সমস্ত কথা স্বীকার করিলেও 'এখানে সেখানে দু'দশটা তাঁত চলিয়ে এক বিরাট বস্ত্র ব্যবসায় ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিতে পারব এমন কল্পনা করে যদি আমরা স্বরূপ প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় ব'সে থাকি, তবে জানব আমাদের অদৃষ্টে আরও দুঃখ আছে। * * * কিন্তু এই শিল্পের উন্নতি সাধনের পথ আবিষ্কারের জন্য কি প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থা আমে বিংশতি শতাব্দীর বৈজ্ঞা-

নিম্ন যুগে প্রযোজ্য ?" স্বীকার করিতে পারিলাম না। প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থা প্রযোজ্য না হইলে কোন ব্যবস্থাটা প্রযোজ্য লেখক বলিয়া দিবেন কি ? যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার—অন্নহীন, বস্ত্রহীন—প্রাচীন ভারতের কলাই কস্কাল সে দেশে'—সেই নিরন্ন দেশে—আজ শুধু শাক ভাতের জন্য কোন্ ব্যবস্থাটী প্রযোজ্য ? তিনি আজ যে বৈজ্ঞানিক দেশের কথা তুলিয়া উহার টেক্কা মারিতে চান, সে দেশেও আজ ন্যূনপক্ষে দশ লক্ষ লোক বেকার। লেখক যদি স্বরাজ মানে বিজলীর বাতি, পাখা আর ঐশ্বর্য্যের ভেপো মনে করিয়া থাকেন তবে সে স্বরাজ—চরকা আর তাঁতে আসিবেনা সুনিশ্চয়। তবে যে স্বরাজে

"আমি চাই ছোট ঘরে বড় মন রবে
নিজের সুখের অন্ন খাই সুখী হবে"

বুঝায়, সেই স্বরাজে নিশ্চয়ই আসিবে। 'মার্কিণে চারিমাস' মন্দ কাহিনী। "অভাবও অভিযোগ" সময়োপযোগী প্রবন্ধ সকলেরই একবার পড়িয়া দেখা উচিত। 'আমাদের ইউরোপ প্রবাস" মন্দ নয়। 'মানুষ পূজা"—সুন্দর জিনিষ—সাহিত্যে নূতন ধারা। "ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ" ছবিরূপ—প্রবন্ধ। সাহিত্যে কোন স্থান নাই। 'আকাঙ্খিত মৃত্যু" কবিতাতে "না ফুরাল ক্রমশীল আশার স্বপন" লাইনেই যদি কবিতাটি শেষ হইত, তবেই কবিতাটিরও আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু হইত। পরে আর কতগুলি লাইনে লেখক মামুলীগং গাহিয়া কবিতাটির সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। "হারাণো খাতার" এখনও খোঁজ হয় নাই।" গৌরীদান"—সামাজিক চাবুক—যাহারা ভুক্তভোগী তাহারা চাবুকের চাবুকানীটা বুঝিয়া লইবেন। 'বাংলার নবযুগের কথা" জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস" মন্দ নয়। বঙ্গবাণীর অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে, আরও ছোট হইলে বোধহয় হৃদয়গ্রাহী হইত। সোণার ফুল" এখনও ফুটে নাই। 'তোমার দান" মামুলী কবিতা। রবীন্দ্রনাথের যুগে সকলেই এক ভাবের রোমন্থন করিতেছে দেখিয়া হাসি আসে। "জাপানে সামাজিক প্রথা" সকলেরই একবার পড়িয়া দেখা উচিত। "ব্রিটান মুক" অনুবাদ। 'ডাক্তারী ব্যবস্থা" চিত্রখানি ভাল খুলে নাই। 'শোক সংবাদ' সত্যেন্দ্রনাথের শোকস্মৃতি বলিবার কিছু নাই।

প্রবাসী—শ্রাবণ।

প্রচ্ছদপটে দশমহাবিদ্যার কমলামূর্ত্তি মনঃপূত হয় নাই। মুখপাতের 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' ছবি খানির পরিচয় রবীন্দ্রনাথের "আসা যাওয়ার মাঝখানে" কবিতা। উক্ত সংখ্যার ৫৪৫ পৃঃ রবি বাবু লিখিয়াছেন,

আকাশে ঐ কালোয় সোনায়
শ্রাবণ মেঘের কোণায় কোণায়
আঁধার আলোয় কোন খেলা যে
কে জানে,
আসা যাওয়ার মাঝখানে!

কবিতা ও চিত্রে সুন্দর মিলন হইয়াছে। চিত্র খানিও আর্ট হিসাবে অতি সুন্দর চিত্র। তাহা ঐ গাছটা যেন কেমন বেখাপ্পা বলিয়া বোধ হয়, এই গাছটা না থাকিলে চিত্র খানি ইতালীয় চিত্র বলিয়া ভ্রম হইত। মোটের উপর চিত্র খানি সুন্দর। 'ভাগের অনাচারে' সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত। ত্যাগীর দেশের ভোগীর বংশধর আমরা আজ ভোগাশক্তির পেছনে পেছনে ছুটিয়া কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আজ আচার্য্যের মতই সেই বিভীৎস দৃশ্যটা আনিয়া আমাদের চশমাঢাকা চোখের সাম্নে ধরিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'সাজসজ্জা আসবাব্ ধনরাশির স্তূপ প্রভৃতি উপকরণে পীড়িত হওয়াই কি জীবনে চরমলক্ষ্য? বিলাসের তাণ্ডব-নৃত্যে মত্ত হইয়া ভুলিয়া যাই কোন দিকে, বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় নিজকে আহুতি দিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছি। উদ্‌ভ্রান্ত মনকে সুস্থির রাখিতে পারি না। হায়! যে ভারতে অন্যূন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রমণীর কণ্ঠ হইতে বজ্রগম্ভীর নিনাদ উঠিয়াছিল।

'যেনাহং মৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্'

আজ কোন পথে সেই ভারত ধাবিত হইতেছে!" হায়! আচার্য্য দেব, 'আজ যদি দেশবাসীর আপনার শতাংশের একাংশও দেশভক্তি থাকিত, তবে কি গোলতলা আর হেদুয়াতে অত ফুর্‌ফুরে আদ্ধির কিম্বা ১৯নং গ্লাসগোর আদ্ধির হুড়াহুড়ি দেখিতে পাইতাম! এদেশে ভা: "নাম পরতাপেই"—'ঐছন করে' কিন্তু 'কার্য্যকালে খুঁজে সব নিজ নিজ পথ।' এই দেশবাসীকে বলিতে হয়,—

"অতি ছল, অতি বল, অতি কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল,

তোমারে কি বলা যায় রে,
ও তব নাম বেয়ান।"

"রমলা" বলিয়াছে। 'উপনিবেশে শিক্ষা প্রণালী ও ব্রহ্মবিদ্যার ক্রমবিকাশের প্রভাব' গবেষণা। 'একটি বাঙ্গালী ভাস্কর' বাঙ্গালীর গৌরব কথা। 'স্বাভাবিক ঘটনা' সুন্দর ব্যঙ্গ চিত্র। 'রবীন্দ্র পরিচয়' বেশ চলিতেছে। 'রণরঙ্গ' কবিতা : কবিতাটি বেশ হইয়াছে। 'উমারাণী' গল্প। স্বামী উপেক্ষিতার করুণ কাহিনী। অনেক দিন অমন নিখুঁত গল্প পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভাষা ও ভাবে একবারে মণিকাঞ্চন সংযোগ। 'কোরিয়ার জাপানী শাসন'—পরাধীন দেশের অবিচার ও অত্যাচারের কাহিনী। ভারতবাসীর পড়িয়া দেখা উচিত। 'বিশ্ব-দরজী' কবিতা, অতি উচ্চ ভাবের কবিতা। কিন্তু ছন্দটা যেন ভাবের মত উচ্চাঙ্গের নহে, তবু কবিতাটি সুন্দর।

যতেক বেদনা যার
এক সাথে জমে' অচল মুকুট গড়েছে মাথায় তাঁ'র
যত আশা হল ছাই,
সে সব তাঁহার অঙ্গবিভূতি—চির সন্ন্যাসী তাই।

বেশ সুন্দর ভাব। 'বাদল দিনে' কবিতা। মান্ধাতার আমলের ভাবের অন্ধ অনুকরণ, প্রবাসীর উপযুক্ত নহে। "স্বতঃ স্ফূর্ত্তি" মহিলা চিত্রকরের পরিচয় পেয়ে স্ফূর্ত্তি হওয়ার কথাই বটে। 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' কবিতার

মাঝে তুমি আপন হারা,
পায়ের কাছে জলের ধারা,
যায় চলে ঐ অশ্রুভরা
কোন্ গানে,

ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পায়ের কাছের জলধারা যে অশ্রুভরা গানে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার খোঁজ পাইয়াও পাইলাম না, না-পাওয়ারই কথা। বোধ হয় অত টুকু উর্দ্ধে উঠিতে পারি নাই, উঠিলে বুঝিতে পারিতাম। সমস্যা বটে। 'পারাবার নাই,—সাইন তীর্থ পূর্ণ। 'বি[illegible]র সামান্য সূত্র' ব্যঙ্গ চিত্রখানি বেশ হইয়াছে। [illegible]" কবিতা সুন্দর। ভাষা ও ভাবে কবিতাটি কবির নামের উপযুক্ত হইয়াছে। [illegible] দীপ জ্বেলে [illegible] দিন। হঠাৎ যে প্রবাসীর এই [illegible]

মুখশ্রী জুজুজাতীয়, গায়ের জামাটা বিহারী, হাত দুটা বাঙ্গালীর বলিয়া বোধ হইল। হাতের আঙ্গুলগুলি কুকুরী দ্বারা বলিয়া ভ্রম হয়। [illegible] চিত্র মোটেই হয় নাই, নীলরংয়ে খড়ির একটা কুটিল রেখা টানিলেই যদি [illegible] হইত, তাহা হইলে বাংলাদেশে চিত্রকরের অভাব নাই। মোটের উপর [illegible] খানি না দিলেও প্রবাসী অকাতরে ভাসিয়া যাইত না। "সত্য" ও "[illegible] সেবক" কবিতা দুইটী যুঁইকুঁড়ির মত শুভ্র ও সুরভি। 'রাজপুতনার [illegible] স্মৃতি' বাঙ্গালীর গৌরব কথা। "ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ দেখা" বাঙ্গচিত্রখানি আরও পরিষ্কার করিলে আরও ভাল হইত। ৺ সত্যেন্দ্র[illegible] স্মৃতিকথাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই।

ভারতী—শ্রাবণ।

প্রথমেই—'বর্ষা বিহার' ছবি। ছবিখানি প্রাচীন। [illegible] ভারতীর প্রায় ১২।১৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী আমাদের বড় আদরের সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি-তর্পণ। বাঙ্গালী—যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে ততদিন সত্যেন্দ্রনাথের [illegible] পূজা করিবেই, ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুণ। "নারীর সৌন্দর্য্য ও আদর্শ" পড়িয়া রীতিমত এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, লেখক কিংবা লেখিকা শুধু পুরুষের দোষ ধরিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছেন। অবশ্য আমাদের যে দোষ নাই সে কথা আমরা বলিতে চাই না, তবে যাহা নাই তাহা আরোপ করিয়া ভারতীয় পুরুষ-প্রকৃতিতে মেয়েলী ঝগড়ার সৃষ্টি করিয়া যে কি লাভ হইবে বুঝি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে পুরুষ নারীকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করে—তাহাতে নারীকে হেয় করা হয় না। যে দেশে নারী শক্তিরূপিণী-জগৎ মাতৃকার অংশ বলিয়া সমপূজিতা,

"যত্রনার্য্য পূজ্যন্তে তত্র তিষ্ঠন্তি দেবতা"

যে দেশের শাস্ত্রের বচন, সে দেশের নারী পবিত্র—ফুলপবিত্রতার আদর্শ তাই এদেশে ফুলের সঙ্গে তুলনা, সে দেশে একথা বলা চলে না। তারপর লেখক 'যৌবন-দেবদাবী তুলিয়া যে সব কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিক আমরা দুঃখিত। লেখক কি বলিতে চাহেন যে পুরুষ শুধু রমণীর যৌবনই যাচাই করিয়া থাকেন—বার্দ্ধক্যের কি কোন আদরই পুরুষ করে না, কিংবা কোন সম্মানই পুরুষ দেখায় না? বাস্তবিক পক্ষে যদি ব্যাপার তাহাই হইত, তাহা হইলে যে ব্রজেশ্বরের বাপ দেবী চৌধুরাণীকে বিবাহ করিতে কোন কসুর

করিত না কিংবা সুভাষিণীর শ্বশুর পাচিক কুমুদিনীর প্রেম উপেক্ষা করিয়া "কালির বোতলের" প্রেমে মশ্‌গুল হইয়া পড়িত এ কথা সুনিশ্চয় বঙ্গের গৃহে গৃহে আজও প্রাচীনার জন্য গৃহিণীর সিংহাসন অধিষ্ঠাপিত আজও—"বুড়া বুড়ী দু'জনাতে মনেরমিলে সুখে" থাকে। লেখক উপসংহারে ডিকেন্সের জোরা চরিত্রের সঙ্গে অস্মদ্দেশীয় নারীচরিত্রের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, "তবে ক্রমেই ইহা প্রণয়িণীক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিয়া স্ত্রীর জন্য দৈনিক সংগ্রাম চালাইবার উপযোগী কঠিনতর উপাদানে গড়া নারীর প্রয়োজন হইয়াছে।" আমাদের মনে হয় লেখক ভুল বুঝিয়াছেন। মহাশক্তিরূপিনী নারীকে আর কঠিন করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহার মনের অন্তর্নিহিত ক্ষমা, দয়া, স্নেহ, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশিই তাঁহার একমাত্র কঠিন উপাদান। তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে তিনি "ঘেরাটোপের" ভিতরে থাকিয়াও রাণীভবানী, স্বর্ণময়ী, রাসমণি প্রভৃতি মহীয়সী রমণী হইতে পারেন। আর নিজের ইচ্ছা না থাকিলে, শত আলো হাওয়ার মধ্যে থাকিলেও, অশ্বক্ষুরমিব ক্ষুর হিল দেওয়া কঠিন চর্ম্মপেটিকায় সুকোমল চরণকমল আবৃত রাখিয়া কঠিন হইতে চাহিলেও তাহারা কঠিন হইতে পারিবে না। "প্রত্যাবর্ত্তন" চলিয়াছে। "ধর্ম্ম কথা'তে লেখক যে ধর্ম্মের কথা আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই। ধর্ম্ম 'হৃদিলীন" বাহ্যিক আচার ব্যবহারে শুধু আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি যদি নিজের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নন্‌কোপারেশন করিয়া ঘরের বিভীষণ সাজেন তবে সে দোষ ধর্ম্মের নহে। 'পড়োবাড়ী' মন্দ নয়, লেখক চেষ্টা করলে এই জিনিষটাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন। "কবিকঙ্কণ বিজ্ঞান ভবন' জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। "অবসর বন্ধু" অনুবাদ, গল্প ভাল জমে নাই।" মারাঠা ইতিহাসের শিক্ষা" সকলেরই একবার পড়িয়া দেখা উচিত। "নারীর প্রতি অবিচার' আগুণের কুলকি লেখিকার শক্তি যথেষ্ট ভগবান তাহার মঙ্গল করুন। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা" ছবিখানি দেখিলে কষ্ট হয়। মেসের উড়ে ঠাকুর যেন রান্না বান্না ছাড়িয়া রাজ মুকুট পরিয়া দুষ্মন্ত সাজিয়াছেন। শকুন্তলার চুল পাকিয়া গিয়াছে, বল্কলের পরিবর্ত্তে তিনি সাল পেড়ে সাড়ী পরিয়া দুষ্মন্ত রাজাকে পান দিয়া আভিথেয়তা করিতেছেন। কালিদাসের শকুন্তলা বিংশ শতাব্দীর সংস্পর্শে হাওয়ায় অনেকটা civilised হইয়াছে। আশার কথা বটে! 'অলকা" গল্প, খুব ভাল জমে নাই, তবে ভাষা বেশ সুন্দর। "নৃত্য কলার বিকাশ" মন্দ হয় নাই। "নিস্তারিণীর রাজনীতি" সাহিত্যে

নূতন জিনিষ, আশাকরি সকলেই ইহার আদর করিবে। আমাদের নিকট বেশ লাগিয়াছে। 'পরের ছেলে' চলিয়াছে। "সত্যেন্দ্র স্মরণে" আমাদের কিছু বলিবার নাই। "চয়ন" বেশ হইয়াছে।

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ।

মুখপত্রে "সধবা পূজা" চিত্রখানি বেশ হইয়াছে। তবে পূজারিণীর হস্তস্থিত সধবার পা-খানি আর একটু খাট করিলে চিত্রখানি একবারে নিখুঁত হইত। 'মহেশ্বরী' ছবি ভাল হয় নাই। মহেশ্বরীর চিত্রখানিকে চিত্র বলা অন্যায় পরিচয় দেওয়া মাত্র। এই ছবিখানি না দিলেই ভাল হইত। 'বৈশেষিক দর্শন' দার্শনিক প্রবন্ধ। "বিপর্য্যয়" সবে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতেতিহাসের সুপ্ত অধ্যায় এতদিন গুপ্ত ছিল, এবার উপ্ত হইয়াছে। "বিজিতা" চলিয়াছে। য়ুরোপের প্যারিসের কথা আলোচনা হইতেছে। "অসীম" এখনও অসীমে। "আন্দামান"—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের খবর। যাহাদের আন্দামান যাইবার যাইবার সৌভাগ্য না হওয়াতে মনোকষ্টে আছেন, তাঁহারা "ভারতবর্ষে"ই সেই সাধ মিটাইতে পারিবেন। 'বাদলের ব্যথা' কবিতা ভাল লাগে নাই। লেখকের ছন্দ বাদলের ঝম্ ঝম্ ছন্দে ব্যথা দিয়াছে। "মেয়েদের জাগা" প্রবন্ধে বলিবার কিছু নাই—তবে মেয়েরা আজ কাল জাগিয়াছে, এই যা আশা "বৃদ্ধা ধাত্রীর মোক্ষনামচা" এবার "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিয়াছে। মোক্ষ-নামচা অতি সুন্দর জিনিষ হইয়াছে। "সুমেধা"—সুন্দর গল্প। 'দিল্লী সাম্রাজ্যের পতন কাহিনী' ঐতিহাসিক কাহিনী। 'নাসের মহাশয়' নাবেবের মতই গম্ভীর ভাবে চলিতেছে। 'পয়লা আষাঢ়' গল্পটী মন্দ নয়। অশোকের উপসংহারের কথাগুলি অতি সুন্দর। 'মার্কিন মুলুক' সুলিখিত প্রবন্ধ। কাজরী বর্ষার কবিতা—বর্ষার মতই রসসিক্ত হইয়াছে। 'জাতিতত্ত্ব' অনেক জাতির খবর পাওয়া যায়। এই ছত্রিশ জাতির দেশে উপন্যাস মিশিবে। 'আজগুবি কাহিনী' আজগুবি খেয়ালের গল্পই বটে—মাথে সময় কাটাইবার একবারে আজগুবি গল্প। 'বিশ্বভারতীতে' উপন্যাসের [illegible]। 'ইঙ্গিতে' বিশ্বকর্ম্মার ইঙ্গিত কতটুকু কাজ হইবে জানি না। [illegible] সুন্দর—ভাবে ও কবিত্বে একেবারে মৌলক[illegible] হিসাব হয় নাই—জের চলিতেছে। 'বাজনা' [illegible]

[illegible]

বৈঠকা।

বাঙ্গালা ভাষাকে সেকালের সংস্কৃতের বৈষ্ঠনী হইতে বাহির করিয়া সজীব চল্‌তি ভাষায় পরিণত করিয়াছিলেন প্রথমে দুইজন। আজকালকার ছেলেরা বিদ্যাসাগরের বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহের আলোচনাপূর্ণ পুস্তকগুলি পাঠ করেন না ৺ব্রজবিদ্যারত্ন এবং বিদ্যাসাগরে যে কথা কাটাকাটি চলিয়াছিল, তাহাও পড়েন না। পড়িলে জানিতে পারিতেন বিদ্যাসাগর চল্‌তি ভাষা কতটা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

চল্‌তি, সহজ ও সোজা ভাষা প্রয়োগ করিবার পথ প্রথম দেখান, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন। তাঁহার প্রচারিত "সুলভ সমাচার" চল্‌তি ভাষার প্রথম প্রবর্ত্তক। "সংবাদ প্রভাকর", "সমাচারচন্দ্রিকা" প্রভৃতির বাঙ্গালা গদ্য অতি ভয়ানক ছিল। ঠাট্টা তামাসা, ছড়া, পাঁচালী লিখিবার সময় তাঁহারা সহজ ভাষা ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু সমাজতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব এবং রাজনীতির আলোচনা করিতে হইলে তাঁহারা কাদম্বরীর গদ্য অনুকরণ করিতে বসিতেন। "সমাচার" সেপথ ছাড়িয়া সোজা ভাষায় রাজনীতির আলোচনা আরম্ভ করে।

"হুতোম" সোজাভাষা ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু সে যে সব ঠাট্টা, বিদ্রূপ। গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইলে প্যারীচাঁদ মিত্রও বহুল বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে বাধ্য হইতেন। তখনকার এমনি রুচি ছিল যে, বাঙ্গালা গদ্যে দই, খই, গাছ, পালা এসব লেখা চলিত না। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় তাঁহার স্বলিখিত আত্মজীবনীতে ধান্যবৃক্ষ লিখিয়া গিয়াছেন। ধানগাছ লিখিলে গাছে Vulgar হয়, সেই ভয়ে তিনি ধান্যবৃক্ষ লিখিয়াছেন।

একটা কথা কখনও যেন কেহ না ভুলেন যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি স্থান হইল রাঢ়দেশ, শূন্য পুরাণ হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদা পুরাণ পর্য্যন্ত প্রায় হাজার বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় যত মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, যত গাথা পাঁচালী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সাড়ে পনর আনা অংশ রাঢ়দেশের বাঙ্গালী দ্বারায় লিখিত। মুকুন্দরায়, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, দাশুরায় এবং বৈষ্ণব কবি মাত্রেই রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পর মৃত্যুঞ্জয় তর্কবাগীশ, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বিদ্যাসাগর, রামগতি, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, প্রভৃতি সকল প্রধান গদ্য পদ্য লেখকই রাঢ়ের লোক ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন যশোর জেলার লোক বটে; কিন্তু রাঢ়ের ভাষাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার সকল কাব্যগ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের অধিবাসী, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঢাকা ও বিক্রমপুর অধিবাসী হইলেও তাঁহারা রাঢ়ের লিখণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার গদ্য পদ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর রচিত পাঠ্য পুস্তক সকল ১৮৭০ খৃঃঅব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত এখনও বাঙ্গালার সকল [illegible]

প্রধান হইতেছে। কলিকাতা হইতে যে সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিক খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়, তাহাদের সকলের ভাষা রাঢ়ীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভাষার যতটা ব্যাপ্তি হইবে, তাহার স্থিতিও তেমনি দীর্ঘকাল ব্যাপী হইবে। শ্রীহট্ট হইতে মালদহ পর্য্যন্ত বা মানভূম পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজের রাজত্বের আমল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন আর সম্ভব পর নহে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাঙ্গালার সাধুভাষার যত ব্যাপ্তি হিন্দুস্থানের আর কোন প্রাদেশিক ভাষায় নাই। ৫ কোটী নরনারী হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে এই বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছে ও ব্যবহার করিতেছে। ইহাকে আর বদলান চলে না। যতদিন শ্যামা বিষয়ক গান থাকিবে, যতদিন বৈষ্ণব মহাজনগণের বৈষ্ণব পদাবলী থাকিবে, যতদিন কবিকঙ্কন ও ভারতচন্দ্র থাকিবে, মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র থাকিবে, ততদিন এ ভাষার পদ্ধতি পরিবর্ত্তন হইবার নহে।

* * * * *

কথাটা বলিবার একটু হেতু আছে। এই বাঙ্গালা সাধুভাষার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন চেষ্টা হইতেছে। যাঁহারা এই চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা অধুনিক কলিকাতার চলতি ভাষা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা জানেন না যে কলিকাতার কোন বিশিষ্ট প্রাদেশিকতা নাই। যাচ্ছি, যাচ্ছি, নিচ্ছি, গেলুম, বেলুম, নিলুম, ইহা কলিকাতার ভাষা নহে। যাহারা কলিকাতার আদি নিবাসী অর্থাৎ তিনি তামুলী, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতি তাহাদের এ ভাষা নহে। ইহা ত্রিবেণীর ও আন্দুলমৌরীর ভাষার খিচুড়ী মাত্র। এ ভাষা বা প্রাদেশিকতা, প্রাদেশিকতা নহে, বরং উহাকে সাম্প্রদায়িক ভাষা বলিতে পারি। কেননা উহা বিলাত ফের্ত্তা বাবুদের এবং পিবালী বাবুদের ভাষা। উহাতে যশোরের আমেজ আছে, দক্ষিণ জয়নগর মজিলপুরের ঢং আছে। আর পিবালী বাড়ীর ভঙ্গিও আছে। এমন 'জগা খিচুড়ী' চলে না প্রেমলিপিতে চালাইতে পার, ঘর ঘরকন্নার চিঠি চাপাটিতে চালাইতে পার; কিন্তু সাহিত্যে চলে না। বিলাতের সমালোচক বহু ভাষাবিদ ঐতিহাসিক Free man সাহেব Kiing's English নামক একখানি ছোট বহি লিখিয়াছিলেন। যাঁহারা কচ্ছি, খাচ্ছি লিখিতেছেন তাঁহারা ঐ বইখানি পড়িয়া দেখিবেন কি? খোষমেজাজে ভাষা বা সাহিত্য গড়া চলে না। ভাষা ও সাহিত্য জাতির প্রকৃতির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠে। মনীষী, মহাকবি ভাষাকে যে প্রণালী দিয়া লইয়া যান, অনেক সময়ে ভাষা সেই প্রণালীতেই প্রবাহিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার সাহিত্যের উপর রাঢ়ের প্রভাব হাজার বৎসরের। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর রাঢ়ের উপনিবেশ মাত্র। তাই পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যও রাঢ়ের ভাবে ভাবুক। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার মধ্যে রাঢ়ের চিহ্ন এখনও প্রচুর রহিয়াছে। কথাটা ইঙ্গিতেই বলিয়া রাখিলাম। কেন না পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে একটু আধটু আলোচনাও করিয়া রাখিয়াছি, ভাষার যথেচ্ছাচার সমাজও সহ্য করিবে না, তাহা এখনই পরিস্ফুট হইতেছে। তাই এইটুকু

Acc. No.....
Book No.....
LIBRARY.

শরত প্রভাতে।

(নিত্যানন্দ মিত্র অঙ্কিত)

উদ্বোধন।

(আয় মা জ্ঞানদা)

তুমিই একদিন বৃন্দারণ্যে ভুবনমোহন নবজলধর শ্যামরূপে সবল বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া, গোপীকুল ললনাদের লাজমান বিস্মৃত করাইয়া, ভালবাসার দীপ্তিতে, তোমাতে বহির্জগৎ ভুলাইয়া, তাহাদের আত্মজ্ঞান প্রকাশ করাইয়াছিলে; তুমিই কালারূপ পরিত্যাগ করিয়া দানবদলনী কালী হইয়া পৃথিবীকে দৈত্যকবল হইতে মুক্ত করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছিলে; তুমিই সেদিন ভক্তদের উত্তপ্ত মরুময় দেশের পাষাণ কঠোর হৃদয়ে "একমেবাদ্বিতীয়মের" রূপান্তর "আল্লাহো আকবর" প্রতিষ্ঠা করিয়া পাষাণে ধর্ম্মের উৎস প্রবাহিত করাইয়াছিলে, আবার তুমিই সামান্য অশ্বাবাসে জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশারূপ ধারণ করিয়া মহাপুরুষের সেই কথায়—"মেরেছিস্ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না!" পুনরুদ্ঘোষণা করিয়া বলিলে "একগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অন্যগণ্ড ফিরাইয়া দাও।" তাই শ্রীশ্রীগীতা বলিয়াছেন—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

জানি না তুমি কি এবং তুমি কে, তবে জগতের কেহ তোমাকে বলে ঈশ্বর, কেহ আল্লা, কেহ বা কালী, কেহ [illegible] ইহা [illegible]

বিভিন্ন [illegible] বিভিন্ন জাতি, তোমাকে তাহাদের ভাষায় আদর করিয়া যখন [illegible] সত্য ও আনন্দ পাইয়াছে তাহারা তোমাকেই তোমা [illegible] পাইয়া নিজেরা কিরূপ কৃতকৃতার্থ হইয়াছে।

আজ তোমায় কি ভাবে চাই দয়াময়? এই ভারতের ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠার

অন্ধকার ঘন ঘটাচ্ছন্ন মেঘাবৃত রজনীতে দূরে—অতিদূরে—একটী সামান্য বর্ত্তিকার রশ্মিও যেমন পথিকের মনের ভীতির যথেষ্ট লাঘব করিয়া আশার সঞ্চার উদ্দীপনা করে, তেমনই তুমি ভারতের অমানিশাতে মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া একবার মাতৃভাবে, জ্ঞানাদাত্রূপে কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে আবির্ভূত হও। তোমার জ্ঞানালোক স্পর্শে অন্ধকারের ভীতিময়ী অজ্ঞানান্ধকার যবনিকা দূরাপসারিত হউক!

তুমিই ত মা বলিয়াছ, "জ্ঞানাৎমুক্তি"। আজ ভারতবাসী তোমার দ্বারে রোগ, শোক, জর্জ্জরিত দেহে দাঁড়াইয়া, তোমারই চরণ তলে মাথা রাখিয়া যুক্তকরে রোগের মুক্তি এবং শোকের সান্ত্বনা প্রার্থী। আজ ভারতবাসীর নিকট তোমার যাবতীয়রূপ বা অবতারের বিকাশ ক্ষণিক স্তব্ধ থাকুক, কেবল তুমি তাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বমঙ্গলময়ী জ্ঞানদাত্রূপে 'প্রতীয়মানা হও!' তোমার কমল কোমল করস্পর্শে আজ তাহাদের অজ্ঞান কঠোর পাষাণ হৃদয় বিগলিত হউক। আর্য্যজাতি তাহার পুঞ্জীভূত প্রাচীন জ্ঞানের দ্বারোদ্ঘাটনের অধিকারী হউক; ইস্‌লামজাতি তাহার প্রাচীন গৌরবে, তোমারই স্পর্শে, গৌরবান্বিত হউক। তোমারই জ্ঞানাঞ্জন শলাকাস্পর্শে আর্য্য ও ইস্‌লামজাতির জ্ঞানচক্ষু পরিস্ফুট হউক। তোমারি মঙ্গল মন্দিরে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত ভারতের বিভিন্নজাতি অযথা বৈষম্য বিস্মৃত হইয়া যে যাহার অধিকার ভেদে তোমারই আরতি করুক। তারপর—

তারপর, জ্ঞানের শুভ্র জ্যোৎস্নাপুতালোকে, অজ্ঞানের যাবতীয় কালিমা রাশি বিদূরিত হইয়া যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভারতবাসী বুঝিবে তাহারা একই মায়ের স্তন্যে পরিপুষ্ট, বহিঃকর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান একই জাতি ভারতবাসী, আরও বুঝিবে যে, যাহারা গণ্ডীমধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ বা ক্রিশ্চিয়ান যে যাহাই অনুষ্ঠান করুন, মাধ্যাত্মিক যাবতীয় অধিকার ক্ষেত্রে তাহারা এক অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অম্লান একটা জাতি, তখনই জাতিগত সাম্যের ভিতর দিয়া শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে। তাই [illegible] তোমার [illegible] অন্যরূপের প্রকাশ চাই না, তুমি বিভিন্ন সময়ে-বিভিন্ন অবস্থায় [illegible] মনে—বিভিন্নভাবে প্রকাশ হইয়া তোমারই বিশ্বরাজ্যে কল্যাণ [illegible] আয় মা, আজ জ্ঞানদাত্রূপে কেবল কোটি [illegible] সমগ্র জগৎবাসী মানবের অন্তরে অভ্যুদয়ে বুঝি [illegible] জগতে ইস্ ভাই, পৃথিবীই একদেশ, সমগ্র মানব জাতিই এক জাতি।—হিন্দু ভাই, মুসলমান

নাই, খৃষ্টান নাই—আছে কেবল বিশ্বমাতার চরণে একটী মাত্র জাতি, সে মহাজাতি।

এই পৃথিবী স্বর্গাদপি গরিয়সী হউক এবং তখনই তুমি মোক্ষদা হইয়া, পৃথিবীর ঘরে, ঘরে অযাচিত মোক্ষ বিতরণ কর—আর আমরা তোমার চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিতে থাকি—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানরূপেন সংস্থিতা॥

শ্রীহেরম্বচন্দ্র চৌধুরী।

পূজারিণী।

গৃহবেদীর পূজারিণী অভিষিক্তা ওগো নারি!
আঁখি ভৃঙ্গারে পূরিত স্নিগ্ধ-অশ্রু অর্ঘ্য-বারি।
গুণ্ঠন তলে আবরিত চারু-বয়ান-ঘৃত-দীপ,
কমকর দুটী কুসুমমুষ্টি, তরুবর-তনু নীপ।
মঙ্গলারতি করিয়া বাজে শঙ্খের নিক্কণে,
ধূপের ধোঁয়ার সৌরভ ভার নিশ্বাস সমীরণে।
হোথায় দীপ্ত ললাটবিন্দু সিন্দুর অনুলিপ্তি,
কণ্ঠের রব ঋকের মন্ত্র, সামের ছন্দোনীতি।
লাজের রঙিমা কুঙ্কুম, ঘর্ম্মচন্দন সুশীতল,
স্নেহ প্রেম দয়া ষোড়শোপচার, সেবা ত্যাগ আদি ফল।
শান্তি বিজরিত দেহে অঙ্কিত সুন্দর আলিপনা,
হৃদি-মন্দির, মঙ্গল ঘট বক্ষে পরিকল্পনা।
আত্মা আহুতি, দুঃখ অনল সমিধ আত্মসুখ,
অঞ্জলি চাহি জাগিছে নেউলে হের, দেবি উন্মুখ।

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী।

"জাল মষ্টার"

(ছোট গল্প)

"সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।"

অনেক দিন পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, আমি চাকুরী ব্যপদেশে কাঁচড়াপাড়ার সন্নিকটস্থ একটী গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষকের পদ পাইয়াছিলাম। অবৈতনিক শিক্ষক কথাটা শুনিয়া হয় ত আপনাদের হাসি পাইবে, কিন্তু দুনিয়ার যখন সকলই সম্ভবপর হয়; তখন আমার পক্ষেও অবৈতনিক শিক্ষকের পদটা বাস্তবিকই সম্ভবপর হইয়াছিল। অবশ্য খোরাক পোষাক পাইতাম, আর মধ্যে মধ্যে বাটীর কর্ত্রীঠাকুরাণীর দুই একটা সারগর্ভ মন্তব্যও হজম করিয়া লইতাম। প্রথমতঃ এই অবৈতনিক শিক্ষকের একটী ছোট ছেলেকে পড়াইবার কথাই ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে খোকার ছোট বোন্ "মিনি" তস্য ভ্রাতা "পটল" ইত্যাদি আসিয়া জুটিল। যাহা হউক বাঙ্গালের প্রাণে সকলই সয়, আমারও কালক্রমে সকলই সহ্য হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিতেছি।

আমি যে বাটীতে পড়াইতাম, তাহার পাশেই একটা সরু গলিপথ ছিল। সেই গলি পাশেই আর একটা বাসা। সেই বাসার উত্তর দিকের জানালা হইতে আমার অবৈতনিক আফিসের আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই দৃষ্টিগোচর হইত। আমার বয়স তখন বাইশ কি তেইশ। সবেমাত্র যৌবনের প্রথম সোপানে আরোহণ করিতেছি। এমনি ভাবে একদিন, সায়াহ্নের স্তিমিত আলোকে একটী মৃদু গুঞ্জনধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। "পটলা" তখন "মিনির" মিহিদানার প্রায় অর্দ্ধেকটা শেষ করিয়াছে। মিনি তখনও মাষ্টার মহাশয়ের হতাশ চাহনির দিকে হা করিয়া চাহিয়াছিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে দুইটী কাল ডাগর চোক আসিয়া পাশের বাটীর জানালায় হাজির হইল। আমার প্রাণটা যে তখন কোথায় চলিয়াগিয়াছে তা স্বয়ং ব্রহ্মা লোক-পিতামহ আসিলে হয়ত বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আমি নির্নিমেষ নয়নে সেই রূপের প্রতিমা দেখিতেছিলাম, আর মধ্যে মধ্যে Beauty is love, love is Beauty

বলিয়া মনটাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিলাম। আমার প্রেমের কাহিনী তোমাদের বোধ হয় ভাল লাগিবে না, তাই একটু চাপিয়া গেলাম।

(২)

পরদিন সকাল বেলায় দেখি, এ হতভাগ্য অবৈতনিক শিক্ষকের টেবিলের উপর বিস্তর জলযোগের আয়োজন রহিয়াছে। আমার তখন ভ্যাবাচ্যাগা লাগিয়া গিয়াছে, কারণ অবৈতনিকের অদৃষ্টে জলখাবার দূরে থাকুক একপেয়ালা জল তাও কোন দিন জুটে নাই। আপেল কয়খানার সর্ব্বনাশ করিব মনে করিতেছি, এমন সময় দেখি কর্ত্তাঠাকুরুণ আমার সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। কর্ত্তাঠাকুরাণীর বয়স অবশ্য ত্রিশের উর্দ্ধে ছিল না। দেখতে শুনতেও ঐ একহারা রকমেরই ছিলেন, কিন্তু মুরুব্বিয়ানাতে অনেকটা বয়োজ্যেষ্ঠা হইয়া পড়িতেন। এদিকে বোল্ চাল্‌টাও হাজার টাকা মাসিক মাহিনা প্রাপ্ত রোজগারে স্বামীর স্ত্রীর উপযুক্তই ছিল। আমার কিন্তু কেমন ভয়ই হইত। হয় ত বা প্রহারই লাভ হয়। যাহা হউক সে দিবস বোধ হয় গ্রহরাজ আমার প্রতি একটু সুপ্রসন্ন ছিলেন। প্রথমই গৃহিণীঠাকুরুণ বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন "হ্যাঁ মাষ্টার! মেয়েটী দেখতে কেমন বল দিকি?"

আমি ত একেবারে অবাক্।

ক-ঠা।—"বল না মাষ্টার; তাতে দোষ কি? তুমি আমার পেটের ছেলের মত"। আমি তখন একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কোন পুস্তকেও এ পর্য্যন্ত পড়ি নাই যে ৩০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের ২২।২৩ বৎসরের ছেলে কি করিয়া থাকিতে পারে। আমি অনবরত মাথা চুলকাইতেই থাকিলাম। গিন্নি ঠাকুরুণ আস্তে আস্তে আমার হস্তে একখানা পত্র প্রদান করিয়া বলিলেন"—দেখনা মাষ্টার, বাবু গিরিদি থেকে তোমার মাইনে ঠিক করবার কথা লিখেছেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা না বলিয়া থাকাও অভদ্রতা বটে।

আমি—তা কোন্ মেয়েটির কথা বল্‌ছেন, মা?

ক-ঠা—আহা, ঐ যে আমাদের "অমলা"।

সবজজ বাবুর মেয়ে। যাহা হউক, প্রাণে কতকটা বল আসিল বটে দেখিতে দেখিতে সবজজ বাবুর সঙ্গেও আলাপ হইয়া গেল। সবজজ বাবুর স্ত্রীও আমাকে দশ-পাঁচ দিনের মধ্যে নাতনী জামায়ের মেরিয়া ফেলিলেন।

(৩)

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কেহই রোধ করিতে পারিবে না। আমার পক্ষেও

সে বিষয়ে কোন বাধা ঘটিল না। কোর্টসিপ আর বহুদূর অগ্রসর না হইয়াই উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। সব্যসাচী বাবু শিক্ষিত এবং অর্থশালী হইয়াও আমার মত গণ্ডমূর্খ কুলীন-কুলতিলক জামাতা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন, এবং বংশপরম্পরায় আমার পুত্রপৌত্রাদির ভার গ্রহণ করিলেন। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর অতিত হইতে লাগিল, আমিও এখন পাকাপাকি জামাই-গিরি সুরু করিয়া দিয়াছি। তবে বাঙ্গালের বুদ্ধিটা বড়ই সোজা ও সরল ছিল, তাই একদিন খুব ঠকিয়া গেলাম।

(৪)

শ্বশুর মহাশয়, পেন্সন নিয়া নিজ এবং তাহার পৈতৃক সম্পত্তি, কোম্পানীর কাগজাদি লইয়া কলিকাতায় বাটিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি আমাকেই সমস্ত কাজ কর্ম্ম একরূপ দেখিতে হইত। অবৈতনিক মাষ্টারের উপরে হঠাৎ একদিন মাষ্টার ঠিক করিবার ভার পড়িল। আমার একটা দোষ ছিল হঠকারিতা, তা ছাড়া লোক আমাকে বেশ ভালই বলিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে একদিন চুপ করিয়া নীচের ঘরে বসিয়া আছি, শ্বশুর মহাশয়ের সেদিন একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল। তখন "শালাবাবু" আসিয়া বলিলেন,—"আমার মাষ্টার কি হ'ল জামাই বাবু?" আমি অমনি চট্‌পট্ করিয়া বলিলাম "এই বসো, আমি আজই খোঁজ করব। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তিনি বেথুন কলেজের প্রফেসর, তিনি তোমাকে অঙ্ক, ইংরেজি এবং সংস্কৃত, সবই পড়াইতে পারিবে।

খোকা বলিল—"তাহলে ত দেখছি, আপনি এক পয়সায় তিন তামাসা দেখাবেন"। সেদিন ঐ পর্য্যন্তই হইয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতে বেথুন কলেজের অধ্যাপক যোগেন্দ্রবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি কয়েক দিন বেশই পড়াইলেন,—পরিচয় দিলেন, বাটী বর্দ্ধমান ফার্ষ্টক্লাস এম্, এ। ক্রমে আমাদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হইল। গ্রীষ্মের ছুটিতে খোকা একেবারে মাষ্টার বাবুকে লইয়া গিরিধির মাসী বাড়ীতে বেড়াইয়া আসিল। মাষ্টার বাবু ত্রিসন্ধ্যার গায়িত্রী জপ এক সন্ধ্যাতেই সারেন। সেক্সপিয়র, বাইরণ ঘন ঘন কোট্ করেন খোকা শীঘ্রই মাষ্টার বাবুকে লইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিল। কলেজে তখন পড়া শুনা রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। একদিন "ভিকন" বলিল "জামাইবাবু! একঠো বাবু আপকো তালাসমে আয়া"। নীচে যাইয়া দেখি একটি চোগা, চাপকান পরা ভদ্রলোক, আমাকে

দেখিয়া হাত উত্তোলন পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জানিলাম, তাঁহার নাম যোগেন্দ্রবাবু, অর্থাৎ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বেঙ্গল কলেজের অধ্যাপক, এক ভদ্রলোকের একখানা পত্র লইয়া, শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। এদিকে মাষ্টার আসিয়া হাজির, তখন সময় ফাঁক্ হইয়া গেল। আমাদের মাষ্টার বি-এ, পাস, তিনি প্রফেসরগিরী কখনও করেন নাই, নামও বদলাইয়াছেন। তখন "মাষ্টার" আমাদের পা জড়াইয়া ধরিলেন। আমরা তখন শ্বশুরের ব্যাপার গোপনে সমাধান করিয়া মাষ্টারকে বিদায় দিলাম। বহুদিন পরে "ওয়াল্টেয়ারে" একবার "জালমাষ্টারের" সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। "জালমাষ্টার" তখন একটী ব্রাহ্মিকার জালে জড়াইয়া বঙ্গোপসাগরের একটা "রকের" উপর, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়, বাঁশী বাজাইতেছিল, সেদিনকার দৃশ্যটা অদ্যও প্রাণের ভিতর—স্মৃতির সৌরভ জাগাইয়া দিতেছে। নীল সাগরের, নীলজলে, চাঁদের জ্যোৎস্না, ঢেউয়ের তালে তালে নাচিয়া বেড়াইতেছিল। আর সেই সাগরজলে, সাগরবালার অপূর্ব্ব সঙ্গীত-তরঙ্গের তালে তালে, লহরে লহরে, উজান বহিয়া যাইতেছিল। সেদিন সত্যি সত্যি আমি জাল মাষ্টারের সব জালিয়াতি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহারাও আমা প্রীতে মিলিয়া, আমায় খুবই যত্ন করিয়াছিল।

শ্রীসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যবসা ও চাকুরী।

স্বাধীনভাবে আয়জনক কিছু করার নাম ব্যবসা। এই সংজ্ঞা মতে দোকানদারী, দালালী, ওকালতি, ঠিকাদারী বা কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতি ব্যবসা। যে অন্যের ফরমাস মত জিনিষ সরবরাহ করে সেও ব্যবসা করে; যে নিজের মূলধন ভাঙ্গিয়া ধার দেয় অর্থাৎ মহাজনী, ব্যাঙ্কিং বা তেজারতী করে সেও ব্যবসা করে, অর্থাৎ অন্যের বেতনভুক না হইয়া স্বাধীনভাবে কোন প্রকার আয়জনক কার্য্যে নিযুক্ত থাকার নাম ব্যবসা।

চাকুরী অন্যরূপ। অপরের মাহিনা খাইয়া কার্য্য করার নাম চাকুরী, যাহারা দোকানদারের, দালালের, উকিলের, জিনিষ সরবরাহের, বা মহাজনের বেতন ভোগী হইয়া কার্য্য করে তাহারা কর্ম্মচারী বা চাকুরে, ইহা ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের চাকুরীও আছে, যেহেতু গবর্ণমেণ্ট একটা ব্যবসা নহে সেইজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ব্যবসার সম্পর্কে সরকারী চাকুরীর আলোচনা করি নাই।

ব্যবসায়ের গৌরব কেন? আর চাকুরীই বা কেন অগৌরবের?

ধরা যাউক ঠিকাদারের কথা। একজন ঠিকাদার একখানা বাটী প্রস্তুত করিবার ভার পাইয়াছেন। উহার জন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইবেন। অবশ্য যেরূপ মাল মসলা দ্বারা গৃহ প্রস্তুত হইবে সেই বিষয় উভয়পক্ষে কথা ঠিক্ ঠাক হইয়া গিয়াছে; ঠিকাদার তাহা হইতে ন্যায়তঃ একচুলও নড়িতে পারেন না, সকল কার্য্য ঠিকাদার নিজে করিতে পারেন না তাঁহার কর্ম্মচারী রহিয়াছে। তিনি যেখানে একনম্বর ইঁটের কথা ছিল সেখানে তিন নম্বর ইঁট দ্বারা কার্য্য করাইলেন। তাঁহার প্রভুভক্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ ঐরূপ কার্য্য করিল। কিন্তু চুরির খবর তাহারা জানে না। গৃহের মালিক গৃহ বুঝিয়া লইল; তিন নম্বর ইঁটের ভিতরকার পয়লা নম্বর চুরি ধরিতে পারিল না, ঠিকাদার স্বাধীন ব্যবসায়ী, তাহার অধীন বেতনভুক কর্ম্মচারীবৃন্দ নগণ্য মাহিনার চাকর, স্বাধীন ব্যবসায়ী বলিয়া কি তাহার এই চুরী অন্যায় নহে, আর তাহার কর্ম্মচারীগণ ক্ষুদ্র ও বেতনভোগী বলিয়া কি তাহারা ও তাহাদের কার্য্য হেয়? স্বীকার করিতেই হইবে এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী হেয় আর তাহার কর্ম্মচারীবৃন্দ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে

নীতির দিক্ দিয়া সকল ক্ষেত্রে ব্যবসা শ্রেষ্ঠ নহে, আর সকল ক্ষেত্রে চাকুরী ও হীন নহে।

এইখানেই বলিয়া রাখিতেছি যে, আমরা নীতির দিক্ দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিব, আমাদের আদর্শ হইতেছে নৈতিক আদর্শ।

বর্ত্তমান কালের ব্যবসা একটু তলাইয়া দেখিলে ইহাই কি চোখে পড়ে না যে এইরূপ অন্যায় প্রতিদিন ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবল হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। দেখা যায় না কি যে প্রতি যোগীতাক্ষেত্রে অপর সকলকে হটাইবার জন্য একজন কর্ম্মকর্ত্তাকে (officer in cherge) ঘুস দিয়া কাজ বাগাইতেছে। প্রায়ই শুনা যায় যে মিউনিসিপালিটীর নির্ম্মাণ কার্য্যে যতটা খরচ হয় তাহার অর্দ্ধেক ঘুসেই ব্যয় হয়। নানা অন্যায় উপায় স্বাধীন ব্যবসায়ীগণ এইরূপে আপনাদের ব্যবসা গৌরবময় করিয়া তুলিতেছেন? অথচ তাহারা সমালোচনার বাহিরে কারণ স্বাধীন ব্যবসায়ী।

স্বীকার করিতেই হইবে, ব্যবসায়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অন্যায় রহিয়াছে, এই অন্যায়ের জন্য একদিকে ব্যবসায়ী যেমন দায়ী জ্ঞাতসারে এই অন্যায়ের সাহায্যের জন্য তাহার কর্ম্মচারীবৃন্দ দায়ী, অবশ্য কোন কর্ম্মচারী অজ্ঞাতভাবে তাহার প্রভুর অন্যায়ের সাহায্য করিলে তাহাকে দোষী করা যায় না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, একই অন্যায়ে স্বাধীন ব্যবসায়ী ও অধীন কর্ম্মচারী জড়াইয়া পড়িতেছে। ব্যবসার তত্ত্বটাই গৌরব তত্ত্বটা তাহাতে সাধুতা আছে ও ভাল করিবার স্বাধীনতা আছে, অন্যায় করিবার স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলা চলে না এবং তাহাতে গৌরবও কিছু নাই।

যাহারা চাউলের সহিত ধূলা ময়দার সহিত প্রস্তর চূর্ণ, ঘৃতের সহিত চর্ব্বি বা সরিষার তৈলে ভেজাল দিতেছেন তাহারা সকলেই স্বাধীন ব্যবসায়ী, তাই বলিয়া ইহাদের স্বাধীনতায় গৌরব করিবার কিছুই নাই, বরং তাহাদের স্বাধীনতার অপব্যবহারে অগৌরবের যথেষ্ট আছে।

যে ব্যবসা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার মালিক ও কর্ম্মচারী উভয়ই দোষী। মালিকের অপরাধ বেশী কারণ মূলধন ও কার্য্যকুশলতা উভয়ের সাহায্যে প্রবলভাবে তিনি অন্যায় করিতেছেন; কর্ম্মচারীর অপরাধ অল্প কারণ অল্প পরিসর ক্ষেত্রে তাহার অন্যায় বদ্ধ, কিন্তু উভয়ই দোষী।

আবার যে ব্যবসা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার মালিক বিস্তৃত ক্ষেত্রে আপনার কার্য্যের সুফল চিন্তায় করিতেছেন। কর্ম্মচারী অল্পপরিসর ক্ষেত্রে

ভাল, কার্য্য করিবার অবসর পাইতেছেন। উভয়ই সাধু—একজন বিস্তৃত ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছেন, অপর সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে আংশিকভাবে কার্য্য করিতেছেন।

যতগুলি ব্যবসা আছে সবগুলিতেই কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। কতগুলি ব্যবসা ভাল কতগুলি মন্দ। এমন করিয়া ভাগ করা চলেনা যে এই জাতীয় ব্যবসা-গুলি ভাল অপর জাতীয়গুলি মন্দ। কারণ ব্যবসার ভাল মন্দ মালিকের ভাল মন্দের উপর নির্ভর করে। আবার মালিকের ভাল মন্দের উপর তাহার কর্ম্মচারীর ভাল মন্দ অনেক সময় নির্ভর করেনা তাহা নহে। তবে ভাল ব্যবসায় মন্দ লোক এবং মন্দ ব্যবসায় ভাল লোক যে অস্থায়ীরূপে কার্য্য করিতে পারেনা এমন নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে স্বাধীনতা কোনখানে? ব্যবসায়ী কি সম্পূর্ণ স্বাধীন? যাহারা ব্যবসা করেন তাহারা সকলে জানেন যে কতভাবে কত লোকের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। ব্যবসার বাধ্য বাধকতা অনেক। ব্যবসা করিলে এইগুলি মানিয়া চলিতে হয়। ব্যবসায়ী স্বাধীন বলিয়া অসময়ে দোকান খুলিলে কেহ কিনিতে আসিবে না। আর ব্যবসায়ী স্বাধীন বলিয়া অপর লোক ত তাহার অধীন নহে। যাহারা তাহার সম্পর্কে আসিতেছে, তাহারা ক্রেতা হিসাবে অন্যান্য ব্যবসায়ী হিসাবে তাহারই মত স্বাধীনভাবে তাহার নিকট আসিতেছে। সুতরাং এ স্বাধীনতা আপেক্ষিক।

চাকুরের স্বাধীনতাও আপেক্ষিক। তবে তাহার স্বাধীনতা ব্যবসায়ীর স্বাধীনতার মত বিস্তৃত ক্ষেত্রে বৃহৎভাবে আপেক্ষিক নহে। তাহাকে একজন, দুইজন বা মুষ্টিমেয় লোকের কথায় চলিতে হয়। চাকুরী করিতে হইলে প্রভুদের কথা মানিয়া চলিতে হয়, নির্দ্দোষ মত কাজ করিতে হয়।

এই স্বাধীনতার দিক দিয়াও বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাই উভয়ের স্বাধীনতা আপেক্ষিক—একজনের ক্ষেত্র বিস্তৃত, অপরের কর্ম্মক্ষেত্রের পরি-সর কম। অনেক সময় তর্ক উঠে যে, চাকুরের স্বাধীনতা একবারেই নাই কারণ পরের মতানুযায়ী তাহাকে কাজ করিতে হয়। স্বীকার করি পরের মতানুযায়ী কার্য্য করিলে স্বাধীনতা খর্ব্ব হয় কিন্তু সে অর্থে ব্যবসায়ী কি পরের মত এড়াইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম? তাহার দশ জনের দিকে চাহিয়া চলিতে হয় কারণ, তাহার ব্যবসা দশ জনকে লইয়া, দশ জনের মত তাহার মতের অনুকূল না হইলে, তাহাকে তাহাদের মত মতই কার্য্য করিতে হইবে, যদি তাহার ব্যবসা চালাইবার ইচ্ছা থাকে এবং ব্যবসা

ত্যাগ করিবার ইচ্ছা না থাকে। প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই যখন ব্যবসায়ীর মত ও কার্য্যের সহিত তাহার সম্পর্কীয় অপর দশজনের মত ও কার্য্যের ঐক্য হইয়াছে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে এই ঐক্য যখন ন্যায়ের ঐক্য, তখনই ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নামের যোগ্য অন্যথা নহে। চাকুরের পক্ষে কি এরূপ স্বাধীনতা সম্ভব নহে? তাহার সহিত কি তাহার প্রভুর এরূপ একটা মত ও কার্য্যের ঐক্য সম্ভব নহে? এরূপ প্রতিদিনই হইতেছে। প্রতিদিন আমরা দেখিতেছি, যে ভৃত্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রভুর দল আপনাদের কার্য্য চালাইতেছেন। অকর্ম্মণ্য প্রভুদের কথা বলিতেছিনা, যাহারা অনলস, বিচক্ষণ ও ধুরন্ধর তাহাদের কথাই বলিতেছি। এই স্থলে প্রভু ভৃত্যে মত কর্ম্মের মিলন হইয়াছে। এই মিলন হইয়াছে বলিয়াই ভৃত্য এখানে স্বাধীন হইয়াছে। সে যখন তাহার মনের মত কার্য্য পাইয়াছে ও করিতেছে তখন তাহার অধীনতা কোথায়? অবশ্য এই মিলন সত্যকার মিলন হওয়া চাই। গোঁজা মিলন বা অন্যায়ের মিলন হইলে চলিবেনা। গোঁজা মিলন অর্থ হইতেছে দাস্তের মিলন অর্থাৎ কেবল মাত্র চাকুরীর জন্য মিলন এই মিলনই আজ সংসারের বেশী দেখিতে পাওয়া যায় তাই চাকুরী হীন বলিয়া উল্লিখিত হয়। চোর ব্যবসায়ীর সহিত চোর ভৃত্যের মিলনকে অন্যায় মিলন বলিব। এইরূপ মিলনের স্বাধীনতা অন্যায় করিবার স্বাধীনতা সুতরাং যথেচ্ছাচার। ইহা নীচ ও ঘৃণিত। এ সত্যকার মিলন নহে; ইহা নীচ স্বার্থের ঘনিষ্ঠতা।

ব্যবসা ও চাকুরী উভয়ের মধ্যে ক্রমের (Digree) ব্যবধান এক হইতে অপরের পরিণতি। একের উপর অপর নির্ভর করিতেছে।

প্রত্যেক জাতীর অতীত ও বর্ত্তমান হইতে দৃষ্টান্ত লইয়া প্রমাণ করা যায় যে যাহারা চাকুরী দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেন বা করেন তাহাদের মধ্যে অনেক মনিষী রহিয়াছেন। আবার ব্যবসায়ীর মধ্য হইতে দৃষ্টান্ত বাহির করিয়া লইয়া যে প্রমাণ করা চলেনা তাহাদের মধ্যে অনেক পাষণ্ড ছিলেন বা আছেন এমন নহে। সুতরাং এক কথায় ব্যবসা ও চাকুরী ইহাদের এককে ভাল বা মন্দ বলা চলে না।

তবে আমাদের দেশে যে ব্যবসাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় তাহা কি ভুল? কখনই নহে। আমরা বাঙ্গালী কেবলমাত্র চাকুরী করিতে চাহি, আর কিছু করিতে চাহি না সেইজন্যই আমাদের অধঃপতন, ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিণ ও জাপানী ব্যবসা করে ইহা সত্ত্বেও কি একথা সত্য নহে যে উহা [illegible]

অপেক্ষা চাকুরের সংখ্যা অনেক গুণ অধিক। মহাজনের (capitalist) সংখ্যা অল্প বলিয়াই চাকুরে অর্থাৎ যাহারা গায়ে খাটিয়া বা মাথা খাটাইয়া রোজগার করে তাহাদের সংখ্যা বেশী। ইংরাজ প্রভৃতি জাতিগুলিকে কেহ ত চাকুরে বলিয়া নিন্দা করে না, কারণ তাহারা ব্যবসা ও চাকুরী উভয়ই করে। তাহারা নিজেদের ব্যবসায় নিজেরা চাকুরী করে, বাঙ্গালী, আমরা কেবল চাকুরী করি তাহাও পরের ব্যবসায় যাইয়া। বিদেশী ব্যবসায়ীদের সহিত আমাদের প্রকৃত ইষ্টের যোগ নাই, উদ্দেশ্যের মিলন নাই অথচ আমরা তাহাদের চাকুরী করি-উপস্থিত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নগদ মাহিনার লোভে আমরা চাকুরী করি। আমাদের চাকুরীর লজ্জা লম্বা সেলামে আরম্ভ হইয়া পদলেহনে গিয়া শেষ হয়। তাই চাকুরীকে সকলে হীন বলে, সত্যই বলে ইহাতে অত্যুক্তি কিছুই নাই। আমাদের প্রভুভক্তি কুকুরের প্রভুভক্তি হইতেও গভীর। আমরা চাকুরীর জন্য সমস্তই করিতে প্রস্তুত হই, আমরা চাকুরী করিতে যাইয়া কেবল শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিক্রয় করি না আমাদের নীতি ও মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দি। এইজন্যই আমাদের চাকুরী দাসত্ব ছাড়া আর কিছু নয়, চাকুরীর স্তর হইতে কোনকালে ব্যবসায়ীর স্তরে উঠিবার আশা আমাদের মনে জাগ্রত হয় না। গভীর নিরাশায় চাকুরীই আমাদের চরমগতি হইয়া দাঁড়ায়। চাকুরীতে আমাদের জীবনের আরম্ভ, উহাতেই শেষ। এইজন্যই আমাদের চাকুরী হীন, ঘৃণিত ও অগৌরবের।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব।

(১)

দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর নিজস্ব বস্তু। পশ্চিমের হিন্দুরা আমরা যাহাকে দেবীপক্ষ বলি সে সময়ে রামলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। এই রামলীলাও দেখিবার বস্তু। এই বাৎসরিক উৎসব পশ্চিমের হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে রামায়ণী কথার স্মৃতি জাগাইয়া রাখে। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসকেরা এই রামলীলার আশ্রয়ে আপনাদের ভক্তিভাবেরও অনুশীলন করিয়া থাকেন। এ ভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার দাস্য ভক্তি। রামলীলাতে শ্রীহনুমানই ভক্তের আদর্শ। অন্তরে নিত্য ইষ্ট-দেবতার সহবাস, বাহিরে তাঁহার লৌকিক লীলার স্মরণ ও মিলন ইহাই এই দাস্য ভক্তির প্রধান উপজীব্য। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তেরা রামলীলার অভিনয়ে এই রস আস্বাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর ভক্ত বেশী কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—লাখে না মিলয়ে এক। রামলীলার মেলাতে যে লোক-সংহট্ট হয় তাহারা কেবল রং-তামাসা দেখিতেই যায়। এই রং-তামাসাও হেয় নহে। ইহার ভিতর দিয়া লোকশিক্ষা হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে এইরূপ যাত্রাদির সাহায্যেই লোকশিক্ষা বিস্তার হইত। এই জন্যই বর্ণ-পরিচয় লাভ না করিয়াও আমাদের দেশের জনসাধারণের মনের ও মনুষ্যত্বের এমন বিকাশ সাধিত হইয়াছে, যাহা ইউরোপ, আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে আজিও দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেবীপক্ষে বা দশরা উপলক্ষে পশ্চিমে যেমন রামলীলার অভিনয় হয়, দক্ষিণে সেই বীরপূজাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমরা যাহাকে মহাষ্টমী বলি, দক্ষিণে-তেলেগু, তামিল ও মহারাষ্ট্র দেশে তাহাকেই অষ্টমহাষ্টমী কহিয়া থাকে। এই দিনে সেদেশের হিন্দুরা বীরপূজা ও বীরভুবনেশ্বরী প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপে দশরা সমগ্র হিন্দু-ভারতের একটা পর্ব্ব হইয়া আছে। কিন্তু বাংলায় যেমন দুর্গোৎসব হয়, এমনটি আর হিন্দু ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া

(২)

দেবীর দশভুজা মূর্ত্তি গড়িয়া আর কেহ এমন উদ্বেলিত ভক্তিভরে, এত মহাসমারোহে সমাজের সকল শ্রেণীকে সৌহার্দ্দ্য পাশে চারিদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া আর কোথাও এমন আনন্দোৎসব হয় না। প্রথম যৌবনে ইংরাজী শিখিয়া পাশ্চত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে পড়িয়া বাঙ্গালীর এসকল উৎসবাদিতে বহুদেবোপাসনাও পৌত্তলিকতা ভাবিয়া কেহ বা বর্জ্জন করিয়া, আর প্রায় সকলেই হেয়জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিলাম। বিদেশীয়েরা আমাদিগকে যে বুলি পড়াইতেন, তখন তাহাই অবিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতাম। সে শিক্ষা আপাতঃ সত্য ছিল, ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। হিন্দু মাত্রেই দেবদেবীর ভজনা করেন। আর প্রত্যেক দেবদেবীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্যরূপেও বরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে যে বহুদেবোপাসনা বিহিত হইয়াছে, এ কথা উড়াইতে দিতেও পারা যায় না। কিন্তু এসকল দেবতার প্রকৃত অর্থ কি, সেকালে আমরা তাহা জানিতাম না। "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—এক ও অদ্বিতীয় এবং অবিভাজ্য ও অখণ্ড সত্য বস্তুকেই বিপ্রেরা বিবিধনামে অভিহিত করিয়া থাকেন, এই শ্রুতি বাক্য তখনও আমরা শুনি নাই। বেদের নামমাত্র জানিতাম; বেদে নৈসর্গিক শক্তির পূজা করিয়াছেন এ কথা শুনিয়াছিলাম। আর এসকল শক্তি এক নহে বহু, ইহাও জানিতাম। সুতরাং বেদে বহু দেবতার উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তখন আমাদের এরূপই বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল। উপনিষদের কথা, কি প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কি নব্যশিক্ষিত ইংরাজী নবীশেরা কেহই প্রায় জানিতেন না। সুতরাং বৈদিক দেববাদের যে সমাহার ও সমন্বয় উপনিষদ করিয়াছেন, তাহার খোঁজ খবর তখনও পাই নাই। বৈদিক মীমাংসাশাস্ত্র আমাদের একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে যুগে যুগে সাধক, তত্ত্বজ্ঞানী এবং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা পূর্ব্বাপরের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গের এবং সাধনাঙ্গের অভিব্যক্তিধারাকে যেভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহার কথা সেকালে আমরা ইংরাজীনবীশের দল কিছুই জানিতাম না। সুতরাং ইংরাজ আমাদিগকে আমাদের স্বদেশের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা শিখাইত, তাহার আপাতঃ যুক্তিযুক্ততা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই প্রামাণ্য সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এইজন্যই প্রথম বয়সে স্বদেশের লৌকিক ধর্ম্মকর্ম্মকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম।

যাঁহারা এসকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহারাও যে এসকলের সত্য অর্থ ও মর্ম্ম নিজনিজের অনুভবে ধরিতে পারিতেন না, কেবল নিজেদের "কোমল" শ্রদ্ধার বলেই ভক্তিমান লোকে এসকল ক্রিয়াকাণ্ডের সাহায্যে নিজেদের অন্তরের স্বাভাবিকী ভক্তির অনুশীলন ও তৃপ্তিসাধন করিতেন। শাস্ত্রযুক্তি না জানিয়াও ধর্ম্মে এবং ভগবানে যে স্বাভাবিকী আস্তিক্য-বুদ্ধি থাকে তাহাকেই "কোমল" শ্রদ্ধা কহিয়াছেন। এই কোমল শ্রদ্ধাবান উপাসককে শাস্ত্রে নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়াও প্রচার করিয়াছিল। তবে ইহাও কহিয়াছেন যে এই কোমল শ্রদ্ধা যাহার আছে,—

"ক্রমে ক্রমে তিহোঁ ভক্ত হইবেন উত্তম।"

দেশের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের আশ্রয়ে এইরূপে কি শাক্ত কি বৈষ্ণব অনেক কোমল শ্রদ্ধাবান্ উপাসক উত্তম ভক্তিলাভ করিতেন। তাঁহাদের ভক্তির আকর্ষণে এই পথে তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভও হইত। তবে এ সকল সাধকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। ইহারাই কিন্তু আবার প্রাচীন সমাজে সত্য ধর্ম্মবস্তুর প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই শ্রেণী কালীভক্তের দেখা যে একেবারে পাই নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের নিগূঢ় ধর্ম্মজীবনের উদ্ঘাটনের অধিকার তখনও জন্মে নাই। সুতরাং ইঁহাদিগকে দেখিয়াও স্বদেশের প্রচলিত ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

(৩)

এখনও যে সকল সাধনতত্ত্বের কথা বুঝিতে পারিয়াছি এমন স্পর্দ্ধা করি না। কিন্তু যৎসামান্য যাহা বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয়, তাহাতেই বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মকে বহুদেবোপাসনা বা জড়পূজা বলিতে আর সাহস হয় না। বাঙ্গালার চাষাও এই দুনিয়ার মালিক যে এক নহেন বিনা বহু একথা বলে না। সে কখনও শিবমন্দিরে যাইয়া শিবলিঙ্গের নিকটে প্রণাম করে; কখনও বা বৈষ্ণবের আখড়ায় যাইয়া রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির সমক্ষে দণ্ডবৎ করে; দুর্গোৎসবের সময় দুর্গাপূজা করে; দীপান্বিতার দিনে কালীপূজা করে; আবার রাসের দিনে এবং জন্মাষ্টমীতে রাধাকৃষ্ণের ভজনও করিয়া থাকে। এ-সত্ত্বেও কোনও দিনই দুনিয়ার মালিক যে, শ্রীভগবান ছাড়া আর-কেহ আছে এরূপ কল্পনা করে না। বাঙ্গালী হিন্দু বহুদেবদেবীর পূজা-অর্চ্চনা করিলেও খাঁটী একেশ্বরবাদী। বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব কহেন। রাধাকৃষ্ণ দুই নহেন, কিন্তু এক। লীলা-প্রবোজনে দুই হইয়া থাকেন। শাক্তেরা ত খাঁটী ব্রহ্মজ্ঞানী। অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধান্তের

উপরেই বাংলার শক্তিপূজা গড়িয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টি ধরাতে এই অখণ্ড-চৈতন্য ব্রহ্মবস্তুই পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হইয়া এই বিশ্বপ্রবাহকে রক্ষা করিতেছেন। বাঙ্গালী শাক্তেরা ঘোরতর অদ্বৈতবাদী। কৈবল্য মুক্তিই তাঁহাদের সাধ্য। ব্রহ্ম-লয়ই এই মুক্তির লক্ষণ। দ্বৈতবুদ্ধি নিঃশেষ নিরস্ত না হইলে এই কৈবল্য লাভ হয় না। দেবদেবীর পূজা নিম্ন অধিকারীর জন্য দেহশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি লাভের উপায়রূপে বিহিত হইয়াছে। এ সকল দেবদেবীর পূজার অজুহাত,

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

সাধকদিগের সাধনার সহায়স্বরূপ তাহাদিগকে সিদ্ধিপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় যে ব্রহ্ম তাঁহার রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। কথাটা বহুদিন পূর্বে আর একবার কহিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণ লোকে এই শ্লোকের ঠিক অর্থটা তলাইয়া দেখেন না। সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। এখানে প্রথম প্রশ্ন উঠে সাধক কাহারা? যাহারা সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই সাধক। সিদ্ধি এখানে কৈবল্য মুক্তি। এই মুক্তির কেবল অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই লাভ হয়। এই মুক্তির আর অন্য পথ নাই। যাঁহারা এই মুক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধক। সর্ব্বত্রই এরূপ সাধকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। হাজার মনুষ্যের মধ্যে কেহ কদাচিৎ এই সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করেন। সুতরাং যাঁহারা প্রচলিত মূর্ত্তি পূজাদি করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলে যে সাধক একথা কিছুতেই বলা যায় না। আর সাধক নহেন বলিয়া এই পূজাতে তাঁহাদের অধিকারও নাই। এতাবৎকাল যে আমরা শুনিয়া আসিয়াছিলাম যে নিম্ন অধিকারীর জন্য এ সকল পূজা-পদ্ধতি বিহিত হইয়াছে, এ কথাটা সত্য নহে। বাঙ্গালার মূর্ত্তি-পূজা বা প্রতিমা পূজার অধিকারী সকলে নহে। যাঁহারা সাধক তাঁহারাই কেবল এই পূজার অধিকারী।

যাঁহাদের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, তাঁহারাই সাধক। এই সাধ্য ব্রহ্ম। সুতরাং যাঁহাদের মনে ব্রহ্ম-পিপাসা উদয় হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই কেবল সাধক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। কেবল তাহাই নহে। এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা প্রথম এই বিশ্ব সমস্যায় সম্মুখীন হইয়া মানবের মনে জাগিয়া উঠে। মানুষ এই জগৎপ্রপঞ্চের তিনটী অবস্থা লক্ষ্য করেন প্রথম যাহা ছিল না পূর্ব্বে তাহা হইল, দ্বিতীয় যাহা জন্মিল তাহা রহিয়া গেল, তৃতীয় যাহা জন্মিয়াছিল এবং

রহিয়াছে তাহা ক্রমে তিরোহিত হইয়া গেল। এই অবস্থাত্রয় দেখিয়া মনে প্রশ্ন উঠে,—যাহা ছিল না, তাহা জন্মিল কোথা হইতে? যাহা জন্মিয়া কোথা থাকে কাহার আশ্রয়? যাহা আছে তাহা তিরোহিত হইয়া গেল কোথায়? বিশ্বসমস্যার এই অবস্থাত্রয়কেই বেদান্ত "জন্মাদস্য যতঃ" কহিয়াছেন। অর্থাৎ জগতের জন্মস্থিতি ও লয় যাঁহা হইতে ও যাঁহাতে তাহাই ব্রহ্ম। ইহাকে সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান কহা যায়। ভৃগু-বারুণী সংবাদে

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যাভিসংবিশন্তি
তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম

অর্থাৎ যাহা হইতে এ সকল ভূতগ্রাম জন্মিয়াছে, জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা এই ভূতগ্রাম জীবিত রহে, অন্তিমে যাঁহাতে এই ভূতগ্রাম প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষভাবে জানিতে চেষ্টা কর, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই বিশেষ জ্ঞানলাভ করাই সাধনের উদ্দেশ্য। "জন্মাদ্যস্য" সূত্র যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করেন, সে ব্রহ্মকে আমরা আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং মন ও বুদ্ধির দ্বারাই ধরিতে পারি। এই জন্যই বরুণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগুকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে যাইয়া কহিয়াছেন যে "এই সকল ইন্দ্রিয়, এই মন এবং বুদ্ধিই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়।" সকল মানুষেই নিজেদের সাধারণ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের প্রতি একটু মনোনিবেশ করিলেই এই সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। কিন্তু এরূপে যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে একটা অনির্দ্দিষ্ট অজ্ঞেয় তত্ত্বমাত্র। এই জ্ঞান সম্বন্ধেই শ্রুতি কহিয়াছেন :—

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে

এই ব্রহ্ম আছেন, এইমাত্র বলিতে পারা যায়; তাঁহার বস্তুতন্ত্রিক উপলব্ধি সম্ভবে না। কিন্তু ধনিতে মণি আছে শুধু জানিলে যেমন দরিদ্রের দুঃখনিবারণ হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম আছেন, যাহা হইতে জগতের জন্মাদি হইয়াছে এই কথা জানিলেই সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। আর এই সাধারণজ্ঞানের দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরে মুমুক্ষু মানুষ ব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আকুল হয়। এই জ্ঞান লাভের আর কোনও পথ নাই। অন্যত্রের বা অন্যমুখীন ব্রহ্মজ্ঞানের পথ ব্যতিরেকী পথ। এই ব্রহ্মোপাসনা [illegible]

উপাসনা। এই পথের সঙ্কেত, এই উপাসনার সূত্র "নেতি নেতি"। অর্থাৎ যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতেছি তাহা ব্রহ্ম নহে।

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি

এই দৃশ্যমান জগতে তাঁহার রূপ নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। হৃদয়ের দ্বারা এবং মনের দ্বারা যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই পথে ব্রহ্মকে সাক্ষী-চৈতন্যরূপে অন্তর্যামী: অন্তরাত্মারূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এ পথ ধ্যানের পথ। এ পথের পরিণতি সমাধিতে। এই সমাধিতে যাবতীয় বহির্নিন্দ্রিয়ের চেষ্টা নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়। এই সমাধিতে দ্রষ্টা বা আত্মা নিজের স্বরূপে অবস্থিতি করেন, শুরুশাস্ত্রমুখে এ সকল কথা শুনিয়াছি। সমাধিভঙ্গে সাধকের বহির্নিন্দ্রিয়-চেষ্টা পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে সমাধিতে তিনি যে তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আমেজমাত্র মাত্র প্রাণে থাকে, কিন্তু আর সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপ্রতিহতভাবে উজ্জ্বল রহে না। এ অবস্থায় সাধক, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা যায় না, তাহাকেই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠেন। সমাধিতে যে বিশ্ব-বিমোহন রূপ দেখিয়া তাঁহার অন্তরের রসসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অলখ-নিরঞ্জনরূপকেই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন। ইহাই সাধকের বিরহের অবস্থা। আর এই ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের ব্যবধান নষ্ট করিয়া যাহার রূপ চোখ দিয়া দেখা যায় না, তাহাকেই চোখ দিয়া ধরিয়া মনপ্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য অরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহার রূপকল্পিত হইয়া থাকে। ইহাই

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা

সাধকদিগের হিতের জন্য অরূপ ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়, এই প্রচলিত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই আমাদের প্রতিমাপূজা নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। যে যাহাকে জানে না, সে তাহার রূপের কল্পনা করিবে কিরূপে?

প্রশ্ন উঠে, তোমরা যে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা কর, তাহার সঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপের কোনও সম্বন্ধ আছে, কি নাই? যদি না থাকে, তাহা হইলে এ কল্পনা সত্য

পেত নহে; সত্যের উপরে এই কল্পনার প্রতিষ্ঠা হয় না। এ কল্পনা বন্ধ্যার পুত্রবৎ, নৃগৃঙ্গবৎ, আকাশকুসুমবৎ—বন্ধ্যার পুত্রের মতন; মানুষের শিংয়ের মতন, আকাশের কুসুমের মতন মিথ্যা,—এ কল্পনা বস্তুতন্ত্র নহে। ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে কল্পনার স্থান আছে বটে, কিন্তু এরূপ মিথ্যা কল্পনার স্থান নাই।

আমাদের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যায় তিন প্রকারের ব্রহ্মোপাসনার উল্লেখ আছে। প্রথম স্বরূপোপাসনা।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য নিদিধ্যাসিতব্য

এইসকল শ্রুতি এই স্বরূপ উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। আত্মাতে আত্ম জ্ঞানের আলোক, সমাধিযোগে এই স্বরূপোপাসনা করিতে হয়। সকলে এ উপাসনার অধিকারী নহেন। রাজা রামমোহনের কথায় ন্যায়ের অধিকার যাঁহাদের জন্মিয়াছে, তাঁহারাই এই স্বরূপ উপাসনা করিতে পারেন। দ্বিতীয়, সম্পদুপাসনা। দুই বস্তুর মধ্যে সামান্য ধর্ম্ম দেখিয়া ক্ষুদ্রতর ও সহজে জ্ঞানায়ত্ত যে বস্তু তাহার সাহায্যে বৃহত্তর ও সহজে যাহাকে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না সেই বস্তুর যে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, তাহাকেই সম্পদ্‌জ্ঞান কহে। এই সম্পদ্‌জ্ঞানের সাহায্যে যে উপাসনা হয়, তাহারই নাম সম্পদুপাসনা। সূর্য্য-উপাসনা এই সম্পদুপাসনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জ্ঞানের ও সূর্য্যের মধ্যে একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে। সে ধর্ম্মটী স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব। সূর্য্য যখন নিজকে প্রকাশ করিতে যাইয়াই সেই দৃশ্যমান জগৎকে প্রকাশ করেন, এবং এই জগতকে প্রকাশিত করিতে যাইয়াই নিজেকে যুগপৎ প্রকাশ করেন; সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও তিনিও আপনাকে এবং বিশ্বকে প্রকাশ করেন। তাঁহার জ্ঞানেতেই বিশ্ব স্থিতি করিতেছে। সেইজন্য আমরা তাঁহাকে বিশ্বের জ্ঞান করিতেছি। এইরূপে ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করিতে যাইয়াই [illegible] প্রকাশ করিতেছেন এবং বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছেন। সূর্য্যের যে স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব দেখিতে পাই, ব্রহ্মেরও তাহাই দেখি। সূর্য্য এবং ব্রহ্মের মধ্যে এই সামান্য ধর্ম্ম আছে। [illegible] ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া দৃষ্ট যে সূর্য্য তাঁহার সাহায্যে অদৃষ্ট যে ব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা সম্পদুপাসনা।

তৃতীয় প্রতীকোপাসনা। [illegible] অধ্যাসজনিত উপাসনাও কহে। অধ্যাসঅর্থ অন্যত্রাভাবে তত্ত্বাবভাষ—অর্থাৎ একস্থানে যে বস্তু দেখা গিয়াছে, অন্যত্র যে বস্তু উপস্থিত নহে, তাহার সত্তা আরোপ করাই অধ্যাস। সুতরাং প্রতীকোপাসনার অর্থ এই দাঁড়াইল যে অন্যত্র অর্থাৎ [illegible] আত্মার

সহিত অনুভূতির মধ্যে যে ব্রহ্মকে জানা গিয়াছে, সেই ব্রহ্মকে কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে যেখানে তাঁহার স্বতঃপ্রকাশ নাই তাহাতে আরোপ করিয়া সেই কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির সাহায্যে যে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাহাই প্রতীকোপাসনা। আমাদের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনের শাস্ত্রে এই ত্রিবিধ উপাসনার কথাই কহিয়াছেন। ব্রহ্মোপাসনার চতুর্থ-পথের উল্লেখ আছে বলিয়া জানি না। আর একটু তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বরূপোপাসনার ত কথাই নাই, সম্বন্ধ এবং প্রতীকোপাসনাতেও উপাসকের সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান আছে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। দেশ-প্রচলিত-প্রতিমা পূজা কতকটা সম্বন্ধোপাসনার পর্য্যায়ে পড়ে। আর শালগ্রামের পূজা প্রতীকের পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু সম্বন্ধই হউক আর প্রতীকই এই দুইয়ের অন্তরালেই উপাসকের যে একটা সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান আছে, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান যাহার নাই সে প্রতিমা পূজারও অধিকারী নহে, শালগ্রামপূজারও অধিকারী নহে।

এই জন্যই কহিতেছিলাম যে, বাঙ্গালার প্রচলিত প্রতিমাপূজাদি নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত হয় নাই, হইতেই পারে না। এই প্রতিমাপূজাতেই বাঙ্গালী হিন্দু সাধকের মধ্যে একটা উচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা এ কথাটা কার জানি না। কোনও প্রামাণ্য পুরাণের কিনা তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু মনে হয় এটা বাঙ্গালার কথা। আমার অনুমান সত্য কি না, হয় ত শ্রদ্ধেয় বন্ধু পাঁচকড়ি বাবু বলিতে পারিবেন। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, কথাটা ব্রহ্মসাধনের ইতিহাসে অতি বড় কথা।

(৬)

বেদে উপাসক আপনার ইষ্ট-দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতেন। বৈদিক দেবতারা আদিতে সকলেই প্রত্যক্ষ ছিলেন। অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র রুদ্র, অশ্বিনী-কুমারেরা সরস্বতী সকলেই প্রত্যক্ষগোচর ছিলেন। ঋগ্বেদ পড়িলে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সায়ণ-ভাষ্যেতেও এই সকল দেবতাদের নৈসর্গিকরূপে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। নিরুক্তেও আছে। সে সময়ে দেবতার নিসর্গের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ মাখামাখি ছিল। বৈদিক উপাসনা শক্তির উপাসনা। গীতা পরে বিভূতিযোগে যে উপাসনার ব্যাখ্যা করিয়াছে। বৈদিক উপাসনাতেই তাহার মূল দেখিতে পাই। তার পর উপনিষদ উপাসনাকে বাহির হইতে ভিতরে আনিয়া অন্তরের অনুভবে এবং ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বৈদিক উপাসনাতে

ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়ে একটা অপূর্ব্ব মাখামাখি ছিল। বেদের দেবতারা ক্ষণপৎ সাধকের ইন্দ্রিয়ের নিকটে প্রকাশিত হইয়াও সেই ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া থাকিতেন। সাধক ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়ের সাড়া পাইয়া বিস্ময়ে আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেন। এই বিশ্বাস ও আনন্দই বৈদিক ধর্ম্মের প্রাণ ছিল। উপনিষদ ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান প্রতিষ্ঠা করিয়া উপাসনাকে একান্ত অন্তর্মুখী করিয়া তুলেন। উপনিষদের উপাসনায় প্রধান কথা, যাহাতে সকল ইন্দ্রিয় চেষ্টার নিঃশেষ নিবৃত্তি, হয় সেই জ্ঞান এবং সমাধি। কিন্তু এখানে আসিয়াই হিন্দুর সাধনা আপনার চরম উৎকর্ষলাভ করিল না। বৈদিক উপাসনায় ইন্দ্রিয়ে এবং অতীন্দ্রিয়ে মাখামাখি ছিল বলিয়া যে একটা সহজ ও সরল রস ছিল, উপনিষদের একান্ত অন্তর্মুখীন উপাসনাতে সাধারণ উপাসকেরা সে রস আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইলেন। চিরদিনই মানুষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ধরিতে পারা যায় না তাহাকেই ইন্দ্রিয় দিয়া সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছে। ভোগ মাত্রেই জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, মানব-প্রকৃতির এই সর্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষা এবং আয়াসের প্রমাণ করে। নিতান্ত নীচ ইন্দ্রিয়াসক্ত যে, সেও কেবল ইন্দ্রিয়কে ধরিয়াই থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ভোগের ইন্দ্রিয়াতীত যে বস্তু তাহাকেই ধরিবার জন্য আকুল হইয়া বেড়ায়। আর এই বস্তুকে পায় না বলিয়াই এক ইন্দ্রিয়ভোগ হইতে নিত্য অপর ইন্দ্রিয়-ভোগের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। মানবের ইন্দ্রিয়ের এই অদম্য অতীন্দ্রিয় পিপাসার প্রেরণাতেই হিন্দুর সাধনার ইতিহাসে উপনিষদের পরে পুরাণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হিন্দুর পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে উপনিষদ-ধর্ম্মের বিকৃতি নহে; কিন্তু তাহার অপরিহার্য্য পরিণতিমাত্র। পুরাণ বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপরে বিবিধ রসমূর্ত্তি সকল গড়িয়া তুলিয়া সত্য ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছেন। এই কথাটা না বুঝিলে আমাদের পৌরাণিক ধর্ম্মের মূল্য এবং মর্য্যাদা গ্রহণ সম্ভব হইবে না। বিদেশীয়েরা মনে করেন যে উপনিষদেই হিন্দুর তত্ত্বজ্ঞানের ও ধর্ম্মসাধনের চরম উৎকর্ষলাভ হইয়াছিল; পুরাণ হিন্দুর অধঃপতনেই প্রমাণ করে। আমাদের নব্যশিক্ষিতদের মধ্যেও একদল লোকের এই ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। তাঁহারাও মনে করেন পৌরাণিক ধর্ম্মে হিন্দুর তত্ত্বজ্ঞানের এবং ধর্ম্মসাধনের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে। কথাটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পৌরাণিক ধর্ম্মে যে কোথাও ভ্রম, কুসংস্কার প্রবেশ করে নাই, এমন কথা কহি না। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান যে দেশের সর্ব্বসাধারণে

সাধন করিয়াছিলেন ইহাও সত্য নহে। সর্ব্বদাই সমাজের অধিকাংশ লোক মূঢ়তায় নিমজ্জিত ছিলেন। ইহাঁরা মুক্তিকামনায় নহে, ভয়ভিক্তিতে হইয়াও নহে, কিন্তু আর্ত্ত বা অর্থার্থীরূপেই দেবতা ভজনা করিতেন। ইহাঁদের ধর্ম্মে সর্ব্বদাই নানাবিধ কুসংস্কার এবং ইন্দ্রজাল মিশাইয়া গিয়াছে। ইহাঁরা বিবেক, বৈরাগ্যাদি সাধন-চতুষ্টয় কিম্বা শমদমাদি ষটসম্পত্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন না। ইহাঁরা উপনিষদ যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন তাহার কোনওই ধার ধারিতেন না। উপনিষদের পরে পুরাণ প্রচার আরম্ভ হইলে ইহাঁরা পৌরাণিক ধর্ম্মে রত সত্য মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইলেন এবং পুরাণের রূপকাদিকে সত্য বস্তুজ্ঞানে নানাবিধ ভ্রান্তি এবং কুসংস্কারের দ্বারা অধিকতর আচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। এ সকল কথা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু আবার ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে এ সকল পৌরাণিক ধর্ম্মের মুখ্য অঙ্গ নহে। এ সকলের দ্বারা পৌরাণিক ধর্ম্মের বিচার করিলে চলিবে না। পুরাণ অজ্ঞানীর জন্য রচিত হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারা জ্ঞানপিপাসু এবং রসপিপাসু ভক্তদিগের জন্যই রচিত হইয়াছিল। কি করিয়া যাহা মনন ইন্দ্রিয়ের অতীত তাহাকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ ও সম্ভোগ করিতে পারা যায়, তাহার পথ দেখাইবার জন্যই পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই কথাটা না বুঝিলে বিগ্রহ প্রতিমা পূজায় মর্ম্মোদ্ঘাটন সম্ভব হইবে না।

(৫)

এই পৌরাণিক ধর্ম্মের দুই শাখা এক শাখাকে অবতারশাখা কহিতে পারা যায়। আর এক শাখাতে পৌরাণিক দেববাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অবতারের পূজা ও দেবতার পূজাতে পার্থক্য আছে। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি এক শ্রেণীর অবতার; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহপ্রভৃতি আর এক শ্রেণীর অবতার। হিন্দুর অবতারেরা এই বিশ্বসৃষ্টির এবং মানবসমাজের ক্রমাভিব্যক্তিধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অনুস্যূত হইয়া আছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহাদিকে ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তির যুগাবস্থা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। বামন, পরশুরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে সামাজিক [illegible] অবতার বলিয়া গণ্য করা যায়। বরাহ ও নৃসিংহ মূর্ত্তির পূজা [illegible] আছে। রামকৃষ্ণের পূজা উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতেই বেশী প্রচলিত। অবতারেরা অনেক অতিলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকিলেও মানবতার ভূমিতেই তাঁহাদের সাধন ভজন হইয়া থাকে। এই অবতারবাদ ও অবতারপূজা এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক অন্তর্মুখীন সাধনভজন

অপেক্ষা পূর্ণতর একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন। মানবতার উৎকর্ষসাধনই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। উপনিষদ্-ধর্ম্ম মানুষকে শুষ্ক চৈতন্যরূপেই ধরিয়াছে, সমগ্রমানবের প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অবতার ধর্ম্ম কেবল অন্তর্মুখীন নহে, কেবল বহির্মুখীনও নহে। অন্তর্বাহ্য মিলিয়া যেমন মানবের প্রকৃতিকে পূর্ণ করিয়াছে, অবতার ধর্ম্মও সেই রূপ ইন্দ্রিয়াতীতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ানুভূতির, জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের, মানবের সঙ্গে অতিমানবের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়া উপনিষদের ঐকান্তিক অন্তর্মুখীন ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানকে পূর্ণতর ও পূর্ণতম করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। জগতের ধর্ম্মসাধনের অভিব্যক্তির ইতিহাস এই অবতারবাদ ও অবতারধর্ম্ম একটা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রচলিত অবতারবাদের সকল কথা মানি আর না মানি, এই কথাটা অস্বীকার করিতে পারি না।

(৬)

পৌরাণিক ধর্ম্মের অন্য শাখা দেববাদ বা দেবোপাসনার শাখা। এই দেববাদ ও দেবোপাসনার কোনও কোনও দিকে অবতারবাদ এবং অবতার উপাসনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছে; আবার কোনও কোনও দিকে ইহা অবতারবাদ ও অবতার উপাসনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া আছে। যেখানে দেবমূর্ত্তি রসমূর্ত্তিরূপে প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে পুরাণের দেববাদও দেবোপাসনা কোনও কোনও বিষয়ে অবতারবাদ ও অবতার ধর্ম্মের উপরে গিয়াছে। যেখানে দেবতার কল্পনা বস্তুতন্ত্র নহে, যে দেবমূর্ত্তি সাধকের সত্য অনুভূতির উপরে গড়িয়া উঠে নাই, যেখানে ইহা নিতান্ত কাল্পনিক, সেখানে এই দেববাদ ও দেবোপাসনা অবতারবাদের নীচে পড়িয়া আছে। ধর্ম্মতত্ত্বের অভিব্যক্তির ইতিহাসের দিক দিয়া আলোচনা করিলে এই কথাটা স্বীকার করিতে হয়।

(৭)

বাংলার প্রতিমা-পূজা অনেকটা পৌরাণিক দেববাদ ও দেবোপাসনার এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। বাংলার এ সকল পূজা-পার্ব্বণের একটা জাতে বিশেষত্ব আছে। ভারতের আর কোনও প্রদেশে বাংলার প্রতিমা-পূজা নাই। দেউলে মন্দিরে মন্দিরে, গণেশ, হনুমান প্রভৃতির দেবমূর্ত্তি আছে। কোথাও বা বিষ্ণু মূর্ত্তিও আছে। মাদুরায় মীনাক্ষীর অর্দ্ধ মন্দির রহিয়াছে। এ সকল মন্দিরে

এই সকল দেবতার বিগ্রহ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। উপাসকেরা নিজ নিজ পূজা লইয়া এই সকল দেবমন্দিরে যাইয়া পুরোহিতের হস্তে অর্পণ করেন, এবং পুণ্যস্নানাদি করিয়া দেবদর্শন করিয়া থাকেন। নিজেদের বাড়ীতে দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার পূজা করেন না। এই ধরণের প্রতিমাপূজা কেবল বাংলা দেশেই আছে। বাংলার এই প্রতিমা-পূজার একটা বিশেষত্ব এই যে, এই সকল প্রতিমাকে বাঙ্গালী কোনও দিনই সত্য দেবতা ভাবে না। কার্য্যে-লোষ্ট্রে বাঙ্গালীর দেববুদ্ধি বহুদিন নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু কোনও দিন পথ-ঘাট হইতে পাথর কুড়াইয়া আনিয়া অশ্বত্থ বা অন্য কোনও বৃক্ষের মূলে জড় করিয়া তাহার পূজা করে না। পশ্চিমের লোকরাই এরূপ করিয়া থাকে। যেখানে বাঙ্গালী কোনও গাছতলায় ভোগ-নৈবেদ্য অর্পণ করে, সেখানেও গ্রামের জনশ্রুতি পুরুষপরম্পরা হইতে দেবতার অধিষ্ঠানটাই বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার প্রাণ। যতক্ষণ না প্রতিমাতে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছে, ততক্ষণ সে প্রতিমা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ; যে সে তাহাকে ছুঁইতে পারে। আবার প্রতিমাতে দেবতার এই অধিষ্ঠান নৈমিত্তিক মাত্র, স্থায়ী নহে। যতক্ষণ সাধক প্রতিমাতে দেবতার অধিষ্ঠান আছে ভাবিয়া তাঁহার পূজা করেন, ততক্ষণই সে প্রতিমা দেবতার প্রতিমা হইয়া রহে। পূজা শেষ হইলে দেবতার অন্তর্ধানে প্রতিমার দেবত্বও লোপপ্রাপ্ত হয়। তখন আবার তাহা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের মতন হইয়া দাঁড়ায়। লোকে জীবের মৃত দেহকে যেমন ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ সাধক এই দেব-প্রতিমাকে বিসর্জ্জন করেন। এই আবাহন ও বিসর্জ্জনের মধ্যেই বাঙ্গালী হিন্দুর দেবপূজার তত্ত্বটা লুকাইয়া আছে। ব্রহ্মসাধক যেমন নিজের সম্বন্ধে দেহাত্মধ্যাস নষ্ট করিয়াই ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়েন, বাঙ্গালী হিন্দু সেইরূপ প্রতিমাতে দেবতা-বুদ্ধি নষ্ট করিয়াই প্রতিমা-পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

একদিন এসকল কথা জানিতাম না ও বুঝিতাম না। যাঁহারা প্রচলিত প্রতিমা পূজাতে অনুরক্ত ছিলেন তাঁহারাও এসকল কথা সম্যক্‌রূপে বুঝিতেন এমন কোনও প্রমাণ পাই নাই। সেইজন্যই ইংরাজী শিখিয়া ইউরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে এতটা সরাসরিভাবে বাঙ্গালীর পূজা পদ্ধতিকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম। সে বর্জ্জনটা নিষ্ফল ও হয় নাই। কারণ ঐরূপ ভাবে একদিন সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত না হইলে আজ অন্তরের অনুভবে এই প্রতিমা-পূজার যে সত্য অর্থও অধিকার বুঝিতেছি বলে মনে করিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিতাম না।

(৮)

আর এসকল কথা বুঝি নাই বলিয়া বাল্যে ও প্রথম যৌবনে এই প্রতিমা পূজার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ধর্ম্মজীবনে ও ধর্ম্মসাধনে যে কোনও শক্তিলাভ করি নাই, এমন কথাও বলিতে পারি না। নিষ্ঠাবান হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া এসকল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলাম বলিয়া, সে সকল ক্রিয়াকলাপ বর্জ্জন করিয়াও আজ নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। সে হাওয়ার মধ্যে জন্মে নাই, সেই সকল ভাবের মধ্যে ফুটিয়া উ নাই; সে সকল পূজা পার্ব্বণের সাহচর্য্য করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যে অনুশীলন হইয়াছিল, ে াগ পায় নাই বলিয়া আমার সন্তানদিগকে কোনও কোনও দিকে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্তই মনে করিতেছি। ধর্ম্মলাভ করিয়াছি, এ অসত্য কথা কহিতে পারি না। কিন্তু ধর্ম্মের কথা, সাধনের কথা, ভক্তির কথা, একটু আধটুও যদি আজ বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই শৈশবের শিক্ষার দৌলতেই এসম্পদলাভ হইয়াছে।

শৈশবে দেবতা কাহাকে বলে যখন জানি নাই, ঈশ্বর কি বস্তু ইহা বুঝি নাই, ব্রহ্মের নাম পর্য্যন্তও শুনি নাই, কিন্তু তখনও মায়ের পীড়া হইলে ঘরের অন্ধকার কোনে যাইয়া দরবিগলিত অশ্রুধারে "মা কালী, রক্ষা কর, মা দুর্গা মাকে বাঁচাইয়া তোল," এসকল প্রার্থনা যে করিতাম তাহা বিফলে যায় নাই। আর পরজীবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াও প্রিয়জনের রোগশয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "ভগবান ইহাকে বাঁচাও, ইহাকে নীরোগ কর" এসকল প্রার্থনা যে করিয়াছি ও করিতেছি তাহা ঐ শৈশবের কালী, দুর্গার নিকটে প্রার্থনা হইতে মূলতঃ ও তত্ত্বতঃ ভিন্ন ইহাও মনে করিতে পারি না। প্রার্থনার মূল জীবের আর্ত্তি, ভগবানের সত্যজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান নহে। প্রাণের আর্ত্তনাদ যেখানে, যাহার উদ্দেশেই যে ভাবে বা ভাষাতেই সে আর্ত্তনাদ ব্যক্ত হউক না কেন, তাহাতেই জীবের দুঃখে নিয়ত কাতর যে ভগবান তাঁহার সিংহাসন টলিয়া থাকে। সে আর্ত্তি পাইলাম কই? সে অসহায় অবস্থতার উপলব্ধি হয় কই? এইজন্যই আমাদের প্রার্থনা বারংবার নিষ্ফল হইয়া যায়।

আমাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। সে অতিপ্রাচীনকালের দুর্গোৎসব নহে। ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে এ উৎসবের সম্পর্ক এখনও আছে, চিরদিনই ছিল। কিন্তু বাবা ঐশ্বর্য্যবিস্তারের জন্য দুর্গোৎসব করিতেন না। আমাদের বাড়ীতে নবমী রাত্রির পূর্ব্বে কোনও প্রকারের রংতামাসার ব্যবস্থা হইত না। নবমী দিন রাত্রেই পূজার মুখ্য অঙ্গ শেষ হইলে পরে সখিসংবাদ বা যাত্রাগানের ব্যবস্থা হইত।

আর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন প্রতিমাদর্শন ও প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণই হইত; বোড়শোপচারে নিমন্ত্রিতদিগকে খাওয়াইবার কোনও ব্যবস্থা হইত না। বিজয়ার দিন সকলেই গ্রামের সমাজ নিমন্ত্রণ হইত। বাবা কহিতেন যে মুখ্য পূজার দিনে এ সকল ভোজ বা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিলে পূজার আয়োজনের ব্যাঘাত হইতে পারে। এই জন্য তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন। একটু বড় হইলেই আমাকেও পূজার আয়োজনে লাগাইয়া দেন। ফুল-তোলা, বেলপাতা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, এসকলের ভার আমার এবং আমার সমবয়স্কদিগের উপরে পড়ে। আর সেই চঞ্চল বাল্য বয়সেও কতটা শুচিতা রক্ষা করিয়া পূজার বেলপাতাগুলি একটী একটী করিয়া বাছিয়া দিতাম, আজিও সে কথা ভুলি নাই। পূজার সময় পুরোহিত যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু তাহার ধ্বনির একটা অপূর্ব্ব মধুরতা আস্বাদন করিতাম। এই মাধুর্য্যের ভিতরে একটা ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল। মন্ত্রের অর্থ বুঝিতাম না বলিয়াই এই ঐন্দ্রজালিক শক্তি আমার চিত্তের উপরে বেশী স্পষ্ট করিয়া বর্ষিয়া মনে হয়। চণ্ডীপাঠের সময় নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ—এই কথাগুলিতে প্রাণে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইত। আমাদের পরিবার বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। গোঁসাইরা আমাদের কুলগুরু ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব বলিয়া আমাদের বাড়ীতে পূজার সময় বলি নিষিদ্ধ হয় নাই। প্রতিদিন এই বলির সময় শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসার ঢাক ঢোল যখন বাজিয়া উঠিত, ধূপের গন্ধ যখন চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গনে ভরিয়া উঠিত; আর চারিদিকে ভক্তেরা গলবস্ত্র কৃতবাসে দাড়াইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতেন, সেই দৃশ্যে প্রাণে এক অপূর্ব্ব উত্তেজনা আনিয়া দিত। সন্ধ্যা-আরতির সময় মণ্ডপের সম্মুখে যখন সারি সারি প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিত, সম্মুখের নাট-মন্দির যখন আলোক-মালায় উজ্জল হইয়া উঠিত, ধূনা ও গুগ্‌গুলের ধূমে যখন মণ্ডপ আচ্ছন্ন হইয়া যাইত, আর চারিদিকে ঢাক ঢোল কাঁসি বাজিয়া উঠিত, তখন সেই ভাবের তরঙ্গের মধ্যে দাড়াইয়া, সেই ধূপের স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়া যখন দেবী প্রতিমার উজ্জল মুখ দেখিতাম, তখন এই প্রতিমাতে কাষ্ঠলোষ্ট্রবুদ্ধি থাকিত না, দেববুদ্ধিই জাগিয়া উঠিত। তার পর বিজয়ার দিনের কথা ভুলিবার নহে। প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আমিরা যখন বাড়ী ফিরিতাম, তখন সমুদয় প্রাণটা যেন খালি হইয়া যাইত। একটা গভীর অবসাদে চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। আবার কবে পূজা ফিরিয়া আসিবে, আবার শূন্য চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর প্রতিষ্ঠা

হইবে, আবার তাঁহারা পূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িবেই তাহা ভাবিয়া প্রাণকে শান্ত করিতাম। এইরূপে যখন কিছুই বুঝিতাম না, জানিতাম না, তখনও দুর্গোৎসব প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিতাম। এবং এই সম্ভোগের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত বুদ্ধির যে অনুশীলন হইত তাহারই ফলে এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড বর্জ্জন করিয়াও যা কিছু ধর্ম্মের কথা বুঝিতে পারিয়াছি তাহা সম্ভব হইয়াছে। অতি-প্রাকৃত বুদ্ধিই সকল ধর্ম্ম বিশ্বাসের বুনিয়াদ। আজিকালিকার বাঙ্গালেরা এই অতিপ্রাকৃত বুদ্ধির অনুশীলনের অভাবে ধর্ম্মবুদ্ধিও হারাইতেছে।

তারপর বাঙ্গালী-হিন্দুর দুর্গাপূজা কেবল দেবতার পূজা নহে। ইহা একটা অতি বড় সামাজিক ব্যাপার। সে কালে পূজাবাড়ীতে তিনদিন যে-সেবার সঙ্গে সঙ্গে আবিরাম নরসেবাও চলিত। কেবল ব্রাহ্মণভোজনই যে হইত তাহা নহে। সমাজের সকল শ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করিতে হইত। এই নিমন্ত্রণে নিতান্ত দরিদ্র বা তথাকথিত হীনজাতিও বাদ যাইত না। গৃহস্বামী স্বয়ং বা তাঁহার পরিবারের কেহ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সকলের বাড়ীতে যাইয়া পূজার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেন। মুসলমানেরা পর্য্যন্ত এ নিমন্ত্রণে বাদ যাইতেন না। আর অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিতদিগের আগমনে বাড়ী জনাকীর্ণ থাকিত। চারিদিকে দীয়তাং ভুজ্যতাং ইহাই শোনা যাইত। এই অপূর্ব্ব সমাজিকাণ্ড ভুলিবার নহে। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবে একদিকে তাহার দেববুদ্ধি অনুশীলন হইত, অন্যদিকে তাহার রঞ্জনী বৃত্তির অনুশীলন হইত, অন্যদিকে আবার লোকলৌকিকতার ও সামাজিক বৃত্তির অনুশীলন হইত। এইরূপ সর্ব্বতোমুখী পূজা-পার্ব্বণ আর কোনও দেশের কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আছে কি না জানি না। শৈশবে এবং বাল্যে এই উৎসবের ভিতরে যে অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিতাম, তাহার স্মৃতি এখনও প্রাণে জড়াইয়া আছে বলিয়া শরতের সূর্য্য যখন উঠে, শরতের রৌদ্র যখন ফুটে, শরতের আকাশ যখন নির্ম্মল হইতে আরম্ভ করে, ক্রমে পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষ যখন আসে, এবং মহাসপ্তমীর প্রত্যুষে যখন চারিদিকে পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠে, সে সকল ক্রিয়াকলাপ বর্জ্জন করিয়াও তাহাতে প্রাণটা এক অপূর্ব্বভাবে ভরিয়া যায়। আমার সন্তানেরা এভাবের সামিল হইতে পারে না বলিয়া কতটা কি যে হারাইয়াছে ইহা ভাবিয়া চিত্ত যে একেবারেই কখনও কখনও বিচলিত হয় না, ইহাও নহে। দুর্গোৎসবের পরিবর্ত্তে আমরা ত ইহাদিগকে কোনও কিছুই দিতে পারিলাম না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

বসন্তের আহ্বান।

শরৎ তোমার হাওয়ার পরশ ধরার গায়ে চঞ্চলি,
রূপ-সায়রে নৃত্য করে চুমকি চুনির অঞ্চলি।
অভিমানের ঘোম্‌টা খুলি আড় চোখেতে চাইলি ছি!
সুর্ম্মা চোখের তন্দ্রা-ঘোর ভাঙ্গল তবে ভাঙ্গল কি?
এই যে ছিল কোথায় গেল বাদল খেলার লাঙন বেলা,
আব্‌ছায়াতে মূর্ত্তি-ধ'রে উঠ্‌ল জেগে আলোক মালা,
মেশামেশি আলো আঁধার ঝুলন দোলায় দুলদুলি।
বাঁধন তোমার আল্‌গা চুমার এক নিমিষে পর্‌ল খুলি॥
সুর-বাহারের পর্‌দা ছিরে কান্না হাসির আগুনে,
দীঘির জলের ঝাপে পাশে ফুল ফুটে ঐ জাকরাণে।
স্বপ্ন তোমার নিচোল সাগর গগণ নীল উত্তরী,
হাস্যময় চোখের দর্পণায় উঠ্‌ল ফুটে নীল পরী।
সুরটী তোমার ঘুর্‌ছে ফিরে সকল ভুবন ঢেউ তুলি।
চুল লেগেছে তারা বীথিতে পর্‌ছে ঝরে সেফালি॥
পদ্ম ফুলের পাপ্‌ড়ি খুলি জাগল যত বল্লরী,
তোম্‌রা বধুর পায়লা পরাণ নূপুর পায়ে সঞ্চরী।
মুক্ত হাওয়া দিও পরাণ আলো ছায়ার সঙ্গমে,
উড়ছে তোমার উড়না খানি সবুজ শোভার বিভ্রমে। [পাতে
ফুট্‌ল কত যুই চামেলী বিভোল তোমার আঁখির
উজল হ'য়ে উঠ্‌ল দিশি ফাগের রঙিন ফাগুয়াতে।
এস মধুর বরৎ রাণী মোদের ঘরের দিপালী।
পথ চেয়ে যে বসে আছি তোমার প্রেমের কাঙ্গালি।
চিত্ত-সাগর মথিত ক'রে এস তুমি সুন্দরি।
আকুল কর, পাগলকর, ভার তোমার ভুবার ভারী।

শ্রীনীরদরঞ্জন বিশ্বাস।

রাধা।

(বিদ্যাপতি।)

যতবারই বিদ্যাপতি পড়িয়াছি, ততবারই একটী চিরপরিচিত মূর্ত্তি আসিয়া প্রাণের মাঝে স্বপ্ন রাজ্যের একটা মধুময়ী স্মৃতি তুলিয়া দিয়াছে। সে যে স্মৃতি, সে যেন কোন কিন্নরীর কোকিল-কণ্ঠ-নিসৃত সাহানার তান, উদার আকাশের নগ্ন নীলিমার পাপিয়ার বিরহী কণ্ঠের ইমন-কল্যাণ। যতবারই এই স্মৃতি ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, ততবারই সেই স্মৃতিটি আসিয়া যেন "স্বপন মাঝে নীরব রাগিণী' বাজিয়ে চলিয়া গিয়াছে। সে যে রাগিণী, সে যেন কত চেনা, কত পুরাণ অথচ কত নূতন কত মধুর। সেই সুরে "পথে প্রিয়া আমায় দেখে ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে'র রাগিণী শুনা যায়, পল্লীবালার কাঁকন আসিয়া কাণের কাছে বাজিয়া উঠে, রূপসী পল্লীবাসিনীর পায়ে তরঙ্গিনী নাচিয়া পড়ে, নীল গগনে শ্যামল ঘণ দেখিয়া "সজল কাজল আঁখি' মনে পড়ে, আর মনে পড়ে বঙ্গ-বধুর সেই "চেয়ে থাকে পতিমুখ মধুমাখা ময়মের" ভাব খানি।

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি,

যতবারই বিদ্যাপতি পড়িয়াছি, ততবারই মৈথিল কবির মৈথিল রাধাকে বাঙ্গালী রাধা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। এ যেন আমাদেরই বঙ্গ-মহিলা! স্বামীর আদরে আদরিণী, স্বামীর গরবে গরবিনী,—

"বঁধু তোঁহারি গরবে গরবিনী হাম্,
রূপসী তোঁহারি রূপে।"

আবার স্বামীর বিরহে স্খলিত বসন, লোলিত ভূষণ—এলোকেশী—

গলিত বসন লোলিত ভূষণ
কুরল কবরী ভার।

সপত্নী আশঙ্কায় সশঙ্কিতা—শুধু শঙ্কিতা নয়, যাহাতে নারীর সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমঙ্গলের অপনোদন হয় সেইজন্য অবলা-জন-সুলভ "রক্ষা কবচ" ব্যবহারেও সুশিক্ষিতা।

'নারীর দীরঘ শ্বাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যাব পাশে বৈসে।'

বিদ্যাপতির রাধাকে বাঙ্গালী মহিলা প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যে প্রেমিকা মূর্ত্তি বিশ্বের সকল দেশেরই চিরন্তন-প্রেমিকা মূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমার মনে হয় তাহাই শাশ্বত প্রেমিকা মূর্ত্তি। বিদ্যাপতির রাধিকাকে যিনিই একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন, তিনিই দেখিবেন যে তাঁহারই দেশের তাঁহারই মনের সেই রক্তরাগে আঁকা মধুরিমা মাখা মূর্ত্তিটী আসিয়া বিদ্যাপতির রাধিকার উপর ছায়াপাত করিয়াছে। যে সৃষ্টিতে কোন সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীবদ্ধ রুদ্ধ বাতাস হা হুতাশ করে না, তাহাই কবির—নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, অমর সৃষ্টি।

বিদ্যাপতির রাধা-চরিত্রে আমরা সেই মহীয়সী রমণী মূর্ত্তিই দেখিতে পাই। আর দেখিতে পাই অতি উজ্জ্বল-সজল আঁখি,—মধুর মাধুরী বিমান সলাজ সুষমা। এ প্রেম নভেলের প্রেম নয়, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রেম নহে—বিলাসের খানের প্রেম নহে—এ প্রেম স্বর্গের—আত্মার—জীবন-মরণের।

প্রথম দর্শনেই দেখিতে পাই শ্রীরাধিকা নবজলধর শ্যাম, ভ্রমর-কৃষ্ণ কুটিল কেশ; পীতবাস পরিহিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া একবারে ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছে। কি করিতেছে, কি বলিতেছে, ভুলিয়া যাইতেছে, প্রাণ অবিরত ধক্ ধক্ করিতেছে, শ্রাবণের ধারার মত অনবরত চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, রাধা সখীর কাছে বলিতেছে,—সখি, কেন তা'কে দেখিলাম, দেখিয়া কেন মনের হাতে প্রাণ সমর্পণ করিলাম!

"কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥"

বাঁশী শুনিলে শরীর ও মন লজ্জায় গলিয়া যায়, গুরুজনের সাম্নে ভাবতরঙ্গ উপস্থিত হয়, দেহ মন অবশ হয়, কুটিলতা ধুলিয়া যায়, যত্নে গায়ে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখি।

ও রস সায়রই ভাব তরঙ্গ।
যতনহি যতনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া কোন দিন হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যান, কোন দিন রাধার নাম ধরিয়া 'রাধানামে সাধা বাঁশী' বাজাইতে থাকেন, সময় পাইলে

অতি নিকটে আসিয়াও পরিহাস করেন। শুধু তাহাই নহে, কোন কোন সময় রাধার অঙ্গ দেখিয়া নিজের দিকে চাহিয়া নিজেকেই আলিঙ্গন করেন। রাধা এই সমস্ত আদর তুলিয়াও ভুলিতে পারেন না।

এক সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিছর না যাই॥

এদিকে রাধাও কৃষ্ণের দিকে আড়নয়নে চাহিয়া চাহিয়া হাসিয়া চলিয়া যান।

গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।

শুধু তা'ই নয়, একদিন স্নান করিয়া উঠিয়া রাধা দেখিতে পাইলেন, কানু সাম্নে দাঁড়াইয়া। সঙ্গে গুরু জন, তাহে আবার ননদী দারুণ, রাধার প্রাণে শত ইচ্ছা থাকিলেও দারুণ লজ্জায় রাধা কানুর দিকে চাহিতেও পারিলেন না—মুখ নীচু করিয়া রাখিলেন। কিন্তু রাধিকা যে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। রাধিকা কতটুকু সুযোগ হইলেই খুব ফিস্‌ফাইয়া সখিদিগকে কাছে আসিবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতে আবার হঠাৎ নেহার অকারণে কথার মোড়ক মাঝা ছিঁড়িয়া গেল। সখিরা সকলেই ব্যস্ত হইয়া এবটি একটি করিয়া চুনী কুড়াইতে লাগিল। আর এদিকে রাধিকা দাঁড়াইয়া শ্যামকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

ওহি ঘুর মোতি যব টুটি গেল
কহত হার টুটি গেল।
সব সখী এক এক চুনি সকল
শ্যাম দরশ ধনী ভেল॥

(২)

তখন রাধিকার বয়স,—

"শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল॥

তখন শৈশব আসিয়া যৌবন-সায়রে পড়িয়াছে, চোখ দুটিও যৌবনের পানে-বাণী শুনিয়াছে। রাধা কখনও কাণের কাছে চোখের তারা ঘুরাইয়া আড় চোখে চান, আবার কখনও বা চোখ দুটী নত করিয়া শুধু "হুঁ" বলিয়া যান। কিন্তু রাধিকার বয়স যাহাই হউক না কেন, তাহার সেই মধুর বয়সটী লইয়া

পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির মনে একটা গোলমাল চলিতেছে। তিনি রাধাকে বালা বলিবেন না তরুণী বলিবেন, ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। তাই তিনি অন্যত্র পদে বলিয়াছেন,

শৈশবে যৌবনে উপজল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ॥

অন্য পদে আছে,—

মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।
কো কহে বালা, কো কহে তরুণী॥

আর এক স্থানে আছে,—

বালা, শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কি কনেঠ॥

ঠিক এম্‌নি একটা কথা লইয়া কবিবর নবীন সেনও তাঁহার "কুরুক্ষেত্রে" গোলমালে পড়িয়াছিলেন। সেখানে অভিমন্যু ষোড়শ বর্ষীয় কুমার, দেহখানি স্বাস্থ্যপুষ্ট, বীরত্বের বাসর-শয়ান, শৌর্য্যের সিংহাসন, অথচ কিশোর-কোমলতায় ভরপুর। কবি সেখানে সমাধান করিয়াছেন,

"কৈশোরে যৌবনে করিছে কিরণ।
কহিছে কৈশোর,—"এখনো কিশোর"।
মিথ্যা কথা "গর্ব্বে কহিছে যৌবন।"

আমরা কিন্তু এরূপ পিনাল কোডের বিচারের পক্ষপাতী নহি। সৌন্দর্য্যকে যেমন রেখাবদ্ধ করিলে উচ্ছ্বাস কমিয়া যায়, কবিতাকেও তেম্‌নি অসীম ছাড়িয়া সসীমে আনিলে তাহার ভাব প্রবণতা কমিয়া আসে। বিদ্যাপতি সেই জন্যই নিজে কোন বিচার না করিয়া নিজকেও সন্দিগ্ধ রাখিয়াছেন, পাঠককেও মুগ্ধ করিয়াছেন।

তবে রাধার বয়স ষোলই হউক আর সতেরই হউক,—এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বেবয়সে মানুষের মনে সুন্দর তব সুন্দর সব যেদিকে ফিরাই আঁখি' মনে হয়, যে সময়ে চিত্তবৃত্তিগুলি আধ বিকসিত শতদলের মত না উন্মীলিত, না মলিন অথচ সুন্দর, যে সময়ে মানুষের মনটা উষার লজ্জারুণ তরুণ তপনের মত না শীতল না তেজোময় অথচ মধুর—এই সেই সময়। যে বয়সটী প্রেমিকের চক্ষে বাদল-নিশীথ, সৌন্দর্য্যের তাজমহল, ঔজ্জ্বল্যের কোহিনুর, মাধুর্য্যের শিশির-স্নাত কুন্দ কুসুম, ঐশ্বর্য্যের মণুর সিংহাসন এই সেই বয়স। যে বয়সে আবাহন

আছে, বিসর্জ্জন নাই, দেয়ানি আছে অমানিশা নাই, সম্মিলন আছে, বিরহ নাই, ইন্দ্রধনু আছে বৃষ্টি নাই, অভিসার আছে কোরস নাই, এই সেই বয়স। এই বয়সেই রাধার প্রেম-নিকুঞ্জে কালার বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে।

রাধিকার বয়স যাহাই হউক রাধিকা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া—কবি রাধাকে দেখিয়া একবারে 'কুকথায় পঞ্চমুখ,' তাঁহার মুখেই শুনিতে পাই যে রাধার সুন্দর মুখে সিন্দুর বিন্দু, পেছনে ঘনকৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম যেন আঁধার (কেশকে) পেছনে রাখিয়া চাঁদ (বদন) উদয় অরুণ (সিন্দুর বিন্দুর) সহিত উদয় হইয়াছে।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥

সে যে চোখ সে চোখ যেন ত্রিভুবন-বিজয়ী মদনের তূনীরাবশিষ্ট দুইটি বাণ।

তিন বানে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দুই বানে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জনে
সোঁপল তোহার নয়ানে॥

সেই সুবলিত বাহুর-ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে লুকাইয়া থাকে, শ্যামপল্লবের ভয়ে কিসলয় কাঁপিয়া উঠে। নয়ন ভঙ্গী দেখিয়া হরিণী পলাইয়া যায়, কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোকিল লুকাইয়া থাকে, গমন-বঙ্গ দেখিয়া রাজহংস লজ্জায় জলে ঝাঁপ দিয়া যায়। গৌরবর্ণ দেহ পাতলা শাড়ীর ভিতর দিয়া যেন উজ্জ্বল সোনার মত যেন জ্বল করে, কটিদেশ সিংহের কটির মত সরু। দেহ অতি ক্ষীণ, যেন শ্রীফলের মত পীন স্তনদ্বয়ের ভারে বুঝিবা ভাঙ্গিয়া পড়ে।

তনু অতি কমলিনী
কুচ ছিরিফল ভয়ে ভাঙ্গিয়া পড়নে জনি।

সেই—যে দাঁত—সেই দাঁত যেন মুক্তাযুক্ত মত—যাহার মিষ্ট অধরে মিশাইয়া যখন মৃদু মৃদু ভাষা বলে তখন যেন আশা মিটিয়াও মিটিতে চায় না।

দশন মুকুতা পাঁতি অধরু মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।

বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পুরল আশা।

স্নানের পর নীলাম্বরী শাড়ী আর ঐ দেহের রস পাইবে না ভাবিয়া কাঁদিয়া জল ধারা মোচন করে।

অবহি ছোড়বি মোর তেজবি লেহা,
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥

যেখানে সে পা ফেলে সেখানেই কমল ফুটিয়া উঠে, যে স্থানে অঙ্গ ঝলকিয়া উঠে সেখানেই বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠে, যে দিকে সে যায় সে দিকেই পদ্ম ফুটিয়া উঠে, যেই সে হাসিয়া উঠে, তখনই যেন অমৃত ঝরিয়া পড়ে, সেই ধনীকে দেখিয়া—শ্রীকৃষ্ণ যেন তিন ভুবনই—যেন রাধাময় দেখিতেছে—আবার দর্শন না পেলে এ দুঃখ যাবে কি?

হেরইতে সো ধনি মোর।
তব তিন ভুবন অগোর॥
পুনঃ কি-এ দরশন পাব।
তব মোহে-ইহ দুঃখ যাব॥

বিদ্যাপতি আশ্বাস দিতেছেন, তোমার নিধি গুণেই আনিয়া দিব।

বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি।

শ্রীহেমরঞ্জন রায়।

মানুষ ও পশুর মোকদ্দমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আদি পিতা হজরত আদমের বংশধরগণ যখন সব-প্রথম আমাদের এই পৃথিবীতে বাস করা সুরু করলে, তখন তাদের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। যত দিন তারা সংখ্যায় অল্প ছিল, ততদিন তারা পশুদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াত', কোন একটা পশু দেখ্‌লেই ভয়ে শিট্‌কিয়ে উঠ্‌ত,—বাঘ-ভালুকের'ত কথাই নেই! দু'-তিনজন লোক এক জায়গায় হ'য়ে যে একটু জমি চাষ ক'রবে—এ সাহসটুকুও তাদের ছিল না! গাছে ভাল ভাল আম, জাম, লিচু ইত্যাদি পেকে থাকলেও, তা' তারা পেড়ে খেতে পারতো না—পাছে বা তাদেরি তেড়ে ধ'রে গিলে খেয়ে ফেলে! হাতের কাছে যে দু'-একটা ফল-ফলারি পেত' তাই খেয়ে কোন মতে বেঁচে থাক্‌তো,—আর গাছের পাতা মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাক্‌ত।

এই ভাবে কিছুকাল কেটে যাবার পর যখন তাদের বংশ বেড়ে গেল, তখন তারা ক্রমেই সাহসী হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল'; পশুদের দেখে তখন তারা আর বড় বেশী ভয় করতো না। এমন কি কালে কালে তারা গ্রাম, নগর, দুর্গ, হাট-বাজার ইত্যাদি বসিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বাস ক'রতে লাগ্‌ল। অনেক রকম অস্ত্রপাতি তৈরী হ'ল, চাষ-বাস বেশ চ'লতে লাগ্‌ল। শুধু তাই নয়,—যে পশুদের ভয়ে তারা ঘর থেকে বেরুতে, পার্‌ত না, সেই পশুদেরই ধ'রে ধ'রে তারা নিজেদের কাজে লাগাতে লাগ্‌ল; কেউ বা গাড়ী টানায়, কেউ বা দিয়ে চাষ করায়, কেউ বা নিজেই চড়ে' বসে—এই রকম আর কি! এম্‌নি ক'রে

* ইহা "এখওয়ানুস্‌-সাফা" নামক আরবী পণ্ডিতমণ্ডলী লিখিত একখানি বিখ্যাত পুস্তকের অনুবাদ। উর্দ্দু, ইংরাজী ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে; আবু সোলেমান, আবুল হাসান, আবু আহমদ প্রমুখ দশজন আরবী পণ্ডিত বসরা নগরে সমবেত ভাবে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম আলোচনা করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বসমেত ৫০ খানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মানুষ যে কিসে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই কথা নানারূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা মোকদ্দমার আকারে অতি চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কারণে "মানুষ ও পশুর মোকদ্দমা" নাম দিয়া আমি উহার বাংলা অনুবাদ করিলাম। এ অনুবাদ আক্ষরিক নহে—ইহা স্বাধীন অনুবাদ।

হাতী, ঘোড়া, উট, গাধা ইত্যাদি জানোয়ার—যারা এতদিন অবাধে যেখানে সেখানে চ'রে বেড়াত—সব্বাই মানুষের হাতে বন্দী হয়ে গেল আর সব্বাইকেই বলদ সাজতে হ'ল! তারা যতই বোঝার ভারে গোঁ গোঁ করুক না কেন, তাদের মনিব সেদিকে মোটে কানই দেয় না! দেখে শুনে ত অনেক পশুই পালিয়ে গিয়ে দূর পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় নিলে! সেই সাথে অনেক পক্ষীও ভয়ে উড়ে চলে গেল। এ দেখে মানুষগুলো, ভাব্‌লে—বাঃ! এরা ত সবই আমাদের তাঁবেদারি, আমাদের ভয়ে ওরা কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে? ধর্ শালাদের! এই না বলে দড়াদড়ি, জাল, খাচা ইত্যাদি নিয়ে ওদের তাড়া ক'রলে।

এমনি করে অনেকদিন যাবত ধর-পাকড় চল্‌তে লাগ্‌ল, অত্যাচারও খুব হ'তে থাক্‌ল। হ'তে হ'তে হ,তে—অবশেষে মহামানুষ হজরত মোহাম্মদ পৃথিবীতে নেমে এলেন, তিনিই এসেই কার কোন্ পথ, তা ঠিক করে বলে দিলেন। পরীর মুলুকের অনেক লোকও তার ভক্ত হ'য়ে দাঁড়াল।

এমনি করে' কিছুদিন গেল। তখন পরীর মুলুকের রাজা ছিলেন—বেয়ারেশ। তিনি বড্ড ভাল রাজা ছিলেন। তার রাজ্যে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খেতো, চোর-ডাকাতের কোন ভয় ছিল না, কেউ কারোপর অত্যাচার ক'রত না। বিষুব-রেখার কাছে বালাসগুণ বলে একটা দ্বীপে তার রাজধানী ছিল। ঘটনাক্রমে একবার একখানা জাহাজ ঝড়ে তাড়া খেয়ে সেই দ্বীপে গিয়ে ঠেক্‌ল। জাহাজে অনেক লোক ছিল, কেউ বা সওদাগর, কেউ বা দার্শনিক, কেউ বা পণ্ডিত—এই রকম। তারা সব্বাই তখন সেই দ্বীপে নাম্‌লো, নেমে এদিক-ওদিক দেখে-শুনে বেড়াতে লাগ্‌ল কি সুন্দর সেই দেশ! ফল-ফুলে গাছ ভরা, মিষ্টি-মধুর নদীর জল, ফুরফুরে দক্ষিণ হাওয়া! পশুগুলো যেখানে-সেখানে মনের সুখে চ'রে বেড়াচ্ছে, খেয়ে দেয়ে সব্বাই বেশ মোটা-সোটা! প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য দেখে আর জমির এমন উর্ব্বরতা দেখে তারা ত ভারী খুসী হয়ে গেল, সে দেশ ছেড়ে আর যেতে চাইল না। এক এক করে সব্বাই সেখানে ঘর বাড়ী তৈরী করে বাস করতে লাগ্‌ল আর পশুদের ধরে ধরে আবার আগেকার মত বোঝা টান্‌তে লাগ্‌ল। পশুরা যখন দেখ্‌তে পেলে যে, এখানেও তাদের নিষ্কৃতি নাই, তখন তারা গতিক বুঝে মরুভূমিতে পালিয়ে যেতে লাগ্‌ল! মানুষও তাদের ধরবার জন্য নানা রকম ফন্দী বের ক'রতে লাগ্‌ল। তাদের বিপদ—পশু-পক্ষী সব তাদের চাকর।

পশুরা যখন মানুষের এই কু-মতলব বুঝতে পারলে, তখন তারা সকলে মিলে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলে। মানুষের হাতে যত রকম অত্যাচার তারা সহ্য করেছে, তা সব পরিষ্কার করে খুলে বল্লে। রাজা সে-কথা শুনে রেগে-মেগে বল্লেন—"কে আছিস্ রে, যাত এখখুনি গিয়ে মানুষগুলোকে আমার সাম্‌নে হাজির কর্।" আদেশক্রমে ৭০ জন লোক রাজার সাম্‌নে এসে হাজির হ'ল, তারা সবাই বেশ সুবক্তা ও পণ্ডিত। তাদের বিশ্রামের জন্য খুব ভাল একটা বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হ'ল। দু-তিন দিন পর যখন তারা সুস্থ হ'ল, তখন রাজ-সভায় তাদের তলব হ'ল।

রাজাকে সিংহাসনে বসা দেখেই তারা তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলে এবং খুব ভক্তিভরে সেলাম করে আদেশের অপেক্ষায় একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"তোমরা কেন আমার রাজ্যে অত্যাচার করছ?"

মানুষের মধ্য হতে একজন উত্তর দিলে—"মহারাজের ন্যায়-বিচারের কথা শুনে আমরা এখানে এসেছি। আশা করি আমরাও আপনার ন্যায়-বিচার হ'তে বঞ্চিত হব না।"

রাজা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"তোমাদের কি বলবার আছে, বল।"

লোকটী উত্তর দিল—"ধর্ম্মাবতার, এই পশুগুলো আমাদের চাকর। এদের অনেকেই পালিয়ে গেছে; যাদের ধরে বেঁধে রেখেছি তারাও এ কথা স্বীকার করতে চায় না যে, আমরা তাদের প্রভু।"

রাজা বল্লেন—"এ সম্বন্ধে তোমাদের কোন প্রমাণ আছে? প্রমাণপত্র দলিল দস্তাবিজ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলে না, তা বোধ হয় জান?"

লোকটী বল্লে,—"হাঁ হুজুর, এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে।"

রাজা সেগুলো উল্লেখ ক'রতে বল্লেন। তখন লোকটী ব'লতে আরম্ভ ক'রলে—"মহান্ সেই খোদাতালা যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের জীবন ধারণের জন্য যা কিছু দরকার—সবই ঠিক করে রেখে দিয়েছেন। সব গুণগান তাঁরই—যিনি দুর্ব্বল মানুষের সুবিধার জন্য নানাবিধ পশু-পক্ষী সৃজন করেছেন। আর যিনি অন্ধ মানুষকে জীবনের সন্ধান দিলেন,—সেই মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের প্রতি স্বর্গের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক। ধন্য সেই খোদা,—যিনি এক বিন্দু জল থেকে হজরত আদমকে সৃজন ক'রলেন, তার থেকে তিনি হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন, তার পর এই পৃথিবীতে অসংখ্য জীবজন্তু সৃষ্টি করে মানুষকে তার মধ্যে

শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন। কোরাণে খোদাতালা বল্‌ছেন—"সমুদয় পশু পক্ষীকে তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় কর, তাদের মাংস খাও এবং চামড়া ও পশম দিয়ে গরম পোষাক তৈরী কর। সকাল হ'লে মাঠে তাদের চরতে দাও, সন্ধ্যা হ'লে আপন গোঠে ফিরিয়ে আন। তারা তোমাদের একটা অলঙ্কার বিশেষ।" অন্যত্র বলেছেন—"উটের পীঠে চড়ে ভিন্ন দেশে যাও আর জাহাজে চড়ে জলপথে ভ্রমণ কর।" অন্য স্থানে তিনি বল্‌ছেন,—"ঘোড়া, গাধা, উট তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তোমরা চড়ে' বেড়াতে পার।" আর এক স্থানে আছে—"ওদের পীঠে চড়, আর তোমাদের প্রতিপালন খোদাতালার মেহেরবানীর কথা চিন্তা কর।" কোরাণের অনেক যায়গাতেই এইরূপ বিধান আছে। এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে পশুরা আমাদের দাস আর আমরা তাদের প্রভু।"

রাজা পশুদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন—"এই লোকটী কোরাণ থেকে প্রমাণ ক'রছে যে, তোমরা তাদের দাস। এ সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বল্‌বার আছে?"

এ কথা শুনে একটা ঘোড়ার নিম্নলিখিত ভাবে উত্তর দিল:—"খোদাতালাকে শত ধন্যবাদ,—যিনি অনাদি অনন্ত ও অসীম, যিনি একটী মাত্র 'কুন্' শব্দদ্বারা তাঁর ভাবময় অন্তর্দেশকে নিখিল বিশ্বের আকারে বাইরে ছড়িয়ে ছিলেন, আর সেই সৃষ্টিকে রক্ষা করবার জন্য মানুষকে এই দুনিয়ায় পাঠালেন। মানুষের কর্ত্তব্য—সে এই নিখিল সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখবে, এর উন্নতি ক'রবে; ও পশু পক্ষীর প্রতি সদ্ব্যবহার ক'রবে ও তাদের কাছ থেকে প্রত্যুপকার নেবে। তাদের উৎপীড়ন বা ধ্বংস করবার জন্য ত মানুষ আসে নি। যাক্, তর্কের দিক দিয়া দেখতে গেলেও উনি যে কোরাণের বাণী উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, ওঁরা আমাদের জীবন মরণের প্রভু; কারণ উক্ত বচনগুলি দ্বারা মানুষের উপর খোদাতালার অনুগ্রহের কথাই বলা হচ্ছে, যেমন আর কোরাণের অন্যত্র আছে—"খোদাতালা পশুদিগকে তোমাদের অধীন করে সৃষ্টি করেছেন, যেমন অধীন সূর্য্য-তারা ও বাতাস-জলকে করেছেন।" ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, তারা আমাদের প্রভু, আর আমরা তাদের দাস, বরং এই কথাই প্রমাণ হয় যে, খোদাতালা তাঁর এই নিখিল জগতের মধ্যে সকলকেই পরস্পর পরস্পরের উপ[illegible] করে সৃষ্টি করেছেন, যা'তে সকলেই সকলের

[illegible] এ কথার

গূঢ় অর্থ এই হচ্ছে যে, আমরা তাদের উপকার ক'রব, আর তারা আমাদিগকে রক্ষা করবে; ভ্রমেও এ নয় যে, তারা আমাদের প্রভু আর আমরা তাদের দাস—যেমন নাকি তারা দাবী করেছে। আমরা সৃষ্টির অনেক পরে আমরা এই দুনিয়ায় বাস করছি। তখন আমাদের উপর কেউ অত্যাচার ক'রত না, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে যেখানে সেখানে বেড়িয়ে বেড়াতাম, কোন রকম চিন্তার কারণ ছিল না। মানুষ আসার পর থেকেই আমাদের [illegible] আদমের বংশধরগণ যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন থেকেই তারা আমাদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করলে। তারা ঘোড়া, গরুর, উট, ষাঁড় ইত্যাদি জীব জন্তুকে ধ'রে ধ'রে তাদের কাজে লাগাতে লাগল আর এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে যে, স্বপ্নেও তা আমরা ভাবতে পারিনি। তখন আমরা আর কি করতে পারি? আমরা বনে জঙ্গলে ও মরুভূমিতে পালিয়ে যেতে লাগলাম। সেখানেও নিস্তার নাই। তারা নানারকম ফাঁদ ও জাল তৈরী করে আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া ক'রলে, যারা ধরা প'ড়ল, উঃ!—তাদের প্রতি কি ভীষণ অত্যাচার, সে কথা বলবার শক্তি আমার নেই। এ ছাড়াও তারা আমাদের অনেককেই জবাই করে ছাল ছাড়িয়ে হাড়গোড় চূর্ণ করে, নাড়ীভুড়ি ছিঁড়ে ফেলে, কাবাব ইত্যাদি তৈরী করে খেয়ে থাকে। এই ত তাদের ব্যবহার! এতেও তারা সন্তুষ্ট নয়! এর উপরেও তারা দাবী করে—আমরা তাদের দাস! এ দাবীর কোন ভিত্তি নেই, যুক্তি নেই,—এ নিছক অবিচার আর উৎপীড়ন।"

(ক্রমশঃ)

মদনমোহন।

(১)

মাঝি মথুর উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়া বলিল, আর্দালী সাহেব, বাবু মহারাজকে জানও নৌকা আর নদীতে রাখ্‌তে পারি না। বাতাস নাই, সবটা আকাশে মেঘের নাম গন্ধ নাই, কেন সে আইড়ল খাঁ আজ এম্‌নি ভাবে উথ্‌লে উঠ্‌লো বুঝ্‌তে পারি না, বাপটা জীবন পদ্মায়, গঙ্গায়, মেঘনায় ও আইড়ল খাঁয় না বাহিয়া দিন কাটাইলাম, দাড়ি গোঁফ পাকাইলাম, নদীর এমন ভাব্‌ত কোন দিন দেখি নাই। এ কি, জলস্রোত তা, তর্ তর্ বেগে ছুটিতেছে, লহরে লহরে ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, একটু স্থির থাক্‌বার যো নাই, মাল্লারা প্রাণপণে দাঁড় টানিয়া হাতে ফুস্কা তুলিয়াছে স্থির ভাবে নিশ্বাসটা পর্য্যন্ত ফেলিবার সময় পাইতেছে না, আর আমি, কখন্ দাঁড়াইয়া কখন্ বসিয়া, কখন্ বা কাত্ হইয়া হাল ধরিতেছি, কই, নৌকাত কিছুতেই ঠিক্ রাখ্‌তে পারিতেছি না। কখন্ নৌকা খানা মোচার খোলের মত দুহাত উপরে উঠিতেছে আবার তন্মুহূর্ত্তেই এপ্ করিয়া তিন হাত নীচে পড়িতেছে পাছে নৌকা কাত হইয়া পাড় কাটিয়া যায় এই আশঙ্কায় প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে, নদীতে আর আর যত নৌকা ছিল ছোট বড় সব নৌকাই খাড়িতে আশ্রয় নিয়াছে লঙ্গর করিয়াছে। এপর্য্যন্ত আইড়ল খাঁ ছাড়ি নাই মদনমোহনের খাড়ি নিকটবর্ত্তী বাবুর অনুমতি পাইলেই ঐ খাড়িতে আশ্রয় নিতে পারি।

আর্দালী বাবুর সম্মতি জানাইলে মাঝি ডাক্ দিয়া মাল্লাদিগকে তালে তালে ধীরে ধীরে দাঁড় টানিতে বলিল, নৌকা খাড়ির দিকে চালাইল। দেখিতে দেখিতে নৌকা ছুটী খেলিয়া ছুটিয়া খাড়িতে প্রবেশ করিল। মাঝিসহ মাল্লারা সমস্বরে একবার মদনমোহনের নাম ও পাঁচ পীরের নাম নিল বদর্ বদর্, হাকিল এবং শান্তির নিশান ফেলিয়া কেহ তামাক সাজিতে গেল, কেহবা অনুচ্চস্বরে ভজন গাইতে আরম্ভ করিল।

(২)

নৌকার আরোহী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মস্ত বাবু। তাঁহার

কিম্বা পরে চাঁদপুরের ডেপুটীর আসনে এমনতর বড় বাবু আর বসেন নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে কেহ হেট কোট পেণ্ট্রুলেন ও চসমা ছাড়িতে দেখে নাই। স্থানীয় রাজা জমিদার ও বড়লোকেরা বলিত, "ডেপুটী বাবুর মত শিক্ষিত লোকের চাঁদপুরে আর শুভাগমন হয় নাই। তাঁহার মুখ দিয়া খৈয়ের মত ইংরেজী, হিন্দি ও সংস্কৃত বাহির হয়। বাবু ইংরেজী ভাষাটা এত আয়ত্ব করিয়াছেন যে কোন সময়ে নিতান্ত দায়ে পড়িয়া বাঙ্গালা বলিতে গেলেও ইংরেজী মিশান বাংলা ব্যতীত খাঁটী বাংলা বলিতে পারেন না।

তাঁহার বাড়ী ববিশাল, বিলাসপুরে। তিনি তিন বৎসর যাবত চাঁদপুরে অখণ্ডপ্রতাপে ডেপুটীগিরি করিয়া বহু অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। অনেক লিখালিখির পর তিনমাস কালের বিদায় নিয়া বাড়ী যাইতেছেন। ডেপুটী বাবুর নৌকা একখানা প্রকাণ্ড ভাওয়ালীয়া। ইহার মধ্যে স্নানাগার, আফিস ঘর ভোজনাগার, শয়নাগার ও পায়খানা ছিল। ডেপুটী বাবুর নৌকায় তাঁহার স্ত্রী মনোরমা, সদ্যস্ফুল্ল কুসুম-কলিকা সদৃশ, ঠিক একই চেহারার একই বর্ণের ও একই বয়সের দুটী শিশু পুত্র একটী ঝি ও আর্দ্দালী। এই নৌকার মাঝি মথুর দাস ও মাল্লা ছয় জন। অপর একটী ছমাল্লাই ডিঙ্গি পাকের সরঞ্জাম, অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র পাচক ঠাকুরসহ ভাওয়ালীয়ার পাছে পাছে আসিতেছিল। এই ডিঙ্গিতে দুই জন মাত্র মাঝি।

(৩)

আমরা ইতিপূর্ব্বে মদনমোহনের খাড়ির উল্লেখ করিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে ইহা খাড়ি নয় ইহা একটী ছোট নদী—আইড়ল খাঁ হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার আইড়ল খাঁতেই পতিত হইয়াছে।

এইরূপ প্রবাদ যে এখনকার বৃদ্ধেরা তাহাদের বৃদ্ধ পিতামহ বা মাতামহের নিকট শুনিয়াছে যে, প্রায় দুইশত বৎসরের পূর্ব্বে মদনমোহন বিগ্রহ স্থাপিত হইলে পর, বিগ্রহের সেবার ও স্নানের এবং সেবায়ত দিনের ব্যবহারের জলের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া তখনকার প্রধান সেবায়েত বা মোহান্ত মদন দাস তিন দিন, তিন রাত্রি অনাহারে ও অনিদ্রায় ধন্না দেওয়ার পর চতুর্থ দিনে এই খাড়ি নদীতে পরিণত হয় এবং বর্ত্তমান আকারে মদনমোহনের মন্দিরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হয়।

মদনমোহন জাগ্রত দেবতা। তাঁহার কৃপায় কত বন্ধ্যার পুত্র হইতেছে, কত মৃতবৎসা সুবর্ণকান্তি পুত্রকন্যা কোলে করিয়া বাবার মানত দিতেছে।

অন্ধের চক্ষু মিলিবার কথা ও পঙ্গুর পা হইতে অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বহুজনপূর্ণ নগর যখন সারা দিন রাত নিত্য নিত্য গন্তব্যপথে ধাবমান ও কর্ত্তব্য কার্য্যে নিয়ত শব্দায়মান লোকদিগের হৈ হৈ রৈ, রৈ, শব্দে,—মুখরিত থাকে, এখানে—"এই মদনমোহনের বাড়ীতে সেরূপ সূর্য্যোদয়ের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শত শত সহস্র সহস্র নরনারী নীরবে কাতারে কাতারে মন্দিরে আসিতেছে বাবার সাক্ষাতে সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইয়া নিজ নিজ অভীষ্ট জানাইতেছে, কেহ সন্দেশ, কেহ টাকা, কেহ মোহর, কেহ শাক সব্জী, কেহ ডাল চাল, কেহবা দুগ্ধ উপহার দিতেছে এবং নিঃশব্দে প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেছে সকলই প্রফুল্ল, সকলই সানন্দ, কাহারও মুখে হিংসা দ্বেষ বা চিন্তার লেশ মাত্র নাই।

(৪)

মন্দিরের সেবায়তগণ সকলই বৈষ্ণব,—হিংসাদ্বেষশূন্য, কৌপিন শিখা ও তিলকধারী এবং মুণ্ডিত মস্তক। প্রত্যেকের গলদেশেই নামের মালা দুলিতেছে। সকলই বিনয়ী সকলই নম্র, কাহারও মুখে উচ্চ কথাটি নাই। লোকের সেবা শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিবার জন্যই ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে। মন্দিরের মোহান্ত বামনদাস বাবাজী সংস্কৃতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি সর্ব্বদাই মালা যপে ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে নিরত থাকেন। তিনি সাদাসিধা ও সদাসন্তুষ্ট। তাঁহারও পরিধানে কৌপিন ও বহির্ব্বাস, তাঁহাকে দেখিলে সাধু বলিয়া বোধ হয়।

মন্দিরে কোন বৈষ্ণবী বা সেবাদাসী নাই শুনিয়া, সুন্দরীদের সুন্দর ও বিলোল কটাক্ষ পাছে বৈষ্ণবদিগের মুক্তি-মস্তক বিঘূর্ণিত করে, তাই এখানে কামিনী বিষবৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে যখন ডাওয়ালীয়া মন্থর গতিতে মন্দিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইল, তখন ডেপুটী বাবু মন্দির হইতে দীর্ঘ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন সোপান শ্রেণী এবং মন্দিরাভ্যন্তরে সুসজ্জিত হর্ম্ম্যাবলী অবলোকন করিয়া সাশ্চর্য্যে মন্দিরেশ্বরীর পূর্ব্বপরিচিত মাঝিকে বলিলেন "মথুর, এ গুলি কি? মথুর জোড় হাত করিয়া বলিল, এ মদনমোহনের মন্দির এই ঘাটে নৌকা রাখিতে পারি।

মন্দিরের শোভা দেখিয়া ডেপুটী বাবু চমৎকৃত হইয়া

ভাল করিয়া দেখার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল, মধুসূদন আর্থবিবার নৌকা সমর করিতে অম্লানবদনে অনুমতি দিলেন। ঠিক সেই সময়ে তিন চারিজন বৈষ্ণব পাড়ে দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "রাজা মহারাজ আপনি যেই হউন, বাবা মদনমোহন ও মহাপ্রভুর দোহাই, দয়া করিয়া তীরে পদার্পণ করিয়া অগ্রস্ত দেবতা মদনমোহনকে দর্শন করতঃ আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুণ"। উপেন্দ্র বাবু কিয়ৎকাল চিন্তার পর তাহাদের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন। অচির কাল মধ্যেই ধুতি পরিধান করিয়া, কোচান চাদরটী গলদেশে ঝুলাইয়া নগ্নপদে মনোরমা, শিশু সন্তানদ্বয় ও বি সহ ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। আরদালী আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল।

বাবু দেখিলেন প্রকাণ্ড বাড়ী, বিশালকায় সিংহদ্বার বজ্রময় (কুলিশ কঠিন) লৌহ কপাটে সংবদ্ধ। ফটকের সম্মুখ ভাগে আট জন বৈষ্ণব সহ মোহান্ত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিনীতভাবে দাঁড়ান আছে। মদনমোহনের বাড়ী চকমিলান। দালান চারিটীই মন্দিরাকারে গঠিত, প্রত্যেক মন্দিরের উপরে সুবর্ণ কলসী অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, আর প্রত্যেক সুবর্ণ কলসীর উপরি ভাগেই পীতবর্ণ পতাকা মৃদু মন্দ অনিলে পত্ পত্ রবে উড়িতেছে। মোহান্তের বিনীত ও সাদরাহবানে ফটক পার হইলে পর, মোহান্ত বাবুকে উত্তরের দালান দেখাইয়া বলিল, এই মন্দিরে বাবা মদনমোহন বিরাজিত আছেন। ডিপুটী বাবু তাঁহার সঙ্গীগণ সহ তথায় উপস্থিত হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন শ্বেতবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সমুচ্চবেদী বা সিংহাসনের উপরে ময়ুর পুচ্ছ নির্ম্মিত সুবর্ণচূড়া বামে হেলাইয়া, সোণার বাঁশীটী হাতে, পীতবসন গায় মদনমোহন ঠিক্ যেন মদনমোহনের ন্যায়ই, তাঁহার বাম দিকস্থিত নীল বসনা, সুবর্ণবর্ণময়ী কিশোরীর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি করিতেছেন ও মৃদু মৃদু হাসিতেছেন এবং শ্রীমতী ও নির্ব্বাক্ মুখভরা হাসিতে সেই বাঁকা শ্যামের বাঁকা ও বিলোল কটাক্ষের প্রতিদান করিতেছেন। তৎপর পশ্চিমের দালানে মোহান্তের আস্তানা পূর্ব্ব দালানে মদনমোহনের পাকশালা ও ভাণ্ডারখানা, এবং দক্ষিণের দালানে বৈষ্ণব শালা দেখিয়া, ডেপুটীবাবু নৌকায় প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলে মোহান্ত অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সহ বিনীত ভাবে তাহার পাছে পাছে নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া সে রাত্রির জন্য মদনমোহনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে এমনি কাতর অথচ বিনয় মিশ্রিত সরল আবেদন

তাঁহাকে অনুরোধ করিল যে, ভেপুটীবাবু কোন মতেই তাহার এ অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাবুর নিজ বাড়ীর রকমের উৎকৃষ্ট দাইল, সরু সুগন্ধি চাউল, ঘৃত, নানা রকমের তরকারী উৎকৃষ্ট দধি, দুগ্ধ ও সন্দেশ তিন জন বৈষ্ণব আনিয়া বাবুর পাচককে বুঝাইয়া দিল।

(৫)

পাচক হরিপদ গোসাইয়ের সঙ্গে আর্দ্দালী রামদাস সিংহের খুব সদ্ভাব ছিল। একটু অবকাশ পাইলেই সে আসিয়া বামুনের কাছে বসিত ও নানা খোস গল্প করিত। রামদাস চুপি চুপি হরিপদকে বলিল, "ঠাকুর আজ বাবুর পোষাক দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। আমিত তাঁহাকে কোনদিন ধুতি পরিতে ও খালি পায় চলিতে দেখি নাই। ঠাকুর বলিল ইহা তোমার ভুল। বাবু সর্ব্বদাই হিন্দু, সন্ধ্যা করেন না বটে, কিন্তু তাঁহার হিন্দু আনার দিকে ষোল আনা টান আছে। রাম, তবে মুরগী—খান কেন। ঠাকুর। আরে পাগল, সে শুধু ইংরেজী ভাষার জন্য। খুব বড় ইংরেজী ওয়ালাদের নিকটে শুনিয়াছি, প্রত্যহ সাপ্তহে সমাংস মুরগীর ঝোল্ নাকি না খাইলে ইংরেজী বিদ্যাটা চুপ্সিয়া যায়—সাহেব সোবাদের কাছে তেমন ফুর্ত্তি পায় না। বামুনের কথায় রামদাস চুপ্ করিল।

এদিকে মদনমোহনের মন্দিরে ঠিক সেই সময়ে'—শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসর ও ও মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল, ধুপ ধুনার গন্ধে চারিদিক সুগন্ধীকৃত ও আমোদ করিতে লাগিল এবং পরমুহূর্ত্তেই তান লয় যোগে সুমধুর সুরে সংকীর্ত্তন গীত হইতে লাগিল। সংকীর্ত্তন শেষ হইবার পর মুহূর্ত্তেই তিন চারটী বৃহৎ খঞ্জার করিয়া ঠাকুরের বৈকালী,—লুচি, সন্দেশ ক্ষীর ও সর দুইজন বৈষ্ণব নৌকায় দিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে হরিপদ দুই তিনবার মন্দিরে গিয়াছে ও বৈরাগী দিগের সঙ্গে মিলিয়া মিসিয়া এখানে সেখানে ঘুরিয়া তাহাদের কার্য্য কলাপ ও আচার ব্যবহার দেখিয়াছে এবং শুনিয়াছে বৈরাগীদিগের প্রত্যেকেই এক বাক্যে "বাবু খুব বড় লোক, বাবুর দুটী লোহার সিন্দুক ভরা টাকা ও সোণার অলঙ্কার এই কথা বলা বলি করিতেছে।

রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে নৌকায় সকলকে আহার করাইয়া ও নিজে আহার করিয়া, একটু বিশ্রাম করার পর হরিপদ আবার মন্দিরে গেল এবং

দেখিল যে বৈরাগীদিগের ও আহার শেষ হইয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ শুইয়াছে, কেহ কেহ বা এবথা সেকথা নিয়া গল্প গুজব করিয়া, আসর জাকাইয়া তুলিতেছে। এ সময়ে হরিপদ তথায় না বসিয়া, নৌকায় ডেঃ বাবুর কামরায় উপস্থিত হইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল বাবু সাহেব "নৌকা ছাড়িতে আদেশ দিলে ভাল হয়, রাত্রে এখানে থাকা বোধ হয় তেমন সুখকর ও নিরাপদ হইবে না।" বাবু বৈষ্ণবদের বিশেষতঃ মোহন্তের ব্যবহারে একিবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে আদৌ চিন্তা না করিয়া, হরিপদকে ধমক্ দিয়া বলিলেন "এসব বড় কথায় তোমার কাজ নাই ঘুমাও গিয়া রাত্রি প্রায় বারটা বাজিতে চলিয়াছে।" ঝি কে বলিলেন, "ঝি কপাটলাগাও।"

হরিপদ বিষণ্ণ মনে সে স্থান পরিত্যাগ করিল এবং নিঃশব্দে আফিস—কামরার দ্বারে দাড়াইয়া দেখিল কামরায়; মাঝি মাল্লা ও আর্দ্দালী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তখন সে নিজে কি করিবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ঠিক্ সে সময়ে, তাহার মনে, কি যেন এক অদূর স্থিত নিশ্চিত বিষাদের ছায়া প্রবেশ লাভ করিতেছিল। তাহার বিবেক—তাহার অন্তরস্থ দেবতা তাহাকে বৈষ্ণবদিগের প্রত্যেক কার্য্যে ও কথায়ই সন্দিহান করিতেছিল, এবং সব উপেক্ষা করিয়া যে কোন উপায়ে তাহার নিজের প্রাণ রক্ষা করার উপদেশ দিতেছিল। সে বিবেকের উপদেশ শুনিল ও ইহার প্রেরণায় তাহার নৌকার উজ্জ্বল বাতিটা ক্ষীণ করিয়া মাঝিদের কামরায় রাখিল ও বাহির হইতে কামরার শিকলটা আটিয়া দিল।

তৎপর যে স্থানে বসিয়া মাঝিরা নৌকার হাল ধরে সে সেস্থানে মৃতবৎ নীরবে পড়িয়া রহিল।

(৬)

রাত্রি প্রায় একটার সময়ে খুব মোটা পাঁচজন লোক আসিয়া বড় নৌকার পাশে দাঁড়াইল, তৎপর ঐ রকম আকৃতির আরো বার জন। তাহার পর প্রকাণ্ডকায়, ভুড়িওয়ালা তেরজন লোক আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী দলের সঙ্গে মিলিত হইল এবং সকলে, একত্র বসিয়া, একযোগে খুব সংগোপনে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। সকলই বলিষ্ঠ এবং সকলেরই মুখ ঢাকিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধা।

মুহূর্ত্তকাল পরামর্শ করার পর আট দশজন লোক ভাওয়ালীয়ার পার্শ্বে এবং তিনজন লোক ছোট নৌকাটীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, হাত বাড়াইয়া নৌকার তলদেশে ঠক্ ঠক্ করিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এরূপ করার পর

হঠাৎ নৌকা দুইটী নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। হরিপদের পা পর্য্যন্ত জল উঠিলে পর, সে ধীরে ধীরে নৌকা হইতে নামিয়া, ডুব দিয়া ডাঙ্গায় উঠিল ও তথায় মৃতবৎ পড়িয়া রহিল প্রায় পনর মিনিট কাল পর্য্যন্ত উভয় নৌকা হইতে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনা গেল তৎপর সব নীরব সব নিশ্চল।

হায়রে নিয়তি তোমার লীলা বুঝা ভার। সুদীর্ঘ তিনটী বৎসর বুকভরা উৎসাহ, মুখভরা হাসি, ও প্রাণভরা উদ্যমে যে ডেপুটীবাবু দিন রাত খাটিয়া নবীন আশায় ও নূতন ভরসায় শুধু তিনটী মাসের জন্য শান্তি কামনায় যাতৃ-কোলের অভিমুখে—যাইতেছিলেন, তাহার এই পরিণাম এই দশা।

যে সুশোভন মনোরম প্রকোষ্টটী মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে হাসির নন্দন-কানন, আনন্দের ফোয়ারা, দাম্পত্য প্রেমের উৎস, আশা ও ভরসার কল্পবৃক্ষ এবং সুকুমার সুন্দর শিশু দুটীর পীযূষমাখা হাসি ও আধ-আধ কথার কুসুম কানন সদৃশ ছিল, হায়রে। সেইটী এক নিমেষ মধ্যে নিয়তির ক্রুর হাসি ও ভ্রূকুটীতে নিবিড় অন্ধকারময়ী প্রেতপুরীতে পরিণত হইল তথাকার পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্যের কথা ভাবিতেও শরীর ঘন ঘন শিহরিয়া উঠে ও হৃদয় শুকাইয়া যায়।

মধুর, বাছা উঠ, আর ঘুমাইও না, সারাদিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর এই সুশীতল সলিল-শয্যা তোমার দেহ ও মনের আরামপ্রদ ও শ্রান্তিহর হইতে পারে তবু সে ঘুম ভাঙ্গিতে জানে না শরীর নিস্পন্দ, অসার ও প্রাণশূন্য করে এরূপ ঘুম ঘুমাইতে নাই। জাগ, নিজে জাগিয়া সঙ্গীগণকে জাগাও এবং অদ্য অপরাহ্ণে মেঘ ও বাতাস শূন্য অবস্থায় আইড়ল খাঁ কেন উথলে উঠেছিল যদি এখনও সে কথা বুঝিয়া না থাক, তবে বুঝিতে চেষ্টা কর।

ছোটবেলা হইতে সারাজীবন, দিন রাত আলো-আধারে বৃষ্টি-বাদলে, ছায়া-রৌদ্রে, বিদ্যুৎ-বজ্রে "ঝড়-তুফানে, সুখে দুঃখে নদীতে নদীতে নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পার নাই, আজ আইড়ল খাঁ তাহার ঢেউয়ের তীব্র কষাঘাতে তোমার না দুটীকে দোলায় মত দোলাইয়া, মদনমোহনের খাড়িতে প্রবেশ করাইয়া তাহা শিখাইয়া দিয়াছে।

যদি আজ আইড়ল খাঁর ভীষণ ভ্রূকুটী ও তরঙ্গের ভীম কষাঘাত উপেক্ষা করিয়া তুমি নৌকা দুটী বরাবর আইড়ল খাঁতেই চালাইতে তবে ডেপুটী উপেন্দ্র-বাবুর পরিণাম এরূপ শোচনীয় হইত না, এবং তোমার পরিণাম অন্যরূপ হইত।

(৭)

প্রায় আধ ঘণ্টা পর পাগরীওয়ালা ত্রিশ জন যমকিঙ্কর একসঙ্গে এক সময়ে নৌকাগুলি ডাঙ্গার দিকে সজোরে টানিতে লাগিল। নৌকা দুটী ডাঙ্গায় অনেকদূর উঠিলে পর, বৈষ্ণবদিগের দুই দুই জন এবং একটী যুবতীকে নৌকা হইতে তীরে তুলিল, ও কাঁধে করিয়া খুব তাড়াতাড়ি মন্দিরের দিকে লইয়া চলিল। এরূপভাবে সবগুলি লাস মন্দিরের মধ্যে নিয়া গেলে পর হরিপদ তাহার চতুর্দ্দিকে কাহাকেও না দেখিয়া লুক্কায়িত স্থান হইতে বহির্গত হইল। এবং তাহার নিজের পরার কাপড় দিয়া বৈষ্ণবদিগের মত মাথায় পাগরী বান্ধিয়া ও কৌপিন আটিয়া দ্রুতপদে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল। মন্দিরের দক্ষিণের দালানের পূর্ব্ব প্রকোষ্ঠে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্ব্বল একটী বৈরাগীকে চক্ষু বুজিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে ও, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে আহা উহু করিতে সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সে দেখিয়া আসিয়াছিল। এখন সেখানে সে ঐ লোকটীর পাশে বসিয়া মদনমোহনের মন্দিরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে মদনমোহন বিগ্রহ স্থানচ্যুত। বেদীর চতুষ্পার্শ্ব ঘেরিয়া বৈরাগীরা খুব দ্রুত ও খুব সঙ্গোপনে কি যেন করিতেছে। হরিপদ উঠিল অতি শীঘ্র অথচ অতি সন্তর্পনে পা টিপিয়া মন্দিরের ফটক পার হইয়া, এক দৌড়ে ঘাটে নৌকা দুটীর নিকটে পৌঁছিল। মুহূর্ত্তকাল নৌকা দুইটীর দিকে তাকাইয়া তাঁহার নিজের, ডেপুটী বাবু ও তাঁহার পরিবারের এবং অপরাপর আরোহীদের পূর্ব্বাবস্থা ও বর্ত্তমান শোচনীয় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিল। মুহূর্ত্তকালের জন্য সে আত্মহারা ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। এবং তাহার অজ্ঞাতসারে, তাহার চক্ষু দিয়া দুইটী তপ্তঅশ্রু বিগলিত হইল। সেই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে অর্দ্ধ-অচেতন ও অর্দ্ধ-সচেতন অবস্থায় সে যেন স্বপ্নে দেখিল নৌকা দুটী কৃতান্তের জীবন্ত সচল মন্দির সেই সূচীভেদ্য ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া ইহার শনৈঃ শনৈঃ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং দুর্ব্বোধ্য ও সম্যক—অশ্রুত ভাষায় তাহাকে তাহার সঙ্গীগণের সঙ্গ নিতে অনুরোধ করিতেছে। তাহার আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকার সাহস হইল না, মা গঙ্গে, বলিয়া খাড়িতে ঝাঁপ দিল ও সাতার দিয়া অপর পারে উঠিল।

(৮)

নৌকার কাছে অনেকগুলি লোকের শব্দ শুনিয়া, হরিপদ বুঝিতে পারিল, বৈষ্ণবেরা আবার আসিয়াছে পাছে সে তাহাদের চোখে পড়ে; এই আশঙ্কায়

ও প্রাণের মমতায় দ্রুতপদে ছুটিল। পদে পদে পদস্খলন হইতে—লাগিল, আছাড় পড়িতেছিল, তবু চলিতে আরম্ভ করিল; কোথায় চলিল কোন্ দিকে—জলের দিকে না স্থলের দিকে সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ নাই, উন্মত্তের ন্যায় অবিরাম গতিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িতে লাগিল।

নিবীড় অন্ধকার নিজের হাতটী পর্য্যন্ত দেখা যায় না অচেনা জায়গা, কোথায় গেলে মাথা রাখিতে পারিবে, একটু আশ্রয় পাইবে স্থির নাই তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, মাথা ভোন ভোন করিতেছে। সেদিকে খেয়াল নাই। যে দিকে পা চলে, সে দিকেই সে বাতাসের গতিতে চলিল।

হঠাৎ একটী বাড়ী দেখিয়া বুঝিতে পারিল এখান হইতে গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এত রাত্রে, এমন বিপদে, নিঃসহায় অবস্থায়, অপরিচিত স্থানে কি করিবে, কে আশ্রয় দিবে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া আবার ছুটিল।

আমরা বলিতে ভুল করিয়াছি, সে যে পাচক ব্রাহ্মণ এই পরিচয়ের জন্য, হরিপদ একটী পিত্তলের থন্তা প্রায় সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাখিত, এমন বিপদেও সে সেই থন্তাটী তাহার সঙ্গে আনিয়াছিল, রাত্রি অনুমান চারটার সময়ে সে ঐ থন্তাটী দিয়া একটী গৃহস্তের ঘরের পাছে বসিয়া সিঁদ কাটিতে আরম্ভ করিল। তখন গৃহস্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া কেবল তন্দ্রার ভাবটা ছিল ঘরের পাছে কিসে খচ্ খচ্ করিতেছে একথা দুই তিনবার মনে মনে বলিয়া, কিছুক্ষণ আড়ি পাতিয়া রহিল, তারপর তাড়াতাড়ি তথায় গিয়া, হরিপদকে ধরিয়া, টানিয়া বাড়ীর মধ্যে নিয়া আসিল।

হরিপদকে, গৃহস্ত প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, সে বলিল, "বাবা, আমি ব্রাহ্মণ, বিশ্বাস না হয় পৈতা দেখ। আমি পেটের দায়ে এমন কুকর্ম্ম করিয়াছি আমাকে মারিও না থানায় নিয়া চল, তথায় দারোগা বাবু যাহা হয় করিবেন।"

গৃহস্ত জাতিতে কপালী, তাহার ব্রাহ্মণের প্রতি বেশ ভক্তি ছিল, হরিপদের কথায় তাহাকে মারধর না করিয়া পরদিন বেলা এক প্রহরের সময়ে তাহাকে নিয়া প্রায় আট মাইল দূরবর্ত্তী কালীপুরের থানায় গেল এবং দারোগা বাবুর নিকটে যথারীতি এত্তাহার দিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

দারোগা কৃষ্ণদাস ঘোষ প্রায় আট মাস যাবত এই থানায় কার্য্য করিতেছেন। তিনি ঘুষ নিতেন না, বিশেষ কার্য্যদক্ষ ও কর্ত্তব্য পরায়ন ছিলেন। কাহারও সঙ্গে বিশেষ মেলা মেশা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি

নির্জ্জনে হরিদাসের সঙ্গে অনেকক্ষণ কি আলাপ করিয়া তাহার পাচক ঠাকুরকে বলিলেন, "ঠাকুর এই চোরটিকে তুমি তোমার নিজহাতে আমার এখানে খাওয়াইও; কনেষ্টবল কৃষ্ণসিংকে বলিলেন আমার এখান হইতে নিয়া তাহাকে একটী স্বতন্ত্র বিছানা দিও, আর যেন সে পলাইতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও।" বেলা দুইটার সময়ে দারোগাবাবু নিজে টেলিগ্রাম আফিসে গিয়া বরিশাল ও ফরিদপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডের নিকট দুইখানা টেলিগ্রাম দিয়া আসিলেন। এই ঘটনার তিনদিন পরে, সবেমাত্র পূর্ব্বদিক লাল হইয়া উঠিতেছে ও ধীরে ধীরে আলো আসিয়া অন্ধকারকে অপসারিত করিতেছে, এমন সময়ে থানার ঘাটে বিশালকায় তিন খানা বজরা আসিয়া নঙ্গর করিল। দারোগাবাবু এই সংবাদ পাইবামাত্র ঘুম ছাড়িয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ও ইউনিফরমের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে, ভুলে টুপীটা না নিয়াই দ্রুতপদে থানার ঘাটে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দুইজন সাহেব ও দুইজন বাবু বজরা হইতে লাফাইয়া পাড়ে উঠিলেন এবং দারোগা বাবুকে নিয়া পুনরায় বজরায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রায় এক ঘণ্টাকাল পরামর্শ করার পর দারোগা বাবু থানায় আসিয়া, থানা চারজন কনেষ্টবলের পাহারাধীনে রাখিয়া অবশিষ্ট কনেষ্টবল ও চোর হরিপদ সহ বজরায় আসিলেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, বজরায় সশস্ত্র কনেষ্টবল, দুইজন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব, দুইজন পুলিশ ইনস্পেক্টার, পাঁচ ছয়জন পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা পশ্চিমা জমাদার ছিল। বজরা ছাড়িবার আদেশ দিলে পর, প্রত্যেকটীতে তিনটী করিয়া পাল খাটাইয়া মাল্লারা প্রাণপণে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল, বজরাগুলি লক্ষ্য বেগে ছুটিল।

বেলা দশটার সময়ে নৌকাগুলি মদনমোহনের ঘাটে পৌছিলে দেখা গেল যে পাকা ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া আট নয়জন বৈষ্ণব বাসন মাজিতেছে। বজরা দেখিয়াই তাহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন্ বজরা কোন্ স্থানে নঙ্গর করিতে হইবে দেখাইয়া দিয়া তাহারা আখরার নিয়মানুসারে নৌকার আরোহীদিগকে মদনমোহন বিগ্রহ দেখার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইল।

নৌকা নঙ্গর করিলে পর ইনস্পেক্টর রতন বাবু, দশজন হিন্দু কনেষ্টবল ও দারোগাবাবু সহ একে একে ঘাটের সোপান শ্রেণী, সিংহ দরজা প্রাচীর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দালান তন্ন তন্ন করিয়া, দেখিয়া ইহাদের রচনা চাতুর্য্য বিশে-

সভা ও পারিপাট্যের কথা আলোচনা করিতে করিতে মদনমোহনের মন্দিরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন ও অবনত মস্তকে মদনমোহনকে প্রণাম করিলেন।

মোহান্ত কৃতাঞ্জলি পুটে, নিতান্ত বিনীতভাবে, সে বেলার জন্য মদনমোহনের আতিথ্য গ্রহণ করার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিলে তাঁহারা সভ্রমভাবে অস্বীকার করিয়া বজরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

(৯)

একটা বাজিতে পনর মিনিট বাকি আছে, এমন সময়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদ্বয়, ইনিস্পেক্টর, দারোগা, সমগ্র কনেষ্টবল, জমাদার ও হরিপদ সহ মদনমোহনের বাড়ীর সিংহদ্বার ও যে যে স্থানে গুপ্তদ্বার ছিল, সে গুলিতে সশস্ত্রে পাহারা বসাইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

রতনবাবু শ্লেষ মিশ্রিত পরুষ বাক্যে মোহান্তকে বলিলেন "ঠাকুর, আর জীবন মালা টপ্ কাইয়া; এখন যাহাদের খোঁজ সহজে করিতে পারিবে তাহাদের খোঁজ কর। ডেপুটী উপেন্দ্রবাবু ও তাহার স্ত্রী ও পুত্রের মৃতদেহ কোথায় আছে দেখাইয়া দাও।" এ কথায় মোহান্তের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, বক্ষস্থল দুর্ দুর্ করিতে লাগিল এবং মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে জড়িতস্বরে বলিল—"বাবু সাহেব তাহাদের লাস আমি কোথায় পাইব"? আচ্ছা দাঁড়াও, তুমি খোঁজ করিতে পারিলে না, আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতেছি। রতনবাবু এই কথা বলিয়া ২৪।২৫ জন বলবান কনেষ্টবলকে মদনমোহন বিগ্রহ উঠাইয়া আনিতে আদেশ করিলেন। এদিকে মোহান্ত কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেলেন। দুই জন সশস্ত্র কনেষ্টবল তাহার পাহারায় মোতায়ন হইল। সবলে মদনমোহন বিগ্রহ বেদী হইতে—স্থানান্তরিত হইলে, দেখা গেল যে, নীচে এক একাণ্ড বাঁধান গর্ত্ত। ইহা শবে পরিপূর্ণ। গর্ত্ত হইতে তীব্র, জ্বালাময় দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। বৈরাগীদিগকে গর্ত্ত হইতে শব উঠাইবার কড়া হুকুম দিলে পর, তাহারা একে একে সেই রাত্রের সব লাসই তুলিয়া বাহিরে শ্রেণীবদ্ধভাবে (সারি দিয়া) রাখিল। ইনেস্পেক্টর বাবুর আদেশানুসারে হরিপদ একে একে সব লাসই শনাক্ত করিল।

সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট-সাহেবদ্বয় শিশু দুটীর মৃতদেহ দেখিয়া চোখে রুমাল দিয়া প্রাচীন ইনেস্পেক্টর রতনবাবুকে বলিলেন "বাবু! তোমাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম না অহিংসামূলক এবং দ্বেষ ও স্পৃহা শূন্য? তদুত্তরে রতনবাবু বলিলেন

সাহেব, বিষুমাত্র রক্তপাতকে বৈষ্ণবেরা ঘৃণা করে, হিংসাদ্বেষের মূল বর্জ্জন বিশ্বাস করে কিন্তু রক্তপাতশূন্য হিংসা বা হত্যা তাহারা তাহাদের ধর্ম্মের প্রতিকূল বলিয়া মনে করে না। দেখুন মোহান্ত কেমন নিচুর (খাটি) বৈষ্ণবী হত্যা! একসঙ্গে এতগুলি লোককে হত্যা করা হইল এক ফোঁটা রক্তও হইল না একটী লোকে চীৎকার পর্য্যন্ত দিল না! কেমন মোহান্ত ঠাকুর তোমার ধর্ম্মের মর্ম্ম এমন নয়?

রতন বাবুর যুক্তিমূলক শ্লেষপূর্ণ উত্তরে সাহেবদ্বয় উভয়ই এক সঙ্গে হো হো স্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে গর্ত্ত হইতে আরো দুইটা অপরিচিত মনুষ্যকঙ্কাল উঠাইয়া বৈষ্ণবগণ দ্বারা মৃতদেহগুলি অপর একটী ভাড়াটে নৌকায় উঠাইল। মোহান্ত ও তথাকার ছোট বড় সব বৈষ্ণবকে পক্ক রজ্জু দ্বারা বান্ধিয়া ও প্রত্যেকের হস্তে এক এক জোড়া লৌহবলয় পরাইয়া একটী বজরাতে সশস্ত্র পুলিসের পাহারাধীনে রাখা হইল। মন্দিরের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করার জন্য লিখিয়া সোনা, রূপা, টাকা, অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্র ও সমস্তমোহন বিগ্রহ বজরাতে উঠাইল। বাড়ীটা পাঁচ জন সশস্ত্র জমাদার ও পঁচিশ জন কনষ্টেবলের পাহারাধীনে রাখিয়া, সন্ধ্যার সময়ে রবিদাস অভিমুখে বজরা ছাড়িবার হুকুম দিল।

(১০)

অদ্য মদনমোহনের মোহান্ত ও সেবায়তগণের বিচারের দিন। আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য, দাঁড়াইবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কেহ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক হরিপদকে, কেহ মোহান্তকে কেহবা মদনমোহনকে দেখাইতেছে, সকলেই নীরব, সকলেই নিস্তব্ধ এবং সকলের মুখেই ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও জিঘাংসার জ্বালাময়ী ছায়া বিরাজ করিতেছে।

জজ সাহেব আসন গ্রহণ করিলে পর সরকারী উকিল উদ্দীপনা পূর্ণ কর্কশ ভাষায়, মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত ঘটনা জুরী মহোদয়দিগের নিকটে বিবৃত করিলেন। সমবেত জনসঙ্ঘ কটমট দৃষ্টিতে মোহান্ত ও বৈষ্ণবদিগের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিল এবং প্রায় সকলের মুখ হইতেই তাহাদের অজ্ঞাতসারে খেদসূচক আহা হুহু শব্দ বহির্গত হইল।

জজ সাহেব প্রায় দুই ঘণ্টা কাল হরিপদের জবানবন্দী গ্রহণ করিলেন।

তৎপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদ্বয়, ইনেস্পেক্টরদ্বয়, দারোগাবাবু ও ডাক্তারবাবুর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, জুরীদিগের মত চাহিলেন।

জুরীগণ, কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর সকলেই এক বাক্যে আসামীগণকে দোষী বলিলে পর, জজ সাহেব মহোদয় রামদাস মোহন্তকে ফাঁসির ও অপর বৈষ্ণবদিগকে যাবজ্জীবন কারাগারের আদেশ দিলেন। তখনই আদালত গৃহে তাহাদিগকে শিকল ধরিয়া বাহির করার ধুম পড়িয়া গেল। জনসঙ্ঘ জজ সাহেবও জুরীদিগকে ধন্যবাদ দিতে দিতে হর্ষোৎফুল্ল মুখে আদালতগৃহ পরিত্যাগ করিল। হরিপদ ও দারোগা কৃষ্ণদাস ঘোষের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সানুকূল বিবেচনা করার জন্য জজ সাহেব গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। এবং দশ বৎসরের মধ্যে এমন বীভৎস ও লোমহর্ষণ কাণ্ডের স্থানটীর চিহ্ন স্বরূপ সে স্থানে একটী ইটও যেন না থাকে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী ও উদ্যোগী হইতে পুলিস বিভাগকে লিখিলেন।

বরিশালের সুযোগ্য পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যত্নে, চারিমাসের মধ্যেই দারোগা কৃষ্ণদাস বাবু ইনিস্পেক্টরের পদে উন্নিত হইলেন এবং হরিপদ গোসাইকে থার্ড গ্রেড সাবইনিস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইল।

এই দুর্ঘটনার কয়েক মাস পরে সরকারী কোন কাজের জন্য মদনমোহনের বাড়ীর দুইটা দালানের ইট আনা হইল। তৎপর বৎসর বর্ষাকালে, আইরল খাঁ প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইয়া পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গাভিঘাতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মদনমোহনের বাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

আর এই ভীতিপ্রদ লোমহর্ষণ ঘটনায় দশবৎসরের মধ্যে আইরল খাঁ উন্মত্তবৎ প্রবল তরঙ্গের তাণ্ডব নৃত্যে মদনমোহনের বাড়ীটী এমনি ভাবে ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া, ধুইয়া ভাসাইয়া নিয়া গেল যে, বাড়ীর একখণ্ড ইট কিম্বা এক টুকরা মাটীরও খোঁজ পাওয়া গেল না। পূর্ব্বে যে স্থানে মদনমোহনের প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, বর্ত্তমানে সে স্থানটীর চিহ্ন মাত্র নাই, চারিদিকেই আইরল খাঁর বিশাল বক্ষে বিশালকায়, পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গগুলি উদ্দাম ও তাণ্ডব নৃত্যে নৃত্য করিতেছে।

শ্রীশারদাচরণ দত্ত।

মার্জ্জনা।

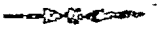

(১)

তুহু সুকুমারী, রাজার ঝিয়ারী,
আমি দীন হীন পথের ভিখারী
তোমাতে আমাতে
অযুত প্রভেদ,
ভিখারীরে ক'রো মার্জ্জনা,—
—ক'রো মার্জ্জনা।

(২)

চন্দ্রমার প্রায় গগনের গায় ভ্রম যবে সৌধ শিরে,
অমল বদন শারদশশী
এলায়িত চারু চিকুর রাশি,
অধরে বিজলী হাসিটী তায়
উড়ে অঞ্চল-চঞ্চল বায়—
অস্তগামী-রবি রক্ত কর রাশি রক্ত পদে লুটে ধীরে—
অনুরাগ রাঙ্গা,—
হৃদি খানি ভাঙ্গা,
লুটে পড়ে বাঁধা মানে না
অবোধে ক'রো মার্জ্জনা, করো মার্জ্জনা।

(৩)

রক্ত করতলে যুক্ত কপোল, মুক্ত বাতায়ন তলে,
খঞ্জন-গঞ্জন অঞ্জন ঢাকা
লোচন যুগল সোহাগ মাখা,
কি জানি কি ভাবে চাতকীর পানে,
কি জানি থাকলো কাহার ধেয়ানে,
ভ্রান্ত উন্মাদ মুগ্ধ পরাণে, বসে থাকি তরুমূলে।

অনিমেষ আঁখি
দেখি তবু দেখি
আঁখির পিয়াস মিটে না,
দর্শকে ক'রো মার্জ্জনা, ক'রো মার্জ্জনা।

(৪)

হাসি মুখ তুলে আকণ্ঠ আবরি খেলা কর যবে জলে,
বীচি বিচঞ্চল সরসী মাঝে
ফুল্ল নির্ম্মল নলিনী সাজে
সিক্ত বসন মুক্ত কেশ রাশি
সিক্ত সুতনু মোহিনী রূপসী
আবাস গামিনী সিক্ত পদ রেখা আঁকিয়া সোপান তলে
আপনারে ভুলে,
থাকি আঁখি তুলে
চির জনমের কামনা,।
মুগ্ধে ক'রো মার্জ্জনা, ক'রো মার্জ্জনা।

(৫)

প্রীতি কোমল কণ্ঠ গীতি তব সুপ্ত নিশীথ মুখরি,
ভুবনে ঢালিয়া করুণ তান
আকুল করিয়া হৃদয় প্রাণ
মোর ভুলায়ে সকল হীনতা
মোর ভুলায়ে সকল দীনতা
স্বরগ মরত মথি প্রকাশিত হৃদয় মন্দিরে সুন্দরী,
দেবী মুরতি খানি
মহিমময়ী রাণী
নত শিরে করি অর্চ্চনা।
পূজারীরে ক'রো মার্জ্জনা, ক'রো মার্জ্জনা।

শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস।

বিরহী।

(গল্প)

আমরা তিন বন্ধু—প্রবোধ, হরেন ও আমি, তিন জনে গঙ্গার উপর নৌকা বাহিয়া চলিয়াছিলাম। ফাল্গুনের অপরাহ্ন, মৃদুমন্দ দক্ষিণ বাতাসে মন প্রাণ আকুল করিতেছিল। আমরা গঙ্গার মাঝখান দিয়া নৌকা চালাইতেছিলাম, তাই উভয় তীরের কত রকম দৃশ্য আমাদের চোখের সাম্‌নে আসিতেছিল। কোথাও বা বিস্তৃত প্রান্তর, কোথাও বা নানাজাতীয় ফলের বাগান, কোথাও ছোট বড় নানা রকমের বাড়ী। গঙ্গার ধারের এই বাড়ীগুলি সত্যই যেন স্বপ্নপুরীর মতন বোধ হইতেছিল। প্রকৃতি দেবী উভয় তীরে যেন অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার রাখিয়াছিলেন। তীরের বৃক্ষশ্রেণী যেন পথিককে আহ্বান করিতেছিল।

আমরা যে দিকটার কথা বলিতেছি তাহা কলিকাতা হইতে অনেক দূরে; তাই সেখানে এখনও কলওয়ালাদের বড় বড় চিমনি মাথা উঁচু করিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া নাই। তাই গঙ্গার তীরে তেমন কোলাহল নাই। গঙ্গার ঘাটে কোথাওবা পারের যাত্রী খেয়ার আশায় বসিয়া আছে, কোথাও বা পল্লীবালা কাপড় কাচিতেছে, কেহবা কলসী কাঁখে জল লইয়া ঘরে ফিরিতেছে, এই রকম নানা দৃশ্য। এই সব দৃশ্যে যখন মন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তখন দেখিতে পাইলাম এক চিতায় ধূম উড়িতেছে। এই দৃশ্য আমাদের মনে এক বিষাদের ছবি আঁকিয়া দিল। মনে হইল আজ আমরা আনন্দে জল ভ্রমণ করিতেছি, আর না জানি কোন হতভাগ্য তার প্রিয় চিতায় শবদেহ তুলিয়া দিয়া কাঁদিতেছে! মনের এই ভাব দূর করিবার জন্য বন্ধু হরেনকে বলিলাম, ভাই, একখানা গান কর। গান বাজনার সরঞ্জাম সব নৌকাতেই ছিল, সে হার্‌মোনিয়ম বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল।

মাঝি—তরী হোথা বাঁধব নাক আজকে সাঁঝে!
ভিড়িও নাক চলুক তরী, ঐ নদীর মাঝে।
ঐ নদীর ঐ বকুল গাছে, জলটী যেথা ছুঁয়ে আছে;
এখনো সেই ঘাটের পাশে পল্লীবালার কাঁকন বাজে।

সেই সাঁঝের ম্লান মাধুরী, কতই ব্যথা আন্‌ছে ডেকে,
গ্রামের ছোট দীপটী প্রাণে বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে
একটী গৃহ হেথায় কি না, ছিল আমার বড়ই চেনা,
ছবিটী তার আজো আমার হৃদয় মাঝে সদাই রাজে।
ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে, এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া,
যেত ছোট কলসীটী তার কোমল তাহার কক্ষে নিয়া,
সোহাগে জল উথলে উঠে,
পড়ত প্রিয়ার বক্ষে লুটে,
পথে দেখে আমায় প্রিয়া ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে।
ঐ নদীর ঐ স্কুল তলে, তটিনীর ঐ শ্যামল কূলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে
এখনো সেই চিতার পরে, শিথিল বকুল পড়ছে ঝড়ে,
সরল মধুর মুখখানি তার দেয় গো ব্যথা সকল কাজে। *

হরেনের গলা বড় সুমিষ্ট ছিল কাজেই এই গান বড় ভালো লাগিয়াছিল। কিন্তু প্রাণে আনন্দ আনিবার জন্য তাহাকে গাহিতে বলিলাম, গানে সে উদ্দেশ্য সফল ত হইলই না বরং প্রাণে এক গভীর বিষাদের রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল।

গান থামিয়া গেল, কিন্তু আমি প্রবোধের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলাম দেখিলাম, সে কাঁদিতেছে। গানটী শুনিলে প্রাণে দুঃখ আসে সত্য কিন্তু এমন করিয়া কান্না; এক দরদী ছাড়া আর কেউ কাঁদিতে পারে না। তাই যদি হয় তবে প্রবোধের কাঁদিবার কারণ কি? জানিতাম সে অবিবাহিত, এবং বিবাহ করিবে না, কাজেই কোন নারীর প্রেম তাকে মুগ্ধ করে নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস, তাই কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ব্যাপার কি প্রবোধ, এমন করে কাঁদচ যে?"

সেদিন তার মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল, তাই সে মনের কথা গোপন করিতে পারিল না। বলিল,—ভাই এই গানে আমার প্রাণের সঞ্চিত ব্যথা যেন নতুন করে জাগিয়ে দিলে।"

আমি বলিলাম—"তোমার আবার দুঃখ কি? তুমি ত এসবের মধ্যে বাঁধা পড়নি কখনো।"

* শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখিত।

"পড়েচি বৈকি, তা নইলে আর এমন দুঃখে আমার কাঁদিবার আগ্রহ হইল কেন? বলিলাম—"তা হলে ভেতরে অনেক ব্যাপার আছে বল। তাই বলতে হবে তোমায় ব্যাপার কি? তবে যদি তোমার কষ্ট হয়, না-হয়—"

প্রবোধ রুমালে চোখ মুছিয়া বলিল—'না ভাই, বলছি শোন। আমি সে দুঃখ আর চেপে রাখতে পারচি না।"

তখন সে বলিতে আরম্ভ করিল,—

তখন আমি বি এ পড়িতাম। আমার এক বন্ধু সতীশের সঙ্গে তাদের দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তাদের বাড়ী ও এই গঙ্গার ধারে একখানি গ্রামে, তবে সে গ্রামের নাম করিব না। সেই গ্রামখানি খুব বড় নয়, কিন্তু সেই গ্রামখানি যেন সৌন্দর্য্যের খনি। গ্রামখানি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। তাই সেখানকার নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

সতীশ তখন ডাক্তারী পড়িত। একদিন আমি ও সতীশ দুজনে তার ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময়, এক বিধবা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া বলিলেন, বাবা একবারটী দয়া করে আমাদের বাড়ী যেতে হবে। মেয়েটার আজ বিয়ে, কিন্তু কি জানি কেন ভাব মূর্চ্ছা হয়েচে। আর একঘণ্টা পরে বিয়ের লগ্ন, যদি বিয়ে না হয় তা হ'লে এজীবনে আর বিয়ে দিতে পারব না।'

সতীশ সেই কথা শুনিয়া বলিল—"যাচ্ছি চলুন, তার জন্য ভাবনা কি?

বিধবা বলিলেন—"এস বাবা, তুমি যাবে তা জানি। গ্রামে যা ডাক্তার আছে সেত আমার মতন গরীবের বাড়ী যাবে না। তাইতে কাছে তুমি যখন থাক, তোমার কাছে ছুটে আসি। তুমি যখন থাক, তখন বরং অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকি।"

সতীশ সে কথার জবাব দিল না। আমায় বলিল—প্রবোধ আমার সঙ্গে চল না, খানিক ঘুরে আসাও হবে।

আমি বলিলাম—"বেশ চল, তাতে আর আপত্তি কি? এখানে বসে থেকেই বা কি হ'বে।"

তখন দুই জনে সেই বিধবার সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলাম। তাঁর বাড়ীও বেশী দূর নয়। বাড়ী ঢুকিতেই সামনে দেখিলাম এক বিবাহ-সভা। এক বৃদ্ধ বরবেশে বসিয়া আছে। বুঝিলাম আজ কার বিবাহ, বিবাহ নয়-কন্যা উৎসর্গ। সতীশকে বলিলাম "বর কেমন দেখচ।"

সেও বর দেখিয়া চমকিত হইল। বলিল—"ভাই এ বিয়ের কথা কিছুই জান্‌তুম না। জানত আমি দেশে খুব কমই আসি। এ যে একেবারে কন্যা বলিদানের ব্যাপার হয়েচে। আগে শুন্‌লে না হয় কিছু টাকা সাহায্য করে যদি ভাল জায়গায় বিয়ে হয় চেষ্টা করতুম।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, মেয়ের এই বর দেখে মূর্চ্ছা হয়নি ত?"

সতীশ বলিল—"তা অসম্ভব নয়, এই রকম বরকে কোন নারী স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারে? আমার ত মনে হয় মূর্চ্ছা হওয়াই উচিত।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা এই বিয়ে কোন উপায়ে রদ করা যায় না কি?"

সতীশ বলিল—"তা কেমন করে যাবে। না হয় ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিতুম, কিছু খরচ করতুম, কিন্তু যখন একবার বিয়ে ঠিক হয়েচে—এ বিয়ে ভেঙ্গে গেলে আর কেউ সে মেয়েকে বিয়ে করবে না।"

"তা বটে," আমি আর কিছু বলিলাম না।

ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলাম মেয়েটী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। মেয়েটী সুন্দরী। যেন একরাশ ফুটন্ত ফুল ছড়ান রহিয়াছে। মন যেন কি এক অব্যক্ত বেদনায় টন্ টন্ করিতে লাগিল। আজ অর্থের অভাবে এমন সুন্দরী এক বৃদ্ধের স্ত্রী হইতে যাইতেছে,—যে বৃদ্ধের বয়স তার বাবার মতন বোধ হয় হইবে। তার মুখখানি বড় সুন্দর কি সরলতা মাখান। এমন সৌন্দর্য্য, সরলতা ইহার কি সমাজে কোন দাম নাই? মানুষের চেয়ে তার টাকাই কি এত বড়? আর এই মেয়েটী বিবাহের শঙ্খধ্বনির মধ্যে, শুভক্ষণে যাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাহাতে সে সুখী হইতে পারিবে কি? এযে দুঃখের নামান্তর।

সতীশের অল্পক্ষণ চেষ্টাতেই তার মূর্চ্ছা দূর হইল। জ্ঞান হওয়াতে মেয়েটী আমাদের দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দূরে সরিয়া বসিল। আমি নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম—এ মেয়েটীর দুঃখ দূর করা যায় কিনা। সতীশ বলিয়াছে অপর বরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যায়; কিন্তু বর পাওয়া যাইবে কোথা? ও ছাড়া ইহার দুঃখ দূর করিবার কোন উপায় নাই। সতীশ সেই বিধবার সঙ্গে নানা কথা কহিতেছিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এরা কি"?

"মুখোপাধ্যায়"।

"তবে আমাদের বিবাহে বাধে না। যদি আমি বিবাহ করি, তবে ত মন্দ হয় না; কত বড় অন্যায় থেকে ইহাকে রক্ষা করা হয়। নইলে আর কোন উপায় নাই। কিন্তু ভয় বাবাকে, মা হয়ত প্রথমে একটু রাগ করিতে পারেন;

কিন্তু নারীকে এত বড় অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করিয়াছি, শুনিলে কখনও রাগ করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি বাবাকে ভয় করিতাম, তাঁর কাছে গিয়া আমি বিবাহ করিয়াছি একথা বলিতে পারিব না। শুনিলে তিনি কি বলিবেন, আমি তা ভালো রকমই জানিতাম।

" কিন্তু এই দৃশ্য কেমন করিয়া দেখি। অবশ্য এরকম ব্যাপার কত শত হইতেছে, তা কটারই বা খোঁজ রাখি। তুমিও হয়ত বলিবে আমার এত মাথা ব্যথার দরকার কি? সে কথা ঠিক। কিন্তু মানুষের সব খোঁজ রাখা ত নয়ে নয়। চোখের সামনে মানুষ যা দেখে তারই জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। ভাবিলাম বাবা যা মনে করেন করুন, আমি ইহাকেই বিবাহ করিব। যদি ভগবান থাকেন তবে একদিন বাবারও মন নরম হইবেই।

আমি সতীশকে বলিলাম—"ভাই, আমি এই মেয়েকে বিয়ে করব।"

সতীশ কহিল—"আজ রাতেই"? "হাঁ"।

সতীশ বলিল "আমি এ কথা শুনে যে কি পর্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হলুম তা বলে শেষ করতে পারচি না"। তখনি বিধবাকে বলিল—"মা আমার এই বন্ধু আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চান, দেবেন আপনি? এর কি আছে না আছে তা আপনি জানেন না কিন্তু আমি জানি। খুব বড় লোকের ছেলে। আপনার মেয়ের অদৃষ্ট ভাল যে এ বিয়ে করতে চাইচে। এ অমনি বন্ধু, বি-এ পড়ে"।

বিধবার চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন—"এত সুখের কথা, বাবা আমার যে এতে কি আনন্দ হল, তা আর কি বলব। আমি যেন স্বর্গ হাতে পেলাম। ওঁর সম্বন্ধে আমার কোন কথাই জানবার দরকার নেই, যিনি মেয়ের দুঃখে এতখানি কাতর হয়েছেন তার মনটাই শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য। তা ছাড়া যদি ওঁর কিছুই না থাকত তবু কমলা আমার মনের মতন স্বামী নিয়ে বনে বাস করেও সুখী হতে পারবে। মেয়ের যে কেন মূর্চ্ছা হয়েছিল তাও জানি, কিন্তু কি করব; উপায় ত কিছু নেই, তাই আজ মেয়েকে বিয়ের সাজের সঙ্গে সঙ্গে বিধবার সাজে সাজাবার জোগাড় করতে গিয়ে বুকফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু একটী কথাও বলতে পারিনি? কাকে বলব, কেইবা শুনবে?

সতীশ বলিল—"যাক, এইবার ত আপনার ভাবনা গেল, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়ের জোগাড় করুন। আমি বাড়ী থেকে লোক জন এনে সমস্ত ব্যবস্থা করচি"। সে তখন সেখান থেকে চলিয়া গেল।

সে জমিদারের ছেলে, তাহার যথেষ্ট, সুতরাং বিবাহ ভাঙাইয়া, তাদের তাড়াইয়া দিতে সতীশকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

বিবাহে শুধু সতীশই যোগ দিল না—তার দিদি, বৌদিদি, প্রভৃতি আসিলেন।

ঠিক লগ্নেই বিবাহ আরম্ভ হইল। শুভদৃষ্টির সময় দেখি, কমলা আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। তার চোখে মুখে অপার আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। মনে হইল সেই আনন্দই ভগবানের আশীর্ব্বাদ। তার সেই মুখখানি নম্রতা ও কৃতজ্ঞতায় ভরা।

বিবাহ হইয়া গেল। পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যখন বলিয়াছিলাম তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার হোক, তখন কি স্বর্গীয় আনন্দে আমার মন ভরিয়া গিয়াছিল তা আমিই জানি। বিবাহের সময় দেখিলাম কমলার গায়ে এক গা অলঙ্কার। গরীবের মেয়ে এত অলঙ্কার কোথায় পাইল? আমি কিছু আশ্চর্য্য হইলাম, পরে শুনিলাম—সতীশ দিয়াছিল।

সতীশকে বলিলাম—"ভাই, গয়না দেবার ও কোন দরকার ছিল না, আমি ত চাইনি।"

সতীশ বলিল—ভাই আমি কিছু জানি না শুসব বিষয়। আমার বৌদিদি, দিদি এরা সব বিলেতে গিয়েছেন, বোধ হয় তুমিও জান। তাঁরাই এই সব গয়না দিয়েছেন। তবে কেবল হার দিতে আমি বারণ করে দিয়েছি—কেন না আমি তোমার স্ত্রীকে উপহার দেব।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কেন না উপহার দেওয়া ত ফেরত দেওয়া যায় না, নইতেই হইবে।

বিবাহের পর বাসর ঘরে কমলা যখন সুসজ্জিতা হইয়া আমার পাশে গিয়া বসিল, তখন তাহাকে দেখিতে ঠিক কমলার মতনই হইয়াছিল!

বিবাহের পর শাশুড়ী বলিলেন—"বাবা, আজ আমায় যে কি উদ্ধার করলে তা আমিই জানি। আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক, সুখে থাক।"

আমি বলিলাম "না না এ সব কিছুই নয়, সবই আপনার মেয়ের ভাগ্য!"

"তা বটে! কিন্তু তোমার গুণ ত অস্বীকার করা যায় না বাবা!"

বিবাহের পরদিন শাশুড়ীকে বলিলাম—"মা, আমি বাবার, আর, মত না নিয়েই বিয়ে করেছি, সেজন্য আজ আমি নিয়ে যেতে পারব না। শুধু

আজ কেন হয়ত অনেকদিন থাকতে হবে। আমি বাবার মন বুঝে ভাবনার নিয়ে যাব।"

তিনি বলিলেন—"তার জন্য কোন ভাবনা নেই বাবা! তবে তুমি আমাদের ভুলে না যাও এই আমার অনুরোধ।"

"না মা ভুলব কেন, প্রায়ই আস্‌ব।"

তাঁর অনুরোধে বিবাহের পর সাত আট দিন সেখানে রহিলাম। সংসারে মাও মেয়ে ছাড়া আর কেহই ছিল না। সে সময় দেখিয়াছি আমায় সুখে রাখিবার জন্য মা ও মেয়ের কি চেষ্টা। আমি বড়লোকের ছেলে পাছে আমার এতটুকু কষ্ট হয়।

নববিবাহিতা স্ত্রী যেমন প্রথম প্রথম স্বামীকে লজ্জা করিয়া চলে, সে সেরকম করিত না। সর্ব্বদা আমায় সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। আমার কোন আদেশের জন্য সদা উৎকর্ণ হইয়া থাকিত, এবং কোন আদেশ পাইলে কৃতার্থ হইত। আমি ভাবিতাম—একি ভাল বাসা না কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ!

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা কমলা "একি তোমার ভাল বাসা না কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ!"

কমলা বলিল—"কেন, আমি কি তোমায় ভালবাসি না?"

"কিন্তু ভাল বাসলে কি এমনি করে চল্‌তে হয়?"

"তাতে ক্ষতি কি? পাছে তোমার কোন কষ্ট হয় এই জন্য। আর বাস্তবিক ও তোমার কষ্ট হচ্ছে। তোমার দোতালা পাকা বাড়ী, ভাল ঘরে থাকতে, খাট বা পালঙ্কের—উপর শুতে, আর আমায় মাটীর ঘর না আছে খাট না আছে ভাল বিছানা। তুমি স্বীকার করবে না তাই যাওয়ার কথা ছেড়ে দিলুম। তুমি আমার জন্য এত কষ্ট সইছ, আর আমি তার জন্যে এমন কি করতে পারচি?"

আমি তাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলাম—"না গো না, আমার কোন কষ্ট হয় নি তোমার মতন রত্ন যেখানে আছে সে জায়গায় থাকতে কি কষ্ট হয়।"

তারপর দুজনে কি এক গভীর আনন্দে মগ্ন হইয়া গেলাম, কথা কহিবার শক্তি রহিল না। খানিকপরে কমলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা কমলা তোমার বিয়ের দিন মূর্চ্ছা হয়েছিল কেন?"

তার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বলিল—'কি জানি তা বল্‌তে পারি না।"

আমি বলিলাম—"ও জবাব দেবে তা জানি। কিন্তু আমি ও উত্তর শুন্‌তে রাজী নই।" সত্যি বল্‌তে হবে কারণ কি ছিল।"

কমলা বলিল—"সে যখন বর বেশে এল তখন আমি দেখে ছিলুম যে এক বুড়ো বর বেশে নায়ুল। আমি আগেও তাই শুনে ছিলুম, এখন তার প্রমাণ পেয়ে প্রাণটা কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল। তারপর মূর্চ্ছা হয়। তুমি যদি আমায় গ্রহণ না করতে তবে আমার যে কি দশা হত তা ভগবানই জানেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অভিন্ন।

(আখীর খম্বাজ।)

তুমি আমি একজন,
দুজনার সুখের মিলন।
আত্মা তুমি, দেহ আমি,
আমি দাসী, তুমি স্বামী।
বল কে বলিতে পারে—
ভিন্ন মোরা ভূলোক মাঝারে?

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

প্রিয় প্রবাস মহাকাব্য।

প্রাচীন হিন্দী কবিদিগের মধ্যে কেহই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনা করিতে চেষ্টা করেন নাই, অথবা যদি কেহ চেষ্টাও করিয়া থাকেন তাহা হইতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তুলসীদাস, সুরদাস, কেশবদাস প্রভৃতি হিন্দী কবিগণ মিত্রাক্ষর ছন্দেই কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করা বোধ হয় তেমন ভাল বোধ করিতেন না। মিত্রাক্ষর অথবা অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত কবিতা কেবল যে হিন্দী ভাষায় আদৃত তাহা নহে, ইহা বাঙ্গালা, গুজরাটী ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষায় এবং উর্দ্দু, পারসী ইত্যাদি ভাষায়ও অত্যন্ত আদৃত। আরবী ভাষার পদ্য ভাগের কথা কে বলিবে, গদ্যভাগেরও অন্ত্যানুপ্রাসের বিস্তর প্রয়োগ দেখা যায়। সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা অশিক্ষিত কৃষকদিগের কথোপকথনে এবং বালকদিগের কথাবার্ত্তায়ও অত্যন্ত আদৃত।

যদ্যপি অন্ত্যানুপ্রাস সর্ব্বত্র আদৃত তথাপি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য সর্ব্বত্র যথেষ্ট আদরলাভ করিয়া আসিতেছে। সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইংরাজী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত অনেক উত্তমোত্তম কাব্যগ্রন্থ আছে।

বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দী কবিগণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে কোন কাব্য রচনা করেন নাই। অবশেষে একজন হিন্দী কবি (১) অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করিতে অগ্রসর হন এবং আশাতীত সফলতা লাভ করেন। তিনি হিন্দী সাহিত্যের একটী অপূর্ব অঙ্গ পূর্ণ করিতে সক্ষম হন, অতএব তিনি যে সাহিত্যিকগণের নিকট যথেষ্ট আদৃত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'প্রিয়প্রবাস' মহাকাব্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং সুললিত। 'প্রিয়প্রবাস' গ্রন্থখানি চারি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কবি প্রণয়ন করিয়াছেন। 'প্রিয়প্রবাসের' ভাষা সংস্কৃত বহুল বলিয়া বিদেশীয়দিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য, এইজন্য ইহার আদর মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশীয়

(১) শ্রীযুক্ত অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায়।

লোকেরাও করিয়া থাকে। 'প্রিয়প্রবাস' গ্রন্থ মন্দাক্রান্তা, বংশস্থ, দ্রুতবিলম্বিত ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষার ললিতবৃত্তে রচিত অতএব ইহা যে সাতিশয় শ্রুতিমধুর হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে ব্রজবাসিদিগের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহাই কবি নৈপুণ্য সহকারে 'প্রিয়প্রবাসে' বর্ণন করিয়াছেন। অধিকাংশ আধুনিক হিন্দী কাব্যের ন্যায় 'প্রিয়প্রবাস' ভাবের অভাবে শীর্ণ নহে এবং তদুপরি ইহাতে অলঙ্কারের ও প্রাচুর্য্য আছে। এক্ষণে কয়েকটী কবিতার নমুনা দেওয়া যাইতেছে, পাঠকগণ স্বয়ং নিরূপণ করুন যে কবির স্থান কত উচ্চে।

যে সময় শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরায় লইয়া গিয়া, উদ্ধব পুনরায় ব্রজে আগমন করিলেন, সেই সময় শোকবিহ্বলা যশোদা উদ্ধবকে বলিলেন,—

"মেরে প্যারে সকুশল সুখী অওর সানন্দ তো হায়?
কোই চিন্তা মলিন উনকো তো নহী হায় বনাতী?
উধো ছাড়ী বদনপর হয় ম্লানতা ভী নহী তো?
হো জাতী হায় হৃদয় তল মে তো নহী বেদনায়ে?"

"হে উদ্ধব আমার প্রিয়পুত্র সকুশল সুখী এবং সানন্দ আছে ত? সে কোন প্রকার চিন্তা দ্বারা অভিভূত হয় নাই ত (১)? তাহার (প্রফুল্ল) মুখ ম্লান হয় নাই ত? তাহার হৃদয় কোন প্রকার বেদনায় অভিভূত হয় নাই ত?

* * * * *

"মীঠে মেওয়ে মৃদুল নবনী অওর নক্রান্ন নানা।
ধীরে নগরে সহিত সুভকো কওন হোগী খিলাতী।
প্রাতঃ গীতা সুগয় কজরী-গায় কা চাও মেথা।
হায় নাগ ন অব উস্কো প্রাণনগরা হমারা"।

"আমি যেমন ধৈর্য্য এবং প্রেম সহকারে প্রিয়পুত্রকে সুমিষ্ট ফল, মৃদুল নবনী এবং নানা প্রকারের ব্যঞ্জন, মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইতাম, তেমন এখন কে খাওয়াইবে? (কেহ খাওয়াইবে না) সে প্রত্যহ প্রাতঃকালে কৃষ্ণা গাভীর স্বচ্ছ দুগ্ধ প্রেমপূর্ব্বক পান করিত, হায়! এখন সে তাহা বোধ হয় পায় না।"

পুত্র অত্যন্ত উপদ্রবী এবং উৎপাতী হইলেও মাতার চক্ষে সে যে পরম শিষ্ট এবং সচ্চরিত্র থাকে তাহাই কবি যশোদার মুখ হইতে বলাইতেছেন। যশোদা বলিতেছেন,—

(১) তাহার শরীর কোন প্রকার চিন্তায় মলিন হয় নাই ত?

"সজ্জোটী হয় পরম অতিহি ধীর হয়লাল মেরা।
লজ্জা হোতী অমিও উসকো মাঙনেমে সদাথী।
জয়মে লেকে সরুচি যুতকো অন্নমে ময় খিলাতী।
হা! ওরমেহী অব নিত খিলা কওন জসা সকেগী।"

"হে উদ্ধব! সে বড়ই লজ্জাশীল; কোন বস্তু কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে সে অত্যন্ত লজ্জিত হইত। যেমন আমি (না চাহিতেই) ক্রোড়ে বসাইয়া স্নেহের সহিত তাহাকে সুমিষ্ট ফল, মৃদুল নবনী আদি ভোজন করাইতাম, তেমন করিয়া কোনও স্ত্রী কি নিত্য তাহাকে ভোজন করাইতে পারিবে?"

এই বলিয়া যশোদা পুনর্ব্বার অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতেছেন,—

"খানে পীনে শয়ন করনে সাদিকী একবেলা।
জো জাতী থী কুছ টল কভী খেদ হোতা বড়াথা।
উধো! এয়সী দুঃখিত উসকে হেতু জে মন হোগী?
মাতা জৈসী অবনীতল মে হয় অমাতা ন হোতী।

"হে উদ্ধব! একদিনের জন্যও যদি তাহার শয়ন ভোজনাদির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইত তাহা হইলে আমার মনে অত্যন্ত খেদ হইত। হায়! অপর কেহ (তাহার পানভোজনের অনেক ব্যতিক্রম হইলেও) আমার ন্যায় দুঃখিত কেন হইবে? তাই বলিতেছি হে উদ্ধব! মাতার ন্যায় স্নেহশীলা অন্য কেহ হয় না।"

যশোদা পূর্ব্বেকার সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া এখনকার কথার সহিত তুলনা করিয়া উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন।

* * * * *

"হা জো বংশী সরস রব সে বিশ্বকো মোহতীথী।
সো সালে মে মলিন বন অও মূক হোকে পড়ী হয়।
জো ছিদ্রোসে অমিয় বরষা সুবিধি মুগ্ধতাকী।
সো উন্মত্তা মরম বিকলা উন্মনা হয় বলাতা।"

"হায়! যে বংশীর সরস রব শ্রবণ করিয়া বিশ্ববিমোহিত হইত এক্ষণে সেই বংশী শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন-জনিত বিরহে মুগ্ধ এবং ধূলিলিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। যে বংশীবরের ছিদ্রসমূহ হইতে অমৃত বর্ষণ হইত এবং যাহা মুগ্ধতার আকর স্বরূপ ছিল, এখন সেই বংশী দর্শনমাত্র আমার হৃদয় কৃষ্ণশোকে অভিভূত হয় এবং আমি অত্যন্ত বিহ্বল উন্মনা হইয়া পড়ি।"

পুত্রবতী নারীর পক্ষে পুত্র কি তাহাই কবি যশোদাকে দিয়া বলাইতেছেন,—

"উযো হোতা সমর নর যো চারু চিন্তামণি হয়।
যো দেতা হায় তিমির উরকা জো অকীয়ামে।
জো জীমে হর সুর-সরিওকী স্নিগ্ধ-ধারাবহতো।
বেটা হী হয় অবনী তলমে রত্ন এয়সা নিরালা।
এয়সা নগয়া-রতন জিসকা ছোগয়া হয় পরায়া।
মো হোয়েগী ব্যথিত কিতনা সোচ জীমে তুমীলো।"

"হে উদ্ধব! পুত্র এমন রত্ন যে তাহা চিন্তামণির ন্যায় (তাহা স্পর্শ করিলে সমস্ত ম্লানতা দূর হয় এবং শরীর প্রফুল্লিত হয়) সমস্ত হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে এবং হৃদয়ে মন্দাকিনীর ন্যায় স্নিগ্ধ-ধারা প্রবাহিত করে। হে উদ্ধব! তুমিই বলো যে, যাহার এমন অমূল্য রত্ন হৃত হইয়াছে সে কত দুঃখিত হইবে?"

কয়েকটী কবিতার নমুনা উপরে দেওয়া হইল, পাঠক স্বয়ং নিরূপণ করুন যে "অযোধ্যাসিংহ" মহাশয় প্রকৃত কবি কিনা এবং 'প্রিয়প্রবাস' যথার্থ মহাকাব্য কিনা। কবির পরিচয় কাব্যে এখন বুঝুন যে অযোধ্যাসিংহ মহাশয় যথার্থ কবি অথবা অন্য কিছু।

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত

আগামী কল্য।

(Shelly'র "To-morrow" অবলম্বনে)

কোন্‌খানে তুমি চিরবাঞ্ছিত আগামী কল্য হায়।
যুবক-বৃদ্ধ-দুর্ব্বল-বলী তোমারেই সদা চায়।
ধনী-দরিদ্র সুখ-দুঃখের অতল সাগরে ভাসি'—
খুঁজিছে নিত্য তব অধরের শুভ্র মধুর হাসি!
চিরদিন ধ'রে ঘৃণা করি যারে ভালবেসে যাহারে বাঁচি,
নিশা শেষে হেরি সেই আজিকেরই কোলেতে শুইয়া আছি।

মানসী।

নাট্যজগতের সহিত যাঁহার কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' এবং বিশেষ করিয়া তন্মধ্যস্থ 'মানসী' চরিত্রের বিষয় অবগত আছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মানসীকে মূর্ত্তিমতী বিশ্বপ্রেমরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং এই চরিত্রের মধ্য দিয়া একটী মহানীতি দর্শাইয়াছেন; তাহা তিনি নিজেই পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"এই নাটকে আমি একটী মহানীতি লইয়া বসিয়াছি। সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটী যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে"। এই চরিত্রের মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাইয়াছেন যে নারীর হৃদয়ের যে নিবিড় প্রেম ও বাৎসল্য, তাহা শুধু তাহার আত্মীয় স্বজন, স্বামী পুত্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না—তাহা এ সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে এবং শারদীয় পূর্ণিমার, স্নিগ্ধ নির্ম্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় ইহা সমগ্র বিশ্বকে একটী পবিত্র শান্তি ও তৃপ্তি প্রদান করে।

মাতৃত্বেই নারীত্বের চরম বিকাশ। এই মাতৃত্ব যতই সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমের দিকে ধাবিত হইবে ততই নারীর নারীত্ব অধিকতর ফুটিয়া উঠিবে। দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থ সব ভুলিয়া সমগ্র জাতিকে আপনার বুকের উপর টানিয়া লইতে পারি, তাহাদিগকে নিজের হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসায় স্নাত করিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ মানসী নিজেই এক স্থানে বলিয়াছেন "স্বার্থের চেয়ে জাতীয়ত্ব বড় এবং জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়।" এবং এই মনুষ্যত্বের বাড়া জগতে আর কিছুই নাই। অতএব যদি কেহ এই মনুষ্যত্বকে চিরদিন চিরজীবন একভাবে রক্ষা করিতে পারেন তবেই তাঁহার সমস্ত রক্ষা হইবে—জীবন সার্থক হইবে।

মানসী যে বিশ্বের সমস্ত প্রাণীকে তাঁহার জীবনের প্রারম্ভ হইতেই ভালবাসিয়া আসিয়াছেন, তাহার প্রথম পরিচয় পাই, যখন সেই দীনা ভিখারিণী, তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিল। ভিখারিণীর দুঃখ দৈন্য ও দুর্দ্দশা দেখিয়া

তাঁহার সেই কৈশোর জীবনের সুপ্ত মাতৃত্ব অর্দ্ধচেতনা লাভ করিয়া সাড়া দিয়া উঠিল, তাঁহার কোমল নারীহৃদয়ের প্রকৃতিগত স্নেহ ও করুণা অজস্রধারে ভিখারিণীর দুঃখ দৈন্য ক্লিষ্ট মস্তকের উপর ঝরিয়া পড়িল। জগতের সমস্ত প্রাণীকে তিনি যে সন্তানের ন্যায় দেখিতেন তাহা তাঁহার একটী কথাতেই বুঝিতে পারা যায় যখন তিনি ভিখারিণীর নিকট হইতে তাহার ছেলেটী পাইবার মানসে বলিলেন—"আহা আমায় ছেলেটী দেবে? আমি ওর মা হব!"

তারপর ভিখারিণী যখন ভিক্ষা পাইয়া মানসীকে "জয় হউক" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল তখন ভিখারিণীর ঐ একটী কথাতেই মানসীর সমস্ত অন্তর একটা অপরিমেয় সুখ, শান্তি ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তাই অজয় সিংহের আগমন মাত্রই তিনি তাঁহাকে ইহার বিষয় ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহার অতিরিক্ত সুখের কিয়দংশ তাঁহাকে দিতে চাহিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মানসী যে সেখানে একটা অতিথিশালা খুলিয়াছিলেন তাহাও তিনি অজয়ের কাছে ব্যক্ত করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে তিনি তথাকার অতিথিগণকে স্বহস্তে আহার দান করেন। এখানেও তাঁহার হৃদয়ের মহত্ব মাতৃত্ব ও পবিত্র করুণার পরিচয় পাওয়া যায় যখন আমরা তাঁহার নিজের কথাটিই পড়ি—"নিজের হাতে না দিলে যে দিয়ে তৃপ্তি হয় না।" মা যে, সন্তানকে স্বহস্তে আহার করাইয়া কত অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করেন, তাহা যিনি মা তিনিই জানেন। সন্তানকে স্নেহ করিবার ও ভালবাসিবার জন্যই ত' নারীর নারীত্বের ও মাতৃত্বের সৃষ্টি!

তাহার পরমুহূর্ত্তেই অজয় সিংহ আসিয়া বলিলেন যে তিনি যুদ্ধে যাইবেন এবং সেইজন্যই তিনি মানসীর নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়াছেন। মানসী যে অজয়কে বহু পূর্ব্ব হইতেই ভালবাসিতেন তাহা অজয় জানিতেন। কিন্তু প্রিয়তমের এ যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ পাইয়াও তিনি কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত হইলেন না—সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। অজয় সিংহ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি যুদ্ধে গেলে তাঁহার দুঃখ হইবে কিনা তখন মানসী নির্ব্বিকারভাবে পূর্ণ উদাসীনতার সহিত একটী ক্ষুদ্র "হবে" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু এই উদাসীনতায় অজয়ের অন্তরে একটা আঘাত লাগিল, কেন না তিনি ছিলেন সাধারণ যুবকেরই ন্যায় এবং সেই হেতু সাধারণ যুবকগণের ন্যায়ই তাঁহার হৃদয়ের ও মনের অবস্থা। মানুষ যাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসে, বিপদের সময় তাহার কাছেই সমস্ত দুঃখ ব্যক্ত করিতে চায় কিন্তু এ দুঃখের কথা

শুনিয়াও যদি তাহার প্রিয় ব্যক্তি এরূপ উদাসীন ও নির্ব্বিকার থাকে, তবে স্বভাবতঃই তাহার হৃদয়ে অভিমান ও দুঃখের আঘাত বাজে। তাই অজয় সিংহও অভিমান সহকারে মানসীকে বলিলেন যে মানসীর এরূপ উদাসীনতার কারণ হয় ত তিনি তাঁহাকে ভালবাসেন না এবং অন্য কাহাকেও ভালবাসেন। মানসী কিন্তু এরূপ কঠোর বাক্যে ও স্থির থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃতভাব ব্যক্ত করিলেন "মানুষ মাত্রকেই আমি ভালবাসি।" এবং অজয় যখন তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া তিরস্কার করিলেন তখন তিনি বলিলেন—"তোমাকে ভালবাসি বলে কি আর কাউকে ভালবাস্‌তে নেই? তুমি একা আমার সমস্ত হৃদয়কে গ্রাস ক'র্ত্তে চাও? কি স্বার্থপর!" এবং পরিশেষে বলিলেন যে বাস্তবিক যদি ইহাতে অপরাধ হয় তবে তিনি ইহার জন্য দণ্ড লইতেও প্রস্তুত আছেন, তথাপি তিনি জগৎকে ছাড়িতে পারিবেন না। তিনি অজয়কে বুঝাইলেন যে জগৎ তাঁহার সন্তান। মা কখনও সন্তানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? তাহার পর, অজয় মানসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অনেক পুস্তকে প'ড়েছি প্রিয়তমকে বিদায় দিবার সময় নায়ীর বক্ষ অজস্র অশ্রু ধারায় প্লাবিত হয়। কিন্তু অজয়কে বিদায়দানে মানসীর এক বিন্দুও অশ্রু ঝরে নাই! কারণ অজয় চলিয়া যাওয়ার পর তিনি ত' শুধু অজয়ের কথাই ভাবিতেছিলেন না—তিনি ভাবিতেছিলেন অন্যান্য সৈন্যদের কথা, তাঁহার দুঃখী অভাগা সন্তানদের কথা। তাই তিনি বলিলেন "আর যারা এ যুদ্ধে হত ও আহত হবে, তাদের কি হবে? * * * এর কি কোনও প্রতিবিধান নেই?" এবং পরমুহূর্ত্তেই তিনি প্রতিবিধান স্থির করিয়া ফেলিলেন। "বেশ আমার কাজ আমি ক'র্ব্বো; যারা যুদ্ধে ম'র্ব্বে তাদের আর কিছু ক'র্ত্তে পার্ব্বনা। কিন্তু যারা আহত হ'বে তাদের ত' শুশ্রূষা ক'র্ত্তে পারি।"

তাহার পর রাণী আসিয়া যখন মানসীর এই কঠোর দৃঢ় সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইলেন তখন তিনি নানা উপায়ে মানসীকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন কিন্তু মানসী—ধীর, স্থির, অটল। তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে তিনি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা হইতে স্বয়ং ভগবানও তাঁহাকে বিরত করিতে পারিবেন না; অর্থাৎ তিনি যুদ্ধে যাইবেনই। তিনি তাই রাণীকে বলিলেন—"আমায় জান ত,' কর্ত্তব্য যখন আমায় ডাকে, তখন আমি আর কারো কথা শুন্‌বার অবকাশ পাই না।" * * * মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার আমি যতদূর পারি নিবারণ ক'র্ব্বো।" মানব জাতির দুঃখে

তাঁর প্রাণ যে তখন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল; তাঁহার যে স্বার্থ চিন্তা লোপ পাইয়াছিল।

তাহার পর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সেই করুণারূপিণী জগজ্জননী পবিত্র প্রেমময়ী মূর্ত্তিখানি মাতৃত্বের অপূর্ব্ব উজ্জ্বল জ্যোতিতে বিমণ্ডিত হইয়া যখন আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষারত—যখন তিনি তাঁর স্নেহের অজস্র স্নিগ্ধ শীতল ধারায় স্পর্শে তাহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান ও উপশম করিতে ব্যস্ত, তখন তাঁহার নারীত্ব ও মাতৃত্ব পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মা যেমন তাঁর কোমল হস্তের স্নেহস্পর্শে সন্তানের সমস্ত জ্বালার অবসান করিয়া দেন তিনিও তেম্‌নি তাঁর বাৎসল্য প্রেম পূত কোমল হস্তের মধুরস্পর্শে, যেন কোন এক অজ্ঞাত মন্ত্র বলে, সেই আহত সৈনিকগণের অসহ্য যন্ত্রণার অবসান করিতেছিলেন।

তাহার পর অজয় সিংহ সেই মহাশ্মশানের ঘোরান্ধকারে আসিয়া মানসীর মুখের সেই অপূর্ব্ব দৈবজ্যোতিতেই চিনিতে পারিলেন—সে এ মেবারের রাজ-কন্যা মানসী। কেননা, তিনি যে অপূর্ব্বজ্যোতিঃ মানসীর বদনমণ্ডল হইতে স্ফুরিত হইতে দেখিলেন তাহা সাধারণ নারীর মুখে দেখা যায় না। তাহা মানসীর ন্যায় দেবী-স্বরূপিণী নারীর মুখেই দৃষ্ট হয়। বুঝি এ তাঁর মাতৃত্বের গৌরবের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি—তাঁর করুণা মাখান অন্তরে দীপ্তপ্রতিমূর্ত্তিখানি, তাঁহার নির্ম্মল মুখ দর্পনে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইতেছিল। তাই অজয়সিংহ বিস্ময়ে ও আনন্দে বলিলেন;—"কিজ্যোতিঃ মানসীঃ * * * তোমার মুখে। এই বিকট আর্ত্তনাদের জন্মভূমিতে; মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে, এই ভয়াবহ শ্মশানে, এই নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারে—একি জ্যোতিঃ!"

তারপর দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মানসীও অজয়ের কথোপকথনে উভয়েরই হৃদয়ের তৎকালীন ভাব স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। অজয়সিংহ অনেকদিন মানসীর নিকট আসেন নাই, সেজন্য মানসীর হৃদয় চিন্তায় বড়ই আকুল হইয়াছিল, কেননা প্রিয়তমের তিলেক অদর্শনেই, মানুষের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং নানারূপ দুশ্চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া ফেলে, এ মানবের প্রকৃতি-গত নিয়ম। মানসী প্রত্যহই রাণীকে অজয়সিংহের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাহাতেই কতকটা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। অজয়সিংহ যখন আসিলেন, তখন মানসী একাকিনী বসিয়া জগতের দুঃখ ও দুরাবস্থার কথা ভাবিতেছিলেন এবং আপন মনে গান গাহিতেছিলেন। গানটী অবশ্য অজয়সিংহকেই লক্ষ্য করিয়া

অজয়সিংহের দর্শনেই তাঁহার কাছে "নিখিল জগৎ সুন্দর সব"। তাহাদের অজয় তাঁহার ভাবনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যে তিনি এই জগতের দীন, হীন, দরিদ্র অসহায় মানবমণ্ডলীর কথাই ভাবিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "ভাবছিলাম মানুষ বড়ই দীন। * * * * এক তরবারীর আঘাতে সে ভূমিসাৎ হয়, এক জ্বরের বিকারে সে শিশুর মত অসহায় হয়ে শুয়ে পড়ে। * * * * * "এবং এই কথাগুলি বলিবার সময় আবার সেদিনের ন্যায় গৌরবের দীপ্তোজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাই লক্ষ্য করিয়াই অজয় বলিলেন—"তোমার মুখে আবার সেই স্নিগ্ধজ্যোতিঃ—সেদিন যা' দেখেছিলাম। * * * সেদিন সেইখানে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে তোমাকে মূর্ত্তিমতী করুণারূপে অবতীর্ণা দেখেছিলাম। * * * "এবং সেই মুহূর্ত্তে অজয় সিংহ বুঝিলেন যে মানসী বুঝি সাধারণ মানবী নন। বুঝি কোন্ স্বর্গীয়া দেববালা। তিনি বুঝি অজয়ের ন্যায় সাধারণ মানুষের জন্য সৃষ্ট হন নাই। তাই অজয়সিংহ বলিলেন,—"আজ হইতে আমি আর তোমায় ভালবাসা দিতে পারি না—ভক্তি দিতে পারি।"

মানসীর শৈশব হইতেই অজয় সিংহও মানসীকে সাধারণ বালিকা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তাই সেদিন যখন রাণীর তিরস্কারে মানসী কাঁদিতেছিলেন, তখন রাণা বলিলেন—"সাবধান রাণী! মানসীর সম্বন্ধে একটু সাবধান হয়ে কথা বলো! ওকে তা' জান? * * * ওযে কে আমিই জানি না। আমি ওকে এখনও চিন্তে পারিনি। ও কোথা থেকে এসেছে কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।" * * * তাহারপরই আবার বলিলেন—"স্বর্গের একটা রশ্মি দয়া করে নেমে এসেছে। অভিমান ক'রে চলে যাবে।" রাণার কাছে মানসী চিরদিনই নিগূঢ়, দুর্ব্বোধ (mysarious) বস্তু। তাই তিনি মানসীর বিষয় সহসা কিছু বলিতে বা কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না। তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে মানসী সাধারণ নারীগণের চেয়ে অনেক উচ্চে এবং সে কোনও পৃথক ধাতুর দ্বারা গঠিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে মানসী ও কল্যাণীর কথোপকথন শুনিয়া ও তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও প্রেমের সম্বন্ধে তাঁহার মত অবগত হওয়া যায়। প্রথমেই তিনি কল্যাণীকে বলিলেন যে তিনি একটা কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেছেন এবং তাতে এরই মধ্যে অনেক রোগী আশ্রয় নিয়েছে। তাহার প্রত্যেক কথাটীর মধ্যে তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কোনের সঞ্চিত আর্দ্রেরসস্থ দয়া ও

আর্ত্তের প্রতি, ব্যাধিগ্রস্ত, পীড়িত, ক্ষুধিত অসহায় প্রাণীগণের প্রতি গভীর অনুকম্পা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাই কুষ্ঠরোগীদের দুঃখ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তিনি কল্যাণীকে বলিলেন—"আহা বেচারীরা কি দুঃখী!" এবং তিনি কল্যাণীকে আরও বলিলেন যে পরের সুখে সুখী হওয়ার চেয়ে সুখ আর নেই। "০ ০ ০ পরকে সুখী করাই প্রকৃত সুখ। নিজেকে সুখী কর্ব্বার, চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়।" এ কথা কয়টী পূর্ণ স্বার্থ ত্যাগের স্পষ্ট পরিচায়ক।

তাহারপর কথায় কথায় অজয় সিংহের কথা উঠিতেই মানসী যেন অধিক উত্তেজিতভাবে অজয়ের সংবাদ লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অজয়ের প্রতি যে তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ পূর্ণ প্রেম ও ভালবাসা সঞ্চিত ছিল তাহা তাঁহার তখনকার একটা আন্তরিক বাক্যেই বুঝিতে পারা যায়;—"আমি তাঁকে—আমার তাঁকে বড়ই দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।" এই কথা কয়টির মধ্যে একটা গুপ্ত লজ্জা সঙ্কোচ যেন প্রতি বাক্যের প্রতি অক্ষরে বিজড়িত।

তাহারপর যখন ছবিওয়ালীর নিকট হইতে তিনি আকবরের, জাহাঙ্গীরের মানসিংহের ও মহাবৎখাঁর ছবি কয়খানি লইলেন—তখন ছবিওয়ালী তাঁহার একখানি ছবি লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সামান্য ছবিওয়ালী পর্য্যন্ত তাঁহার মুখের কমনীয় সৌন্দর্য্য ও দীপ্ত উজ্জ্বল প্রভায় এতই চমৎকৃত হইয়াছিল, যে সে তাঁহার ছবি না লইয়া যাইতে চাহিল না। ছবিওয়ালী তাহার সহজ সরল অন্তরের ভাবটী প্রকাশ করিয়া বলিল—"এমন করুণা মাখান মুখ আমি কখনও দেখি নাই।" ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে মানসীর হৃদয়ের করুণা অসাধারণ ও অপরিমেয় ছিল। তাই তাহা কাহারও চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু মানসী তাঁহার ছবি না দিয়াই ছবিওয়ালীকে বিদায় করিলেন।

ছবিওয়ালী চলিয়া গেলে মানসী দেখিলেন, কল্যাণী মহাবৎখাঁর ছবিখানি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন। (মহাবৎখাঁ কল্যাণীর স্বামী) তাহা দেখিয়া মানসী কল্যাণীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ছবিখানি কল্যাণীকে প্রদান করিলেন এবং মানসী যখন বলিলেন "এত লজ্জা সঙ্কোচ কিসের কল্যাণী—তিনি ত' তোমার স্বামী।" তখন কল্যাণী বলিলেন যে তিনি বিধর্ম্মী। তাহাতে মানসী বলিলেন, "প্রকৃত প্রেম ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না, জাতি বিচার করে না। প্রেম ত' ধর্ম্মে ধর্ম্মে নয়, হৃদয়ে-হৃদয়ে! ধর্ম্মভেদে'ত হৃদয়ের বিভিন্নতা নাই।" অর্থাৎ তিনি বলিতে চান যে, ধর্ম্মভেদ থাকিলেও

জগতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সেই সম্বন্ধ, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের যেমন নিবিড় সম্বন্ধ। কারণ, "সব মানুষই এক ঈশ্বরের সন্তান" এবং আরও বলিলেন যে ভালবাসিতে হইলে ঘৃণিত কুৎসিৎকেই ভালবাসা উচিত। কেননা সুন্দর—যাহারা সুপুরুষ যাহারা, তাহাদের ত' সকলেই ভালবাসে, কিন্তু কুৎসিত যাহারা তাহাদের ভালবাসিতে পারাই ত' হৃদয়ের শক্তির, গৌরবের ও মহত্বের পরিচয়। "যে যত কুৎসিত, তাকে ভালবাসা তত পুণ্য। যে যত ঘৃণিত, সে তত অনুকম্পার পাত্র।" এবং তিনি আরও বলিতে চান যে অর্থাৎ তিনি বলিতে চান যে এক ধর্ম্মের লোক আর এক ধর্ম্মের লোককে অনায়াসে ভালবাসিতে পারে। তাহাতে কোনও অপরাধ বা পাপ নাই। ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা। শরৎবাবু তাঁহার "দত্তায়" নরেন্দ্র ও বিজয়ার ভালবাসা ও প্রেমের মধ্যেও ঠিক এই কথাটিই প্রমাণ করিয়াছেন।

তৎপরে কল্যাণী চলিয়া যাইলে মানসী গান গাহিলেন—

"প্রেমে নর আপনি হারায়, প্রেমে পর আপন হয়:
আঁধারে প্রেম হয়নাক' হীন, দানে প্রেমের হয়নাক' ক্ষয়"।

এই সঙ্গীতটীর মধ্যে তাঁহার বিশ্ব প্রেম বন্যার বারিধারার ন্যায় শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। তিনি গানের শেষে আবার গাহিয়াছেন—

"স্বর্গ মর্ত্তে আসে নেমে, মর্ত্ত স্বর্গে ওঠে প্রেমে,
প্রেমের গান গগন ভরা, প্রেমের কিরণ ভুবনময়।"

বিশ্ব প্রেমের যে কি মহান্ শক্তি, কি পরম মাধুর্য্য তাহা এই গানটীর কয় ছত্রে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

অতঃপর রাণী আসিয়া যখন বলিলেন যে মানসীর বিবাহ স্থির করিবার জন্য রাণা মানসীকে ডাকিতেছেন, তখন মানসী বলিলেন যে তিনি বিবাহ করিবেন না। তিনি বলিলেন—"পরিণয়ের গণ্ডীর মধ্যে আমার জীবনকে আবদ্ধ রাখবোনা। আমার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়।" অর্থাৎ তাঁহার প্রেমকে তিনি একটী পুরুষের মধ্যে বা কয়েকটী প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চান না, তিনি চান তাঁহার প্রেমকে সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া জীবনকে ধন্য করিতে, জগতের প্রাণীগণকে সুখী ও শান্ত করিতে। রাণা মানসীকে কিছু কিছু বুঝিতেন, তাই তিনি একথা শুনিয়া মানসীকে কিছুই বলিলেন না বরং তিনি রাণীকেই বলিলেন—"কোন কথা ক'য়োনা। দেখে যাও, শুদ্ধ দেখে যাও। * * এটা একটা স্বর্গীয় কিছু।"

সেদিন হোলির সময় রাণা যখন উদয়সাগরের তীরে বসিয়া হোলি খেলায় মত্ত, রমণীগণের উৎসব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এবং সঙ্গীত শ্রবণে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন; তখন মানসী তাঁহাকে গৃহে যাইবার জন্য ডাকিতে আসিলেন। রাণা সহসা ভাবিতে ভাবিতে মানসীকে বলিলেন যে,সংসার ছলনা,—সংসার মায়া; কিন্তু মানসী তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন—"আমি সংসারকে অত খারাপ ভাবতে পারিনা, বাবা।" মানসী আরও বলিলেন যে, বাস্তবিক যদি সংসার একটা মায়া হয় ত;—সে বড় মনোহর মায়া। * * * কিন্তু এইখানেই তার শেষ নয়।" ইহাতে রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "সংসারের শেষ কোথায়"—তখন মানসী বলিলেন—যে, সংসারের শেষ—"মানুষের চিন্তাজগতে।" কেন না, এই পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু সৌন্দর্য্য, রূপ, সবই মানুষ তাহাদের চিন্তার মধ্য দিয়াই প্রত্যক্ষ করে। অতএব যেদিন মানুষের চিন্তা-শক্তি লুপ্ত হইবে—সেই দিনই এই সংসারও লোপ পাইবে। এটি একটী পূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব। মানুষের সুন্দর জিনিষ কিছুই নাই, তার সবই কুৎসিত—সে ক্রুর, ঈর্ষাপরায়ণ স্বার্থলোভী! কিন্তু মানসী তাহার উত্তরে বলিলেন "সে তার মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধি না থাকলে মানুষের অনুকম্পার স্থান রহিত কোথায়? কার দুঃখ দূর করে, কাকে টেনে তুলে মানুষ সুখী হ'ত? * * * * সংসার বড় দীন, তা'কে টেনে তুল্‌তে হবে।" অর্থাৎ সকল মানুষ যদি সমান সৎ, সচ্চরিত্র, দেবতুল্য হইত, তবে তাহার কাহারও নিকট হইতে সাহায্য বা অনুকম্পা লাভের আবশ্যক হইত না। এবং তাহাকে উদ্ধার করিবার প্রয়োজন হইত না। এই দুঃখ, দৈন্য দারিদ্র আছে বলিয়াই ত' দয়া, প্রেম, অনুকম্পার সৃষ্টি! এইখানেও তাঁহার বিশ্বপ্রেমের একটী পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর রাণীর আহ্বানে মানসী চলিয়া গেলেন।

অবশেষে সেদিনও রাণী আসিয়া যখন রাণাকে মানসীর বিবাহের কথা বলিলেন তখনও রাণা তাহাতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"* * * মানসীর বিবাহ হবে না। আমার বোধ হয় মানসী বিবাহের জন্য তৈরী হয়নি।" এই কথাটী তিনি রাণীকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

তাহার পর পুনরায় মানসী সেই নির্জ্জন উদয়সাগর তীরে আসিয়া মনে মনে অজয়ের দেশান্তর গমনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। নারী যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে সে ব্যক্তি যদি তাহাকে না জানাইয়া তাচ্ছিল্যভরে তাহাকে অবহেলা করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তবে তাহার হৃদয়ে যে আঘাত

পাপে সেটা স্বাভাবিক। অজয়কে মানসী প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন তাই অজয় তাঁহার অজ্ঞাতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত, ব্যথিত ও অভিমানক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাই তিনি সেই রাত্রিতে নিজের মনে বলিলেন—* * * জন্মের মত বিদায়টী একবার এসেও নিয়ে যেতে পারতে!" তাঁহার মনে হইল অজয়ের বিরহে তাহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেন নিভিয়া গিয়াছে। তাই তিনি খেদ করিয়া বলিলেন—"চন্দ্রের জ্যোতিঃ এত ক্ষীণ কেন? উদয় সাগরের বারিরাশি হঠাৎ এত ম্লান যে? প্রকৃতির মুখের সেই হাসিটী কোথায় গেল?" মাত্র একটী প্রাণের অভাবে যেন তাঁহার জীবন আজ হইতে একটী ঘোর বর্ষার নৈশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি গাহিয়াছেন—

"যবে সেই রহে পাশে, ধরণী মধুর হাসে;
চলে যায় অমনি সে হয়ে আসে অন্ধকার।"

* * * * *

বিহনে তাহার সব থেমে যায় গীতরব;
শুকায় সৌরভ; যায় সব সুধা বসুধার।"

গানটীতে তাঁহার বিরহ কাতর হৃদয়ের নিবিড় অশ্রুসিক্ত বেদনা নিরন্তর ঝরিয়া পড়িতেছে।

মানসী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে অন্তর্বিপ্লবই জাতীয় পতনের শ্রেষ্ঠ মূল। একটা সংসারের মধ্যে যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাধে, তখনই সে সংসারে ভাঙ্গন ধরে। জাতির মধ্যেও সেই অবস্থা। তাই তিনি বলিয়াছেন—"হা রে অধম জাত। তোমার পতন হবে না ত' ক'ার হ'বে? যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ,—আর কে রক্ষা করে?" তিনি যেন পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে এ জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। তিনি বুঝিতেন, যে জাতির পতন অন্যজাতির জন্য সংঘটিত হয় না;—জাতির পতন ঘটে, জাতির নিজের দোষেই। তাই তিনি হিন্দুদেরই দোষ দিতেন। মুসলমানদের কখনও কিছুই বলেন নাই, তাহাদের তিনি চিরদিন সন্তানের মতই দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

তার পর অজয় সিংহের মৃত্যুতে মানসী বড়ই অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি যে অজয় সিংহকে কিরূপ ভালবাসিতেন, অজয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। এবং এতদিন তিনি অজয় সিংহের নিকট তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই, বলিয়া অভিমানভরে ও লজ্জার বন্ধনে হৃদয়ের পূর্ণ

প্রেম অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ ও আপ্‌শোষ করিতে লাগিলেন।

মানসী জানিতেন অজয় সিংহই তাঁহার স্বামী পতি-দেবতা। তিনি জানিতেন বিবাহ ত' মন্ত্রোচ্চারণের বা কয়েকটী লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নহে, প্রকৃত বিবাহের অর্থ, হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের পবিত্র প্রেমের বন্ধন। তাই যদিও অজয়ের সহিত তাঁহার বাহ্যিক বিবাহ এবং মন্ত্রোচ্চারণ ও আচার পালন কয়েকটী সম্পন্ন হয় নাই, তথাপি তিনি স্থির ধ্রুব জানিতেন—অজয়সিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এবং অজয় সিংহই তাঁহার স্বামী। তাই তিনি গোবিন্দ সিংহের প্রাঙ্গণে অজয়ের মৃতদেহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিঃসঙ্কোচে সকলের নিকট অশ্রুসিক্ত লোচনে কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—"এই অজয় সিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হ'য়েছিল, কেহ জান্তে পারেনি—আমি নিজেও জান্তে পারিনি। নীরবে নিভৃতে আত্মায় আত্মায় সে বিবাহ সম্পাদিত হ'য়েছিল। * * অর্থাৎ তিনি বলিতে চান আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনই প্রকৃত মিলন, প্রকৃত বিবাহ।

কিন্তু পরক্ষণেই সত্যবতীর সান্ত্বনা বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন, এবং বলিলেন যে অজয় যেরূপ আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন তেম্‌নি করিয়াই সকলের প্রাণ বিসর্জ্জন করা উচিত ও তদ্বারা জীবন ধন্য করা উচিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার প্রিয়তম অজয় তাঁহারই স্নেহের সন্তান দেশবাসীগণের প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণ দিয়াছে তাই তিনি অজয়ের মৃত্যুতে একটা অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন এবং গোবিন্দ সিংহকে বলিলেন "বৃদ্ধ গোবিন্দ! ধন্য তুমি যা'র এহেন পুত্র! ধন্য আমি, যা'র এই স্বামী! * * এ আমাদের গর্ব্ব ক'রবার সময়, শোক ক'র্ব্বার সময় নয়!" ইহাতে তাঁহার নিবিড় বিশ্ব প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববাসীর জন্য নিজের প্রিয়তমকে বিসর্জ্জন দিতেও তিনি ব্যথিত হন নাই, বরং গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন।

অজয়ের মৃত্যুর পর হইতে মানসীর বিশ্বপ্রেম পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত হইল। তখন হইতে যেন তিনি এক নূতন আলোকে তাঁহার জীবনের নূতন পথ উদ্ভাসিত দেখিতে পাইলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন,—"আমার কর্ত্তব্য পথ আজ জীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে প্রসারিত দেখ্‌ছি।" অর্থাৎ এখন হইতেই তাঁহার হৃদয় সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার অন্তরের প্রেম সমস্ত পৃথিবীর বক্ষে ক্ষরিত হইতেছে।

এত দুঃখ কষ্টেও মানসী ধীর, স্থির প্রশান্ত। তাই তিনি কল্যাণীর দুঃখ ভার স্বেচ্ছায় নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, এবং বলিলেন "দুঃখ আমাকে পিষে ফেল্‌বে ঠিক করে এসেছিল তা সে পারে নাই—পার্ব্বেও না। * * ও দুঃখ আমার বড় উপকার ক'রেছে। এতদিন জীবন অপূর্ণ ছিল, আজ পূর্ণ হয়েছে।"

অর্থাৎ মানুষ যতদিন সুখের রাজ্যে বাস করে ততদিন পরের দুঃখ কষ্ট কিছু বুঝিতে পারে না, কিন্তু যখন সে নিজে সেই দুঃখের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই সে পরের দুঃখ পূর্ণমাত্রায় বুঝিতে পারে।

মানসীও তাই পরের অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশ্য পূর্ব্বেও যে তিনি বুঝিতেন না তাহা নহে, কিন্তু এতদিন যেটুকু অসম্পূর্ণ ছিল—আজ তাহাই পূর্ণ মাত্রা ধারণ করিল। এতদিন তাঁহার প্রেমের কিয়দংশ অজয়কে দিতে হইত কিন্তু আজ হইতে সবটুকুই বিশ্বের বুকে ঢালিয়া দিতে পারিবেন, এবং আরও বুঝিয়াছিলেন যে, এতদিন তিনি তাঁহার জীবনকে প্রকৃত পক্ষে কোনও কাজেই লাগাইতে পারেন নাই, আজ তাই তাহাকে কার্য্যে লাগাইতে ও তাঁহার মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতে চাহিলেন। তিনি কল্যাণীকে তাঁহার কার্য্যে সহায় হইতে অনুরোধ করিলেন "এ কার্য্যে আমার সহায় হও" তুমি তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর! সান্ত্বনা পাবে, বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না; যোগ্যাযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা করেই সুখী।"

অর্থাৎ কল্যাণীর প্রেমকে, তিনি বিশ্বপ্রেমে পরিণত করিতে উপদেশ দিলেন।

তাহারপর সত্যবতী আসিলেন এবং যখন তিনি (মানসী) শুনিলেন যে মোগলের সহিত রাণার সন্ধি হয় নাই এবং সত্যবতী তাঁহাকে দুঃখের সহিত জানাইলেন, যে "মেবারের আজ পতন হইল"। তখন মানসী বলিলেন যে মেবারের পতন বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয়েছে। মেবারের পতন আরম্ভ হয়েছে, সেই দিন থেকে,—"যেদিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চ'লেছে। যেদিন থেকে সে ভারত ভুলে গিয়েছে। * * *" তিনি বলিয়াছেন, যে যখন কোনও ধর্ম্ম শুদ্ধ শুষ্ক আচার অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায়, তা'র আর সমস্ত অর্থকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ কেবল অন্ধভাবে কতক-গুলি মিথ্যা লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হয়, তখনই তাহাদের পতন

আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেরও আজ এই অবস্থা। তাই আজ বাঙ্গালী ও দুর্দ্দশা এবং অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমাদের এই পতিতজাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম এবং সমাজকে উন্নীত করিতে হইবে। তাহার সঙ্কীর্ণতা, মলিনতা, ও সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিতে হইবে।

মানসী বলিলেন যে যদি আবার এই ধর্ম্মকে উদ্ধার করিতে হয়, তবে স্বার্থ, কুটিলতা প্রভৃতি সমস্ত বর্জ্জন করিয়া প্রাণপনে আবার আমাদের জাতিকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। আবার মানুষ হইতে হইবে। এ পতনে হতাশ হইয়া নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তিনি বলিলেন, আগে চাই আমাদের মনুষ্যত্ব পরে জাতীয়ত্ব। "যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়তা বড়, তেম্‌নি জাতীয়তার চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, ত' মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক্। দেশ স্বাধীনতা ডুবে যাক্—এ জাতি আবার মানুষ হক।" এবং এই মানুষ হইতে হইলে তাহাদের এক নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে এবং সে ধর্ম্ম বিশ্বপ্রেম। "আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌তে হবে। জাতীয় উন্নতিরপথ শোনিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয়, জাতীয় উন্নতিরপথ, আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে।" এই নীতি অবলম্বন করিয়া আবার হিন্দু তাহাদের জাতীয় জীবনের পথে অগ্রসর হয়, তাই তাহারা আবার মানুষ হইবে। বর্ত্তমানে মহাত্মাজীও আমাদিগকে এই মহামূল্য পথ অবলম্বন করিতেই উপদেশ দিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে যখন রাণা ও মহাবৎখাঁ উভয়ে পরস্পরের বিনাশ সাধনে উদ্যত, তখনও মানসী তাঁহাদিগকে এই উপদেশ প্রদানে—ভ্রাতৃহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, মেবারের পতন হইয়াছে বটে, কিন্তু সে পতন হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার উপায় ভ্রাতৃহত্যা নয়—তাহার উদ্ধারের উপায় আবার মানুষ হওয়া—এবং এই মানুষ হইতে হইলে বিশ্বপ্রেমকেই প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হইবে। এই মানবীর চরিত্র পাঠ করিয়া আমরাও যদি আজ তাঁহারই নীতি অবলম্বন করিয়া জাতীয় জীবনের পথে অগ্রসর হই, তবেই আমরা স্বরাজ পাইব, স্বাধীনতা পাইব। আজ আমাদেরও সেই মেবার রাজকন্যা মানসীর করুণ সুরে সুর মিলাইয়া একসঙ্গে গাহিতে হইবে—

"কিসের শোক [illegible] আবার তোরা মানুষ হ'
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ"

০ ০ ০ ০ ০

জগৎ জুড়ে উঠুক সেনা, সমস্বরে বাজায় চোক—
সত্য সেনা তোদের সঙ্গ, মিথ্যা সেনা পক্ষ হোক—

০ ০ ০ ০ ০

যশ ও দেশ ডুবিয়া যাক্, আবার তোরা মানুষ হ।

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

আশার বাণী।

কেঁদনা কেঁদনা আরগো জননী, দুঃখের রজনী হয়েছে ক্ষয়।
ঘুচাতে তোমার দারুণ বেদনা, জেগেছে সন্তান ভারতময়।
হিন্দু মুসলমান হয়ে এক প্রাণ, মাতৃ ভক্তি হৃদে জাগায়ে দেছে
কাতর বদন দেখিয়া তোমার, মান অভিমান ভুলিয়া গেছে।
আজি গগন ভেদিয়া, ভারত ভরিয়া, গাহিছে সকলে গান,
জননী তোমার মুক্তির তরে, মানব হৃদয়ে উঠেছে বান।
মুছাতে তোমার দুঃখের কালিমা, দৃঢ় করি হৃদে বেঁধেছে বল।
সুখের করিয়া নিয়েছে মাথায়, কারাবাস সম দুঃখের স্থল।
বিলাস বাসনা ত্যজিয়াছে সবে, তোমারি দেওয়া বসন খানি।
লইয়াছে আজ মাথায় করি, ভাই বোনে মিলি একতা আনি।
রত্নখনী তুমি চিরদিন মাগো, যে রত্ন এবে প্রসবিলে ভবে।
ধন্য আজি সবে এ ভারত তলে, উজ্জ্বল ভারত তাঁহারি প্রভাবে।
কর আশীর্ব্বাদ মোদের জননী, চিরদিন যেন এই ভাবে থাকি।
হাস্য বদন দেখিয়া তোমার, ভাই বোনে সবে হইব সুখী।

শ্রীমতী অনুশীলা ঘোষ।

পদ্মিনীসমস্যা।

পাঠান ও মোগলসম্রাট্‌গণের রাজ্য-লালসা, ধনলালসা ও রূপলালসা যে, কতবার বীরপ্রসবিনী রাজপুতনাকে শ্মশানে ও অরণ্যে পরিণত করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আলাউদ্দীন খিলিজী রাজ্যলোভে লুব্ধ ও রূপ-মোহে মুগ্ধ হইয়া যে চিতোরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল, তাহা অবশ্যই ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। যাঁহার জন্য চিতোরের বীরগণ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, নারীগণ জ্বলন্ত চিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং অবশেষে পাঠানগণ চিতোরকে ভগ্নস্তূপে পরিণত করিয়াছিল, সেই পুণ্যশ্লোকার নাম যে ভারতের নরনারীর নিকট প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, সে কথাও বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার কথা শৈশবে পড়িয়াছিলাম,—

"তেরশত একত্রিংশ সংবৎ বৎসরে।
বসিত লক্ষ্মণসিংহ সিংহাসনোপরে॥
কুমার লক্ষ্মণ নহে প্রাপ্ত-ব্যবহার।
রাজ্যকরে ভীমসিংহ পিতৃব্য তাঁহার॥
যাঁর প্রিয়তমা সে পদ্মিনী মনোরমা।
রূপে, গুণে, জ্ঞানে, অবনীতে অনুপমা॥
যাহার রূপের কথা শুনি দিল্লীপতি।
চিতোর ঘেরিল আসি হয়ে ক্ষিপ্তমতি॥
রাজ্যলোপ, বংশলোপ প্রাপ্ত হয় তায়।
ধ্যানমাত্র যবনীর ক্ষুধার জ্বালায়॥
তথাপি পদ্মিনী সতী, সতীত্ব রতন।
না দিলেন যবনেরে করি প্রাণপন॥
অতুলিত রূপ, গুণ, সতীত্ব সহিত।
অর্পিলেন অগ্নিশ্বাসে রাখিতে স্বহিত॥" *

* পদ্মিনী উপাখ্যান।

কৈশোরে লিখিয়াছিলাম,—

"আজি—

চিতোর দুর্গের সম্মুখে দাঁড়ায়ে,
বিষাদিত চিত বীরেন্দ্র সব ;—
চিন্তার তরঙ্গে ভাসি'ছে হৃদয়,
কার (ও) মুখে নাহি একটী রব।

পদ্মিনী রতনে লভিবার তরে,
পাপ আলাদীন যবন-রাজ,—
অগনন সেনা করিয়া সহায়,
চিতোর পুরীতে আগত আজ—

যে উজ্জ্বল রত্ন—ভারত ভুবনে,—
বিকাশিছে নিজ বিমল কর ;—
সে রত্ন না পরি' স্বীয় কণ্ঠ দেশে,
পারে কি থাকিতে যবন বর ?

বন্দী ভীমসিংহ যবন শিবিরে,
তাই আজি তাঁর উদ্ধার তরে,—
রাজরাণী বীরা পদ্মিনী সুন্দরী
গিয়াছেন তথা ছলনা ক'রে।

চিন্তার তরঙ্গে হ'য়ে বিচলিত,
কহে মনে মনে ক্ষত্রিয়চয় ;—
'জয় মা মঙ্গল—শিবানি, শঙ্করি,
যেন আশা আজি সফল হয়।'

এমন সময় দেখিতে দেখিতে,
দ্রুতগামী দুই তুরগ' পরে,
একটী পুরুষ,—একটী রমণী,—
আসিল উলঙ্গ কৃপাণ করে।

অমনি পুলকে মাতিয়া তখন,
করিল নিনাদ ক্ষত্রিয় চয় ;—
আকাশ ভেদিয়া উঠিল সেরব—
জয় মহারাণী—রাণার জয়'।

মুক্ত ভীমসিংহ—রাণীর কৌশলে ;
আনন্দের মদে সকলে ভোর ;—
সহসা কিন্তু সেভাব দূরে গেল,
উদিত হইল বিষাদ ঘোর। *

অবশ্য এ সমস্তই মহাত্মা টডের প্রতিধ্বনি, আমরা এক্ষণে টডের কথাই বলিব, এবং সংক্ষেপেই তাহা বলিবার চেষ্টা করিব। টড বলিতেছেন,—১৩৩১ সংবৎ বা ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে চিতোরের রাণা লক্ষ্মণসিংহ পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার রাজত্বকালে পাঠানগণ চিতোর আক্রমণ করে। লক্ষ্মণসিংহ অপ্রাপ্ত ব্যবহার হওয়ায়, তাঁহার পিতৃব্য ভীম সিংহ তাঁহার অভিভাবকস্বরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। ভীম সিংহ সিংহলের চৌহান বংশীয় হাম্মির সিংহের কন্যা পদ্মিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই পদ্মিনী রূপে গুণে অতুলনীয়া ছিলেন।† তাঁহার রূপের কথা শুনিয়া দিল্লীর পাঠান বাদসাহ আলাউদ্দীন খিলিজী পদ্মিনীকে পাইবার আশায় চিতোর আক্রমণ করিয়া বসে। অনেক দিন পর্য্যন্ত চিতোর অবরোধ করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায়, আলাউদ্দীন একবারমাত্র পদ্মিনীকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করে। দর্পণে প্রতিফলিত তাঁহার মূর্ত্তিদর্শনে সে পরিতৃপ্ত হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। আলাউদ্দীন সামান্য অল্পেকজনমাত্র শরীর রক্ষী লইয়া চিতোর দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দর্পণে প্রতিফলিত পদ্মিনীমূর্ত্তি দেখিয়া ফিরিয়া আসে। ভীমসিংহ তাঁহার

* রাজপুত কুসুম।

† পদ্মিনী সম্বন্ধে টড্ বলিতেছেন,—

"Her name was Pudmini, a little bestowed only on the superlatively fair, and transmitted with renown to posterity by tradition and the song of the bard. Her beauty, accomplishments, exaltation, and destruction, with other incidental circumstances, constitute the subject of one of the most popular traditions of Rajwarra."

(Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. I. Mewar.)

প্রত্যুদ্গমন করিয়া দুর্গবাহিরে গমন করিলে, দুর্গপাদদেশে লুক্কায়িত আলাউদ্দীনের সৈন্যগণ ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া যায়। পদ্মিনীকে পাইলে, আলাউদ্দীন তবে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে বলিয়া প্রকাশ করে। সে সংবাদে চিতোরবাসিগণ হতাশ হইয়া পড়েন, তাঁহারা ভীমসিংহের উদ্ধারের জন্য পদ্মিনীকে দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহারই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পদ্মিনীকে সে কথা জানাইলেন। পদ্মিনী যাইতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি নিজ সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহার আত্মীয় গোরা ও বাদলের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হন। যাহাতে পদ্মিনীর সম্মান রক্ষা এবং ভীমসিংহের উদ্ধারসাধন হয়। পরামর্শে সেইরূপই স্থির হইল। আলাউদ্দীনের নিকট সংবাদ গেল যে, পদ্মিনী তাহার নিকট যাইবেন, কিন্তু তাঁহার সহিত তাঁহার মর্য্যাদানুরূপ সহচরী, দাসী প্রভৃতি যাইবে, তাহাদের মধ্যে কতক দিল্লী পর্য্যন্ত গমন করিবে, কতক রাণীকে পঁহুছিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। তাহাদের প্রতি যাহাতে কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন না হয়, বাদশাহের সেইরূপ আদেশ প্রচার করিতে হইবে। সে দিবস বাদশাহ পরিখার নিকট হইতে সরিয়া আসিবেন। এইরূপ স্থির হইলে, সাতশত আচ্ছাদিত শিবিকা পাঠান শিবিরের দিকে যাইতে লাগিল। প্রত্যেক শিবিকায় এক একজন চিতোরের প্রসিদ্ধ বীর বসিয়া রহিলেন, ছয়জন সশস্ত্র সৈনিক বাহকের বেশে এক একখানি শিবিকা বহন করিয়া লইয়া চলিল। ক্রমে তাহারা পাঠান শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইল, বাদশাহের শিবির কানাত দ্বারা আবৃত হইয়া গেল। বাদশাহ ভীমসিংহের সহিত পদ্মিনীর সাক্ষাতের জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় দিয়াছিলেন। রাজপুতেরা ভীমসিংহকে একখানি শিবিকায় তুলিয়া লইয়া চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই পাঠান শিবিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল, অনেক সময় যাইতেছে দেখিয়া বাদশাহ অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিলেন যে, রাজপুতগণই ছদ্মবেশে আসিয়াছেন।

"কবি কহে এত নহে নারিকেলী কুল।
কুলের পাতায় ঢাকা কণ্টকের কুল॥
যেমন বদন খুলে শিবিকার দ্বার।
অমনি গরজি উঠে ক্ষত্রিয় হাজার॥" *

* শালুমা উপাখ্যান।

কিন্তু আলাউদ্দীন সুরক্ষিত অবস্থায়ই ছিল। ক্রমে পাঠান রাজপুতে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাজপুতেরা পিছু হটিয়া দুর্গের দিকে আসিতে লাগিল। তাহারা অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ধরণী বক্ষে আশ্রয় লইল। ভীমসিংহের জন্য একটী দ্রুতগামী অশ্বসজ্জিত ছিল, তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে প্রবেশ করিলেন। এই যুদ্ধে চিতোরের প্রসিদ্ধ বীরগণ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। গোরাও বাদল এই যুদ্ধের নেতা হইয়াছিলেন, গোরা পাঠান সৈন্য মথিত করিয়া শেষে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতপুত্র দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, বীর বাদল পাঠান ব্যূহভেদ করিয়া, ক্ষতবিক্ষত দেহে চলিয়া আসেন। গোরার পত্নী চিতাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিয়া স্বীয় প্রভুর অনুসরণ করেন। আলাউদ্দীন চিতোরাধিকারেও পদ্মিনীলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যায়।

কিন্তু সে চিতোর ও পদ্মিনী ভুলিতে পারে নাই। আলাউদ্দীন সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া আবার চিতোর আক্রমণ করিল। রাজপুতগণের বিবরণে তাহা ১৩৪৬ সংবৎ বা ১২৯০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু ফেরিস্তা ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে তাহার সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পাঠান সৈন্যগণ চিতোরদুর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতটি অধিকার করিয়া বসিল। রাজপুতগণ ক্রমে ক্রমে জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। রাণা লক্ষ্মণসিংহ একদিন রাত্রিতে কিরূপে অন্ততঃ তাঁহার একটি মাত্রও বংশধর রক্ষা পায়, ইহার চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় যেন চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইলেন, এবং শুনিলেন, তিনি যেন বলিতেছেন "মৈ ভুখা হুঁ"। কিসে তাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় জানিতে চাহিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে দ্বাদশ জন মুকুটধারী চিতোরের জন্য রক্ত দান না করিলে, রাজ্য পরহস্তে যাইবে। তাহার পর তিনি অন্তর্হিত হন। রাণা পর দিবস প্রাতঃকালে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়া গত রাত্রির ঘটনা বিবৃত করেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। সেদিন রাত্রিতে রাণা সকলকে লইয়া আবার সেইখানে যান, এবং সকলেই সেই মূর্ত্তি দেখিতে পান। মূর্ত্তি আবার প্রকাশ করেন যে, এক এক জনকে রাজ চিহ্নে ভূষিত করিয়া, তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, চতুর্থ দিনে যুদ্ধে তাহাকে জীবন দান করিতে হইবে। তাহার পর রাণার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে প্রথমে চিতোরের জন্য কে রক্ত দান করিবে, তাহা

লইয়া তর্ক উঠে। অরিসিংহ জ্যেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া, প্রথমেই চিতোরা ধিষ্ঠাত্রীর ক্ষুধা নিবারণ করেন। মধ্যম অজয় সিংহ তাহার পর যাইতে স্বীকৃত হইলে, তিনি পিতার প্রিয়পাত্র হওয়ায়, রাণা তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলেন। ক্রমে ক্রমে আর দশভ্রাতা জ্যেষ্ঠের পথ অনুসরণ করিলে, লক্ষ্মণসিংহ ও অজয় সিংহের মধ্যে কাহার যাওয়া হইবে, তাহা লইয়া ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। অবশেষে লক্ষ্মণ সিংহই জয়ী হন। অজয়সিংহ পাঠান ব্যূহ ভেদ করিয়া, কৈলওয়ারে চলিয়া যান। লক্ষ্মণসিংহের যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে নারীগণের জহরব্রত অনুষ্ঠিত হয়। মহিষী হইতে আরম্ভ করিয়া চিতোরের যত রমণী সেই ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অবশ্য পদ্মিনী সুন্দরীও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। এক প্রকাণ্ড গহ্বর মধ্যে চিতা রচনা করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। যেমন তাহা জ্বলিয়া উঠিল, অমনি চিতোরের নারীগণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তখন লক্ষ্মণসিংহ যুদ্ধযাত্রা করিয়া চিতোরাধিষ্ঠাত্রীর শেষ ক্ষুধা মিটাইলেন। পাঠানেরা দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া আলাউদ্দীন দেখিল যে, গহ্বর হইতে ক্রমাগত ধূম উদ্গীরিত হইতেছে, সেই গহ্বর আজিও চিতোরে বিদ্যমান আছে, কিন্তু কেহ তাহাতে প্রবেশ করিতে সাহস করে না। প্রবাদ, এক বিষধর ভুজঙ্গ তাহাকে আগুলিয়া রহিয়াছে। আলাউদ্দীন জনশূন্য চিতোর অধিকার করিল, এবং তাহার মন্দিরও সৌধাদি ভূমিসাৎ করিয়া তাহাকে অরণ্যে পরিণত করিয়াছিল। ভীমসিংহও পদ্মিনীর প্রাসাদটি তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল বলিয়া টড উল্লেখ করিয়াছেন। আলাউদ্দীন কিছুদিন চিতোরে থাকিয়া, মালদেব নামে তাহার সামন্ত রাজার প্রতি তাহার ভার অর্পণ করিয়া, দিল্লীযাত্রা করে।

টডের লিখিত বিবরণই প্রায় সর্ব্বত্রই আলোচিত হইয়া থাকে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এক ফেরিস্তা ভিন্ন আর কেহ পদ্মিনী প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ফেরিস্তার গ্রন্থেও পদ্মিনীর নাম দেখা যায় না। আমীর খসরুর "তারিখিআলাই" গ্রন্থে চিতোর আক্রমণের কথা দৃষ্ট হয়, গ্রন্থকার নিজেই সে আক্রমণে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, ৭০৩ হিজরীর ১১ই মহরম ১৩০৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সোমবার আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করে। রাজা প্রথমে পলাইয়া যান, অবশেষে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ত্রিশ হাজার হিন্দুর নিপাত সাধন করিয়া, আলাউদ্দীন নিজ পুত্র খিজির খাঁকে

চিতোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসে। চিতোর খিজিরখাঁর নামানুসারে খিজিয়াবাদ নাম ধারণ করে। *। জিয়াউদ্দিন বার্ণের "তারিখি ফিরোজশাহীতে" আলাউদ্দীন চিতোর অবরোধ করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। এই অবরোধ বর্ষাকালে সংঘটিত হওয়ায়, বাদশাহের সৈন্যগণকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।†

এক্ষণে ফেরিস্তার কথা উল্লিখিত হইতেছে। ফেরিস্তা বলিতেছেন যে, আলাউদ্দীন নিজে চিতোরাক্রমণে গমন করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কখনও মুসলমান সৈন্য চিতোরে উপস্থিত হয় নাই। ছয় মাস অবরোধের পর ৭০৩ হিজরী বা ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে চিতোর পাঠানদিগের অধিকারে আসে, এবং আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজিরখাঁ তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়। তাহার নামানুসারে চিতোর খিজিয়ানবাদ নাম ধারণ করে।‡

ইহার পর ফেরিস্তা আবার বলিতেছেন যে, হিজরী ৭০৪ বা ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে চিতোরের রাজা রতন সেন এক অদ্ভুত উপায়ে কারাগার হইতে পলায়ন করেন। চিতোর দুর্গ অধিকার করিয়া, আলাউদ্দীন তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনিয়াছিল। তাঁহার একটি কন্যার অসাধারণ রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া, আলাউদ্দীন তাঁহাকে পাইলে, রাজাকে মুক্তি দিবে বলিয়া প্রকাশ করে। রাজা কারাগারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হওয়ায়, তাহাতেই স্বীকৃত হন, এবং কন্যাকে আসিতে সংবাদ দেন। তাঁহার পরিবারবর্গ স্ববংশের সম্মান রক্ষার জন্য কন্যাটিকে বিষ প্রয়োগে হত্যাকরার অভিলাষ করেন। রাজকন্যা কিন্তু এক কৌশল করিয়া পিতার উদ্ধার ও নিজের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, এইরূপ প্রচার করিয়া দেওয়া হউক যে, তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার সহচরীবর্গ সহ দিল্লীতে উপস্থিত হইবেন। কিন্তু পিতাকে তাঁহার কৌশলের কথা জানাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি রাজ পরিবারের কতকগুলি অনুচরকে বর্ম্মাচ্ছাদিত ও অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত করিয়া, স্ত্রীলোকের ব্যবহারোপযোগী শিবিকা মধ্যে লইয়া,

* Tarikhi-i-Alay, Elliot's History of India, Vol. III. p. 77.
আমীর খসরুর 'আসিক' নামক কাব্যগ্রন্থেও চিতোর আক্রমণের উল্লেখ আছে।
† Tarikhi-i-Ferozshahi, Elliot's History of India Vol. III. p. 189.
‡ Brigge' Ferishta (Cambray) Vol I. pp. 353-4.

আপনাদের সম্মানানুরূপ অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যসহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। রাজকন্যা পিতার দ্বারা বাদশাহের নিকট হইতে আপনার ছাড়পত্র আনাইয়া লইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহারা নির্ব্বিবাদে দিল্লী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। রাত্রিকালে তাঁহারা নগরে গিয়া পঁহুছিলেন, বাদশাহের বিশেষ আদেশানুসারে শিবিকাগুলি কারাভবনে গিয়া উপস্থিত হয়। সশস্ত্র সৈন্যগণ বাহিরে অবস্থিতি করে। শিবিকাগুলি পঁহুছিবা মাত্র রাজপুতগণ তাহা হইতে বাহির হইয়া, কারারক্ষীদিগকে আক্রমণ করিয়া বসে, এবং রাজাকে লইয়া পলায়ন করে। রাজার পলায়নের জন্য অশ্ব সকল সজ্জিত ছিল, তিনি তাহাদের একটিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুচরগণের সহিত কোনরূপ বাধা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই বেগে নগরমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসেন, এবং তাঁহার রাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হন। তথায় তাঁহার পরিবারবর্গ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার পর রাজা পাঠানদিগের অধিকৃত স্থান সমূহে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলে, আলাউদ্দীন খিজিরখাঁকে চিতোর হইতে চলিয়া আসিতে বলে, এবং রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর চিতোরের ভার অর্পণ করে, তিনি বাদশাহের সামন্ত রাজা হইয়া উঠেন। ০

---

* "At this time, however, Ray Ruttun Sing, the Raja of Chittoor, who had been prisoner since the King had taken the fort, made his escape, his escape in an extraordinary manner. Alla-ood-Deen, having received an extravagant account of the beauty and accomplishments of one of the Raja's daughters, told him, that if he would deliver her over to him, he should be released. The Raja, who was very illtreated during his confinement, consented, and sent for his doughter, with a manifest design to prostitute her to the King. The Raja's family, however, hearing of this dishonourable proposal, concerted measures for poisoning the princess, to save the reputation of the house. But the Raja's daughter contrived a stratagem by which she proposed to procure her father's release, and preserve her own honour. She accordingly wrote to her father, to let it be known that she was coming with all her attendants and would be at Delhi on a certain day, acquainting him with the part she intended to act. Her contrivance was this. Having selected a number of the dependents of the family, who in complete armour, concealed themselves in litters (such as are used by women), she proceeded with such a retinue of horse and foot, as is cus to to guard ladies of rank. Through her father's means, she received the King's passport, and the cavalcade proceeding by slow marches to Delhi,

ফেরিস্তার লিখিত রতন সেনের কন্যাকর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার এবং পদ্মিনী কর্ত্তৃক ভীমসিংহের মুক্তি যে একই প্রকার ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ফেরিস্তা রতন সেনের কন্যার কোন নামোল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি রূপে গুণে ও উদ্ধার কৌশলে যে পদ্মিনীরই সমতুল্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারই যে পদ্মিনী হওয়া সম্ভব, আমরা পরে তাহা বলিতেছি।

মেবারে রাণা রাজ সিংহ" রাজ সমুদ্র * নামে একটী প্রকাণ্ড দীঘিকা বা খাল খনিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাঁধের উপরে পঁচিশ খানি প্রস্তরখণ্ডে 'রাজ প্রশস্তি' নামে এক মহাকাব্য খোদিত আছে, তাহাতে মেবারের রাজ-বংশের বিবরণ ও রাজসমুদ্র বা খালেরও বর্ণনা আছে। আজমীরের রাজ-পুতানা মিউজিয়মের ১৯১৮ সালের বার্ষিক বিবরণে উক্ত রাজ প্রশস্তির একটী অস্পষ্ট প্রতিলিপি (rough transcript) হইতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিব-রণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু মূল খোদিত লিপির সহিত এই অস্পষ্ট প্রতিলিপির

---

was admitted without interrupton It was night when the party arrived and by the King's especial permission, the litters were allowed to be carried into the prison, the attendants, having taken their stations without. No sooner were they within the walls, than the armed men leaping out of the litters, put the King's guards to swords, and carried off the Raja Horses being already prepared for his flight, he mounted one, and rushing with his attendants through the city, before opposition could be made, fled to his own country among the hills, where his family were concealed. Thus by the exertions of his ingenius daughter, the Raja effected his escapes and from that day continued to ravage the country then in possession of the Mahomedans. At length, finding it of no use to retain Chittor, the King ordered the prince Khizr Khan to evacuate it, and to made it over to the nephew of the Raja. This Hindoo prince, in a short time, restored the principality to its former condition, and retained the tract of chittoor as tributary to Alla-ood-Deen during the rest of this reign. He sent annually large sums of money, besides valuable presents, and always joined the imperial standard in the field with 5000 horse and 10,000 foot."

(Briggs' Ferishta, Cambrey, Vol I. pp 362 3)

* রাজসমুদ্রকে টড Rajsamuddra 'Royal sea' এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসমন্দর' লিখিয়াছেন।

মিল করা হয় নাই। উক্ত বার্ষিক বিবরণে লিখিত আছে যে, পদ্মিনীর স্বামী রাণা লক্ষ্মণ সিংহের রাজত্বকালে আলাউদ্দীন চিতোর লুণ্ঠন করিয়াছিল। * কিন্তু উক্ত মিউজিয়মে রাজপ্রশস্তির একটী নকল ও আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, পদ্মিনী লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মণসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নসীবা রত্নসিংহের পত্নী। এবং তাঁহার জন্য আলাউদ্দীন চিত্রকূট বা চিতোর অবরোধ করায়, লক্ষ্মণসিংহ আপনার দ্বাদশ ভ্রাতা ও সপ্ত পুত্রের সহিত শত্রুপুত হইয়া স্বর্গ গত হন। তাঁহার একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র অজয়সিংহ পরে রাজ্যলাভ করেন। †

আমাদের বিবেচনায় রাজপুতানার মিউজিয়মের বার্ষিক বিবরণের লেখা ঠিক নহে। সংক্ষেপে লিখিত হওয়ায় এবং মূলখোদিত লিপির সহিত অস্পষ্ট প্রতিলিপি মিল না করিয়া লওয়ায়, লেখক লক্ষ্মণসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নসীর কথাটা সম্ভবতঃ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। কারণ রাজপ্রশস্তির প্রতিলিপি ও তাহার নকলে এত দূর অনৈক্য হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। প্রশস্তির নকলে লিখিত রত্নসীর সহিত ফেরিস্তার কথিত রতন সেনের ও ঐক্য দেখা-যাইতেছে। ফেরিস্তা রতন সেনের কন্যার কথা উল্লেখ করিলেও প্রশস্তিতে তাঁহাকে রত্নসিংহের পত্নী পদ্মিনী বলিয়াই জানা যাইতেছে। টডের লিখিত পদ্মিনী কর্ত্তৃক ভীমসিংহের উদ্ধার ও রতন সেনের কন্যা কর্ত্তৃক তাঁহার মুক্তি একই প্রকার হওয়ায়, ফেরিস্তার লিখিত রতন সেনের কন্যাই যে পদ্মিনী, এবং

---

* "Alauddin sacked Chitoor in the reign of Lakshmana Singh, husband of Padmini"

(Annual Report on the Working of the Rajputana Museum, Ajmeer for the year ending 31st. March 1918. P. 3.)

† 'তস্যপুত্রো নরপতী বাণাস্ত জসকর্ণবঃ।
তৎসুতোনাগপালোঽস্ত শূভপালঃ সুতোঽস্ততু॥
পৃথ্বীমলঃ সুতস্তস্ত পুত্রো ভুবন সিংহকঃ।
তৎপুত্রো ভীমসিংহোজয়সিংহোঽস্ত তৎসুতঃ॥ ৩
লক্ষ্মণসিংহস্তস্যেয় গদ্রমণ্ডলীকাভিধোঽস্ততু।
কনিষ্ঠো রত্নসী ভ্রাতা পদ্মিনী তৎপ্রিয়াঽভবৎ॥ ৪
তৎকৃতেল্লাবদীনেন রুদ্ধেশ্রী চিত্রকূটকে।
লক্ষ্মণসিংহোদ্বাদশ স্বভ্রাতৃভিঃ সপ্তভিঃ সুতৈঃ। ৫
সহিতঃ শত্রুপুতোঽসৌ দিবং যাতোঽস্তচাম্বুজঃ।
একউদ্ধারিতোঽজৈষীৎ রাজ্যং চক্রে ত তোরসী"। ৬

রাজপ্রশস্তি, চতুর্থসর্গ।

তিনি তাঁহার কন্যা না হইয়া পত্নী হওয়াই যে সম্ভব, ইহাই আমরা মনে করি। প্রশস্তিতে ভীমসিংহকে লক্ষ্মণসিংহের পিতামহ বলিয়া দেখা যাইতেছে। টডের লিখিত লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্রস্থলে প্রশস্তিতে সপ্তপুত্র দেখা যায়। কিন্তু দ্বাদশ ভ্রাতার উল্লেখ আছে। যখন রাজপ্রশস্তি রাণা রাজসিংহের আদেশে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন তাহার প্রামাণ্য যে সর্ব্বাপেক্ষা গ্রাহ্য, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তদ্ভিন্ন উহা একখানি খোদিত লিপি। হস্ত লিখিত গ্রন্থ অপেক্ষা খোদিত লিপির প্রামাণ্যই বিশেষরূপে সগ্রাহ্য হইয়া থাকে। তাহা হইলে আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি যে, পদ্মিনী লক্ষ্মণসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নসিংহের পত্নী। ফেরিস্তার কথায় বিশ্বাস করিলে, তিনি রত্নসিংহকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আর প্রশস্তির রচনানুসারে তাঁহারই জন্য লক্ষ্মণসিংহ পুত্র ভ্রাতা সহস্বর্গগত হইয়াছিলেন। ফেরিস্তা রত্নসিংহকে দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, টড যেমন ভীমসিংহকে পাঠান শিবিরে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছেন, রত্ন সিংহ সম্ভবতঃ সেইরূপভাবে পাঠান শিবিরেই বন্দী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পত্নী পদ্মিনী পাঠান শিবির হইতেই তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার পরেই আলাউদ্দীন চিতোরের সর্ব্বনাশ সাধন করে। কারণ, মুসল-মান ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক কেবল একবার মাত্রই চিতোরাক্রমনের কথা লিখিয়াছেন। আমরা এইরূপভাবেই পদ্মিনী সমস্যার সমাধান করিতেছি। চিরদিন জানি, "ধর্ম্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্," এখন দেখিতেছি, ঐতিহাসিক-তত্ত্বও তাহাই।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

বনের মায়া।

সবুজবনের উপর দিয়ে সোণালি আলোর রেখা নদীর জলে এসে ফুটে উঠেছে; উষা যেন তার আলতা মাখা চরণ নদীর জলে ধুয়ে নিল; বীণায় তারে সোণার ছড় ছুইয়ে দিতেই বনে বনে পাখীর সুরে একটা সাড়া পড়ে গেল। নদীর কিনারে উৎসুক হরিণের দল; কান উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সোয়ারের জন্য বনের তলে কি এক নূতন কাকলী ভরে এনেছে। বনের রূপ আর নদীর জল যেন পরস্পর গলাগলি হয়ে মিশে রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন বন নদীর কূলে কূলে জীবন বীণার কি সুর যেন ছড়িয়ে রেখেছে! সৌন্দর্য্য দেবতার প্রথম অঞ্জলি দিয়ে ধরণীর অনিন্দ্য আঁখির এই ভরা আবেশটী নিত্য বিচিত্ররূপে তরুণ জীবনের চির সরসতা যেন এখানে ঢেলে দিয়েছে। কচি পাতায় পাতায় জীবনের রূপ প্রাণের সতেজ ছবি। গাছের পাতায় পাতায় জড়িয়ে সবুজের রাজত্ব নিবিড় হয়ে উঠেছে। বনের সেই ঘনছায়ায় হরিণ শিশু খেলা করে, পাখীরা নীড় নির্ম্মাণ করে! বনের পাতায় কীট পতঙ্গ বিচরণ করে। বনের পঙ্কলে বাঘ ও হরিণ শিশু জলপান করে, আবার বনের নিদ্রিত আঁধারে বাঘ শিকারের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। বনের উপর প্রজাপতি বিচরণ করে, আম গাছের ডালে সর্পের রক্ত আঁখি জ্বল জ্বল করে। এখানে যেন ক্রূর ও সরল, করুণ ও হিংস্র পাশাপাশি বিরাজিত। কি এক বনের মায়া সবাইকে এক সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে!

বন থেকে পাখী ধরে আনলে পাখী বনের মায়ায় কাতর হয়। হরিণ শিশু লোকালয়ে এলে বনে ছুটে পালাতে চায়; কখনো বনের দিকে চেয়ে তার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ে। পাখী লোকালয়ে এনে আবার সে বনেই ফিরে যায়। বনের কি মোহিনী মায়া! বনের সৌন্দর্য্যের পরিচয় বোধ হয় এক মাত্র তারাই জানে। মানুষ বনে যায় কুঠার হাতে নিয়ে। বন কেটে নৌকা বোঝাই করে তারা লোকালয়ে ফিরে আসে। মানুষ বনে গিয়ে দু'দিন কষ্ট ভোগ করে;—অর্থে তাদের সে কষ্ট দূর হয়। মানুষ বনে গিয়ে শিকার করে,—অস্ত্রে পাখী বধ করে, হরিণ মারে, কদাচিৎ দু'একটা বাঘও সে

শিকার না করে তাও নয়। তারপর উল্লাসে ঘরে ফিরে আসে।—বনের সৌন্দর্য্য সে বোঝে না। সে হিংস্র প্রকৃতির চরিতার্থ করে তৃপ্তি পায়—আমোদ উপভোগ করে। বনের গাছপালা তাকে যে একটু শান্তি দেয় তা' ক্ষণিক। দু'দিনের বনের সৌন্দর্য্যের ছাপ—তার মনের ভিতর তলিয়ে যায়। অর্থ লিপ্সা আর হিংস্র বৃত্তি মানুষের প্রকৃতি জয় করেছে। হয় অর্থ, নয় হিংসা বৃত্তির চরিতার্থতাই একমাত্র তাকে' বনের ভিতর টেনে আনে।

মানুষ এমন কখনই ছিল না। মানব-সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ বনেই ছিল। অরণ্যের ছায়াতলে ঋষিদের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হতো। আশ্রমের যজ্ঞধূমে কানন সুরভিত হতো। বনের শ্বাপদ ও হরিণেরা দলে দলে সেখানে এক সঙ্গে বিচরণ করতো; নীবার অন্নে ঋষিকন্যারা পাখীর আহার্য্য দিত; ঋষি বালকের বল্কল বস্ত্র পরিধান করে সমিধকাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বনে বনে ঘুরে বেড়াত। পুষ্পলতিকার আলবালে ঋষিকন্যারা জল সেচন কালে পুষ্প সম্ভারের দিন গণনা করতো। বনের সৌন্দর্য্যে বনের বাতাসে তখন মানুষের মন সজীব ছিল। বনের হরিণ, বনের পাখী, বনের শ্বাপদ সকলেই মানুষের করুণার অংশ নিত। বনের শোভায় তারা বিশ্বধাতারূপ নিরীক্ষণ করেছিল। ধর্ম্মনীতি, সমাজ, বিশ্বমৈত্রির উদার মন্ত্র মানুষের অন্তরে এখানেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল। বনের লতা যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ জড়িয়ে বড় হয়, বনের ফুল যেমন স্বতঃই সুবাসে ভরে ওঠে, মানুষের মনেও তেমনি করুণার ধারা স্বতঃই উৎসারিত হতো। বনের পাতায় পাতায় মানব নীতির মূলসূত্রের প্রথম শ্লোক মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছিল।

মানুষ ধীরে ধীরে নগরের কৃত্রিম বিলাস ব্যসনের মধ্যে ডুবে পড়লো।—বন পড়ে রইলো। কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে গড়তে গিয়ে মানুষের স্বাভাবিকতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে মানুষ নূতন হয়ে গড়ে উঠলো। সভ্যতার নূতন মোহে মানুষ বলদীপ্ত পশুরমত অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে লাগ্‌লো। সমাজের বলশালীরা নেতারূপে পরিগণিত হলো। সমাজের সাম্যবাদের গ্রন্থী আস্তে আস্তে খসে পড়তে লাগলো।

মানুষের বিলাস তৃষ্ণা নানা আকারে—মানুষকে পীড়ন করতে লাগলো। তখন কদাচিৎ মানুষের বৈরাগ্য বাসনা মানুষকে বনের সহজ সরল পথে ফিরিয়ে আন্‌তো। বনের মায়ায় একদিন তাকে ফিরতেই হবে। মানুষ আপনাকে যখন ফিরে পেতে চায়,—আপনার ভিতর আপনাকে দেখবার ইচ্ছা বলবতী হয়

তখনি মানুষ বনের আশ্রয় নেয়। তখন তার স্বাভাবিক জীবনের পথও কতকটা পরিষ্কার হয়ে আসে।

তৃষ্ণা ও বিলাস যখন ভোগের চরম সীমায় গিয়েও কিছুই খুঁজে পায়না তখন মানুষ আবার সত্যের পথ অনুসরণ করে। কিন্তু যে পথ একবার স্বভাবের বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে লাভ করাতো সহজ নয়। জীবনের এতকালের গ্রন্থী কি একদিনে কখনো খসে পড়তে পারে? বিলাস বাসনা ও বনের মায়া উভয়ের মাঝখানে পড়ে মানুষ ক্লিষ্ট হয়, কিন্তু কিছুই আর সহজ-ভাবে গ্রহণ করবার উপায় থাকে না। মনের এই বিশৃঙ্খলতার ভিতরই বর্ত্তমানে মানুষের মনে আশ্রম প্রবৃত্তির ভাব জাগ্রত হয়েছে।

মানুষ পুনরায় বনের মায়ায় আকৃষ্ট হয়েছে। বনের সবুজতায় পুনরায় সে প্রাণের রূপ ফিরে পেতে চায়। তার শুষ্ক ক্লিষ্ট প্রাণ আজ বনের সবুজতার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু এতদিনে বনের যা পরিবর্ত্তন হয়েছে, মানুষ এতকাল যাকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে, সে বন যে আজ মানুষের পক্ষেও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বনের হরিণ, বনের পাখীও যে তার কাছে অপরিচিত। বনের ফুল লতা পাতা সুহৃদ না হয়ে মানুষের বসতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অপরিচিত মানুষ এখানে পীড়াগ্রস্ত হয়। বনের সৌন্দর্য্য মানুষের দেহে মনে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার পরিবর্ত্তে রোগও অসন্তোষের বীজ উৎপন্ন করে। বনের মায়া আর মানুষকে নিগড়ে বাঁধতে পারে না। মানুষ যে আজ বনের নিকট চির অপরিচিত। বনের ছায়া মানুষের ছায়া চোখে তৃপ্তির অঞ্জন মেখে দেয়, কিন্তু প্রাণের গভীর সন্তোষ মোটেই উৎপাদন করে না।

আজ মানুষ বনের পরিত্যক্ত সন্তান। মানুষ বিমুখ হয়ে বনের যতটুকু ক্ষতি করেছে, ততটুকু পূর্ণ না করতে পারলে মানুষ কখনো বনের স্নেহের দাবী করতে পারে না। যে সুন্দরবন এক সময়ে মানুষের ঐশ্বর্য্য ও সৌষ্ঠবের ভাণ্ডার ছিল, এখন কেবল মাত্র তাহা শ্বাপদের নিশঙ্ক ভ্রমণের স্থান হয়েছে। মানুষ নৌকায় চড়ে চারি দিকে বনের এই বন শোভা দেখে তৃপ্ত হয়। প্রকৃতি কি সৌষ্ঠবই এখানে সাজিয়ে রেখেছে। বনের চারিদিকে নদীর শতমুখ ছড়িয়ে রয়েছে। নদীর কলগানে অহর্নিশ বন মুখরিত হয়। এই বিরাট শোভার বিচিত্র রূপ একমাত্র পাখীই অনুভব করে। এই রূপের উপমা নেই। শত ধারে সমুদ্রের স্রোত এই শ্যামলভূমি সিক্ত ক'রে রেখেছে। জোয়ারের স্রোতে কুল্-কুল্-রবে চারিদিক জলে ভরে আসে। প্রভাতে

হরিণের দল সেই সিক্তভূমির উপর বিচরণ করে, কখনো নির্নিমেষ নেত্রে যাত্রীর নৌকার দিকে চেয়ে থাকে। প্রসূতির এই প্রিয় দুলালের সোনালি চক্‌চকে লোম-আয়ত দৃষ্টি কি সুন্দর! কখনো শিকারীর নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যখন আর্ত্তনাদ করতে থাকে—কি নিদারুণ দৃশ্য! সোঁয়ারের জলে যখন ভটভাগ প্লাবিত হতে আরম্ভ হয় হরিণগুলি দৌড়িয়ে কোন উচ্চ ভূখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন লোকেরা চারিদিক দিয়ে সেই হরিণশিশুগুলি ধরে; কখনও প্রাণভয়ে ইহারা জলে লাফিয়ে পড়ে কিম্বা সাতার দিয়ে নদী পার হতে চায় কিন্তু শিকারীর দল ক্রমাগত পিছনে তাড়া করে, এই ক্লান্ত প্রাণীগুলিকে জীবিত অবস্থায় ধরে নিয়ে আসে। লোকালয়ে এসে কিছুদিন তারা এক গাছি তৃণও মুখে দেয় না। বনের কোন পাখার ডাক শুনলেই তারা উৎকর্ণ হয়ে শোনে এবং বনে এসেছে মনে করে, চকিতে পালাতে গিয়ে গলবদ্ধ রজ্জুর পীড়নে লাফ দিতে গিয়ে উপুর হয়ে পড়ে যায় হায়! বনের মায়া এখনো তাদের ছাড়েনি। বনের পাখীটীর গান অবধি তারা ভোলেনি। হরিণ গুলি কেওড়া পাতা খেতে ভাল বাসে, কোন গাছে বানরের আওয়াজ শুনলেই হরিণগুলি গাছের তলে এসে জড় হয়। কেন না তারা জানে বানরের কেওড়া খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পাতা ও ফল নীচে পড়বে, হরিণগুলি সে গুলি কুড়িয়ে খাবে। শিকারীরা গাছে উঠে বানরের আওয়াজ করে হরিণের দল গাছের তলে ডেকে আনে তার পর পাতার বদলে তীর গুলি হরিণের শরীরে বিদ্ধ করে। হরিণ মাটীতে লুটিয়ে আর্ত্তনাদ করতে থাকে। কত সুন্দর সুন্দর গায়ক পাখী বছর বছর শিকারীর গুলিতে বিনষ্ট হয়। এই ভাবে কত যে বনের শোভা সম্পদ শিকারীর নিষ্ঠুর আমোদে লুপ্ত হয়ে যেতেছে। বন শিকারের জায়গা হয়ে বনের অশ্চার্য্য সম্পদ দিন দিন নষ্ট হচ্ছে। বনের শোভা কেবলমাত্র বনের শ্যামলতায় পরিণত হয়েছে। উষার বন্দন গানে পাখীর সেই সুমিষ্ট কাকলী, বনানীতলে হরিণ শিশুর নৃত্য—অরণ্যের প্রকৃত সম্পদ, তা-ক্রমে অতীতের গতকথায় পরিণত হবে। তখন এই শ্যামল রূপের গম্ভীর দৃশ্য ভয়াল কর্কশতায় ভরে উঠবে। শ্যামল রূপের প্রাণহীন ছবি মাত্র পড়ে থাকবে। বনের মায়ার সরসতা প্রাণহীন ও তিক্ত বলে প্রতিপন্ন হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

পুরুষ।

(১)

ভারত-ভস্মে অযুত রূপে জেগে উঠ পুনঃ বীর,
নীহারিকা হ'তে কুমারিকাবধি উন্নত করি শির।
উত্তালতল ঊর্ম্মিকরাল বিশাল বারিধি বক্ষে,
তুঙ্গ ভূধরে শুভ্র শিখরে ঝাপদ সচল কক্ষে
ঘনঘটাময়ী অমানিশার বিজলী উজল চক্ষে,
নাচিয়া উঠুক শোণিত তোমার,
কাঁপিয়া উঠুক আসন ভূমার,
উঠ উঠ আজি বীর;
গর্জ্জন ঘন ভীম ঝঞ্ঝায় রহিবে দাঁড়ায়ে থির।

(২)

ভয় নাই ভাই, কাপুরুষে হবে হারাতে,
কাপুরুষ সবে করিয়া সাধন শিব হয়ে হবে দাঁড়াতে
সমরে শ্মশানে কবরে মশানে সকলে কি যাবে ছুটিয়া,
ধূমকেতু জ্বালা কজ্জল নভে চাঁদিমা কি রয় ফুটিয়া,
কম্পন ঘন পৃথ্বী ভূমারে রয় কিয়ে কেহ মুটিয়া
ছুটে যাবে আজি সবি
তুই শুধু ওরে র'রি
পারিবিনা তোরা হারা'তে;
কল্লোল ভরা হিল্লোল আজি তোরই শুধু হ'বে ছাড়াতে।

(৩)

মিশাইতে হবে ধৈর্য্যে আজিকে শৌর্য্যের সাথে টানি,
পেতে দিয়ে বুক সহিতে যে হ'বে—নিন্দা-গুড়ি-গ্লানি,
অত্যাচারীর হত্যা—কঠিন চরণে পড়িবে আঁটি,
দুঃখ-শ্রাবণে রক্তপ্লাবনে ভিজাইতে হবে মাটি
আপন মাংস অংশ করিয়া দিতে হবে তোরে কাটি

তবু তোরে হবে দাঁড়াতে
হিংসা দানবে তাড়াতে
সহিতে কত না বাণী।
বার বার তোরে দিবি বলিদান
তবে যদি জাগে প্রাণী।

(৪)

তোর ভুলে যেতে হবে আপনার কথা ভুলে যেতে হবে ঘর,
পরকে, সদাই করিবি আপন নিজের করিবি পর
পিতার আদর, জননীর স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা,
বাসর শয়নে নব বধূটীর মৌন মধুর আশা
সরস রভস পেলব পরশ, আঁখিটীর আড় ভাষা
ফাগুয়া মাখান ফাগুনের সাঁঝে
সরম-গোধূলি মিলনের লাজে
করিতে যে হবে পর,
(তুই) আপনার তেজে উঠিবি জাগিয়া
করিবি না কা'রে ডর।

(৫)

মানুষের মাঝে তুইরে পুরুষ, পৌরুষ শুধু বল,
রহিবি কি শুধু মাথাটী নোয়ায়ে আপনারে করি তল?
ছিন্ন করিয়া ভিন্ন বাঁধন উঠিতে যে হ'বে তোর,
সুপ্ত মনের গুপ্ত তেজের ভাঙ্গিতে যে হ'বে ঘোর
দুঃখ-কংসে ধ্বংস করিয়া ভাঙ্গিবি আলস-দোর
একাই উঠিবি জাগি
রহিবি না চাহি কারো লাগি,
সকলি যাইবে আঁখিতল,
মরণ-কালিয়দিরে হাসিবি আপনা ঘিরে
খল খল খল খল।

শ্রীবরদা দত্ত।

নিজেকে বড় ভাগ্যবতী জ্ঞান করিত। কিন্তু ভগবান তাহার কপালে এমন একটানা সুখসম্ভোগ দিতে চাহিলেন না। তাই বোধ হয় শিবনাথ একদিন প্রাতে বলিলেন যে, তিনি সংসার ছাড়িয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ-প্রান্তে আশ্রয় লইতে চলিলেন, তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার বাৎসরিক দশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি তাঁহার অবর্ত্তমানে ভাগিনেয় শ্যামাচরণই উত্তরাধিকার সূত্রে পাইবে এই মর্ম্মে তিনি এক উইল ও করিয়াছেন। বাসন্তী কিন্তু এ সংবাদে বড় দমিয়ে গেল—পিতৃতুল্য শ্বশুরকে ছাড়িয়া দিতে তাহার প্রাণ হাহাকার করিল। তাই সে শিবনাথকে অনেক বুঝাইল, শেষে কাঁদিয়া ফেলিল। তখন তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "মা! সংসারের মায়ায় আমায় আর জড়াস্ না। তোদের কাছে থেকে ভগবানের নাম কর্ব্বার অনেক চেষ্টা কর্লাম—কিন্তু এত সুখে—এমন ভোগে থাক্‌লে কি তাঁকে প্রাণ ভরে ডাক্‌তে ইচ্ছা করে? তাই মা, আমি দিনকতক নির্জ্জনে গঙ্গার তীরে বসে তাঁর নাম কর্ত্তে চাই। এতে তোদের বাধা দেওয়া উচিত কি? তবে মা, এই টুকু তোর কাছে বল্‌ছি যে, যদি তোরা কোন কারণে আমায় ডাকিস বা আমি জান্তে পারি যে, তোদের কোন বিপদ হয়েছে—আমি তখনি সব ছেড়ে দৌড়ে চলে আস্‌বো।" এই বলিয়া তিনি বাসন্তীর হাতে লৌহ-সিন্ধুকের চাবি দিলেন ও বলিলেন, "বাড়ীর গিন্নির কাছে এ চাবি বরাবর থাক্‌তো। এতদিন আমি বাধ্য হয়ে এটা রেখেছিলাম। এই নে—আজ থেকে তুই এর ভাণ্ডারী"। তারপর তিনি শ্যামাচরণকে বিষয় কর্ম্ম বুঝাইয়ে দিয়ে বলিলেন, "সংসারে কোন কর্ত্তব্যে কখনো যেন অবহেলা না হয়—তাহ'লে আমি আবার উইল কর্ব্বো।"

ছয় মাসের মধ্যেই শ্যামাচরণ কিন্তু একে একে অনেকগুলি কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিল, অগাধ সম্পত্তির মালিক হইয়া সে মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না। জমিদারীর বাঁধা আয়ে তুষ্ট না হইয়া দশজনের কথায় ব্যবসা করিবে স্থির করিল ও ঘন ঘন কলিকাতা যাইতে লাগিল। বাসন্তীর এটা ভাল না লাগিলেও সে প্রথমটা স্বামীকে কিছু বলিতে ভরসা করিল না। কিন্তু তার পর যখন সে বেশ বুঝিল যে স্বামীর অনাবিল আদর স্রোতে ভাঁটা পড়িতে সুরু হইয়াছে—তাহার সেই প্রাণখোলা উচ্চহাস্য কোথায় সরিয়া গিয়াছে—সুন্দর মুখে কালিমার রেখা দেখা দিয়াছে তখন সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বামীকে বিষয় কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন শ্যামাচরণের মেজাজটা মোটে ভাল ছিল না। ব্যবসায় একটা মোটা

দাঁও মারিবে এই লোভে সে বাজার হইতে ঋণ করিয়া মাল কিনিয়াছিল। আজ সকালে সে সংবাদ পাইয়াছে যে, সে মালে লাভ তো দূরের কথা এখন আসল টাকা টানিয়া ঘরে আনা খুব শক্ত। তাই সে আজ বড়ই দমিয়া গিয়া কি করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবে এই ভাবনায় ব্যস্ত ছিল। এমন সময় তাহার মনে পড়িল লৌহ-সিন্ধুকের মধ্যস্থ সোনা রূপার জিনিসগুলার কথা। আপাততঃ মান বাঁচাইতে হইলে সেগুলাকে বন্ধক না দিলে বা বিক্রয় না করিলে চলিবে না, এই স্থির করিয়া সে পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া সিন্ধুকের চাবি চাহে। বাসন্তী চাবি দিবার আগে তাহাকে উপদেশ দিতে বসিল। ফলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে জীবনে এই প্রথম পত্নী ধমকাইল, বলিল যে, সে গরীবের মেয়ে তাহার পক্ষে টাকা কড়ির খবর না রাখাই ভাল।

এই কথায় বাসন্তীর মনে বিষম ধাক্কা লাগিল। কোন কথা না বলিয়া—লৌহ সিন্ধুকের চাবিটা ফেলিয়া দিয়া সে নিজ কক্ষে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার মনে বিষম অভিমান দেখা দিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিজ্ঞা করিল যে জীবনে সে আর স্বামীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না এমন কি স্বামী জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেও সে তাহার উত্তর দিবে না। গরীবের মেয়ে সে গরীবের মতই থাকিবে। তারপর শ্যামাচরণ পাকাপাকি রকম কলিকাতা বাস আরম্ভ করিল। টাকার দরকার হইলেই সে দেশে আসিত আর কোন প্রকারে কিছু হস্তগত হইলেই পলায়ন করিত। পত্নীর সহিত সাক্ষাতের কোন সুযোগ সে ঘটিতে দিত না।

এই ভাবে বাসন্তী পুরা দুটা বৎসর কাটাইয়াছে। কখনো কাহারও নিকট সে মনের দুঃখ জানায় নাই—বা জানাইতে চাহে নাই। এমন কি বৃদ্ধ শিবনাথ পত্রের উপর পত্র দিয়া তাহার স্বামীর সঠিক অবস্থা তাহাকে জানাইতে লিখিলেও সে অতি কষ্টে সে প্রলোভন দমন করিয়াছে। পাছে স্বামীর সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে লিখিতে অভিমানের বন্যা আসিয়া হৃদয়ের উৎস খুলিয়া দেয়—পাছে কোন অজানা মুহূর্ত্তে নিজের অজ্ঞাতসারে সে স্বামী নিন্দা করিয়া ফেলে এই ভয়ে সে স্বামীর সংবাদ দান একেবারে বন্ধ করিয়াছিল।

তাই আজ সে শিবনাথের পত্র পাইয়া বিষম ভাবনায় পড়িয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, বহুদিন আত্মীয় স্বজনকে না দেখিয়া তাঁহার মন বড় খারাপ হইয়াছে তাই তিনি দিন কয়েকের জন্য একবার তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন। দুইদিনের মধ্যেই তিনি দেশে পৌঁছিবে।

ভাবাচরণের কথা ভাবিয়াই বাসন্তী কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে তো নিশ্চিন্তমনে কলিকাতায় বসিয়া আছে। এদিকে শিবনাথ দেশে ফিরিয়া তাহাকে না পাইলেই তো সব জানিয়া ফেলিবে, আর তখন হয় তো তাহাকেও বাধ্য হইয়া সব বলিয়া ফেলিতে হইবে। তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে সে স্বামীর ভালবাসা হারাইয়াছে। ছি! ছি! তার চেয়ে সে স্থির করিল যে, স্বামীকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া দিবে। তাই সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া শেষে কম্পিত হস্তে অশ্রুসিক্ত নয়নে দুই বৎসর পরে আজ তাহাকে পত্র লিখিতে বসিল।

(২)

শিবনাথ দুশো ক্রোশ রাস্তার ধূলা ও কয়লার গুঁড়া মাখা দেহখানি লইয়া বাটীর প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও হাঁকিলেন, "কৈ গো মা, কোথা গেলি?"

বাসন্তী তৎক্ষণাৎ রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া শ্বশুরের পদধূলি গ্রহণ করিল ও গাত্রবস্ত্র সংযত করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল "আমাদের একেবারে ভুলে জাননি তাহ'লে? কিন্তু মামা! আপনি তো মোটা হন্ নি!"

হো হো করিয়া হাসিয়া শিবনাথ বলিলেন, "বেটি! আমি কি মোটা হব বলে সেখানে গেছি রে? আচ্ছা, তুই বা কোন ফিরেছিস্?" তারপর বাসন্তীর মুখপানে ভাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ মা! তোর কি কোন অসুখ করেছিল? কৈ, আমায় তো কিছু জানাস্ নি।"

বাসন্তী মাটিপানে চাহিয়া বলিল, "আমি বেশ ভালই আছি।"

বৃদ্ধ সংশয় জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "এর নাম ভাল থাকা! না! তুই বল্‌বি না। শ্যাম কোথা?"

একটু পরে শ্যাম আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া শিবনাথ বলিলেন, "হাঁরে, তুই নাকি ব্যবসা কর্চ্ছিস্। কিসের ব্যবসা? কোথা দোকান করেছিস্?

শ্যাম বলিল, "চালানী কাজ। কলিকাতায় একটা অফিস্ খুলেছি।"

শিবনাথ। চালানী কাজ? তুই তার কি বুঝিস্? তা, আমায় বুঝি একবার জানাতে নেই? আচ্ছা তোর চিঠি পেতাম না কেন? শ্যাম উত্তর দিতে পারিল না। শেষে বলিল, "বড্ড কাজের ভীড়।" শিব। কাজের ভিড়ে আমায় ভুলে যাওয়াটা—ভাল লক্ষণ নয়। তোর ও তো শরীর ভাল নাই দেখ্‌ছি।

বাসন্তী আর অগ্রসর হইতে দিল না, ধীরে ধীরে বলিল, "মুখ হাত ধোবেন আসুন। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

শিবনাথ যাইতে যাইতে বলিলেন, "শ্যাম, ডোর ব্যবসাটা একবার আমায় বুঝিয়ে দিস্।"

প্রথম কয়টাদিন শিবনাথ গোলেমালে—দশজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া কাটাইলেন, সংসারের সব সংবাদ লইবার বড় একটা সুযোগ ঘটিল না। তারপর একদিন বৈকালে জলযোগ করিতে করিতে হঠাৎ বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ মা! সংসারের কিছু খোয়া যায় নি? লোহার সিন্দুক ঠিক আছে ত?"

বাসন্তী দমিয়া গেল—বুঝি বা সব প্রকাশ হইয়া পড়ে। সে একটু সুরটা নরম করিয়া বলিল, "সব ঠিক আছে। তবে সিন্দুকের চাবি আমার কাছে রাখি নাই—কি জানি যদি হারিয়ে ফেলি।"

শিবনাথ বলিলেন, "শ্যাম কি তোর চেয়েও সাবধান হতে পারে নাকি? কি জানি আমার অবর্ত্তমানে যদি একটু গোছালো হয়ে থাকে আচ্ছা, একটা কথায় জবাব দিবি মা! শ্যাম ডোকে বেশ যত্ন করে তো?"

এ রকম আক্রমণের জন্য বাসন্তী মোটে তৈয়ারী ছিল না। তাই তার সুন্দর মুখখানি ফ্যাকাশে হইয়া গেল—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "করে।" তার পর কথা বদ্‌লাইবার জন্য বলিল, "আজ মিষ্টির থালায় যে হাত দিলেন না। বাইরে থেকে আপনার খাওয়া একেবারে কমে গেছে। একটু বসুন—আমি ক্ষীরের বাটিটা নিয়ে আসি, দিতে ভুলে গেছি।"

শিবনাথ হাসিলেন, বলিলেন, "ক্ষীর যে রাত্রে খাই—এখন কেন?"

বাসন্তী চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, "তা হোক আপনি বড্ড কম খেলেন টাট্‌কা ক্ষীরটা খেতেই হবে।" সে পলায়ন করিয়া—হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কারণ সে যখন ক্ষীরের বাটি হাতে আসিল তখন স্বামীর প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

স্বামী বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়াও তাহার সহিত একদিনও কথা কহেন নাই। প্রথমে বাসন্তী ভাবিয়াছিল যে, তাহাকে চিঠি লিখিয়া আনার জন্য সে রাগ করিয়াছে ভাবিয়াছে যে সেই সব জানাইয়া চক্রান্ত করিয়া শিবনাথকে কাশী হইতে টানিয়া আনিয়াছে। যাহা হোক, দুই দিনের মধ্যে তাহার সে ভুল ভাঙ্গিলেই সে তাহার সহিত কথা কহিবে এই আশায় সে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু একে একে দুই দিনের স্থলে দশ দিন কাটিল তবু একবার শ্যামাচরণ তাহার

নিকট দাঁড়াইল না—একবার বলিল না যে, সে সন্ধি করিতে চাহে। তখন বাসন্তী আরও কঠিন হইবার চেষ্টা করিল। বিনা দোষে যদি স্বামী তাহার নির্য্যাতন করিতে পারে তাহা হইলে সেই বা কেন নীচু হইবে? তাহারও কি মানের দাম নাই? হলেই বা সে গরীবের মেয়ে—অনাথা; তাই বলিয়া সে যাচিয়া স্বামীর পদতলে কেন পড়িবে?

স্কন্ধে অভিমানের পর্ব্বতভার ধারণ করিয়াও সে হিমাদ্রির মত সোজা হইয়া রহিল।

তার পর এক দিনের ঘটনায় তাহার রাগ আরও বর্দ্ধিত হইল। সে বেশ লক্ষ্য করিয়াছিল যে, এবার কলিকাতা বাস করিয়া স্বামীর নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে। নতুবা যে কখনো কারও সহিত জোরে কথা কহিত না সে আজকাল কারণ অকারণে দাসদাসী এমন কি আত্মীয় স্বজনকে পর্য্যন্ত গালাগালি দিত—অপমান করিত। সমস্ত সংসার যেন তাহার নিকট বিষময় বোধ হইত। শুধু শিবনাথের সম্মুখে সে কোন রকমে গুম্‌রাইয়া কাটাইত। আর বাসন্তীকে সে প্রত্যক্ষে কিছু না বলিলেও—পরোক্ষে পদে পদে তাহার অপমান করিত—সুযোগ পাইলেই বাসন্তীর কার্য্যে বাধা দিত—ভিন্নরূপ হুকুম চালাইত। এমনকি সেদিন বাসন্তী পাশের ঘরে আছে জানিয়াও সে শাসাইতেছিল, "আমার নামে যে কোন বদ্‌নাম কর্ব্বে বা আমার হুকুম তামিল না কর্ব্বে—তাকে আমি চাবুকে লাল করে বাড়ী থেকে তাড়াবো। এ বাড়ী আমার—এ বিষয়ের আমি মালিক, আর কেউ নয়।"

বলা বাহুল্য, ঐ কথায় বাসন্তী রাগে অভিমানে ফুলিয়া—নিজ কক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িল। সে যে ইচ্ছা করিলে স্বামীর বিরুদ্ধে অনেক কথা মামা শ্বশুর আসিবা মাত্র তাঁহাকে শুনাইতে পারিত। আর সেই যে পত্র লিখিয়া তাহাকে কলিকাতা আনিয়া—তাহার মান বাঁচাইয়াছে। তাহার দুঃখ এই যে, স্বামী এতদিন একসঙ্গে ঘর করিয়াও বুঝিতে পারে নাই যে, সে সে ধাতুতে গড়া নয়! স্বামীর আদর অনাদরের কথা—তাহার অধঃপতনের দুর্ব্যবহারের কথা কি সাধ্বী স্ত্রী অপরকে জানাইতে পারে? স্বামীর আদর হারাইয়াছে একথা অপরকে বলিবার আগে সে দম্ ফাটিয়া মারা যাইবে যে! স্বামী যাহা মনে করে করুক,—তাহার নিজের মনে যত অভিমানের বন্যাই বহুক্—এ লজ্জার কাহিনী অপরকে বলিয়া—সে স্বামীর ও নিজের অপমান করিতে পারিবে না—এর জন্য যদি তাহাকে মরিতে হয়—সে হাসি মুখে মরিবে।

(৩)

সেদিন সকালে বাসন্তী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল যে কর্ত্তা বাবু তাহাকে এখনি ডাকিতেছেন। এমন অসময়ের ডাকে বেচারী একটু চঞ্চল হইল, তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া আসিল। তখন শিবনাথ দালানে দাঁড়াইয়া দাসদাসীদের জড় করিয়া তাহাদের জবাব দিতেছিলেন। বাসন্তীকে দেখিয়াই তিনি তাহাদের বিদায় দিলেন, তার পর বলিলেন, "মা! এ জায়গা আমার আর ভাল লাগছে না। আমি কাশী ফিরে যাব।"

"সেকি এখনো পনেরো দিন হয় নি'—এসেছেন। না—এরমধ্যে আপনাকে আমি ছেড়ে দোব—না—কিছুতেই না!"—বাসন্তীর স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। অভাগিনী এই কয়দিন বৃদ্ধ-শ্বশুরের সেবা করিয়া যে হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু করিয়া ফেলিয়াছে!

বৃদ্ধ ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং বলিলেন, —"আর যদি বলি যে, আমার সঙ্গে তোকে যেতে হবে—তাহ'লে ত আর আপত্তি নেই?"

বাসন্তী চম্‌কাইয়া উঠিল, বলিল, "এখন? নামনে পূজো!" বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার মাথায় হাত দিলেন।

বলিলেন, "মা! চল্‌না আমার সঙ্গে নূতন দেশ দেখ্‌বি—কেমন মহাদেব দেখবি। তোর শরীরও ভাল হবে, বাসন্তীর কান্না আসিল, পিতৃতুল্য এই বৃদ্ধকে পাইয়া যে তাহার অনেক ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। তবু স্বামীকে ছাড়িয়া যাওয়া-এই সময়ে। না—যাইবে না। অসম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, "তীর্থ কর্ত্তে আমি পারি না! সংসার দেখবে কে?"

একটু হাসিয়া শিবনাথ বলিলেন, "আর যদি শ্যামও সঙ্গে যায় তাহলে তো আর সংসারের ভাবনা থাক্‌বে না?" বাসন্তীর চক্ষে জল আসিল! ভগবান তাহাকে একি বিষম সমস্যায় নিক্ষেপ করিলেন!

শিবনাথ বলিলেন, "শ্যামও গোড়ায় গোলমাল করেছিল। তাকে আমি দুই ধমকে রাজী করেছি। আর মা! সেখানে গিয়েই না হয় আমার সেবা কর্ব্বি। কাঁদ্‌ছিস কেন মা! কোন ভয় নেই—আমি এখনো অনেক দিন বাঁচ্‌বো। নাতির মুখ যে আমার দেখতেই হবে। বাবার কাছে নিয়ে এবার নাতীর জন্য পূজা আমায় দিতেই হবে।"

বাসন্তী অগত্যা পলায়ন করিল।

কাশীধামে আসিয়া কিন্তু তাহার দুঃখের মাত্রা বাড়িল বই—কমিল না। দেশে এক বাটিতে থাকিলেও স্বামীস্ত্রীতে সাক্ষাৎ অতি অল্পই হইত—আর বাক্যালাপের কোন প্রয়োজনই ঘটিত না। কিন্তু এই বিদেশে আসিয়া শিবনাথ তাহাদের সে সুখ টুকুও অপহরণ করিলেন। তাঁহার আব্দারের মাত্রাধিক্য ঘটিল। তিনি শুধু উভয়কে একসঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া গঙ্গাস্নান বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্যামকে কোন আদেশ করিতে হইলে বাসন্তীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন আর বাসন্তীকে কোন প্রয়োজন হইলে শ্যামকে ডাকিয়া দিতে বলিতেন। ফলে স্বামীস্ত্রীতে মহাবিপদ গণিল। তবে বিপদটা বেশী বাসন্তীরই হইল। কারণ শ্যাম মাতুলের প্রতি রাগটা তাহার উপরই প্রকাশ করিতে লাগিল। বাসন্তী তাহাকে কিছু বলিতে আসিলেই বিষম গালাগালি খাইত, আর সে তাহাকে কিছু বলিতে আসিয়া এমন কর্কশ ভাবে কথা কহিত—তাহার প্রতি এমন রূঢ় ব্যবহার করিত যে, সে দুঃখে, ক্ষোভে মাথাটি নিচু করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইত—কোন উত্তর দিত না শ্যামাচরণ তখনো রাগে ফুলিতে থাকিত।

দেশে দাসদাসীর দ্বারা শ্যামাচরণ নিজের সেবা চালাইত; এখানে কিন্তু অল্পের বিস্তরে তাহাকে পত্নীর মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল। অথচ ইহার জন্য তাহার প্রতি বিরক্তির মাত্রাটা ক্রমে বর্দ্ধিতই হইতেছিল। সে শুধু ভাবিত যে, কবে সে এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে—কবে মাতুল তাহাকে দেশে ফিরিতে বলিবেন। পত্নী আজ পর্য্যন্ত মাতুলের নিকট তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলে নাই—ইহা জানিয়া যে বেচারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া দূরের কথা—তাহাকে আরও ঘৃণা করিতে সুরু করিয়াছিল। এ দিকে বাসন্তীও নানা প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া স্বামীর সংস্পর্শে আসিলেও সে একটুও ছোট হইতে রাজী ছিল না। বুক পোরা অভিমান লইয়া সে তুষানলে জ্বলিতেছিল; তবু কোন দিন স্বামীর সম্মুখে একটুও দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলে নাই!

(৪)

সেদিন ভোরের আলো সবেমাত্র আসিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেই বাসন্তীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ভূমি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল ও বাতায়ন-সমীপে আসিয়া নিদ্রালসজড়িত নেত্রে বহিঃপ্রকৃতির পানে চাহিল। অমনি একটা দমকা বাতাস একরাশ মেথলী ও মল্লিকাফুলের গন্ধ ভাসাইয়া

আনিয়া তাহার নাসিকাগ্রে ধাক্কা দিল—তাহার চূর্ণকুন্তলরাশিকে নাচাইয়া দিল। যুবতী সন্ত্রস্ত হইয়া গাত্রবাস সংযত করিল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। অতীতের একটা বড় মধুর স্মৃতি যেন কাহার কোমলকরস্পর্শে হৃদয়ের আঁধার রাশিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আলো ও হাসিমাখা মূর্ত্তি লইয়া নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল কৈশোরের সেই রঙ্গিন দিনগুলা—যখন সংসার তাহার চক্ষে বড় কোমল বড় শান্তিমাখা লাগিত—যখন প্রতি লতায় পাতায় সৌন্দর্য্য ভাসিত—প্রতি কীটপতঙ্গে আনন্দ মিলিত—চন্দ্রে সূর্য্যে মাধুর্য্য ক্ষরিত—সারা প্রকৃতিতে প্রেম জাগিত-আর মানুষমাত্রেই সারল্য থাকিত! তখন যে তাহার বাঁচিবার—এ সংসার ভোগ দখল করিবার বড় সাধ হইত! আর এখন! হায়,—প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার এক ভাবনা হইয়াছে—কবে তাহার এ দুঃখের অবসান হইবে—কবে সে মুক্তি পাইবে! কখনো গম্ভীরনাদিনী কলকল্লোলিনী পতিতপাবনী ভাগিরথীর জলে নাবিয়া —কখনো সামগান মুখরিত—পূতালোকোদ্ভাসিত সাধুজনসেবিত দেবাদিদেবের মন্দিরে লুটাইয়া পড়িয়া—কখনো আঁধার নির্জ্জন কক্ষে নৈশউপাধানে অশ্রুসিক্ত মুখখানি লুকাইয়া—সে শুধু মুক্তি প্রার্থনা করিত। জীবনযুদ্ধে—পরাজিত হইয়া—ক্ষতবিক্ষত দেহ লইয়া সে প্রতিপদে হটিতেছিল—তাহার আর দাঁড়াইবার—নড়িবার, এ সংসারে আত্মপরিচয় দিবার সাধ মোটে ছিল না। নারীর সর্ব্বস্ব—তাহার একমাত্র অবলম্বন—পতি প্রেম হারাইয়া কোন্ অভাগিনী বাঁচিয়া থাকিতে চায়!

ভাবিতে ভাবিতে একবার শয্যার দিকে চাহিল। নিদ্রামগ্ন শ্যামাচরণকে দেখিয়া তাহার চক্ষু যেন আর ফিরিতে চাহিল না। কতকাল কতযুগ যে, সে তাহাকে ভাল করিয়া দেখে নাই! দেখিতে দেখিতে সহসা যেন কাহার করস্পর্শে পদ্মপত্রস্থিত বারিরাশির ন্যায় তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুরাশি ধারায় ধারায় ঝরিতে লাগিল—কোন বাধা মানিল না। তখন প্রাণপণ শক্তিতে অশ্রুর উৎসমুখ বন্ধ করিতে গিয়া সে বোধ হয় কোন অস্পষ্টশব্দ করিয়া ফেলিয়াছিল; কেন না, শ্যামাচরণ ঠিক সেই সময় জাগিয়া ও শয্যায় বসিয়া চক্ষু মুছিল, বাসন্তীর চক্ষে জল দেখিয়া খুব বিরক্তি পূর্ণ স্বরে বলিল, "এ আবার কি বিপদ! সকলের আমায় জ্বালাতন করা ছাড়া কি আজ আর কোন কাজ নাই?" বাসন্তী কি জবাব দিবে? তাহার সব সংযমের বাঁধ যে আজ অশ্রুর প্লাবনে ভাঙ্গিয়া দৌর্ব্বল্য প্রকাশ হওয়ায় সে যেন আরও

কাতর হইয়া পড়িল। অঞ্চলাগ্রখানি মুখে গুঁজিয়া দিয়া সে মেজে বসিল ; চলিয়া যাইবার মত শক্তি তাহার ছিল না।

শ্যামাচরণ তখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পত্নীর এই ক্রন্দনে সেও বিষম বিস্মিত হইয়াছিল। সে বলিল, "তুমি কি চাও যে আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব ?"

বাসন্তী শিহরিয়া উঠিল, অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "ওগো, আমি যে আর পাচ্চি না—কি কর্ব্ব আমি—তুমি বলে দাও।" সে কোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্তরের হাহাকার তাহার—সব বুদ্ধি বিচারশক্তি দাবাইয়া দিয়া বলপূর্ব্বক বাহিরে আসিতেছিল শ্যামাচরণও বড় বিচলিত হইয়া পড়িল। এতটা যে সে কখনও কল্পনাও করে নাই। পত্নী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পরামর্শ চাহিবে ইহার জন্য সে যে মোটে প্রস্তুত ছিল না। সে বলিল, "আচ্ছা, আমি আজ মামাকে সব বল্‌ছি।" তার পর ঢোক গিলিয়া বলিল, "না হয় তুমি নিজেই সব বল কিন্তু তা'হলে—"তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বাসন্তী তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—আমায় মুক্তি দাও! এ অভিনয় এ ভণ্ডামী আর আমি চালাতে পাচ্চি না। আমার আর সহ্য শক্তি নাই!"

শ্যামাচরণও খুব দমিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে জাগিল যে দোষ কার ? এই নারীর ? না তার ? এতো এতদিন সহ্যই করিয়া আসিয়াছে—তবে—কেন—না! সে স্থির করিল সে ভাবিবে।

পত্নীকে টানিয়া তুলিয়া সে বলিল, বাসন্তি! আমায় ভাব্বার একটু সময় দাও। মাথাটা এখন বড় গুলিয়ে গেছে। আমি আস্‌ছি।"

সে কক্ষ ত্যাগ করিল আর বাসন্তী হর্ম্ম্যতলে আপনার ক্ষুদ্র দেহখানি লুটাইয়া দিয়া আবেগ ভরে কোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৫)

সেই সন্ধ্যায় বাসন্তী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া—গলবস্ত্র হইয়া স্তিমিত নেত্রে যুক্তকরে মহেশ্বরের আরাধনায় বসিয়াছিল। মন্দির জনাকীর্ণ। সন্ন্যাসী গৃহস্থ, ধনী নির্ধন, সাধু ভণ্ড, সব জটলা পাকাইয়া—মন্দির সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। সানায়ের পঞ্চম তান মধ্যে মধ্যে পূজার্থীদের 'হর হর বোম্ বোম্' নাদ ছাপাইয়া তাহাদের কাণে যেন ধ্বনিত হইতেছিল অমনি তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁকিতেছিল, "জয় বাবা বিশ্বনাথজীকি জয়!" তাহাদের কোলাহল আর কাঁসর ঘণ্টার নিনাদ সমস্ত মন্দিরটি কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

বাসন্তীর কানে কিন্তু এসব কি [illegible] না। কোলাহল আজ তাহাকে উন্মাদিনী করিয়া [illegible] করিয়া সে যে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। [illegible] ছাড়িয়া মন্দিরে আসিয়া দেবতার চরণে সে লুটাইয়া পড়িয়াছে। দেবতার কৃপায় কি হতভাগিনীর দুঃখ ঘুচিবে না। সে আজ প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল যে, দেবতার অনুগ্রহকণা না পাইলে সে আজ মন্দির ছাড়িবে না—তাহার আর স্থান কোথায়!

আরতি শেষ হইল—ক্রমে জনতা কমিয়া গেল—মন্দির শূন্যপ্রায় হইল—বাসন্তী কিন্তু নড়িল না। এদিকে শিবনাথ বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন ও শ্যামাচরণকে বলিলেন, "বৌমাকে খুঁজে নিয়ে এস।"

শ্যামাচরণ প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঐ নির্ব্বাত-নিষ্কম্প মূর্ত্তি কি তাহার স্ত্রীর?

বাসন্তীর সেই [illegible] বেশ, আর একাগ্রতামাখান ভক্তি ও পবিত্রতা আলোকে উদ্ভাসিত মুখখানি দেখিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। একি আজ দেবতার আশীর্ব্বাদ না লইয়া ছাড়িবে না? এতো সাধারণ মানবীর প্রার্থনা নয়—এযে সতীর উৎকট সাধনা! দুই হাতে চক্ষু মুছিয়া সে আবার চাহিল। তার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। আজ সমস্ত দিন সে ভাবিয়াছে—বিবাহিত জীবনের ছোট বড় ঘটনা যতদূর সম্ভব মনে করিয়া সে আলোচনা করিয়াছে; আর বুঝিয়াছে যে, সেই ভুল করিয়াছে। মায়া-মৃগের পশ্চাতে ঘুরিয়া সহরের বিলাস ব্যসনে মুগ্ধ হইয়া সে এই দেবীর—সতীর অবমাননা করিয়াছে—তাহাকে কাঁদাইয়াছে! তার পর এখন সতীর এই মূর্ত্তি দেখিয়া অনুশোচনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা করিল যে সোতখনি কাঁদিয়া পত্নীর হাত দুটি ধরিয়া বলে "ওগো, আমায় একবার মাফ কর—একবার আমার ভুল সংশোধন কর্ব্বার সুযোগ দাও!"

আবেগ ভরে সে ধীরে ধীরে তাহার কম্পিত হাতখানি বাসন্তীর কাঁধে দিল। কথা কহিবার বা ডাকিবার শক্তি তাহার কণ্ঠে ছিল না। বাসন্তীও চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল ও স্বামীকে দেখিয়া ত্রস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। শ্যামাচরণ তাহার হাত ধরিয়া টানিল ও উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আমায় একবার মাফ কর তুমি—তোমার আমি বড্ড কষ্ট দিইছি।"

বাসন্তীর বাক্-শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল—উদ্গত নয়নে সে স্বামীর মুখপানে

চাহিল। শ্যামাচরণ বলিল, "আমি বড় লোক হতে চাই না—মামার বিষয় আমার সহ্য হবে না। তাঁকে আমি এখনি সব বলছি।"

এ কি স্বপ্ন না সত্য! বাসন্তীর মাথা ঘুরিয়া গেল। শ্যামাচরণ তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিল।

এমন সময় পিছন হইতে শিবনাথ হাঁকিলেন, "বারে তোরা! এ বুড়োটাকে বেশ ভুলে গেছিস তো!" সহসা বাসন্তীর অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিলেন, "এ কি! বৌমার কি হোল! ডাক্-ডাক লোক ডাক্।—পাল্কী আন্।"

শ্যাম প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "মামা! আমার দোষেই—" বাধা দিয়া শিবনাথ বলিলেন, "কোন কথা নয়—যা—পাল্কী নিয়ে আয় শিগ্‌গীর।—যা—যা। এস মা তুমি আমার সঙ্গে!"

শ্যামাচরণ চলিয়া যাইতেই শিবনাথ বলিলেন, "কি মা! কাঁদ্‌ছিস্?

তাহ'লে দেবতা তোর ওপর দয়া করেছে! হবে না! এ যে জাগ্রত ঠাকুর! বড় উঁচুদরের পীঠস্থান!"—তাহার হাত ধরিয়া সে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, 'মা! তোর ছেলে বুড়ো হলেও তোরা কি তার চখে ধুলো দিতে পার্ব্বি? সন্দেহের উপর দেশে ফিরে তোকে দেখেই আমি তোর আর তোর সংসারের সঠিক অবস্থাটা বুঝে নিয়েছিলাম। আর মা! শুধু তোর মুখ চেয়েই আমি শ্যামকে এইরকম শিক্ষা দিলাম। নইলে—যাক্ সে কথা। তাকে শাস্তি দিলে যে তোকেও শাস্তি দিতে হয়—তাই আমি এই রাস্তাই বেছে নিয়ে—তার চোখ ফুটিয়ে দিলাম! ওকি! এখনো কাঁদছিস তুই? তাহ'লে কিন্তু আমি রাগ কর্ব্ব।"

বাসন্তী কৃতজ্ঞতাভরা হৃদয় তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেই তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! অমন কাজ করিস্ না মা! বাবার মন্দিরে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়—তাঁর চরণামৃত এক চুমুক—খেয়ে বাড়ী চল্—আর তোকে কিছু ভাব্‌তে হবে না।"

শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি, এল।

দেশবন্ধু।

(১)

বন্ধ দুয়ার খুলিয়া আজিকে
এসেছ সবার প্রাণের প্রিয়,
তোমার ত্যাগের শীতল ছায়ায়
তাপিত আতুরে ডাকিয়া নিও।

(২)

একি আলোড়ন মহা শিহরণ
নব কলরোল নতুন ছন্দে
এস এস বন্ধু সবাকার প্রাণ,
এ ভারত আজ তোমায় বন্দে।

(৩)

মহা সাধনায় সাধক তুমি যে
এবে দীনতায় করুন ভায,
আপনা বিলায়ে সকল দিয়াছ
ভিখারীর মত পরেছ বাস।

(৪)

শৃঙ্খল ছেড়ে এসেছ বাহিরে
কত—মহীয়ান্ গৌরব ময়,
তোমার পরশ মুগ্ধ মধুর
সকলের প্রাণ তোমায় চায়।

(৫)

ওগো ভারতের প্রাণের বরেণ্য
নিঃস্বার্থ আজ সফল কাজ,
ভারত মাতার প্রাণের আশীষ
বিফল হবেনা তোমাতে আজ।

শ্রীমতী ষোড়শীবালা দেবী।

বৈদিক ভারতে সমুদ্র-যাত্রা।

বৈদিকযুগে ভারতবাসিগণ সমুদ্র-যাত্রা করিতেন কিনা সে কথার চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই। বৈদিক সাহিত্যে সমুদ্রযাত্রার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা এত অল্প এবং অসম্পূর্ণ, যে তাহা হইতে কোন প্রকার ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে এক মত হইতে পারেন নাই; তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ম্যাক-ডোণাল্ড, স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুভব করেন যে, বৈদিক যুগে হিন্দুগণ সমুদ্রপথে ব্যবসা এবং বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করিতেন। অন্যদিকে জিমার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, বৈদিক ভারতবাসি সমুদ্রের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। বৈদিক ভারতের রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার ইতিহাস আমরা এত অল্প জানি যে, বৈদিক সাহিত্য পাঠে আমাদের মনে হয় যে, বৈদিকযুগে ভারতবাসী ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য এবং ভাষা ব্যতীত অন্য কোন জিনিষের চর্চ্চা করিত না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমার Dr. Rhys Davids কথা মনে করিয়া বলিব যে, "Generally speaking the books on India have been so exclusively concerned with questions of religion and philosophy of literature and language, that we have been apt to forget that the very necessities of life, here as elsewhere, must have led the people to occupy their time very much, not to say mostly, with matters than those with the accumulation and distribution of wealth" (Buddhist India. Chap. VI.) কেমেডি সাহের প্রমাণ করিয়াছেন যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ সমুদ্র পথে ব্যাবিলনে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।

বৈদিক সাহিত্যে সমুদ্র ভ্রমণের যে কয়েকটী প্রমাণ পাওয়া যায় এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। বৈদিক সাহিত্যে নৌ কথার বহুবার উল্লেখ দেখা যায়। সর্ব্বপ্রথমে ঋকে এবং পরে অথর্ব্ব এবং ব্রাহ্মণে নৌ কথা পাওা যায়।

নৌ কথার অর্থ নৌকা বা জাহাজ। কিন্তু এই নৌকা সমুদ্রপথে যাইত কিনা সেই কথাই আমাদের প্রতিপাদ্য। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বলেন যে

in a great majority of cases the ship was merely a boat for crossing rivers, though no doubt a large boat was needed for crossing many of the broad rivers of the Punjab as well as the Yamuna and Ganges (Vedic India.) :

সমুদ্রপথে ভ্রমণোপযোগী জাহাজের দুইটী সরঞ্জাম অত্যাবশ্যক—সেই দুইটী মাস্তুল এবং পাল। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে এই দুইটীর কোনটীরও উল্লেখ নাই। তাই ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বলেন যে, it is certainly against the theory of the evidence sea-trade that there is no mention of any of the parts of the ship such as masts and sails except the oars (vide India.) মাস্তুল এবং পালের উল্লেখ না থাকায়, ধারণা স্বাভাবিক যে এই দুইটীর কোনটীই বৈদিকযুগে আর্য্যগণ জানিতেন না। এবং ইহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বৈদিক আর্য্যগণ বিস্তৃত সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। তাঁহারা সমুদ্রের ধারে ধারে যাইতেন, কিন্তু সমুদ্রপথে বহু দূর যাইতেন না। আবার অন্যদিকে দেখিতে পাই যে, ঋগ্বেদে (৫ম, ১৯, ৪) ভগ্ন রাজ্যের সহিত নিমজ্জমান জাহাজের তুলনা করা হইয়াছে। ঋকে (১ম, ৫৬, ২, ৪ম, ৫৫, ৬) উল্লেখ আছে যে অর্থের জন্য এবং লাভের জন্য অনেক লোক সমুদ্র-যাত্রা করিত। ঋকের আর এক স্থলে একটী নৌকার কথা আছে, সে নৌকার এক শত খানি দাঁড় ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, এত বৃহৎ নৌকা কেবল সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিবার জন্যই প্রস্তুত করা হইত।

এই ত গেল নৌকার কথা। এখন আমরা সমুদ্র কথার উল্লেখ আছে কিনা এবং কি অর্থে সমুদ্র কথা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখিব। সমুদ্রের উল্লেখ বহুস্থানে পাই। সমুদ্রের কথা তাঁহারা জানিতেন। তবে এই সমুদ্রের কথার উল্লেখ হইতে বলা যায় না যে তাহারা সমুদ্র পথে ভ্রমণ করিতেন। কিসোর বলেন যে বৈদিক ভারতবাসী সিন্ধুনদকে সমুদ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণ কিন্তু অন্য কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে সিন্ধুনদকে বৈদিক হিন্দু সমুদ্র বলিয়া অভিহিত করেন নাই। ঋকে (১ম ৪৭, ৬, ৭ম, ৬, ৭, ৯ম ৯৭, ৪৪) সমুদ্রের রত্নের কথা এবং অন্যান্য কথা প্রমাণ করে যে বৈদিকযুগে হিন্দুগণ সমুদ্রযাত্রা করিতেন। মুক্তা এবং সামুদ্রিক শামুকের উল্লেখ ঋক এবং অথর্ব্ব বেদে অনেকবার আছে। দ্বীপের

উল্লেখ থাকে এবং অথর্ব্ব বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দ্বীপ বোধ হয় সিন্ধু নদের বালুচড়।

এই কয়েকটী প্রমাণ ব্যতীত বৈদিক সাহিত্যে সমুদ্রযাত্রার আর বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। এই সব প্রমাণ হইতে এ কথা অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, বৈদিক-যুগে আর্য্যগণ বাণিজ্যের জন্য ও অন্যান্য কারণে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিতেন। খৃষ্টের জন্মাইবার ৭০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে হিন্দুগণ ব্যাবিলনে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন; এই কথা কেনেডি সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন। একদিন হঠাৎ এই সমুদ্র ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়া পরদিবসই যে ভারতবাসী সুদূর ব্যাবিলনে সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়াছিলেন, এ কথা নিশ্চয়ই সম্ভব।

শ্রীশৈলেন্দ্রভূষণ সেনগুপ্ত।

প্রেমের জয়।

তোমায় আমায় মিলন হবে—এই কথাটী হলে জানাজানি
এই মিলনের শত্রু যারা, তাদের মাঝে হ'ল কানাকানি!
ভয় ভীতি ও লজ্জা সরম দীপ্ত তেজে উঠ্‌ল সজাগ হ'য়ে
তোমায় তারা শাসন করে রক্ত আঁখির শক্ত কথা ক'য়ে!
বলে তারা—"ওরে অবুঝ' ওরে সবুঝ' ওরে সরম হারা,
কেমন করে' নিবি বরে' অজানার এই মূঢ়হৃদয়-কারা!
যা'রে কভু দেখিস্-নি তুই, জানিস্-নি তুই, চিনিস্-নি তুই ওরে,
কোন্ পরাণে তাহার পায় স'পে দিবি এমন করে' তোরে!
স্থির হ'যে থাক্,—নড়িস্ নাকো—চরণ যুগল রাখিস্ ক'রে খাড়া.
বাহির, হতে প্রেম নিবেদন যতই আসুক—দিস্‌নাকো তার সাড়া!"

* * * *

প্রেম ছিল যে মিত্র তোমার, শাসন-বাণী কিছুই শোনে না সে,
গোপন মৃদু চরণ ফেলে বুকের তলে ধীরে সে যে এসে!
বলে তোমায় চুপে চুপে—"আজিকে প্রথম মিলন রজনীতে
হৃদয় দুয়ার খুলতে হবে, ভুলতে হবে লজ্জা সরম ভীতে,

মুখরিত কুঞ্জ ধীরে যে এলো সে গোপন অভিসারে !
চির চেনা এই অন্ধকার—বলে' সে আজ, বরেণ্যে তারে !"

* * * * *

এক নিমিষেই ভুমুল বেগে উঠল মনে ঝড় বয়ে,
ওমনি ওঠে মুকুল ভলা—শিউরে ওঠে কাঁপন ভয়ে !
ভয় পাঁচি [illegible]—এমনি সবে উর্দ্ধ শ্বাসে ছুটল বেগে,
প্রেমকে নেহাৎ একলা পেয়ে বন্দী করে' রাখ্‌ব নীচে চেপে !
ক্ষিপ্র পায়ে চুটল তারা তোমার দলিত দেহের সকল খানে,
[illegible] দস্যু কি আর ভালবাসায় জানে কাহন মানে ?
[illegible], বন্ধ হ'ল আসা যাওয়ার পথ,—
আগে সওয়া এই দুয়ারে থমকে গেল মনোভবের রথ !
মুক্ত হ'ল নধর অধর—হাসির রেখা ফুটতে পা'তে নারে,
মনের কোণের গোপন কথা মুখ দিয়ে না ব্যক্ত হ'তে পারে !
[illegible] ভনু ক'রল বিবশ—স্বাধীন গতি রইল না আর তোমার,
চরণ যুগল চল্‌তে নারে, আলিঙ্গনে হাত দুটী না উঠে !
তোমায় তোমার হৃদয় মাঝে বন্দী হ'য়ে বিরাজ করে প্রেম,
আকুল চোখে চায় সে ব'লে, পাছে তাহার হয় বিলম্ব হেম !

* * * * *

আজ্‌কে একি নূতন দেখি ! কোথায় গেল সেই সে সরম ভীত ?
সোনার কাঠির জীবন পরশ কে ছোঁয়াল তোমার দেহে আজ ?
কোথায় প্রেমের বন্দী দশা ?—কোথায় গেল শিথিল বেলা শেষ !
অধর আঁখি মুক্ত আজি—সবায় মাঝেই দেখ্‌ছি শুধু প্রেম !

গোপাল ভৌমিক

আগমনী

আয় মা ভবানি। জটাজূটধারিণি, সুরবিলাসিনি ত্রিলোকপালিনি, স্থির-সৌদামিনি একবার দয়া করিয়া ভারতের ঘরে ঘরে আয়। ত্রিতাপে তাপিত, কামাদিকলুষিত, বিজ্ঞান বিবর্জ্জিত, জনগণকে উদ্ধারের জন্য বেদাদি-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তিত হইলেও যখন আমরা তাহার কিছুই ধারণা করিতে সমর্থ হইলাম না, বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী করিতে সমর্থ হইলাম না, তখন তুই মা দয়া করিয়া ইন্দ্রিয় গোচর হইলি। তুই মা নিত্যা, অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, সাগর, পর্ব্বতাদিরূপে তুই বর্ত্তমানা। কিন্তু যখন অসুরগণের দ্বারা দেবগণ বিমর্দ্দিত, নিপীড়িত ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, তখন তুই বিশেষ মূর্ত্তি ধারণ করিলি। তোর সেই আবির্ভাবকেই লোকে তোর উৎপত্তি বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিল। বাস্তবিকই যখন তুই নিরবয়বা বা জগন্মূর্ত্তি স্বরূপিণী থাকিস তখন তোর দ্বারা জীবের কোনও বিশেষ কার্য্য হয় না। যেমন অতি শীতল প্রস্তরের ভিতরে অগ্নি থাকিলেও হস্তসংলগ্নে অতিশয় শীতল বোধ হয়, সেই প্রচ্ছন্ন অগ্নিদ্বারা জীবের কোন কার্য্য হয় না। পাকাদি কার্য্যের জন্য প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণে অগ্নি নির্গত করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ দেবগণও নিজ্ঞা, দুর্ব্বাকারা তোকে স্তবাদিদ্বারা আবির্ভূতা করিয়াছিলেন। তাই তুই মনোনয়ন-রঞ্জনমূর্ত্তিতে প্রকাশিতা হইলি। তুই নবযৌবনসম্পন্না, অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা, অলক্ত-সিক্তিচরণা, ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানা, অতসীপুষ্পবর্ণাভা নানাভরণভূষিতা অতি বিচিত্রবসনা হইয়া নয়নেন্দ্রিয় আকৃষ্ট করিলি; নাদাপুরিতদিঙ্মুখা অভয়-ধ্বনি বদনাব্জরূপে শ্রবণেন্দ্রিয়ে সুধা দান করিলি। তুই মা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে সর্ব্বাহস্তে কর্ম্মিয়া, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ অন্ন ভক্তগণকে প্রদান করিয়া রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিলি এবং বুভুক্ষিতগণের ক্ষুধা দূর করিলি। চন্দনচর্চ্চিত সুরভিপুষ্পবিভূষিত কস্তুরী-কুঙ্কুম-বিলেপিত অঙ্গে নানাগন্ধকে সুগন্ধি প্রদানে তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিলি। মৃণালাদপি কোমল বরাভয়প্রদ সুকোমল করকমল সংস্পর্শে মানবের স্পর্শেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিলি।

অহো, মা তোর কতই দয়া! তুই মানবের কোন [illegible]

জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা। যিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে [illegible] অর্পণ করিয়াছেন, [illegible] নশ্বর জগতের অসার [illegible] মুগ্ধ ও কলুষিত না হয়, সেই জন্য আমাদের উচিত ভোর ঐ মৃন্ময়ীমূর্ত্তিকে চিন্ময়ী-রূপে দর্শন করিয়া [illegible] কর্ণযুগল অর্পণ করিয়াছেন, আমাদের উচিত আমাদিগকে অধঃপতনকারী গণিকাদের সুগন্ধিত গানে বিমুগ্ধ না হইয়া; মায়ের মায়ের [illegible] কর্ণ-কুহর পবিত্র করিয়া তাঁহার কোমল কোলে আশ্রয় লইতে [illegible] যিনি দয়া করিয়া সর্ব্ব আস্বাদকারী লোল রসনা অর্পণ করিয়াছেন, [illegible] তাঁহার প্রদত্ত [illegible] বঞ্চিত হইয়া অভোজ্য ভোজনে [illegible] কি রসনাকে [illegible] করিব? যাঁহার দত্ত রসনা তাঁহারই নাম করা কি আমাদের উচিত নহে? মা কি আমাদের ক্ষণস্থায়ী [illegible] বার জন্য আসিয়া [illegible] ভোগ হইবে [illegible] ত্যাগ হয়— [illegible] অঙ্গে সুগন্ধ কস্তুরী চন্দনাদি [illegible] জগদম্বা, কি মনুষ্যত্ব বিনাশী কামোদ্দীপক অঙ্গে [illegible] চরিতার্থ হইবার জন্য আমাদের ত্বগিন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন? [illegible] আমাদিগের পরমানন্দ প্রদানের জন্য মৃণালাবতসংস্পর্শী, সুকোমল [illegible] করিয়াছেন। আর ভাই সব ছুটে আয়,— [illegible] আমাদের [illegible] মোচন [illegible] —পাপ-তাপ দূর করিবার জন্য, ভক্তি সুরধুনীতে শিবসোহাগিনী, কৈলাসবাসিনী কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া সন্তানের দুঃখে দুঃখিতা হইয়া [illegible] ঘরে আগমন করিয়া থাকেন।

ঐ দেখ ভাই, মা আমার দশপ্রহরণধারিণী হইয়া আসিতেছেন। [illegible] মহিষাসুর [illegible] [illegible] সমুদ্র উদ্বেলন [illegible] [illegible] সৃষ্টি [illegible] দেহ কম্পনে [illegible] বিকম্পিত করিলে, তুই মা [illegible] মহিষাসুরকে খড়্গাঘাতে নিধন করিয়াছিলি। ঐ মহিষাসুরের [illegible] ত্রৈলোক্য [illegible] ভীত হইয়া যখন [illegible] [illegible] [illegible]

জন্যই আবির্ভূতা হইয়াছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ দেবীর হস্তে বজ্র, পাশ, শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর প্রভৃতি স্ব স্ব অস্ত্র প্রদান করিলেন এবং কেয়ূর কুণ্ডলাদি মণি মুক্তা আভরণে সুসজ্জিতা করিলেন।

তুই মা দশদিক্ রক্ষা করিবার জন্য দশহস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিস্; দেবতাও ঋষিগণের পীড়নকারী দৈত্যগণের নিধনের জন্য দক্ষিণ হস্তপঞ্চকে ত্রিশূল, পদ্ম, চক্র, বাণ ও শক্তি এবং বাম হস্ত পঞ্চকে খেটক (ফলক অর্থাৎ ঢাল) ধনু, পাশ অঙ্কুশ ও কুঠার ধারণ করিয়াছিস্। সুতীক্ষ্ণ তিনটী শূলদ্বারা দৈত্যমুণ্ড ত্রিখণ্ডিত করিবার জন্যই তোর এক হস্তে ত্রিশূল, পশুচ্ছেদনের ন্যায় অসুরকণ্ঠ বিচ্ছিন্ন করার জন্যই অপর হস্তে খড়্গ, সুদূরে পলায়িত দৈত্যগণ যাহাতে অব্যাহতি না পায় সেইজন্য হস্তান্তরে বাণ, আর এক হস্তে শত্রু নিধনে সম্পূর্ণ সমর্থশক্তি। আবার অসুরাস্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল। বাণ নিক্ষেপ জন্য ধনু, বাঁধিয়া আনিবার জন্য রজ্জু। পাপের দণ্ড প্রদানের জন্য অঙ্কুশ, মস্তকাদি ছিন্ন করিবার জন্য কুঠার ধারণ করিয়াছিস্; কিন্তু এই সকল বাহিরের শত্রু দমন করিলেই কেবল চলিবে না মা, আমার অন্তরে যে মহাদৈত্য বর্ত্তমান তাহাকেও নিধন করিতে হইবে। বাহিরের দৈত্য ত কেবল আমার নশ্বরদেহ নষ্ট করে, অন্নবস্ত্রাপহরণ করে এবং আমাকে রাজ্যভ্রষ্ট করে মাত্র; কিন্তু অন্তরের কামাদি মহাদৈত্য যে অবিনশ্বর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মাকে জর্জ্জরিত করে।

ঐ দেখ মা, আমার বাসনা রক্তবীজকে [illegible] ছিন্ন করিলেও তাহার কর্ত্তিত রক্ত বিন্দুমাত্র ভূমি সংলগ্ন হওয়া মাত্র তৎ পরিমাণ মহাবল পরাক্রান্ত বহু বাসনা দৈত্যের সৃষ্টি করে। [illegible] নিধন করিতে পারিতেছি না। একবার তুই কালীরূপ ধারণ করিয়া জিহ্বা দ্বারা [illegible] বৃদ্ধিতে বিকাশিত হয়। ঘোর বিক্রমে [illegible] করিয়া ঐ অসুরের সমস্ত রক্ত পান কর্, উহার বিন্দুমাত্র যেন ভূমিতে পড়িতে (অর্থাৎ বাসনা কণিকা স্থিতে সংলগ্ন হইতে) না পারে; আমার ত ক্ষুদ্র জীবের মত বহুধা বিভক্তা জীবনতন্ত্রা [illegible] না কেন, তুই যে মা অনন্ত, তোর ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্তিই [illegible] কণিকামাত্র। তোর কালরূপী বিশ্বগ্রাসী বদনে [illegible] তাহার নির্ম্মূল অস্তিত্ব [illegible] তোর ব্রহ্মাণ্ড দাতাতেও তাহা [illegible] আছি মাত্র।

১। [illegible] আমাকে

ভীষণ বেগে আক্রমণ করিতেছে। তোর দক্ষিণ হস্তস্থিত ত্রিশূলের অগ্রভাগে বাক্, কায় ও মনঃ রূপ তিনটী নিশিত শূল বর্ত্তমান। উহা দ্বারা তিন ত্রিপুরাসুরকে ত্রিখণ্ডিত করিয়া ত্রিপুরারিগৃহিণী ত্রিশূলধারিণী নাম সার্থক কর মা!

২। তমোরূপ আর একটী মহারিপু অসুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার বিবেক বৈরাগ্য নষ্ট করিতেছে—আমাকে মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত করিতেছে—ঘোর নরকের পথিক করিতেছে। একবার তুই দ্বিতীয় হস্তস্থিত ব্রহ্মবিদ্যারূপ খড়্গের চমকে অন্ধকার বিদূরিত করিয়া তমোদৈত্যকে বিনষ্ট কর মা!

৩। আবার ঐ দেখ, কাম ক্রোধাদি ছয়টী মহা দৈত্য আমাকে চক্র ভাবে বেষ্টন করিয়া নাশিতে নিতে চেষ্টিত। তোর তৃতীয় হস্ত ধৃত সংযমাদি ষড়্রূপে শানিত চক্রাঘাতে ঐ সকল দৈত্যগণকে নিধন করিয়া তোর চক্রিণী নাম সার্থক কর মা।

৪। রূপ রসাদি পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চবিষয় রূপে পরিণত হইয়া [illegible] কি ভীষণ দৈত্য রূপ ধারণ করিয়াছে! আমার মনোভৃঙ্গকে তোর চতুর্থ স্থিত মধু পান করিতে না দিয়া দূরে সরাইয়া লইয়া পলাইয়া যাইতেছে—তোর বাম হস্ত স্থিত জ্ঞান ধনুকে টান দিয়া তাহাতে ভক্তি ব্রহ্মবাণ যোজনা করিয়া ঐ ভীষণ [illegible] সংহার কর মা—আমার মনোভৃঙ্গকে পুনঃ নিজ তোর পাদপদ্ম মধু পানে [illegible] কৃতার্থ হইতে দেও মা।

৫। প্রভু শক্তি, উৎসাহ শক্তি ও মন্ত্র শক্তিরূপ ত্রিশক্তিকে একত্র করিয়া তুই শক্তি [illegible] অস্ত্র ধারণ করিয়াছিস। ঐ প্রভুশক্তির দ্বারা তুই আমার [illegible] আধিপত্য প্রদান কর। উৎসাহ শক্তি দ্বারা আমার অলস, অবসন্ন, হতাশ, জড়ত্বে [illegible] বিদূরিত কর মা এবং মন্ত্রশক্তি দ্বারা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত কর মা। এ ত্রিশক্তি [illegible] জড়তা, আলস্য ও অধর্ম্মরূপ মহাসুর ত্রয়কে বিনাশ করিয়া আমাকে শক্তি তনয় [illegible] এবং তোর শক্তিধারিণী নাম সার্থক কর।

৬। [illegible] ধারিণী। পিট অর্থাৎ [illegible] মহাস্ত্র ধারণ করিয়া তুই [illegible] বেটন করিয়াছিস। আমাকে যখন [illegible] করাইয়া করিবে—নিতান্ত ভীরু কাপুরুষ করিবে, তখন যাহাতে তোর ষষ্ঠ স্থিত সাহস রূপ বেটন (ঢাল) দ্বারা রক্ষা করিস। ঐ [illegible]

তাহলে আজ আমি নরাধম, কাপুরুষ ও পরাধীন। তোর সন্তানকে অভয় দানে তাহার পরাধীনতা দূর কর মা!

৭। আমার জ্ঞান প্রদান জন্য ঐ জ্ঞানধনুক রূপ পূর্ণচাপ তোর সপ্তম হস্তে ধারণ করিয়াছিস। উহার সাহায্যে অজ্ঞান অসুর কে নিধন করিয়া একবার নিত্যানন্দের অধিকারী কর মা!

৮। আমার মন মত্ত করী নিরন্তর বিষয়ারণ্যে ভ্রমণ করিতেছে, একবার মা কৃপা করিয়া এই মদমত্ত মনোহস্তীকে তোর হস্তস্থিত তমোপাশদ্বারা, তোর কূটস্থ চরণস্তম্ভে বন্ধন কর মা—আর যেন বিষয়াসুর আমাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে না পারে। এবং ঐ হস্তীরূপী বিষয়াসুরকেও দূরে বন্ধন কর।

৯। আর যখনই মনোহস্তী বিষয়ারণ্যে যাইতে উদ্যত হইবে তখনই তোর দক্ষ হস্ত স্থিত বিবেকাঙ্কুশ দ্বারা উহাকে শাসন করিস, আমি যে তোর সন্তান মা। তাই বলি তোর অধম সন্তানকে বিষয় রাক্ষসের হস্ত হইতে বিবেকাঙ্কুশ দ্বারা রক্ষা কর মা!

১০। ব্রহ্মবিদ্যারূপ কুঠারাঘাতে মায়া বাসনাকে নিধন কর মা—যেন আমি তোর সুকোমল ক্রোড়ে চিরকাল বাস করিতে সক্ষম হই। মাগো যদি তোর ভক্ত সন্তানকেই উদ্ধার না করিবি, তবে তোর অধম তারিণী, পতিত-পাবনী নামের সার্থকতা কে করিবে? আমি কত চেষ্টা করি তোর চরণ চিন্তা করিতে কিন্তু কামাদি অসুরগণের তাড়নায় কিছুতেই পারিনা। তাই বলি, একবার দয়াময়ী হুই, দয়া করিয়া এই সকল অসুরগণকে নিধন করিয়া দে মা—যেন তোর রূপ ধ্যান, তোর রূপ জ্ঞান, তোর নাম গান করিয়া দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারি।

ঐ দেখ মা তোর সন্তানগণের দুর্দ্দশা। কেহ বা পাশ্চাত্যভোগমূলক সভ্যতায় আকৃষ্ট হইয়া ইহকাল সর্ব্বস্ব হইতেছে। কেহবা শাস্ত্রালোচনা করিয়াও তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভুলে বলে কৌলাচারের স্বয়ম্ভোগকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেছে।

কেহ বলিতেছে স্পর্শদোষ উঠাইয়া দেও। উহা অনৈক্য—পরাধীনতা এই সকল দোষের মূল; আবার অপরে বলে, উহা উঠাইলে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কাজে বলিয়াই সনাতন ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে সজীব রহিয়াছে।

কেহ বলে, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" বেদবাক্য, অপরে বলে, [illegible]

ব্রহ্ম” ও বেদেরই বাক্য। অতএব তোমার সেই এক ব্রহ্ম যদি সর্ব্বব্যাপী তো তবে দেব মন্দিরে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার কর কেন? তোমার মন বলে, প্রতিমা যদি ব্রহ্ম, তবে দেবীমূর্ত্তির পূজা করিতে দেখিলে মনে কেন? বিজাতীয় কুৎসিত পুষ্পবিল্বদলে পূজা করিতে অপরাধ হইলে, তুমি যেই মনের ছায়া-খানি কর, সেই মনটী কাহার সৃষ্ট? এই সকল মতভেদে আমরা অনৈক্যের সৃষ্টি করিতেছি। সহযোগী, অসহযোগী ভিন্ন দল হইতেছি। তোর সন্তান হইয়া আমরা সকলে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি। তাই বলি মা, তুই আমাদিগকে ছাগ প্রদান কর আমরা সকলে অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া একমনে, এক ধ্যানে, এক জ্ঞানে, একভাব তোকে জননীরূপে, আবার তোকে জন্মভূমিরূপে পূজা করিয়া মনুষ্যত্ব সার্থক করি।

এলি মা, বৎসরান্তে [illegible] দেখ তোর সন্তানের দুর্দ্দশা, তোর সহস্র সহস্র সন্তান রাজরোষে কারাগারে, কত লক্ষ লোক ভীষণ বন্যায় প্রাণ হারাইয়া শত শত বৎসর [illegible] কষ্টে তোর বার্ষিক পূজা করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] মাত্র, গত বৎসর পূজার সময় অনেকে আশা করিয়াছিল, পৌষ মাসে স্বরাজ পাইব। তুই, রাজরাজেশ্বরের মাতা হইবি। চৌষট্টি উপচারে তোর পূজা হইবে, কিন্তু আমাদের অকর্ম্মণ্যতায় সেই আশা বিফল হইল—নিগ্রহ ও লাঞ্ছনাই সার হইল। আমি কি দিয়ে তোর পূজা করিব মা? আমাদের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই [illegible] কেবল রোদন ও হাহাকার। আয় মা তোর সন্তানের উষ্ণাশ্রুবারিতে ধৌত করি। ছাগ বলিদানের বিনিময়ে আমরা নিজেরা বলিপ্রাপ্ত হই। প্রকৃত ছাগ ত আমরা যাহাদের [illegible] ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা—যাহাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা [illegible] [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন—যে দেশে লিঙ্কনের মত মহাপুরুষ জন্ম সেই ভারতবাসী বলে [illegible] পরবাসী হইয়াছি—অনাহারে [illegible] করিতেছি, [illegible] আমাদের মত ছাগল [illegible] কোটী ভারতবাসীকে [illegible] বোধ হয় তিন [illegible] [illegible] আমরা শ্রেষ্ঠ ছাগ। মা, ছাগদের [illegible] [illegible] [illegible]

মা! তোর আশীর্ব্বাদে আমাদের বংশধরগণ মানুষ হউক—শক্তির সেবক হইয়া প্রকৃত শক্তি লাভ করুক। তবেই তোর সন্তাননামে পরিচিত হইতে পারিবে, আমাদের মত ছাগলকে নির্ম্মূল না করিলে এদেশে প্রকৃত শক্তিধর মানব দেখা দিবে না। যখন ঐ সকল শক্তিধর সন্তান জন্মলাভ করিবে, তখন তাহারা ইচ্ছামত ধনধান্য পুষ্পদ্বারা তোর পূজা করিতে সক্ষম হইবে।

মা তোর পুত্র বড়ানন, বড়রিপুকে চর্ব্বণ করিয়া চিরকুমার হইতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়াই সকল দেবগণ তাহাকে সেনাপতি করিয়াছেন। আমরা শক্তিহীন, বড়রিপুবশ, বড়াননের সেবা আমরা করিতে পারিব? মা তোর সঙ্গে লক্ষ্মী রহিয়াছেন আমরা লক্ষ্মীর উপাসনা করিতে পারিতেছি না বলিয়া লক্ষ্মীও আমাদের নিকট হইতে সাগর পারে অবস্থিতা। তোর দয়া হইলেই আবার লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিবেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" তাই পরাবিদ্যারূপিণী সরস্বতী এখন অন্তর্হিতা! আমরা বলসেবক হইলে সরস্বতীরও কৃপা অনিবার্য্য হইবে। তাই বোধ হয় এখন বল সেবক (বলশৈত্যিক) গণের সর্ব্বত্র জয় জয়কার। মা তোর সকল সন্তান সিদ্ধিদাতা গণেশ, সিদ্ধিহস্তে অবস্থিত। যখন সকল শক্তি সেবক হইব, তখনই সিদ্ধি লাভে সক্ষম হইব—গণেশের কৃপা লাভ করিব।

এস মুখে জয়ধ্বনী, প্রাণের সহিত মিলিয়া আজ শারদীয়া পূজার দিনে নীল বিস্তৃত পূর্ণ গঙ্গাজলে দয়াময়ী মায়ের চরণ যুগলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি এবং মনোবাঞ্ছা শক্তি লাভের প্রার্থনা করি। তিনি শরণাগত, দীন, আর্ত্তজনের পরিত্রাণ পরায়ণা, তাই এস সকল নরনারী তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি এবং সমস্বরে পাঠ করি,—

"শরণাগত দীনার্ত্ত, পরিত্রাণ পরায়ণে,
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে।"

শ্রীকালীপদ সামাধ্যায়ী।

গৃহশিল্প ও কারখানা।

ভারতে আজ গৃহশিল্প কারখানার বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিতেছে। [illegible] আগে শিল্পই নাই তাহাদের গৃহশিল্পই বা কি আর কারখানাই বা কি? পুকুরের মাঝখানটায় একটী ঢিল ছুড়িলে যেমন সমস্ত পুকুরের জলই নড়িয়া উঠে তেমনি সুদূর পাশ্চাত্য দেশের আন্দোলন এখানে পৌঁছিয়া এদেশকে একটা উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। [illegible] করিয়া গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠা [illegible] আজ কেউ ভাবিতেই পারিত না, যদি না ইংলণ্ডের কলকারখানা-গুলি বিষম রূপ ধারণ করিত। [illegible] অধীনের পায় পায় [illegible] আবার ভাল মধ্যে [illegible] সে স্বাধীনভাবে একবার নিজের অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া [illegible] না। আজ ভারতে যাহা কিছু নূতন দেখা যাইতেছে [illegible] যাহা কিছু নূতন শুনা যাইতেছে, সকলেই তাহাদের [illegible] লোকসান হিসাব নিকাশ করিয়া দেখি নাই, যাহার ফলাফল [illegible] বিনা যুক্তি তর্কে [illegible] মিটনস হেলেটির মত না বুঝিয়া [illegible] যাথা নাড়িয়া লাভ কি? দেশকালপাত্রভেদে সকল জিনিষের [illegible] বদলাইয়া যায়। মনে কর ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে চার্লস নামে কোন এক ব্যক্তি নিউইয়র্কে এক পুকুর [illegible] পরিষ্কার করিয়া মৎস্যের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহা [illegible] যাওয়ার জল পচিয়া মৎস্য মরিবার উপক্রম হইয়াছে। রাম নামে এক ব্যক্তি ভাবতে বসিয়া সংবাদপত্রে এই খবর পড়িয়া মনে মনে ভাবিল পুকুরের জল যদি পচিয়াই যায়, তবে আর পুকুর কাটিয়া লাভ কি? এই মতলবে যদি সে পুকুর [illegible] [illegible] করে সে দেশের মঙ্গলকামী ব্যক্তিত্ব [illegible] তোমরা কি তাহাকে পাগল বলিয়া প্রশংসা করিতে পারিবে? দুইশত বৎসর পরে যদি জল পচিয়াই থাকে তবে তাতেই বা দোষ কোথায়? এই দীর্ঘ দুই শত বৎসর চারাসের পুত্র পৌত্র ঐ পুকুরের সুমিষ্ট জল পান করিয়া এবং মৎস্য ভক্ষণ করিয়া কত পুষ্ট হইয়াছে। আজ যদি জল পচিয়াই থাকে তবে আর [illegible] তাহারা [illegible] করিবে।

সে জন্য ভারতে বসিয়া রামের পুকুর কাটা বন্ধ হয় কেন। কিছু দিন পূর্ব্বে একটী মাসিক সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম—সমস্ত পৃথিবী কলকারখানায় ভরিয়া গেল, ভারত কি এখন তার মামুলী আমলের চরকা নিয়া বসিবে? যদি তার বস্ত্রসমস্যা চিরদিনের জন্য মীমাংসা করিয়া দিতে পারে তবে সে চরকা নিয়া বসিবেনা কেন? কিন্তু যেখানে দেশ বিদেশ হইতে স্বল্পব্যয়ে কলে প্রস্তুত অল্পদামী সুন্দর সুতায় ও কাপড়ে ভরিয়া যাইতেছে সেখানে এই চরকার কাটা বহু শ্রমলব্ধ মোটা সুতার কাপড় চিরদিনের জন্য স্থান পাইবে কি? গোঁড়া হইলে চলিবে না। বস্তুতঃ আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যে ভারতকে শুধু বাঁচিয়া থাকিলেই চলিবে না, পরন্তু পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমসূত্রে মাথা তুলিতে হইবে। প্রতিযোগিতায় হাতের লাঠী বহাল রাখিতেই হইবে। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে এক জনকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আর এক জনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে হইবে। কতগুলি লোক আছে যাহারা অতীতের দোহাই দিয়া মাথা খুঁড়িয়া অস্থির। সাধারণতঃ তাহারা বলিয়া থাকে ভারত একদিন এই চরকার কাটা সুতার বস্ত্রে নিজের অভাবও পূর্ণ করিতই, পরন্তু দেশ বিদেশেও সেই বস্ত্রাদি রপ্তানী হইত।" এই কথা বলিয়া লাভ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশ-কাল-পাত্রভেদে সবকিছুই পরিবর্ত্তন হয়। সে যুগও নাই, সে সমাজও নাই। ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশ তখন কার্পাস সূতার বস্ত্রাদি তৈরী করিতেই জানিত না। সে দেশেও তখন কলকারখানা প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কাজেই ভারতের পৃথিবীবিখ্যাত দ্রব্যাদি বহুমূল্যে সহজেই বিক্রিত হইত।

আজ হয়ত স্বদেশানুরাগ তীব্রভাবে কাপড়ের প্রত্যেক তন্তুতে তন্তুতে নাড়া দিতেছে বলিয়া স্বদেশী অতি মোটা কাপড় অধিক মূল্য দিয়াও ব্যবহার করিতেছি। আর তাহাই বা সকলে ব্যবহার করি কোথায়? এই ভাব চিরদিন থাকিবে কি? দেশের অধিকাংশ লোক আধপেটা খাইয়া অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কোন মতে দিন যাপন করে। কাজেই যত মূল্যে তাহারা যাহা পাইবে তাহাই ক্রয় করিবে। যাহারা দেশেই থাকে কিংবা বিদেশে যায় তাহারা একবার একবার ভাবিয়া ও সময় পায় না। দ্বিতীয়তঃ পরিবারের সকলে মিলিয়া চরকা কাটিলে হয়ত বস্ত্রসমস্যা অতি কষ্টে মীমাংসা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অন্ন সমস্যা কখনই দূর হইবে না।

দুরপ্রিয়কে কেবলমাত্র বস্ত্রের দিক্ দিয়া দেখিলেই চলিবে না। অন্যান্য

দ্রব্যাই বা কি ভাবে কোথা হইতে আসে? প্রতি বৎসর যে কোটী কোটী টাকার দ্রব্যাদি আমাদের দেশে আসে তাহার সবগুলই কলকারখানা জাত। গৃহশিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রায়ই এ দেশে আসে না। অল্প সময়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে যে জিনিষ তৈরী হয়, তাহাই বাজারে স্থান পাইবে। চিনি তৈরীকরা অতি সহজ। কিন্তু ইহা ঘরে ঘরে প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করিলে কয়লার খরচ উঠিবে কি না সন্দেহ। দেশের সকলে মিলিয়া যদি ঘরে ঘরে কেবলমাত্র একটা জিনিষই তৈরী করে তবে অবশ্য চলিতে পারে। কিন্তু তাহাও গৃহশিল্প বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নহে, বরং গৃহশিল্পও কলের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। চীনের বাসন এবং জাপানের দিয়েশলাই অনেকটা এই ভাবে তৈরী হয়। জাপানের ঘরে ঘরে মেয়েরা কেহ বা বাক্স তৈরী করে, কেহ বা কাটি তৈরী করে। হাও মেসিনে একজন ঐ কাটি সংগ্রহ করিয়া মসলা লাগায়। পরে একটী কোম্পানী উহা ক্রয় করিয়া কেরোসিন আটিয়া বাজারে [illegible] কাচের কারখানা এত বেশী যে, উৎপন্ন এত [illegible] হয় না। অনেক দেশে মোটা মোটি ঘরে ঘরে মেয়েরাই তৈরী করে। দেশের অভাব পূর্ণ করে। আমাদের দেশেও আছে কিন্তু [illegible] গৃহশিল্প না বলিয়া কারখানা বলিতে বাধ্য। এখানে যে সুতা তৈরী হয় তাহা ঘরোয়া ভাবে গৃহশিল্প। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ঘরে বসিয়া চীনা ভায়ারাই বিক্রয়কার্য্য [illegible] করিতেছে। এইভাবে কতকগুলি জিনিষ অবশ্য গৃহশিল্প ও কলকারখানায় [illegible] উৎপন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে দেশ আবলম্বী হইতে পারে না।

কলকারখানা যে দেশকে একান্তভাবে ধনী করিয়া তুলিবে আর গৃহশিল্প যে সকল দোষের আকর তা বলিতে চাই না। দোষ গুণ, লাভ লোকসান হিসাব নিকাস করিয়া যাহা ভাল তাহাই আমাদের বরণ করিয়া লইতে হইবে। কারখানার "কাল পিঠাটা" দেখিয়ে আমরা দেখিতে চাই যে, উহাতে কতগুলি লোকের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করিয়া দেয়। মেয়েলোক এবং পুরুষ একত্রে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না, অতি পরিশ্রমে [illegible] দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে [illegible] ধনকুবের সৃষ্টি করে। দশজনার টাকায় একজন বড় হয়। দেশে কোটী কোটী মুদ্রা থাকিলেও দেশের লোকের না খাইয়া মরিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদিতে [illegible] দেশের লোকের পরে বসিতে হয়। (আমরা উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকা এবং ইউরোপের কথা।

উল্লেখ করিতে পারি) একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে এই রোগের মূল কোথায়। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে "Unequal distribution of money between the Capitalist and the labour" হইতে এই রোগের বীজ। এই বীজ ধ্বংশ করিতে পারিলেই রোগ অনেকটা মিটান যায়। Labour তার পরিশ্রমের মাশুল পায় Capitalist লাভের টাকা গণিয়া নেয়। এই টাকাটাই হচ্ছে Lion's share। Labour কে যদি লাভের অংশ দেওয়া যায় তাহা হইলেই বোধ হয় সকল গোল মিটিয়া যায়।

আর একটা কথা। উত্থানের পথে কোন দেশই কারখানা দিয়া আরম্ভ করে নাই। কারখানার Foundation বা ভিত্তিতে গৃহশিল্প থাকিবেই। ইংলণ্ডেও একদিন গৃহশিল্পের খুবই প্রাধান্য ছিল। আজ জাপানের সেই অবস্থা। ইংলণ্ডের সেই গৃহশিল্প ধ্বংস করিয়া কারখানার প্রতিষ্ঠা করিতে সময় যে কতখানি নেহাৎ কম হয় নাই। দেশের তাঁতিরা যখন দেখিল যে তাহাদের কাজ নাই তখন তাহারা দলে দলে আসিয়া কারখানায় আগুণ ধরাইয়া দিত, যখন তখন কলওয়ালাদিগকে গোপনে হত্যা করিত। একটী সামান্যের ভিতর হাজার হাজার লোক যে কতখানি শক্তি সঞ্চয় করিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহা ইংলণ্ডের কারখানাওয়ালাদের ও সেই অবস্থা হইল। রণে ভঙ্গ দিতে পারে তাহাদের উপায় রহিল না। গৃহশিল্প এদেশ হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল। ভারতের গৃহশিল্প অবশ্য অন্যভাবে ধ্বংশ পাইয়াছে। ইংরেজ যখন দেখিল যে ভারতের গৃহশিল্প নষ্ট না করিতে পারিলে [illegible] সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারত বক্ষে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না, তখন তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া উপায়ে ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে এই উপায়ে হইয়া তাহারা তাঁতির হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত কাটিয়া [illegible] পাওয়া যায়।

ভারতে [illegible] শিল্প কিম্বা কারখানা ইহার কোনটিই নাই। এই নবজাগরণের পথে জাপানের অনুকরণে আমাদের গৃহশিল্পেরই আশ্রয় লইতে হইবে। তাহার জন্য যেমনি শিক্ষা এবং পারদর্শিতার আবশ্যক অনুরূপে [illegible] মূল ধনের প্রয়োজন। আমাদের ইহার উভয়েরই অভাব। গৃহশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল গুণ অর্জ্জন করিতে হইবে। কারখানা চাই না এ কথা যেন কোন সময়েই আমরা মনে না করি। একপক্ষে গৃহশিল্প অবশ্য সর্ব্বাংশে সুন্দর, যদি সকল দেশেই ইহার সমানভাবে

আমার এবং যন্ত্র থাকিলে। অন্যান্য দেশে কারখানা বাড়ায় এবং লোকের মূলধনে কিছুতেই চলিতে পারে না। আমাদের দুটি কারখানা প্রতিষ্ঠা থাকিলে, তাহা যে কতদিনে না সন্তবপর হয় সে কথা গৃহনিয়ন্ত্রই জানে। আমাদের [illegible] একমাত্র সম্বল—পত্র মুখাপেক্ষী হইব না। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ইরাক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(২)

নেনিভা, প্রাগৈতিহাসিক যুগের একমাত্র বিখ্যাত [illegible] ঐতিহাসিকের মতে যাহা নালন্দা ও তক্ষশীলা হইতেও প্রাচীনতর, [illegible] একরূপ 'ইরাকেরই' গৌরব। রাজনৈতিক ভূখণ্ডে নেনিভাকে [illegible] অন্তর্গত দেখা যাইবে; কিন্তু অবুচনেজ্জরের আমলে নেনিভা এবং [illegible] একই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ব্যাবিলনের [illegible] নাই বর্ত্তমান নাই। কেবল শাত-এল্-হিলা [illegible] করার তন্নিকটস্থ ভূভাগে তেমন বড় কষ্ট নাই। প্রত্যাহ [illegible] অপর কারণ বলিয়া কথিত হয়। এক বৎসর সেখানে [illegible] ছিল যে প্রায় ১৫।২০ মাইল পর্য্যন্ত জল সুপ্রাপ্য যেন একরূপ [illegible] উঠিয়াছিল। ফলে আমাদের গৌর পাণ্ডুয়ার যে দশা [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে। মহামারী উপস্থিত হইয়া মানুষ ও গরু [illegible] জীবন বিসর্জ্জন দিতে থাকে। [illegible] ব্যাবিলন একরূপ শ্মশানে পরিণত হয়। [illegible] যে হিলা নামক যে ক্ষুদ্র সহর বর্ত্তমান, তাহা প্রাচীনব্যাবিলনের [illegible] মাত্র; ক্রমশঃ লোকজন [illegible] প্রস্থান করায় উহা এক ক্ষুদ্র নগরে [illegible] সংখ্যা প্রায় ৩৫০০০।

ব্যাবিলনের [illegible] দশার [illegible]

...সহরটি নামে ধোপাদের সহর যমুনা নদীর পূর্ব ও পশ্চিম দুই পারেই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-সহর ছিল সহরের বাম পারে। কালক্রমে যে অংশ বিশ্ববিদ্যালয়-সহর হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, সেই অংশ মুছাল নামে এখনও বর্ত্তমান আছে। ইউরোপের পথে মুছাল লোক সংখ্যার হিসাবে দ্বিতীয় ও বাণিজ্য প্রভৃতি হিসাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। মুছালের লোক সংখ্যা সাত হইতে আশি হাজারের মধ্যে।

নেনিভার অন্য অংশ অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানে কতকগুলি বহু দূর বিস্তৃত উচ্চ স্তূপ ব্যতীত অপর দ্রষ্টব্য একরূপ কিছুই নাই। তাহা হইলেও তাহার উপর উঠিয়া মুছালের সান্ধ্য দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখা যায়। সেদেশের আকাশ সাধারণতঃই প্রায় পরিষ্কার; সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সেখান হইতে ভাল করিয়া দেখা যায়। নেনিভার স্তূপের উপর উঠিলে দজলার উপর দিয়া দুটি মুছালের অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। মুছাল সহরের ঠিক পিছনে একটু দূরে—পর্ব্বত প্রাচীর। প্রাচীরের পরে পরিখার ন্যায় বিস্তৃত নিম্নভূমি। এই পরিখার পরে সহর আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ নীচু হইতে হইতে নদীর উপর পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং নেনিভা হইতে নদীর [illegible] একটা বাড়ী নামিয়া ভ্রম হয়। যেন বহু [illegible] কোন আরবোপন্যাসের দৈত্যের হস্তে নির্ম্মিত হইয়া [illegible] উঠিয়াছে!

[illegible] ইহাই। তাহা ছাড়া একটু শীতাধিক্য হইলে দেশের তুলনায় [illegible] বলিলেই চলে। বসরা প্রভৃতি [illegible] গ্রীষ্মের সময় ছায়াতেও ১৩০ ডিগ্রী ছাড়াইয়া উঠে ও [illegible] মুছালে ১২০ [illegible] পড়ে না। যাঁহারা এখানে বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] তাঁহাদের [illegible] নাতিশীতোষ্ণ স্থান নির্ব্বাচন বা [illegible] প্রশংসার [illegible] বর্ত্তমান রাজা ফৈজল (King Faisal [illegible] [illegible] করিয়াছেন এবং তাঁহার [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] এখানে [illegible] [illegible] তাহা [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছে।

[illegible] কতকগুলি মসজিদ বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। নবি শীত নবি জর্জিস ও [illegible] কবীর বা বড় মসজিদ মুছাল সহরের মধ্যে এবং নবি ইউনিহা নেনিভার [illegible] নামে, নেনিভা হইতে একটু দক্ষিণে অবস্থিত তাহা ছাড়া ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও বহু ধর্ম্ম মন্দিরাদি মুছালে বিদ্যমান। শুধু যে মুসলমান ধর্ম্মমন্দির তাহা নহে এখানে খ্রীষ্টানদিগের অনেকগুলি গির্জ্জা আছে, ইহুদিদিগের 'সিনগগ্' ও আছে। তদ্ভিন্ন অনেকানেক ভগ্ন বশিষ্ট প্রাচীন ইমারতাদি ও বিশেষ সম্মানের সহিত দৃষ্ট হয়। যদিও এতগুলি বড় বড় মসজিদ্ এখানে বিদ্যমান তথাপি তাহাদের মধ্যে আমাদের এ দেশের মত সর্ব্বদাই [illegible] দেখা যায় না। [illegible] কবীরে, যখন নামাজের সময় হয় তখন, ঘণ্টা বাজাইয়া ও দিনে নিশান তুলাইয়া ও রাত্রে আলোক দেখাইয়া অপরাপর মসজিদগুলিকে নামাজের সময় বলিয়া দেয়। তখন একই কালে ও এক সঙ্গে সমস্ত মসজিদে যে আজান দান উত্থিত হয় তাহা বাস্তবিকই শুনিবার উপযুক্ত।

মুছালে একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। তথাকার মুসলমান [illegible] বা তুরস্কের মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত; তাহারা নিজেদের মত এমন কি [illegible] দেশের মুসলমানদিগের মতও এত ধর্ম্মের গোঁড়া নহে। ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই [illegible] অন্তর্হিত হইতেছে ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু মুছালে [illegible] মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি ইহুদি এমন কি হিন্দু পর্য্যন্ত তথাকার মন্দিরে [illegible] করিয়া নির্দ্দিষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু শিখপ্রধান [illegible] কারবালাতে কোন অ-মুসলমানের পক্ষে মুসলমান ধর্ম্ম মন্দির [illegible] লাভ দুরূহ।

মুছালের কথ্য ভাষা [illegible] আছে। তাহার মধ্যে তুর্কি, কুর্দ্দিশ, আরবি ও ভেষ্টন [illegible] প্রধান। এতগুলি কথ্য ভাষা [illegible] তাহারা তাহার উপযুক্ত হইয়াছে। তাহারা [illegible] নিজেরাই নামে কুর্দ্দিস্থানের এক অংশ [illegible] অধীন [illegible] তুরস্কের অধীনে স্ব-শাসিত (Self go[illegible] মান আর খৃষ্টান অধিবাসীর [illegible] সমান। [illegible] সংখ্যা [illegible] ধর্ম্মাবলম্বী নাই বলিলেই চলে। [illegible] ইংরেজি [illegible] শিখা [illegible]

তাহাদের শিক্ষা তাহাদিগকে কেবল যে যান্ত্রিকভাবে [illegible] নহে, মানুষ হিসাবে পড়পক্ষে তাহারা [illegible] চাইছে ভাল না হইলেও মন্দ নহে। তাহাদের সাহস, [illegible] ধর্মবিশ্বাস, তাহাদের কর্তব্যবুদ্ধি আমাদের চাইতে [illegible] বেশী। দোষ তাহাদের থাকা অসম্ভব নহে এবং থাকেও [illegible] তাহার নাই? তাহা হইলেও গুণের ভাগ তাহাদের বেশী। [illegible] যারা বুঝায় তাহা তাহাদের আছে। মধ্যশ্রেণী [illegible] বিশ্লেষণে,—ইংরেজি না আসুক; আমাদের চাইতে [illegible] শিক্ষা তাহাদের আমাদের বর্তমান [illegible] শিক্ষা হইতে ভিন্ন [illegible] হইতে পারে, [illegible] তাহাদের মেয়েরা, [illegible] মুসলমান মেয়েরা পর্যন্ত [illegible] পড়া [illegible], খুঁটি [illegible] ও অন্যান্য শিল্প [illegible] তা ছাড়া [illegible] পাড়াগাঁয়ের [illegible]

[illegible] কিন্তু তাহাতেও [illegible] [illegible] তাহার পরিণত করিতে [illegible] প্রয়োজন হয় [illegible] তাহাদের নাই বলিলেই [illegible]। কেরলদের যাযাবর বেদুইন [illegible] কোন স্থায়ী বাসস্থান নাই [illegible] এখানে কয় সপ্তাহ উটের লোমের তাঁবু ফেলিয়া সপরিবারে [illegible] পুরী, ডাকাতি, লুঠন [illegible] এবং নরহত্যা [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] গোস্বামী।